আমাদের সমাজ

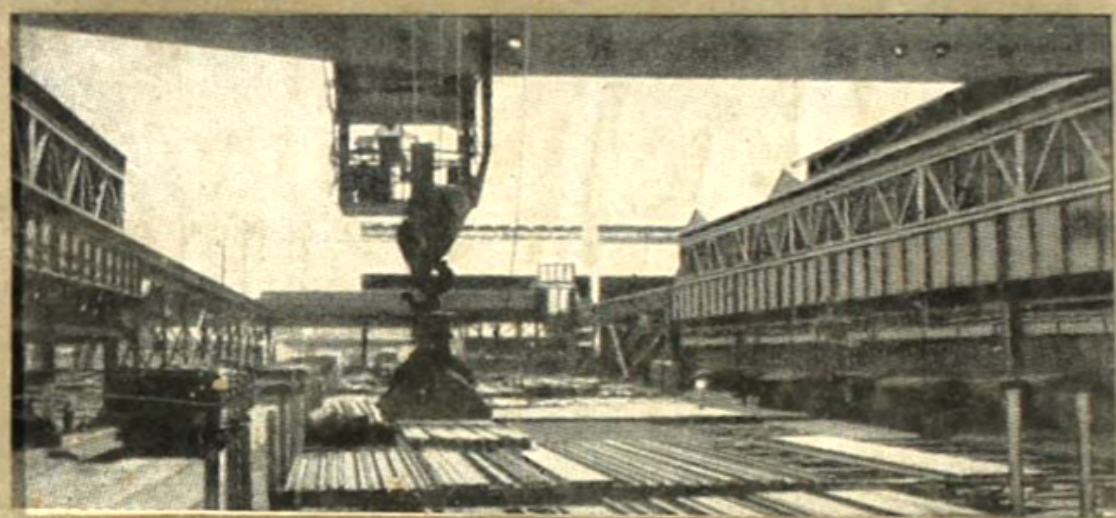

ম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা] ফাল্গুন • ১৩৬৪ [ফেব্রুয়ারী-মার্চ • ১৯

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

ভারতে সর্বাধিক
বিক্রয়ের গৌরব অর্জন
করেছে

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

লক্ষ্মী ঘিয়ে
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥

বলার মত কাহিনী

আমাদের কথা পাঁচজনকে বলার মতই। দেশের শিল্পোন্নতির ইতিহাসে আমরা একটা বিশেষ অধ্যায় জুড়ে আছি। ১৯৪৮ সালে আমাদের কারখানা থেকেই ভারতের রি' স্পিনিং ফ্রেম তৈরী হয়। তারপর আরও অনেক প্রথম তৈরীর কৃতিত্ব আমরা অর্জন করেছি—যেমন, প্যাকাশায়ার বয়লার ও ওয়াটার টিউব বয়লার। রূপার বাঁধে ভারতের কয়েকটী বৃহত্তম আকারের স্লুইস গেট তৈরি করেছি আমরাই। হীরাকুদ বাঁধের বিরাট বিরাট পাইপগুলিও আমরাই জুগিয়েছি। ভারতের রেলপথের জন্য নানারকম পরিবহন সরঞ্জাম ও লোকোমোটিভ বয়লার আমরা তৈরী করে থাকি। সিন্ধ্রিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক যন্ত্রপাতি তাও তৈরি করেছি আমরা। চিনি ও পাট শিল্পের জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি আমরা তৈরী করতে সুরু করেছি দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের জন্য বিভিন্ন উপকরণাদি আমাদের কারখানায় তৈরী হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ও পৃথিবীর সেরা কলাকৌশলের সহযোগিতায় আমাদের প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। এইভাবে ভারতের মৌলশিল্পের সহায়তায় টেক্সম্যাকো নিয়োজিত আছে।

টেক্সটাইল মেশিনারী কর্পোরেশন লিমিটেড

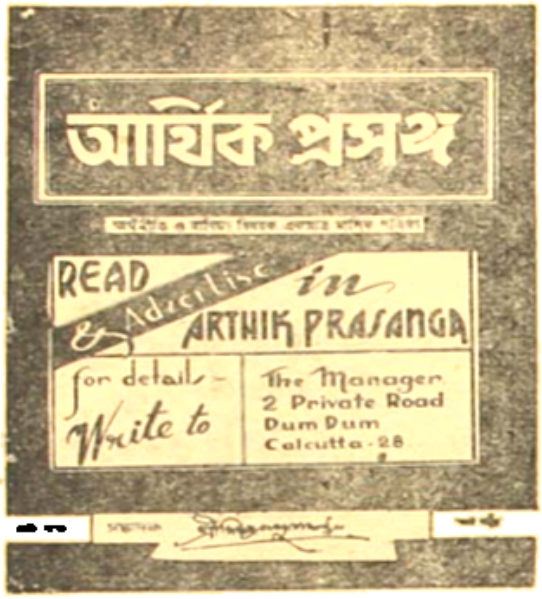

বার্ষিক চাঁদা— ৯৲ টাকা
ষাণ্মাসিক চাঁদা—৪৷৷০ "
ছাত্রদের জন্য :—
বার্ষিক—৩৷৷০ ষাণ্মাসিক—৪৲ টাকা
এই সংখ্যার মূল্য—দুই টাকা

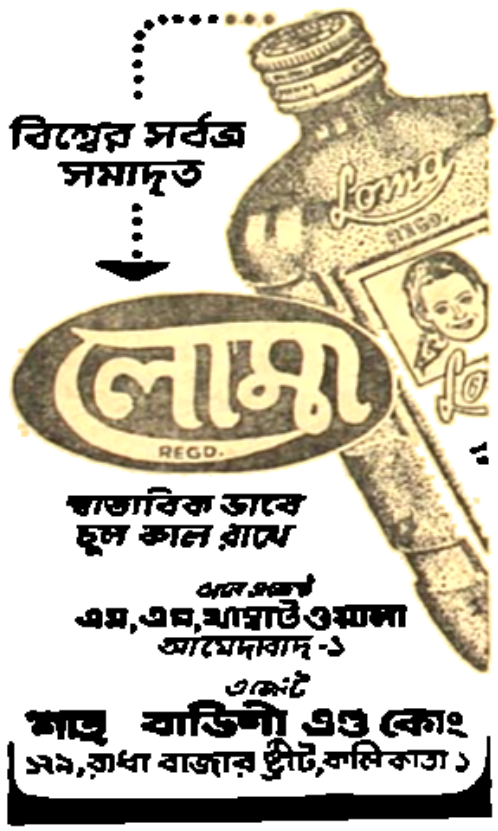

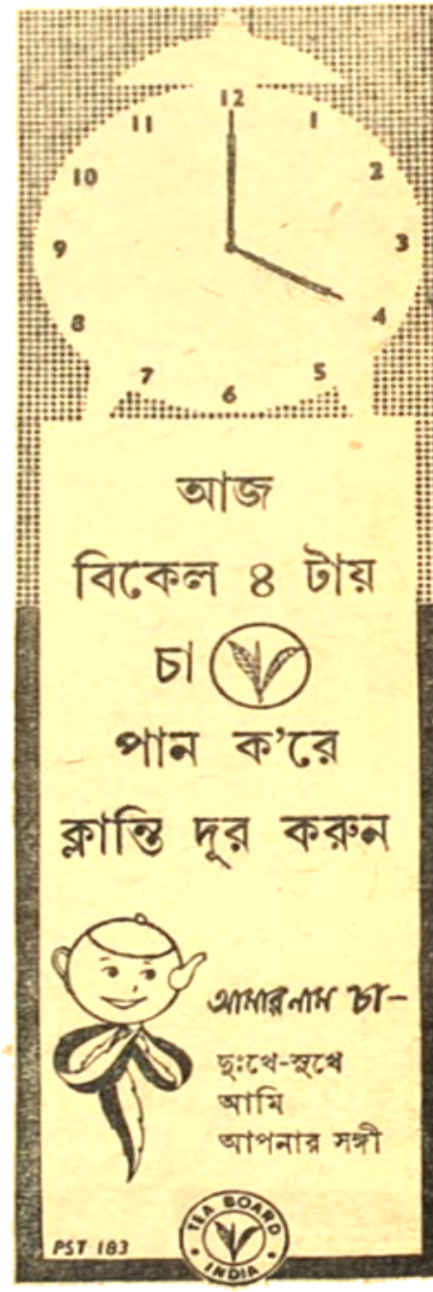

NATIONAL SHEET
Serves EVERY INDUSTRY

TIN PRINTERS AND
CONTAINERS MANUFACTURERS
INCLUDING
DRUMS KEGS BUCKETS Etc

PHONE: 55-4696 GRAM: NASMET WORK

NATIONAL SHEET & METAL WORKS
PRIVATE LIMITED.

36-A, SAHITYA PARISAD ST. ★ CALCUTTA-6

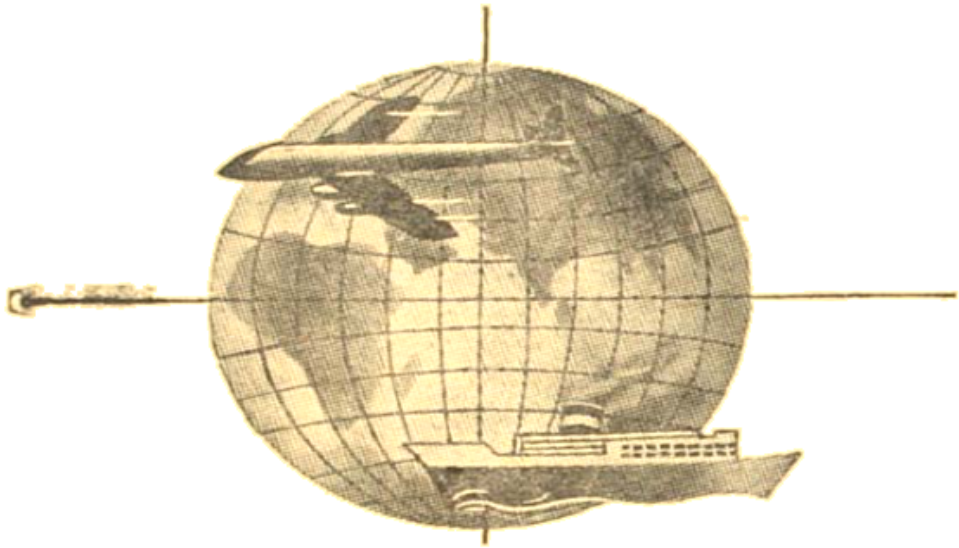

জাতীয় পরিকল্পনা ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার ...

সকল দেশেই বিশেষতঃ এই ভারতীয় পরিকল্পনার যুগে, দেশের সমৃদ্ধিসাধন বহুলাংশে বহির্বাণিজ্যের প্রসারে সাপেক্ষ। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের প্রসার বর্তমানকালে নির্ভর করে দেশের উন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর।

বহির্বাণিজ্য ব্যাপারে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অভিজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ববিধ সাহায্যদানে সদা তৎপর।

পৃথিবীর যাবতীয় উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্রে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নিজস্ব এজেন্ট ও করেসপনডেন্ট আছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক

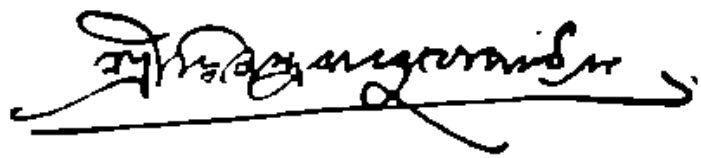

ফাল্গুন : ১৩৬৪

ফেব্রুয়ারী—মার্চ : ১৯৫৮

কার্য্যালয় :
২, এ্যাইকোট রোড, বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬
লিটল অফিস
১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯

এই সংখ্যার মূল্য দুই টাকা

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অবস্থায় যে রোগ প্রকাশে রক্তের দূষিত হয়, রক্ত প্রবাহের সঙ্গেই তার দূষিতত্ব হয়। তাই রক্তের সংস্পর্শের প্রথমে উপকার পাওয়া যায়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিভিন্ন রক্তের মাধ্যমে তা সমস্ত দেহে দূষিত হয়ে ওঠে।

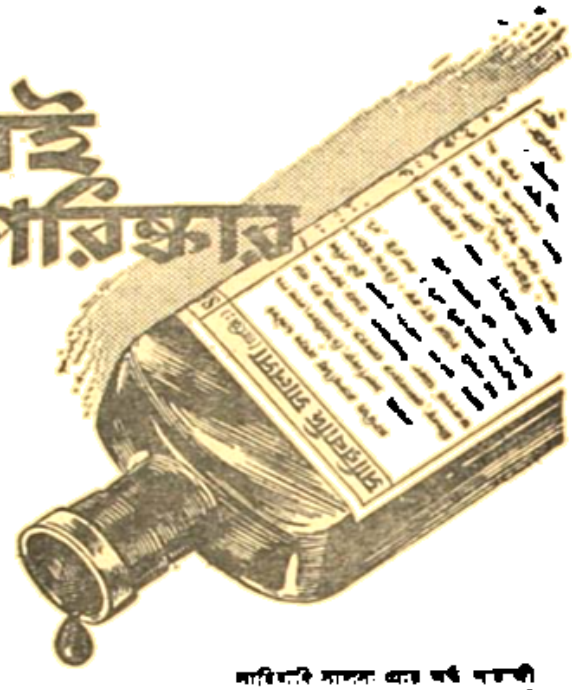

সারিবাদি সালসা প্রথম বার পানকারী থেকে অভ্যাস সেবীর সর্বাঙ্গে রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রমাণিত। সারিবাদি সালসা সেবনে বিষাক্ত ফোঁড় সারিয়ে হয়, ঘেমে, পাঁচড়া, দুষ্ট ক্ষত, এবং অন্য দূষিত সর্বপ্রকার চর্মরোগ, রক্ত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, শিরার নীলা আকারিক হয়, মুখ সুন্দর পাক এবং শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ নূতন রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধি

কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-বি (কলিঃ), আয়ুর্বেদ-আচার্য্য।

৯৯এ মোহনবাগান রোড, কলিকাতা-৪২

- সাধনা ঔষধালয়
- ঢাকা

আসা ও এসেন্সী-পুরিবির প্রকৃত

সার্থকের পথে একটি স্বপ্ন

এ শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি নয়। যে বিপুল আয়োজন পরিকল্পনা রূপায়িত করছে ও সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, কেবল তেল খুঁড়তে ৫০ মাইল দূরে একটি গ্রামে এই ছবিটি তোলা হয়েছে। সেখানে এখন একটি তেল কূপ খনন করা হচ্ছে। ভবিষ্যৎ সুখের সম্ভাবনায়। কত দূরত্ব থেকে, কত কষ্ট স্বীকার করে। এ দেখেছে যে এই বিপুল কর্মযজ্ঞের অংশে সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে— একটা স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। এরাও এ বিরাট কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিয়োগ করে নিজের প্রয়োজনীয় কিছু কিছু উৎপাদন করতে পারবে। এ ছাড়া নিজের আয় বাড়াবার মত ও হয়তো ছোট একটা মুদীর দোকান গড়ে তুলবে।

ভারতের এরকম আরও অনেক নবীন উদ্যোগী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ হচ্ছে। এর ফলে আরও অনেক গ্রামে যেতে দেখা যাবে, নিত্যের চাহিদাগুলি মেটাবার জন্য সেখানে কারখানা গড়ে তোলার শক্তি পাওয়া যাবে, বন্যার হাত থেকে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা যাবে। কিন্তু এজন্যের জন্য চাই অনেক টাকা।

আপনার সকল টাকা খরচ না করে, যা কিছু আপনি জাতীয় পরিকল্পনা রক্ষায় সার্টিফিকেটে অথবা সঞ্চয়ের অন্য কোন পরিকল্পনায় রাখুন, তাতেই সরকারের হাতে আসে। আপনার টাকাটা আপনার কাছেই ফিরে আসবে, আর সেই সঙ্গে আয়করমুক্তির সুযোগও পাবেন।

১২ বছরের জাতীয় পরিকল্পনা

সঞ্চয় সার্টিফিকেট

- প্রতি বছরে শতকরা ৪.৯১ টাকা আয়কর-বিহীন সুদ
- সমস্ত পোষ্ট অফিসে ৫ টাকা থেকে ৫০০০ টাকার সার্টিফিকেট বছরেই পাওয়া যায়।
- ভারত সরকার এগুলির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন।

অন্য সঞ্চয় পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য সরকারী সিকিউরিটি

১০ বছরের ট্রেজারী সেভিংস ডিপোজিট সার্টিফিকেট।
পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

এই সব স্কীম সম্পর্কে আরও তথ্য ও বিবরণের জন্যে যান, আপনার ডেপুটি কমিশনার, মহকুমা অথবা আপনার অঞ্চলের আঞ্চলিক সঞ্চয়ক্ষেত্র সেক্রেটারি অফিসারের কাছে লিখুন।

শক্তির জন্য ইস্পাত

জাতির শক্তিবৃদ্ধির জন্যই ইস্পাতের প্রয়োজন। মূল এবং ভারী শিল্পের জন্য, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের জিনিষপত্র তৈরী করার জন্য বহু কল-কব্জার দরকার। কল-কব্জার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হোল ইস্পাত। ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুরে যে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে, সেগুলি থেকেই সরবরাহ করা হবে প্রয়োজনীয় ইস্পাত। লক্ষ লক্ষ টন ফসল এবং লক্ষ লক্ষ ওয়াট বিদ্যুৎ শিল্পগুলিতে জোগাবে শক্তি।

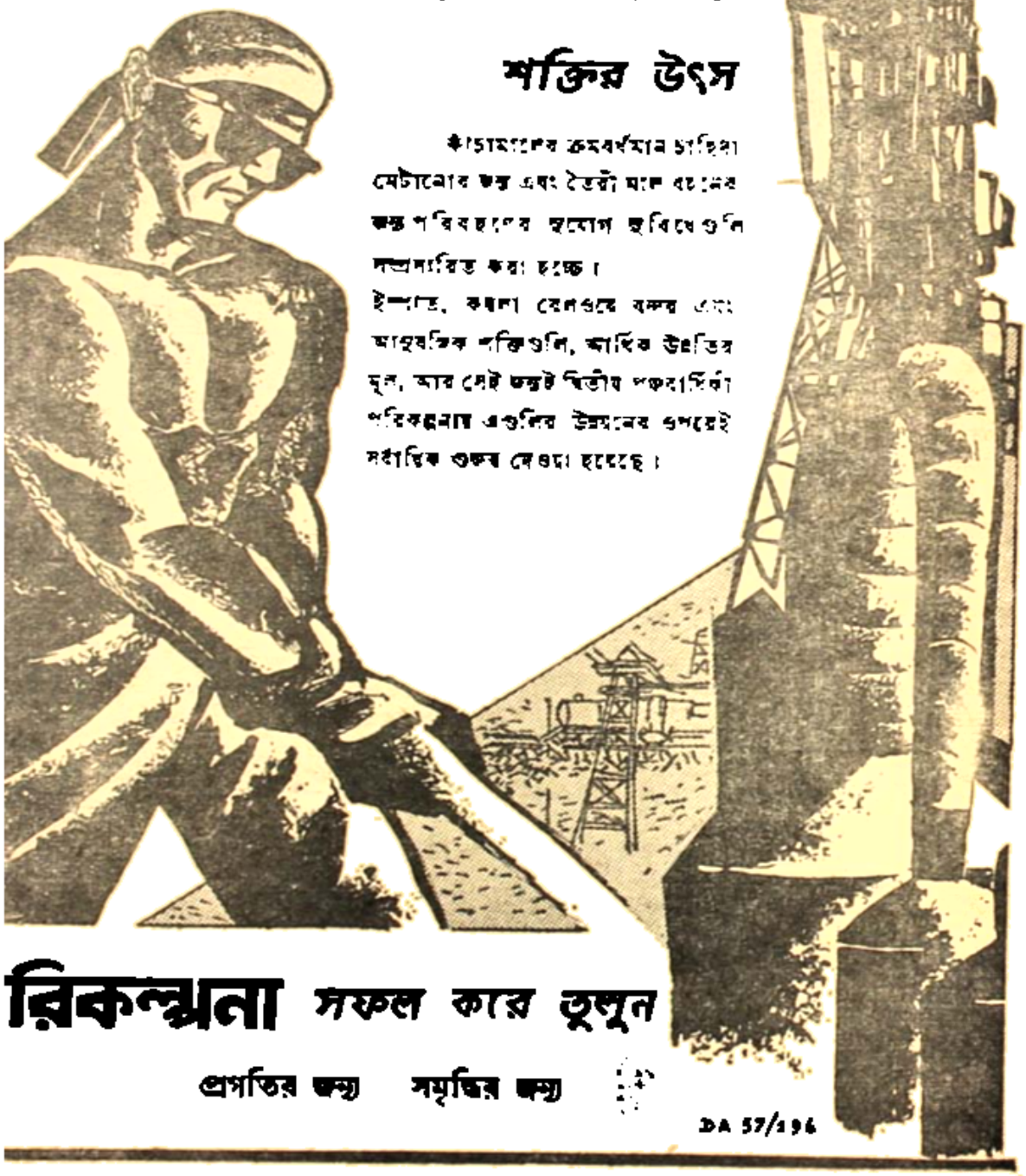

শক্তির উৎস

কারখানার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য এবং তৈরী মাল বহনের জন্য পরিবহণের সুযোগ সুবিধেগুলি সম্প্রসারিত করা হচ্ছে।

ইস্পাত, কয়লা যোগানের যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক শক্তিগুলি, আর্থিক উন্নতির মূল, আর সেই জন্যই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এগুলির উন্নয়নের ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রিকল্পনা সফল করে তুলুন

প্রগতির জন্য সমৃদ্ধির জন্য

DA 57/196

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা] সূচীপত্র [ফাল্গুন, ১৩৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
বর্ষ পরিক্রমা	১
ভারত সরকারের বাজেট	৪
ভারতের মত উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কাঠামোসম্পন্ন দেশের করনীতি—অধ্যাপক শ্রীঅলক ঘোষ	৯
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সংকট—অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু	১১
শ্রীমুদ্রা দর্শন—অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার মিত্র	১৪
দান কর—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	১৭
সমাজবাদী সমাজের পথে ভারত—অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	২০
উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থ নিয়োগের জন্য জাতীয় সঞ্চয়—শ্রীবিমল চন্দ্র সিংহ	২৪
ভারতের জাতীয় সংবেদ মূল্যের —অধ্যাপক এম. এস. ধাকার	২৫
ভবিষ্যতের সমাজতন্ত্র—শ্রীআভাস দাসগুপ্ত	২৯
ভারতের বহির্বাণিজ্য—শ্রীঅতনকুমার মুখোপাধ্যায়	৩৩
ভারতের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭
বাংলা পরিভাষা—অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জকুমার মজুমদার	৪৩
টাকার মূল্য ও অধ্যাপক বি আর সেনয়—শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	৪৪
ভারতীয় অর্থনীতিতে কুটীর ও আয়তন শিল্পের স্থান—শ্রীব্রজবল্লভ রায়	৪৬
১৯৫৭ সালে শিল্পোন্নয়নে ভারতের অগ্রগতি	৫০
খনিজ তেলের কথা	৫২
খাদ্য-সমস্যার আশু সমাধান—শ্রীঅচল বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫
ভারতের রাস্তা উন্নয়ন ও মোটরগাড়ী শিল্প—শ্রীসুবলকুমার চক্রবর্তী	৫৭
কয়লার ভবিষ্যৎ—অকুর	৫৯
চা-শিল্পে মজুরী বনাম উৎপাদন হার বৃদ্ধি—শ্রী চা-কর	৬১
জামসেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অর্ধ শতাব্দী অনুষ্ঠান	৬৭
অর্থনৈতিক সমাজে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব	৬৯
গ্রন্থ-পরিচয়	৬৯
যৌথ কোম্পানী প্রসঙ্গ	৭৩
টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানার একটি দৃশ্য	প্রচ্ছদপট

সৌন্দর্য্যে ও সংরক্ষণে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট য়্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা : আসানসোল : শিলিগুড়ি : মাদ্রাজ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অবদান——

স্বাধীনোত্তরযুগে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সকল রূপায়নের দ্বারা ভারত অর্থনৈতিকক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই সমৃদ্ধির পথে আর একটি পদক্ষেপ। আশাবাদী পরিকল্পনার সার্থক সাফল্যের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের অবদানও কম নয়।

জাতির সেবায় আমরাও সাধ্যমত নিম্নলিখিত কর্মক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হইতেছি।

ঔষধপত্রাদি—ওষধ, বিবিধ ভেষজদ্রব্য ও ইন্‌জেকশান
রাসায়নিক দ্রব্যাদি—সল্ফ, ডাবী ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী
ল্যাবরেটরী রি-এজেন্টস—এই সকল দ্রব্য উচ্চমান সম্পন্ন ও সরকারী মানকসংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তুত
সাবান ও প্রসাধন সামগ্রী—মার্গো সাবান, নিম টুথপেষ্ট ইত্যাদি
নানাবিধ তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্য
বীজাণুনাশক ও প্রতিরোধক দ্রব্যাদি

ক্যালক্যাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

প্রধান কার্যালয়—০৫, পত্তিত্তিয়া রোড, কলিকাতা-২৯

ভারতের অন্যান্য শাখা ও বিক্রয়কেন্দ্র

দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, ভিজাগাপট্টম, রাঁচী, পাটনা, জামসেদপুর, নাগপুর, বিলাসপুর, শিলিগুড়ি, ব্যাঙ্গালোর, আসানসোল এবং মধুপুর

সামান্য একটু সৌজন্য

শীতের রাতে ট্রেনের
কামরায় জোয়ান মানুষ
সারা বেঞ্চি জুড়ে কম্বল মুড়ি
দিয়ে শুয়ে আছে···
পাশেই হয়ত বাচ্চা এক ছেলে
মালপত্রের ওপর ঠায়
বসে' শীতে
কাঁপছে···এক কোণে ভীড়ের
চাপে কোন মহিলা
হয়ত কষ্ট পাচ্ছেন···বুড়ো
অথর্বদের ফিরে
দেখছেই না কেউ···ট্রেনের
কামরায় এই ধরনের
অপ্রীতিকর দৃশ্য
হামেশাই চোখে পড়ে।
অথচ সহযাত্রীদের
সামান্য একটু
সৌজন্যে সকলের
পক্ষেই ট্রেন-ভ্রমণ প্রীতিকর
হ'য়ে উঠতে পারে।
মিষ্টি কথা আর আন্তরিক
ব্যবহারে পথের অনেক
কষ্ট অনেক অসুবিধাই
হাসি মুখে সহ্য করা যায়।

পূর্ব রেলওয়ে

খাদ্য উৎপাদনে অগ্রগতি...

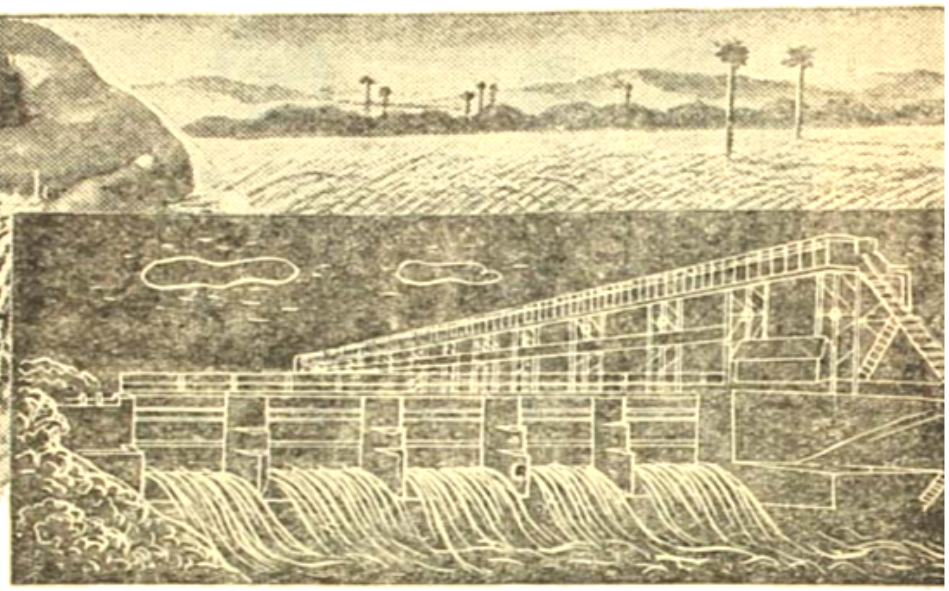

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে ১৮০ মাইল জায়গা জুড়ে বয়ে চলেছে দুরন্ত ময়ূরাক্ষী নদী। মাসাঞ্জোরে একটি বাঁধের সাহায্যে গতি নিয়ন্ত্রিত করে মোট ৯৩ মাইল লম্বা খালের মধ্য দিয়ে জল চালিয়ে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৩৩০,০০০ একর এবং নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত ১২০,০০০ একর জমি সিঞ্চিত হবে।

যে সব জমিতে এতদিন বছরে মাত্র একটি করে অল্প ফসল ফলতো এখন সে সব জমিতে বছরে দু'বার প্রচুর ফসল ফলবে। তাছাড়া ২০,০০০ একর পতিত জমি আবাদী জমিতে পরিণত হবে এবং সেখানে ৩০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হতে পারে এমন একটি হেমেরেটিং প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে।

ময়ূরাক্ষী বাঁধ এবং এর সহায়ক তিনটি বাঁধের ও খাল কাটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর দ্বারা প্রায় ৬০০,০০০ একর জমিতে সেচ কার্য চলেছে।

অনুমিত ১৬ কোটি টাকা এই পরিকল্পনার ব্যয় হবে। কিন্তু এর ফলে যে বাড়তি ফসল ফলবে তার মূল্য হবে বছরে আনুমানিক ৮ কোটি টাকা। ৮০,০০০ একর জমির উপর পরীক্ষা করে এই হিসাব পাওয়া গেছে।

এইভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা এবং নিষ্ঠা নিয়ে সকলের সহযোগিতায় আমরা গড়ে তুলবো।

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা

সোনার বাংলা

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা] [ফাল্গুন, ১৩৬৪

বর্ষ পরিক্রমা

আর্থিক প্রসঙ্গ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। দীর্ঘ ছয়টি বৎসর ধরিয়া আর্থিক প্রসঙ্গ ইহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে নানা বাধা-বিঘ্ন ও অসুবিধা-অন্তরায়ের মধ্য দিয়া। প্রতিটি বৎসর সমাপ্তির পর আর একটি বৎসরের সূচনায় প্রতিবারই আর্থিক প্রসঙ্গের সংগ্রাম-ক্লিষ্ট যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত জীবনের দীর্ঘ কাহিনীর কথা মনে পড়ে। মানুষের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা মানুষের মনকে এমনি আলোড়িত করে তাহার প্রতিটি জন্মদিনে। আর অধিক বয়সেই এই জন্মদিন বোধহয় অধিকতর পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। তাহার কারণ বোধহয় অতীত যত দীর্ঘ হয় ততই স্মৃতিসমৃদ্ধ হয়। পিছনে ফেলিয়া আসা দিনগুলির দুঃখ-দৈন্য, করুণা, সুখ, আশা আনন্দ সব মিলিয়া একটি একটি করিয়া দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া যে মালা গাঁথা হয়, তাহারই দিকে আবার দৃষ্টি পড়ে জন্মদিনের পুনরাবৃত্তিতে। স্মৃতিসমৃদ্ধ অতীত জন্মদিনে মানুষকে বিহ্বল করিয়া তোলে—কখনও আনন্দের আতিশয্যে—যাহা পাইয়াছি, যাহা সৃষ্টি করিয়াছি, যাহা দিতে পারিয়াছি অকাতরে, অকপট মনে, কখনও বা বেদনামূর্ত করিয়া তোলে—যাহা দিতে পারি নাই, শত চেষ্টা করিয়াও যাহাকে হারাইয়াছি, সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করিয়াও যাহাকে রাখিতে পারি নাই, তাহাই মনে পড়ে বারংবার এই দিনটিতে।

একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক মানুষের জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেইজন্যই আজ বর্ষপূর্তি দিবসে এবং নব বৎসরের সূচনায় ছয়টি বৎসরের অতীত কাহিনীগুলি একটি একটি করিয়া মনে পড়িতেছে। প্রথম দিনে যাহারা ছিল, তাহাদের অনেকেই আজ নিকটে নাই; কেহ মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে কেহবা আরও নিকটে আসিয়া একাত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে: সকলের কথাই আজ বিশেষ করিয়া মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছে। দীর্ঘ ছয়টি বৎসরে যাহাদের অযাচিত স্নেহ-শ্রদ্ধায় আর্থিক প্রসঙ্গ সঞ্জীবিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট অন্তরের একান্ত কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। আশা করি দুঃখে-সুখে, দূরে ও নিকটে তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত শুভেচ্ছা আমরা নিরন্তর পাইতে থাকিব।

• • •

আর্থিক প্রসঙ্গের একটি বৎসরের পর্যালোচনা করিতে গিয়া ভারতের ও ভারতের বাহিরে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে যেমন নিরতিশয় দুঃখ অনুভব করিতেছি তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে সাফল্যের গৌরবের আনন্দ উপলব্ধি করিতেছি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এখনও মারণাস্ত্র বিশ্বের আবহাওয়াকে কলুষিত করিতেছে। মিশর ও হাঙ্গেরিয়ার অশান্তি নির্বাপিত হইলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়াতে অশান্তি পুনরায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অ্যালজিরিয়া এখনও শান্ত হয় নাই। ভারতের ভূখণ্ডে গোয়ায় পর্তুগীজ অত্যাচার এখনও পুরা মাত্রায় চলিতেছে। পরশ্রীকাতর পাকিস্থান নিজের সমস্যা সমাধান করিতে পারে নাই; তবুও ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষদার ও হীন

চক্রান্ত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে নাই। শতাধিক বৎসরের ভারতবাসী পাকিস্তানী হইয়া এখনও বিদেশী কবলের প্রবুদ্ধ মোহ হইতে আত্মরক্ষার পথ পাইল না; পরন্তু তাহাদেরই প্রয়োচনায় ভারতের কাশ্মীর লইয়া জিঘাংসার মত্ততায় নিজেদিগকে আত্মঘাতিতে ভরিয়া তুলিতেছে, ইহাতে দুঃখ হয়।

ভারতের অভ্যন্তরে ব্যাপক পরিকল্পনার বিরাট সাফল্যের কাল্পনিক প্রচেষ্টার যে ধুম-ধাড়াক্কার আয়োজন চলিতেছে, তাহাতে করভারের প্রবল চাপ, মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক বাণিজ্যসঙ্কট ভোগ্য, পণ্যের অভাব, বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি তৎসহ খাদ্যাভাব সমগ্র আভ্যন্তরীণ পরিবেশকে ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছে। জানি না মানুষের দুঃখদিনের মুক্তির কামনায় এই পরিকল্পনা কতদূর সফল হইবে; বুঝিতে পারি না, ইহাই সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার স্বরূপ কিনা; এখনও সংশয় হয় গান্ধীজি ভারতের জন্য এমনি পরিকল্পনা কামনা করিয়াছিলেন কিনা! বে-সরকারী ক্ষেত্রে মুনাফালোলুপ অধিকগোষ্ঠীর শোষণ, সরকারী ক্ষেত্রে রাজকর্মচারীদের অযোগ্যতা, অবহেলা ও জাতীয় স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা, ব্যক্তি-নির্বিশেষে মন্ত্রীমণ্ডলীর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব, দলীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার বিরাট পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গণসহযোগিতাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাই মনে হয় জাতির সর্বাত্মক কল্যাণের এমনি পদ্ধতি বাঞ্ছনীয় কিনা!

আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের আলোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে খাইকারী দ্রব্যের মূল্যের গতি ১৯৫৭ সালের আগষ্ট বাড়িতে বাড়িতে ১১২ (১৯৩৯=১০০) বিন্দুতে উঠিয়াছিল। বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতিও সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। ২৫২ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল নিঃশেষ হইয়াছিল। মুদ্রাস্ফীতি চরম অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তজ্জন্য বিভিন্ন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসৃতও হইয়াছিল।

খাদ্য উৎপাদন—কৃষি শস্যের উৎপাদন ১৯৫৬-৫৭ সালে সামগ্রিক ভাবে ১২৩ বিন্দু পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার শতাংশ ছিল ১১৫·৯ মাত্র। তণ্ডুল শস্যের উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ সালে ৫৩·৫ মিলিয়ন টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৬-৫৭ সালে ৫৭·৩ মিলিয়ন টন হইয়াছিল। চাউল উৎপাদন ১৩ লক্ষ টন বেশী হয় এবং গমের উৎপাদন ৫ লক্ষ টনের মত বেশী হয়। অন্যান্য তণ্ডুল শস্যের উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়াছিল কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সাল অপেক্ষা ১৯৫৬-৫৭ সালে ইহা হ্রাস পাইয়াছে।

বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের মধ্যে ইক্ষু (গুড় হিসাবে) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৫·৫৮ মিলিয়ন টন হইতে ৬·১৫ মিলিয়ন টন বেশী হইয়াছিল। তূলার উৎপাদনও ঐ সময় ১০ লক্ষ বেল হইতে ৪৭·২ লক্ষ বেলে পরিণত হয়। চীনাবাদামের উৎপাদনও এই বৎসর বেশি হয়। পাট ও চায়ের উৎপাদন মোটামুটি ১৯৫৫-৫৬ সালের মতই ছিল। বাণিজ্যিক ফসলের বিভিন্ন সামগ্রিক ভাবে ৮ শতাংশের মত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নিম্নে এই তালিকাটি দেওয়া হইল।—

কৃষি উৎপাদন

	(১০ লক্ষ টন হিসাবে)		শতাংশ বৃদ্ধি
	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	
চাউল	২৬·৮৫	২৮·১৩	৪·৮
গম	৮·৫৭	৯·০৭	৫·৮
অন্যান্য তণ্ডুল শস্য	৫৩·৫৬	৫৭·২৫	৫·১

সমস্ত খাদ্য শস্য	৬১·২৯	৬৮·৬৯	৫·৪
তুলা (দশলক্ষ বেল)	৪·০০	৪·১২	১৩·১
পাট (,, ,,	৪·২০	৪·২২	পাওয়া যায় নাই
চীনাবাদাম (,, টন)	৫·৯৮	৬·১৫	১৩·৬

শিল্প উৎপাদন—শিল্প উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু গত দুই বৎসর অপেক্ষা নিম্ন হারে। ১৯৫৪ সালে উৎপাদন সূচী ছিল ১১৩, ১৯৫৫ সালে ১২২, ১৯৫৬ সালে ১৩৩। ১৯৫৭ সালে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে প্রায় ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই উৎপাদনের হার ভোগ্যপণ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রায় সমভাবে লক্ষিত হইয়াছিল। তবে শিল্পবিশেষে কোথাও বেশী বা কোথাও কম হইয়াছে। সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় পরিকল্পনা কালিক ৫ শতাংশ অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে।

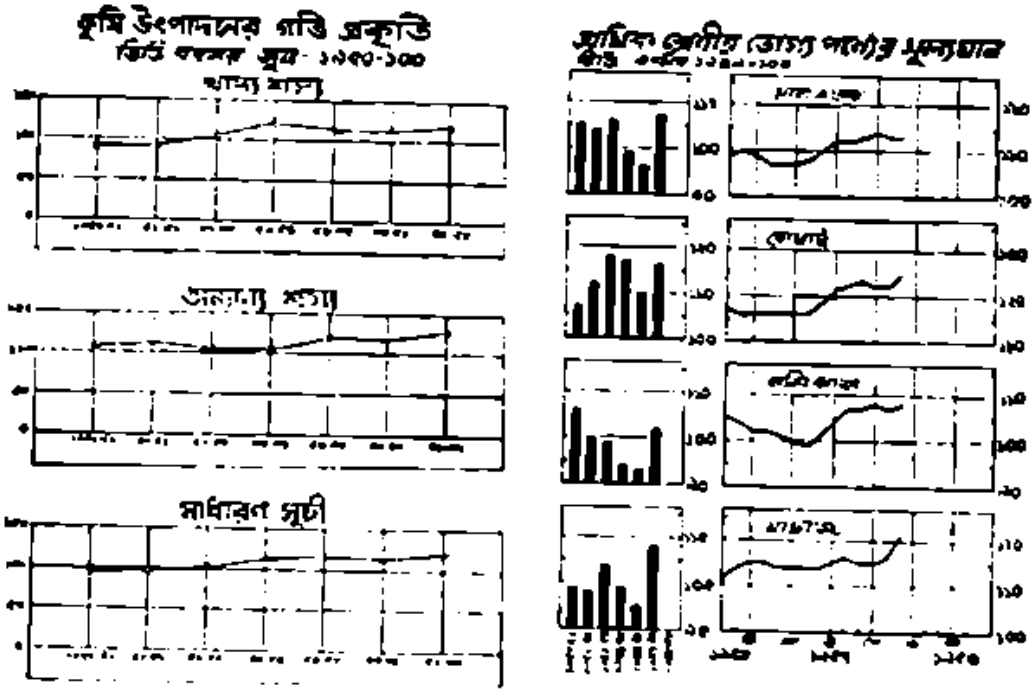

মূল্যের গতি—যে অর্থনীতিতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা নাই, বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিও সুবিধাজনক নয়, সেখানে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী। ১৯৫২-৫৩=১০০ ভিত্তি ধরিলে দেখা যায় যে ১৯৫৬ সালে এপ্রিল মাসে ১০০ হইতে নভেম্বরে মূল্যমান ১০৯ হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ইহা আবার ১০৬ হয় ও পরে জুলাই-আগষ্ট মাসে ইহা ১১২তে পরিণত হয়। ১৯৫৮ সালের প্রথমে ইহার পুনরায় হ্রাস পায়। ঐ সময় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পায়। গমের মূল্য মোটামুটি ১৯৫৬ সালের স্তরেই থাকে। শিল্পজাত কাঁচা মালের মূল্য ১৯৫৭ সালের প্রথমভাগ হইতে ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে ১২২ হয় এবং বৎসরের শেষে পুনরায় নামিয়া আসে। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মূল্যমানও অনবিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে তবে উল্লেখযোগ্য যে জীবনযাত্রার সর্বাদীন ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় লোকের ক্রয়-ক্ষমতা আশাতীতভাবে হ্রাস পাইয়া অর্থ সংকটের সৃষ্টি করিয়াছে। নিম্নে পাইকারী মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির একটী বিবরণ দেওয়া হইল :—

পাইকারী দ্রব্যের মূল্যহার

(১৯৫২-৫৩ = ১০০)

	ডিসেম্বর ১৯৫৬	আগষ্ট ১৯৫৭	ডিসেম্বর ১৯৫৭
তণ্ডুল শস্য	৯৭	১০৬	৯৮
খাদ্যশস্য (তণ্ডুল শস্যসহ)	১০৫	১১২	১০৪
শিল্পের কাঁচামাল	১১৬	১২০	১১৫
কারখানাজাত দ্রব্য	১০৯	১০৯	১০৮
	১০৮	১১২	১০৭

আর্থিক হালচাল—১৯৫৭ সালে লোকের হাতে টাকার পরিমাণ ৯৭ কোটী টাকার মত বাড়িয়াছিল। ১৯৫৬ সালে ১৩২ কোটী টাকা ও ১৯৫৫ সালে ২১৫ কোটী টাকা বাড়িয়াছিল। ১৯৫৭ সালে এই টাকার পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা কম হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে এই বৎসর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক তহবিল ৩২৭ কোটী টাকার মত হ্রাস পায়। পূর্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ১৯১ কোটী টাকা। সুতরাং উভয় টাকা মিলিয়া আভ্যন্তরীণ বাজারে তেজীভাব ছিল। সামগ্রিক বিচারে দেখা যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ঋণ ৩৭৮ কোটী টাকা বৃদ্ধি পায়। উহার পরিমাণ ১৯৫৫ সালে ১৪৬ কোটী টাকা ও ১৯৫৬ সালে ২৪২ কোটী টাকা। বেসরকারী ক্ষেত্রেও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সরকারী ঋণও বাড়িয়া চলে। অবশ্য ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাও প্রবলভাবে দেখা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংকটজনক পরিস্থিতি ১৯৫৬ সালের এপ্রিল হইতে সারা ১৯৫৭ সাল একইভাবে চলিয়াছিল। চলতি ঘাটতির পরিমাণ ১৯৫৬-৫৭ সালে ২৯০ কোটী টাকা হইয়াছিল এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের প্রথমার্ধে ২৯৮ কোটী টাকা পর্যন্ত উঠিবে অনুমান করা যায়।

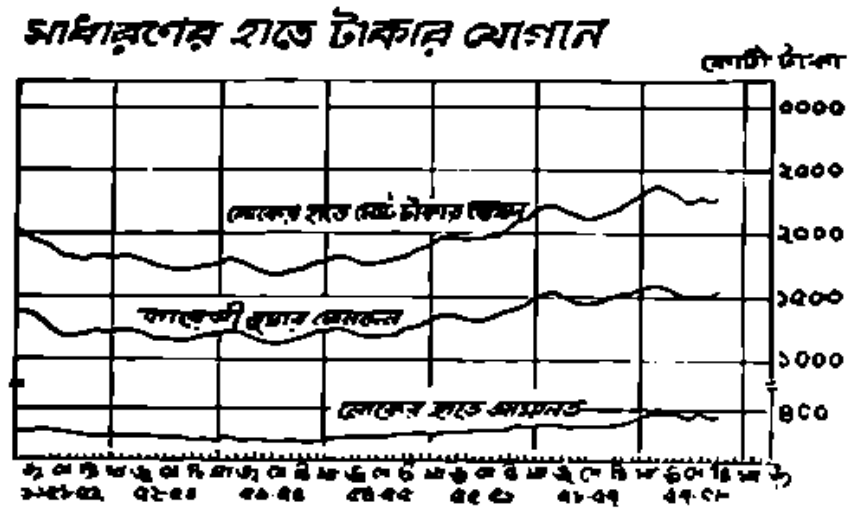

এহেন আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট পরিস্থিতিতে পরিকল্পনার রদবদল সম্পর্কে আলোচনা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন মহল মনে করেন যে পরিকল্পনার রূপায়নে কোন অসুবিধা হইবে না। সাময়িক অসুবিধা দূর হইয়া বর্তমান সংকটের অবসান ঘটিবে। কোন কোন মহল মনে করেন, পরিকল্পনার নামে অতিরিক্ত ঝুঁকি লওয়া ঠিক হইবে না এবং অত্যাবশ্যক নয় এমন পরিকল্পনাগুলি বাদ দেওয়া বা বিলম্বে আরম্ভ করিলেও চলিতে পারে।

* * *

উল্লিখিত পরিবেশে ও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট লোকসভায় উপস্থাপিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য এবারের বাজেট অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী পেশ করিতে পারেন নাই। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু লোকসভায় ও রাজ্যসভায় এই বাজেট পেশ করেন।

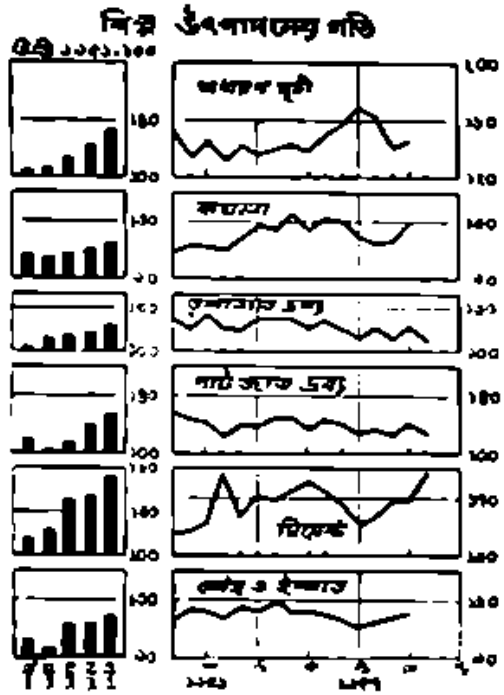

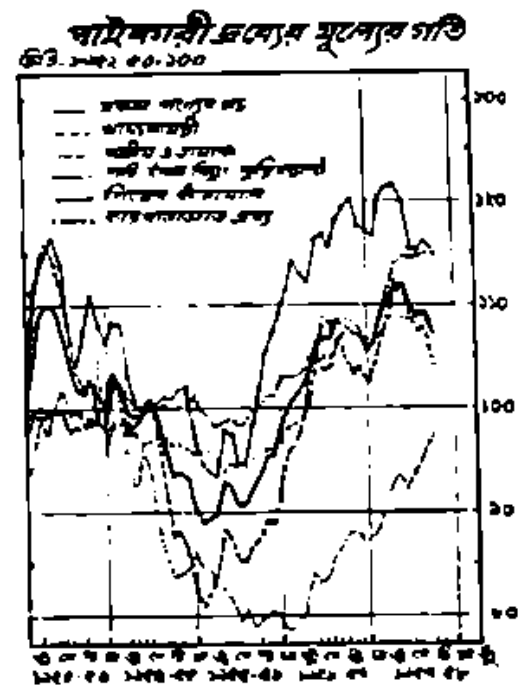

বাজেট এক নজরে

বাজেটের চূড়ান্ত হিসাবের সংক্ষিপ্ত রূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(লক্ষ টাকায়)

	১৯৫৭-৫৮ সনের		১৯৫৮-৫৯ সনের বাজেট
	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	
মোট আয়—	৭০৮,০৩	৭২৪,৬৩	৭৬৩,১৬ + বাজেট প্রস্তাবের ফলে প্রাপ্ত ৫,৮৩
মোট ব্যয়—	৬৭২,২৯	৭১৯,৫৮	৭৯৬,০১
	+৩৫,৭৪	+৫,০৫	—২৭,০২

(+ = উদ্বৃত্ত ও — = ঘাটতি)

ভারত সরকারের বাজেট

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু অর্থমন্ত্রীরূপে লোকসভায় ভারত সরকারের ১৯৫৮–৫৯ সালের বাজেট পেশ করেন। বর্তমানে যে হারে কর ধার্য আছে তদনুসারে বাজেটে রাজস্ব খাতে ৩২ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু অর্থমন্ত্রী আগামী বৎসরে যে সমস্ত নূতন কর ধার্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা হইতে ৬ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইহার ফলে চূড়ান্ত ঘাটতির পরিমাণ ২৭ কোটী তিন লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে বলে মনে হইতেছে। বাজেটে এই ঘাটতি পূরণের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

শ্রীনেহরু বলেন যে, লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে করের কাঠামোর ইতস্ততঃ পরিবর্তন করা যাইতে পারে; কিন্তু গত বৎসর যে সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা বলবৎ থাকিবে।

আগামী বৎসর প্রতিরক্ষা খাতে ২১৮ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা এবং অসামরিক খাতে ৫১৭ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা আগামী বৎসর প্রতিরক্ষা খাতে ১২ কোটী ৯ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে।

দান-কর ধার্যের প্রস্তাব—শ্রীনেহরু প্রত্যক্ষ কর হিসাবে দান-কর ধার্যের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে, কোন এক বৎসরে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দান করা হইলে তাহা এই করের আওতা হইতে রেহাই পাইবে। দান-কর ধার্য করিয়া তিন কোটী টাকা লাভ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এতদিন এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মৃত্যু-কর হইতে রেহাই দিবার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে উহার পরিমাণ হ্রাস করিয়া ৫০ হাজার টাকা করা হইয়াছে।

সিমেন্টের উপর উৎপাদন শুল্ক টন প্রতি ২০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ২৪ টাকা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সিমেন্টের উপর ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্য অতিরিক্ত শুল্ক (সার চার্জ) প্রত্যাহার করা হইয়াছে; সুতরাং সিমেন্টের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না। অর্থমন্ত্রী আয়-করের কাঠামোতে কোনরূপ বড় রকমের পরিবর্তন প্রস্তাব করেন নাই। কারখানা হইতে যে বনস্পতি বাজারে ছাড়া হইবে, তাহার প্রথম তিন শত টনের উপর উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে। ইহার ফলে বনস্পতির উপর মোট উৎপাদন শুল্কের পরিমাণ ২৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে।

নূতন জাহাজ নির্মাণের জন্য যে উন্নয়ন রিবেট দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ শতকরা ২৫ টাকা হইতে বাড়াইয়া শতকরা ৪০ টাকা করা হইবে। যে সমস্ত কারখানায় এক শতের অধিক বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত তাঁতে সুতীবস্ত্র উৎপাদন করা হয়, সেই সমস্ত কারখানাকে একত্রিতভাবে শুল্ক প্রদানের যে সুবিধা দেওয়া হইত, সেই সুবিধা প্রত্যাহার করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যে সমস্ত কারখানায় ২৪ হইতে ১০০ পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তাঁত চালু আছে, সেই সমস্ত কারখানার উপর হইতে একত্রিতভাবে যে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা আছে, তাহা দুইটি পর্যায়ে বৃদ্ধি করা হইবে। ইহার ফলে রাজস্ব খাতে ৮০ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইবে।

নাইলন, পারলন প্রভৃতি মূল্যবান কৃত্রিম রেশমী শাড়ীর উপরে মূল্যানুপাতিক বিক্রয় কর ধার্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ—শ্রীনেহরু বলেন যে, বর্তমানে যে হারে কর ধার্য আছে, তদনুসারে আগামী বৎসর ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ২০৫ কোটী টাকা হইবে। গত বৎসরের বাজেটে ক্রমান্বয়ে দেশের কর ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা করা হয়। ইহাতে যেসকিছু পরিমাণ কর ধার্য করা প্রয়োজন হয়। অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোথাও কোথাও হয়ত কিছু পরিবর্তন করা দরকার হইতে পারে। কিন্তু গত বৎসর যে সকল প্রধান ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, সেগুলি চালু রাখিতেই হইবে। প্রয়োজন হইলে আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, তাহা অবশ্যই আমরা পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত থাকিব। কিন্তু আমাদের সমস্ত সম্পদ রক্ষা করিয়া, উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ও ক্রমান্বয়ে সুষম বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া এবং এইভাবে জনগণের জীবন ধারণের মান উন্নয়ন করিয়া আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সার্থক করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রী বর্তমান বাজেট বিবৃতিকে পদযাত্রীর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলেন, বর্তমান অবস্থা মোটামুটি চালু রাখা হইবে। তবে কোথাও কোথাও সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা।—শ্রীনেহরু বলেন, সাম্প্রতিক কয়েক মাসে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক অবস্থায় কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। জিনিষপত্রের মূল্য কমের দিকে গিয়াছে এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ভাণ্ডার পূর্বে যে গতিতে কমিয়া আসিতেছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক গতিতে আমাদের এই ভাণ্ডার হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করিতে হইতেছে। সাধারণভাবে আর্থিক বাজারও অনেকটা সহজ হইয়াছে। অর্থ সরবরাহ এবং ব্যাঙ্কের ঋণদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণও এখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতিজনিত চাপ এবং বৈদেশিক দেনাপাওনার ক্ষেত্রে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এইসব ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি—১৯৫৬ সালের শেষভাগ হইতে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর যে চাপ রহিয়াছে, তাহার পর্যালোচনা করিয়া প্রধান মন্ত্রী বলেন, সরকারের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সম্প্রতি কয়েক মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক সম্পদ হইতে ব্যয়ের হার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৭ সালে এপ্রিল-জুন সময়ে মাসিক ৩৬ কোটী টাকা হিসাবে উঠান হইলেও সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহে উহা সাপ্তাহিক ৪ কোটী টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বহির্বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১১ কোটী টাকা ছিল। কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালে অবস্থার মোড় ফিরিয়া যায় এবং প্রায় ২৯২ কোটী টাকা ঘাটতি থাকিয়া যায় আমদানী যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রপ্তানি কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় এইরূপ বিরাট ঘাটতি ঘটে। প্রধানতঃ মূলধনী মাল, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পের কাঁচা মালই আমদানী করা হয়। সম্প্রতি বৈদেশিক বাণিজ্যে যে অনুকূল ধারা লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহা বহাল রাখিতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব আমদানী হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

বৈদেশিক সাহায্য—চলতি বৎসরে রেলওয়ে উন্নয়ন, টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীর কারখানার সম্প্রসারণ ও ট্রম্বেস্থিত তাপ-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে যে ঋণ পাওয়া গিয়াছে, প্রধান মন্ত্রী তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বন্দরসমূহের উন্নয়ন, কয়লা খনি-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা ও দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের জন্য ঐ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে গত দুই তিন মাস যাবৎ আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কয়েকটি দেশ সাহায্য দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মিত্রভাবাপন্ন দেশগুলি হইতে ভারত ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত ৪৬০ কোটী টাকার মত অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করিয়াছে। যে সকল সাহায্য চুক্তি বা ব্যবস্থা অনুসারে ভারত বিদেশ হইতে পাইতেছে অথবা সাহায্য পাইতে পারে, সেই হিসাব অনুযায়ী আগামী বৎসর ৩২৫ কোটী টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ভারত নিজেও আগামী বৎসর ভারত নেপালকে ২ কোটী ২০ লক্ষ টাকার মত অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য দান করিবে। ব্রহ্মদেশকেও ২০ কোটী টাকা ঋণ দিতেও ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইহার মধ্যে ১৫ কোটী টাকা দেওয়া হইবে বর্তমান বৎসরে এবং বাকী টাকা আগামী বৎসরে।

১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়—বর্তমান আর্থিক বৎসরের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ করেন যে, রাজস্ব বাবদ ৭২৪ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা আয় এবং ৭১৯ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়

হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ইহার ফলে ৫ কোটী ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। ভারত সরকার অর্থ কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া অতিরিক্ত ৩৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা রাজ্যসমূহকে দিতেছেন—ইহার ফলেই উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছে। ব্যয়ের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে ২৬৬ কোটী ৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে—এই খাতে ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব ধরা হইয়াছিল ২৫২ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা। প্রতিরক্ষা খাতে এই ১৩ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির কারণস্বরূপ শ্রীনেহরু বলেন, অতিরিক্ত অসামরিক রসদপত্র ক্রয়, জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, সৈন্যদের মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধা দান বিমান এবং সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্যই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। বাজেটে অসামরিক খাতে আনুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৪১৯ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে ৩৩ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা।

বর্তমান বাজেটের গতানুগতিক ধারা বহু পূর্ব হইতেই অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন। কর ধার্যের আর কোন সুযোগ সুবিধা নাই, তাহা সরকার ও দেশবাসী উভয় পক্ষই অবহিত। যাহা বাকি ছিল তাহা দানকর। তাহা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করা হইয়াছে। আর যাহা করা হইয়াছে তাহা অদল-বদল মাত্র। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ ইহাকে Pedestrian Budget বলিয়াছেন। সুতরাং গতানুগতিক পরিস্থিতির কোন সমাধান নাই বর্তমান বাজেটে। যাহা চলিতেছিল তাহাই চলিতে থাকিবে। যেমনটি তেমনটই।

• • •

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটও সেই গতানুগতিকতার ছাপ বহিয়া আনিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রায় একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—যে বর্তমান বাজেটের নূতন কোন কর ধার্য করি নাই। এই বাজেটটি মাত্র তিন মাসের জন্য। কারণ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কত টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাইবেন তাহা না জানা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাজেট প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। মোটামুটি ব্যয়-বরাদ্দের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইল।

আগামী বর্ষে শিক্ষা বাবদ গত বৎসর অপেক্ষা যে ৫ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে সে টাকা বেশী আয়ও হইবে। পুলিশে ১ লক্ষ টাকা বেশী, ভূমির রাজস্ব বাবদ ৪৮ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে ও ৩০ লক্ষ টাকা বেশী খরচ হইবে। আবগারি দরুণ আয় বাড়িবে না, খরচ কিছু কমিবে। সেল্‌স্ ট্যাক্সের হিসাবে এবার ১৯৪১, '৫৪ ও '৫৬ সালের আইন মত এবং ১৯৪১ মোট স্পিরিট বাবদ হিসাব ধরা হইয়াছে। এ বাবদে এবার ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা কম আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় অনুশাসনে চিনি, তামাক ও মিলজাত বস্ত্র প্রদেশের সেল্‌স্ ট্যাক্সের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ১৯৫৭ সালের এক আইনে রেলওয়ে মাশুলের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয়ে ঘটিতব্য শতকরা ১·৩৭ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাইবেন তদনুসারে ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩২ লক্ষ ৮১ হাজার আলোচ্য বর্ষে ৬২ লক্ষ ১৫ হাজার পাইবেন। বর্তমান শিল্প বিজ্ঞানে ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হইবে। কিন্তু কুটীর শিল্পে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। এ বাবদে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে মোটা টাকা বরাদ্দ হয়।

• • •

সুতরাং আলোচ্য পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের তথা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের যে পরিবেশ নিরীক্ষণ করিলাম তাহাতে বর্তমান বৎসরের শুভাশুভ ফল সহজেই অনুমান করা যায়। অর্থাৎ আমরা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রহিলাম। অতএব ভগবান ও ভাগ্যই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবেন। ততঃ কিম্।

ভারতের মত উন্নয়ন মূলক অর্থনৈতিক কাঠামোসম্পন্ন দেশের করনীতি

শ্রী অলক ঘোষ, অর্থনীতির অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক কাঠামোসম্পন্ন দেশের মূলধন গঠনের সমস্যাই অন্যতম প্রধান সমস্যা। দেশের চলতি অর্থের উৎসগুলিকে গঠনের ক্ষেত্রে পরিচালিত করার মধ্যেই পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করে। সম্প্রসারিত পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে সঞ্চয়ের অভাব গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তথাপি সম্প্রসারিত অর্থনীতিতে গঠনের পরিমাণ ক্রমবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। সমাজের লোককে যাহাতে সর্বাধিক সঞ্চয়ে বাধ্য করা যাইতে পারে, তজ্জন্য করভার বৃদ্ধি করিয়া ভোগ্য পণ্যের ব্যবহার জোর করিয়া হ্রাস করিতে হইবে। কর ভার বৃদ্ধি করিয়া ভোগ্য পণ্যের ব্যবহার হ্রাস করিবার অর্থ এই নয় যে ভোগের নিম্নতম মানের বিচ্যুতি ঘটিবে অর্থাৎ যাহারা জীবন যাত্রার মানের নিম্নতম স্তরে বাস করিতেছে তাহাদের মানের আরও হ্রাস হইবে। কর ভার বৃদ্ধির উদ্দেশ্য এই হইবে যে যাহাদের আর্থিক মান দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাদেরই ভোগ-ব্যয়ের সর্বাধিক অংশ কর হিসাবে টানিয়া লওয়া। সোজা কথায় উন্নয়ন মূলক অর্থনীতিতে করনীতির প্রথম উদ্দেশ্য হইল ; "যাহাদের বেশী লাভ তাহাদের উপর টাক্স বসাও —তাহাদের অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা আছে, টানিয়া লও, কিন্তু দেখিও তাহাদের উপার্জনের উৎসাহ যেন হ্রাস না পায়।" সবচেয়ে নিশ্চিত এবং কার্যকর পন্থা হইতেছে যে পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে যখন মুদ্রাস্ফীতি মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে, তখন কর ভার বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত আয় এবং ব্যবসায়ের লাভের উপর এমন ভাবে কর ধার্য করিতে হইবে যাহাতে সমসাময়িক প্রয়োজনে অর্থের সঙ্কুলান না ঘটে।

ভারতে আয়করের প্রবর্তন হয় ১৮৬০ সালে, অবশ্য ইহাকে প্রকৃত পক্ষে কার্যকরী করা হয় ১৯০৬ সালে। যদিও ঐ সময় হইতে সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত আয় ও ব্যবসায়ের লাভের উপর কর ধার্য করা হইয়াছে, তথাপি দেখা যায় যে ভারতের ৩০ কোটি ৫৮ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ৫/৬ লক্ষ লোক ট্যাক্স দেয় অর্থাৎ এক শতাংশের এক পঞ্চমাংশ মাত্র। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের আয় বৃদ্ধির উপায় হিসাবে আয় করের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু আয় করের পরিমাণ এখানে এতই কম যে আয় করের বর্তমান স্তর আরও নামাইয়া দিলেও অন্যান্য প্রকার কর প্রয়োগ না করিলে আর্থিক কাঠামোর সমতা ও স্থায়িত্ব ঘটিবে না।

ব্যয়কর এ ক্ষেত্রে একটি চমৎকার পন্থা। ব্যক্তিগত আয়ের বেশ খানিকটা অংশ টানিয়া লইবার সুষ্ঠু প্রচেষ্টাই হইল অতিরিক্ত ব্যয় হইতে নিবৃত্ত করা এবং তদ্বারা সঞ্চয়ে বাধ্য করা। কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে যে ব্যয়কর হইতে সরকারের যে আয় বৃদ্ধি পাইবে তাহার পরিমাণ নিশ্চিত করিয়া অনুমান করা যায় না। ইহা ছাড়া ব্যয়করের প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত ধীরে ধীরে হয়। কর ভারের গুরুত্ব জনসাধারণ প্রথমেই উপলব্ধি করিতে পারে না এবং একটি বৎসর অতি বাহিত না হইলে ব্যয়ের উপর করের সঠিক পরিমাণ বুঝিতে পারা যায় না। আয় কর সাধারণতঃ পূর্বেই অনুমান করা যায় এবং ইহার প্রতিক্রিয়াও তাড়াতাড়ি অনুভূত হয়। তাহাছাড়া ইহাতে সরকারের আয় সম্পর্কেও একটা সুষ্ঠু হিসাব পাওয়া যায়। আয়, লাভ এবং সম্পদের উপর

প্রত্যক্ষভাবে কর বসাইবার সর্বোত্তম পন্থা হইল সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী-ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর প্রয়োজনে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থসরবরাহ করিয়া সমানে অর্থের প্রাচুর্য সৃষ্টি করা। যখন যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো আয়কর বসানোর অনুকূল সেই সময় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর প্রবর্তন সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে পারে এবং ইহার দ্বারা আর্থিকক্ষেত্রে স্থায়িত্ব বিধানও সম্ভব হয়। প্রথম পর্যায়ে নিরাপত্তামূলক কর হইতে আয়ের পরিমাণ ব্যয়ের তুলনায় এত বেশী হইতে পারে যে সঞ্চয়ের পরিমাণ মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়। এই ধরণের সঞ্চয়ের একটা বিশেষ সুবিধা হইতেছে যে ইহাতে সরকারের আয় প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে এই অর্থ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সরকারী কর্মসূচীর রূপায়নে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে—যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, যোগাযোগ ও পরিবহনের সম্প্রসারণ। প্রকৃত পক্ষে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর (যেখানে সম্ভব) প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আয় এবং সম্পদের উপর প্রত্যক্ষ কর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে সাহায্য করিবে অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি করিবে।

"স্থায়িত্ব বিধান এবং উৎপাদন বৃদ্ধি" এই দুইটি উদ্দেশ্যের প্রয়োজনেই ঐ সকল কর প্রবর্তন ব্যতীত সম্পত্তিকরের সাহায্যে সহর অঞ্চলে ঐ অঞ্চলের জমি ও বাড়ীর উপরে আর একটি কর বসানো যাইতে পারে। উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য হইল সহরগুলিকে সম্প্রসারিত করা এবং তজ্জন্য বড় বড় সহরে নূতন নূতন গৃহ নির্মাণ করা। এই রকম সহর সম্প্রসারণের ফলে জমির দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং পুরানো ঘর বাড়ীর মূল্যও দ্রুত বাড়িয়া যাইবে আর তাহারই ফলে মালিকদের আয়ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়িবে। সুতরাং সম্পত্তির উপর কর নির্ধারণের সার্থকতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে ভারতে মূলধন মুনাফা কর এই সমস্যা সমাধান করিতে সক্ষম নয়। সুতরাং এই কর কার্যকরী করার জন্য সমস্ত জমি এবং বাড়ীর যথার্থ মূলধনী মূল্য নির্ধারণ করিয়া তাহার উপর কর ধার্য করিতে হইবে। এই মূল্য নির্ধারণ অন্ততঃ পাঁচ বৎসর অন্তর করিতে হইবে।

স্থায়িত্ব বিধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে ব্যয়ের উপর ও বিবিধ রকম সামগ্রীর উপর কর বসাইতে হইবে। এই সকল কর আমদানী দ্রব্যও দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর উপরও বসাইতে হইবে। সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য অথবা মুদ্রাস্ফীতির জন্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ক্রমকর এবং বিক্রয় কর উভয়ই বসানো যাইতে পারে। কিন্তু আয় বৃদ্ধির উৎসাহে যেন দেশের কর নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ এমন নির্মমভাবে কর ব্যবস্থা প্রবর্তন না করেন যাহার ফলে সাধারণের অবশ্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীও কর প্রভাবে দুর্মূল্য হইয়া পড়ে এবং করনীতি সমগ্র দেশে একটা অত্যাচার ও নিষ্পীড়নের প্রতীক হইয়া দেখা দেয়। এমনও হয় যে অনেক সময় কর নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর বসাইতে গিয়া সমগ্র দেশবাসীকে কর পীড়নে বিব্রত করিয়া তোলেন। এরূপ ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জনকল্যাণের দিকটি উপেক্ষিত হয় এবং তাহা পরিশেষে প্রতিবাদের প্রবল ধাক্কায় বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ন্যায় গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি জনকল্যাণের চিরন্তন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির মহান্ আদর্শে পরিচালিত করিতে হইবে। সমগ্র দেশবাসীকে কর প্রভাবের আওতায় আনা মোটেই যুক্তি সঙ্গত নহে ; সুতরাং মূলধনী কর ও অন্যান্য ব্যয়কর সীমার মধ্যে রাখিয়া তাহার অত্যন্ত সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে হইবে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে লক্ষ্যসাধিত অর্থনীতিতে কর পদ্ধতি এমনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া আভ্যন্তরীন আর্থিক ক্ষেত্রের স্থায়িত্ব বিধান করিয়া ইহার উন্নয়ন-মূলক কর্মসূচীগুলির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থের সংস্থান করিতে সমর্থ হয়। তাহা ছাড়া বেসরকারী ক্ষেত্রের সমৃদ্ধির জন্য ইহা যেন মূলধনী দ্রব্য-সামগ্রী এবং ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোনরূপ উদ্দীপনা হ্রাসের কারণ না হয়। সর্বশেষে ইহা সতর্কবাণী রূপে গ্রহণ করিতে হইবে যে সমগ্র দেশবাসীকে কর প্রভাবে আতঙ্কিত করিলে তাহার ফল বিষময় হয় অর্থাৎ তাহা জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী হয় এবং তাহা গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিকল্পনার শুভ উদ্দেশ্যকে বিড়ম্বিত করিয়া ব্যর্থতায় পরিণত করে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সংকট

অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমেই প্রতিকূল হচ্ছে। রপ্তানীর চেয়ে আমদানীর পরিমাণ বাড়ছে, এবং বাণিজ্য উদ্বর্তে ঘাটতির পরিমাণও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর, তার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কমছে, এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারত প্রায় দেউলিয়াতে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা নিম্নরূপ।

(কোটি টাকার হিসেব)

বৎসর	মোট আমদানী	মোট রপ্তানী	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত
১৯৪৭-৪৮	৪৫৬	৪০৮	৪৮
১৯৪৮-৪৯	৬৪৪	৪৫৯	১৮৫
১৯৪৯-৫০	৬৪৮	৫০৬	১৪২
১৯৫০-৫১	৬৫০	৬০১	৪৯
১৯৫১-৫২	৯৭০	৭৩৩	২৩৭
১৯৫২-৫৩	৬৬৭	৫৭৭	৯০
১৯৫৩-৫৪	৫৬৭	৫৩১	৩৬
১৯৫৪-৫৫	৬৫৬	৫৯৪	৬০
১৯৫৫-৫৬	৭০৫	৬০৯	৯৬
১৯৫৬-৫৭	৮৪০	৬০৩	২৩৭

(এ আই, সি, ইকনমিক রিভিউ, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৮)

এ ছাড়া, বর্তমান আর্থিক বৎসরের অর্দ্ধাংশের, (অর্থাৎ, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭) যে বিবরণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বুলেটিন, জানুয়ারী, ১৯৫৮ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে, তা আরও ভয়াবহ। এই সময়ে মোট আমদানীর পরিমাণ ৬২২·২ কোটি টাকা।

এরূপ প্রতিকূল বাণিজ্য অবস্থার কারণ কি? দেশবিভাগের ফলে ভারতের আমদানী অনেক বেড়েছে। কাঁচা পাট ও তুলা এখন পাকিস্তান থেকে আনতে হচ্ছে, পূর্বে এগুলি ভারতের অন্যতম প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিল। অনাবৃষ্টি প্রভৃতির জন্য দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম

হচ্ছে, এবং ফলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। অবশ্য দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য আমদানী আর একটি কারণ। এদবের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রচুর কলকব্জা এবং জলসেচ ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যের জন্য সরঞ্জাম বিপুল পরিমাণে বিদেশ থেকে কিনতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই প্রতিকূল অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, যন্ত্রপাতি, ইস্পাত প্রভৃতি দ্রব্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি ও তজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধি এবং দেশে প্রতিকূল জলবায়ুর দরুণ প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করার জন্যই বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমান ভারবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে।" (এ, আই, সি, ইকনমিক রিভিউ, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫৮ (কিন্তু কেবলমাত্র আমদানী বৃদ্ধি বর্তমান বাণিজ্য সংকটের একমাত্র কারণ নয়। দেশে রপ্তানীর অবস্থাও মোটেই সুবিধাজনক নয়। ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় পরবর্তী বৎসরগুলিতে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ অনেক কমেছে। বিগত অর্ধ বৎসরের (এপ্রিল সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭) অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, রপ্তানী দ্রুত কমতির পথে। ভারতের প্রধান দু'টি রপ্তানী দ্রব্য চা ও পাট জাত দ্রব্যের রপ্তানী গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় কি ভাবে কমেছে, তা নীচের হিসাব থেকে বোঝা যাবে :

	এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৫৬	এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৫৭	কমার পরিমাণ
চা	৫৭·৯ কোটি টাকা	৩৮·৪ কোটি টাকা	১৯·৫ কোটি টাকা
পাটজাত দ্রব্য	৫৬·৭ ,,	৫১·৪ ,,	৯·৩ ,,

(রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন, জানুয়ারী ১৯৫৮)

রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ ও দাম দুই-ই কমেছে। বিদেশে ভারতের এসব জিনিষের চাহিদা কমার অন্যতম প্রধান কারণ উৎপাদন দ্রব্যের নিকৃষ্টতা। ভারতের বাণিজ্য দীর্ঘকাল এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে অনুকূল অবস্থা ফিরিয়ে আনা যায়। সরকার আমদানী লাইসেন্সের ক্ষেত্রে অনেক কড়াকড়ি করেছেন, এরূপ বহু জিনিষের আমদানী বন্ধও হয়েছে। কিন্তু তবু মোট আমদানীর পরিমাণ কমে নি, বরং ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে। শিল্পের জন্য যে সব কাঁচামাল বিদেশ থেকে আনা হচ্ছে, যেমন তুলা ও পাট), সেগুলি দেশে বেশি পরিমাণে উৎপাদন করে এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা কিছুটা আমদানী কমানো সম্ভব। তবু তার জন্য সময় প্রয়োজন। আর শিল্পোন্নয়নের জন্য কল-কব্জা ইত্যাদি আনতেই হবে। সুতরাং, এদিকে আমদানী হ্রাস করা অসম্ভব।

সমস্যার সমাধানের জন্য রপ্তানী বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শিল্প অর্থ সাহায্য করপোরেশন, রপ্তানী ও পরামর্শদাতা কমিটি প্রভৃতি গঠন, রপ্তানীজাত দ্রব্যবিশেষের উপর রিবেট অনুমোদন, রপ্তানী ঝুঁকি বীমার প্রবর্তন, বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যের জন্য বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য প্রভৃতির দ্বারা সরকার অবশ্য নানাভাবে চেষ্টা করছেন। তবু প্রয়োজনের তুলনায়, এ সব সামান্য। সামগ্রিকভাবে রপ্তানীবৃদ্ধির জন্য নিম্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। (১) কৃষি, শিল্প, খনিজ প্রভৃতি সকলক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো, তবেই আমরা বেশি করে জিনিষ বিদেশে প্রেরণ করতে পারব। (২) পরিচিত ক্রেতা

বৃটেন, আমেরিকা ছাড়াও অন্যান্য দেশে বাণিজ্য প্রসারের জন্য চেষ্টা করতে হবে। মধ্য প্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে বাণিজ্য বিস্তৃতির সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারী ও বে-সরকারী উভয় পর্যায়েই প্রতিনিধিদল প্রেরণ, বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন প্রভৃতির দ্বারা এই কাজ করতে হবে। (৩) বিদেশে ভারতের উৎপন্নদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য আরও বেশি করে প্রদর্শনী, মেলা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। পুস্তক-পুস্তিকার প্রচার ব্যাপকতর করতে হবে এবং এই কাজে নিযুক্ত শিক্ষিত কর্মচারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। (৪) উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। উৎপাদনের খরচা কমিয়ে জিনিষের দাম কমাতে না পারলে বিদেশের জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো যাবে না। (৫) যে সব শিল্পের রপ্তানী সম্ভাবনা বেশি, যেমন চা ও পাট, সেগুলির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরকারের নিজের হাতে নিয়ে এদের সর্বপ্রযত্নে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। আর বর্তমানে সরকার এ সব শিল্প নিজের হাতে গ্রহণ না করলে শিল্পপতিদের সর্বপ্রকারে সহায়তা করা উচিত। (৬) রপ্তানীবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যয় হ্রাসের জন্য জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও সাধারণ বীমা, অবিলম্বে জাতীয়করণ করা প্রয়োজন।

গত বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার ডাঃ ডি, সুজার সভাপতিত্বে একটি রপ্তানী উন্নয়ন কমিটি গঠন করেন। নভেম্বর মাসে এই কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশগুলি নিম্নরূপ ("দি জার্নাল অফ ইণ্ডাষ্ট্রী এ্যাণ্ড ট্রেড" নভেম্বর, ১৯৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)—(১) রপ্তানি দ্রব্যের পরিবহন ব্যয় হ্রাসের জন্য নির্দিষ্ট জিনিষের ক্ষেত্রে রেল, জাহাজ, বিমান প্রভৃতির ভাড়া কমাতে হবে। (২) রপ্তানী দ্রব্যের উপর থেকে অন্তঃশুল্ক ও বিক্রয় কর কমাতে হবে এবং অন্যান্য করের পরিমাণও যথাসম্ভব কম করতে হবে। (৩) রপ্তানী কার্যে ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করার জন্য যাদের রপ্তানীর পরিমাণ বাড়বে তাদের আয় করের অংশ মকুব করতে হবে। (৪) একটিমাত্র সংস্থার মারফৎ সকল রপ্তানীকার্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (৫) রপ্তানীকার্যে ব্যবসায়ীরা যাতে বেশি পরিমাণে অর্থ ঋণরূপে পেতে পারেন তার জন্য বাণিজ্যব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রভৃতির পক্ষ থেকে হুণ্ডির পরিমাণ অনুসারে বেশি করে অর্থ সাহায্য দিতে হবে। হুণ্ডি পুনর্বাট্টার হার সাধারণ ব্যাঙ্ক হারের চেয়ে কম করতে হবে। (৬) ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত ব্যবসায়ীদের রপ্তানী বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সমবায় সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।

বিশেষ শিল্পজাত দ্রব্য বিবেচনায়, ডি সুজা কমিটি প্রধান রপ্তানী দ্রব্য চা এর রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য প্রতি পাউণ্ড চা-এর ওপর ১২ নয়া পয়সা করে রপ্তানী শুল্ক হ্রাস করার জন্য সুপারিশ করেছেন। মিল জাত কাপড় ও তাঁতবস্ত্র সম্পর্কেও কয়েকটি সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। রপ্তানী উন্নয়ন কমিটিতে অধিকাংশ সদস্য ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ীদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সুপারিশগুলি করা হয়েছে। ভারতের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থায় রপ্তানী বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেন তেন প্রকারেণ রপ্তানী বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন নয়। দেশের কোটি কোটি গরীব মানুষের ভোগ্য দ্রব্যের অভাব ঘটিয়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে রপ্তানী দ্রব্যের প্রসার কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। তা ছাড়া রপ্তানী বৃদ্ধির অজুহাতে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়া ও তাদের সুবিধার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াও ক্ষতিকর—সমাজতান্ত্রিক নীতির বিপরীত।

৯ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে রপ্তানী পরামর্শদাতা সমিতির সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীমোরারজী দেশাই আমদানী হ্রাস ও রপ্তানী বৃদ্ধির প্রয়োজনে কিছু পরিমাণে ব্যবসা যদি অল্প লাভে অথবা বিনা লাভে করার জন্য ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন জানান। বিনা লাভে কখনও ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে না, বাণিজ্য মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে শ্রীদেশাই কি করে এ কথা ভাবতে পারলেন, তাই আশ্চর্য! একজন ব্যবসায়ী (শ্রীএস. জি. জেহটা) মুখের উপরেই জবাব দিয়েছেন, একাজ কেউ করবে না। (স্টেট্‌সম্যান, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮)। সুতরাং, ব্যবসায়ীদের হৃদয়বৃত্তি, সততা প্রভৃতির উপর ভরসা করে বসে থাকলে কিছুই হবে না।

ভারতের বাণিজ্য অবস্থাকে অনুকূল করা তথা বৈদেশিক মুদ্রা অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করার জন্য আর দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত, আমদানী ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য, শিল্পে কাঁচা মাল প্রভৃতির পরিমাণ কমানোর জন্য দেশে অধিক পরিমাণে এগুলি উৎপাদন করতে হবে। আর, দ্বিতীয়ত, রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং বিক্রয় মূল্য কমানোর জন্য দ্রুত শিল্পায়ন, শিল্পক্ষেত্রে সরকারের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মালিকানা এবং পরিবহন, বীমা, প্রভৃতির পূর্ণ জাতীয়করণ একান্ত আবশ্যক।

———

শ্রীমুদ্রা দর্শন

অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার মিত্র

জীবনবীমা কর্পোরেশনের কেলেঙ্কারী সম্বন্ধে বিচারপতি চাগ্‌লার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু এ সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান চালাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমুদ্রার দর্শন (Philosophy) কেহই অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ হইতেছে।

আমার মনে হয় মুদ্রার কার্যাবলী ভারতের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি তথা এই ব্যবস্থার পরিচালক ও কার্যনির্বাহক সমিতির যিনি অধ্যক্ষ অর্থাৎ শ্রীনেহেরুর প্রতি একটি ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নহে। স্বাধীনতার পর আমাদের সরকারী নেতারা যে সামাজিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন তাহাকে ঘটা করিয়া Socialistic Pattern of Society ও Mixed Economy আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের দ্বিবার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী হইতেছে। স্মরণ থাকে যেন এই পরিকল্পনা রাশিয়া আমেরিকা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর দ্বারা সমর্থিত হইতেছে অর্থাৎ আমরা যে ব্যবস্থা করিতেছি তাহার উদ্দেশ্যটা হইতেছে বস্তু বৃদ্ধি (production Multiplier) এবং উহার সহায়ক হইতেছে রাশিয়ান ও মুখ্যতঃ বড় বহর, টেক্‌নলজি ও দ্রুততা (time ও spaceএর সংক্ষেপ আনয়ন) এবং অন্য কোন সময়ে রাশিয়ান টেকনিক, কখনও বা আমেরিকান্ টেকনিক ব্যবহার করিতেছি অর্থাৎ পাশ্চাত্য জাতির, সমাজের ও মানব মনের যে চিন্তা ও কার্যাবলী সেগুলিকে বড় বহরে ফল করিবার প্রয়াস করিতেছি। (স্মরণ রাখিবেন যে আমাদের plan তৈরী করিবার জন্য কোন econometric modelএর সাহায্য নিই না কেন—Domar, Harrod, Marx, Keynes, Schumpeter অথবা Mahalanobis রচিত modelএর কোনটীতেই ভারতীয়

জাতির সমাজের বা ভারতীয় মনের, এক কথায়, ভারতীয় ছাপ নাই—প্রত্যেক modelএ পাশ্চাত্য জাতির বস্তুতন্ত্রির প্রয়াসের মত একটা পরিকল্পনা আছে, উহাতে মানুষের স্থান নাই। একথা এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে পাশ্চাত্য economics সবটাই machine, technology ও large scale ; ফলে Disequilibrium, inequality ও inhumanity, exploitation, suppresion. সুতরাং বিচিত্র কি যে এহেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মস্তরের কর্মধারাই প্রকট হইবে –forgery, chickenery. dishonesty—এগুলি ত এই ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক ফল। যদি আমরা এই ব্যবস্থা মানিয়া লই যে, যেখানে মানুষের (humanity) কোন মূল্য নাই, সেখানে অমানুষিক ফল দেখিলে আৎকাইয়া উঠি কেন, সোরগোল তুলি কেন এবং বাদানুবাদ করি কেন? উহাকে এই সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ধ্বংসের দিকে বা অবনতির দিকে ভাসিয়া চলি না কেন? যদি মানুষের মন লইয়া মাথা ঘামাইতে হয় তবে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় machine আছে, মানুষ নাই, যে ব্যবস্থায় time ও spaceএর relativity আছে, কিন্তু human blindএর variability নাই, যে Model (econometric) শুধু time ও spaceএর variability লইয়া differential calculus দেখায়, কিন্তু মানুষের মনের কোন খবর লয় না (N. B. Human mind more faster than time and space), সে ব্যবস্থাকে পরিহার করিতে হইবে এবং যে ব্যবস্থায় মানুষের প্রতি indifferential calculus নাই, মানুষকে সম্মুখে রাখিয়া machine, ও technology চলিতে পারে, প্রতিটি মানুষ বা মানুষের ক্ষুদ্র দলকে লইয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির যে ব্যবস্থা যাহাকে গান্ধিজী Decentraliserd economy বলিয়াছেন—যাহাতে কোন সংঘাত (Disequillibrium অথবা imbalance) থাকিবে না, সুতরাং কোন "অধর্ম" হইবে না,—সেই ব্যবস্থা গঠন করিতে হইবে। গান্ধীজীর উত্তরাধিকারীরা যদি সত্যই সেই ব্যবস্থা চালু করেন তবে তাহাই হইবে প্রকৃত ভারতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে ব্যবস্থায় মুদ্রার প্রকৃতির লোকের উত্থান বা পতনের বা কেলেঙ্কারীর অথবা পার্লামেন্টারী আলোচনার প্রয়োজন হইবে না। দুঃখ হয় গান্ধীজী ভারতীয় স্বাধীনতা লাভের পর তাহার পরিকল্পিত সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে পারেন নাই। আবার ভয় হয় যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন এবং ভারতের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেন, তাহলে বাঁচিয়া থাকিতে চাহিতেন কিনা?)

শ্রীমুদ্রা দেখাইয়াছেন যে বর্তমান ব্যবস্থায় সাধারণ মূলধন লইয়া industrial empire গড়া চলে, তাহাতে humanityর কোন স্থান নাই এবং forgery, dishonesty প্রভৃতি অন্যায়গুলিকে আনুষঙ্গিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। Dishonesty, suppresion, inequality ও exploitation ছাড়া কোন দেশেই largescale machine economy গড়িতে পারিয়াছে কিনা আমার জানা নেই। যে কোন দেশের economic ও industrial growthএর ইতিহাস পড়িলে জানা যাইবে অর্থাৎ ১এর পিঠে ক্রমাগত শূন্য বসাইতে গেলে, এই ব্যবস্থায় নানারূপ inhumanity বা গলদ দেখা দিবে। সুতরাং এক মুদ্রাকে লইয়া হাসাহাসি করিলে কি হইবে? হাজার হাজার মুদ্রা এই ব্যবস্থায় আছে এবং থাকিবে, শুধু আমাদের দেশে নয়, সোভিয়েট ও আমেরিকান সমাজেও economyতে এই প্রকার indifference to humanity আছে। থাকিতেই হইবে, নাহলে যন্ত্রতান্ত্রিক সফলতা লাভ করা যায় না।

অন্যদিকে মুদ্রা বলিতেছেন যে সত্য সত্যই যদি humanity ও societyর উন্নতি করিবার ইচ্ছা হয়, আইস, আমি আমার সমগ্র industrial empireকে public trustএ পরিণত করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মত যত মুদ্রা ভারতের ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি ও চাকুরীতে আছে সবাই এস, public trust করিয়া humanity ও societyর মঙ্গল করি। চ্যালেঞ্জটি তাহা হইলে কাহার প্রতি—ভারতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি এবং সেই ব্যবস্থার ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের প্রতি বলিয়াই আমার মনে হয়।

উপরি উক্ত দুইটী ব্যবস্থার মধ্যে কোন compromise চলিতে পারে না, ভারতকে দুইটীর একটি বাছিয়া লইতে হইবে, মধ্যবর্তী স্থানে থাকা চলিবে না। প্রথম ব্যবস্থায় মানুষের দিকে indifference দেখাইয়া, input ও outputএর model সহযোগেও machine এবং technologyএর মাধ্যমে আমরা sputink পর্যন্ত আকাশে উঠিতে পারি।

দ্বিতীয় ব্যবস্থায় মানুষকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়া তাহার মানসিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারি - রামরাজ্য স্থাপন করা একেবারেই অসম্ভব নয়—কিন্তু এ ব্যবস্থায় বস্তুর বহর (Production Multiplier) বাড়িবে না—যতটুকু মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন তাহাই হওয়া যাইবে। ইহাতে Full employment economy (modern sense) না হইতে পারে কিন্তু Self-sufficiency economy নিশ্চয়ই হইবে। এই economic model এ কটিকে ডাইনে রাখিয়া বাঁদিকে পৃষ্ঠ ঘুরাইতে হইবে।

রাশিয়ান আমেরিকান ব্যবস্থার উপরি লিখিত প্রথম ব্যবস্থা আছে, দ্বিতীয়টী নাই। আমার মনে হয় ভারতের অন্তরাত্মা দ্বিতীয় ব্যবস্থাটীই চাহে। সুতরাং রাশিয়ান বা আমেরিকান ব্যবস্থার সংযোগে ভারতীয় ব্যবস্থা পাওয়া যাইতে পারে না উহাতে (Russian & American =) American economics পাওয়া যাইবে, কিন্তু উহা Indian economics নহে ; সম্ভবতঃ Indian economics এখনও লেখা হয় নাই—সে Economics মুদ্রারা লিখিবে না, রাশিয়ান আমেরিকান economistরা আসিয়া Statistical Instituteএ push-button methodএ লিখিবে না—সে Economics প্রত্যেক ভারতীয় নিজের হাতে নিজের মন দিয়া লিখিবে।

অর্থমন্ত্রী যে ভারতের এই dilema উপলব্ধি করেন নাই, তাহা আমার বক্তব্য নহে, তাহার প্রতিটি দুইটি বক্তৃতা এ সম্পর্কে অনুধাবনযোগ্য—একটী বোম্বাইয়ে Merchants Chamberর Golden Jubilley উদ্‌যাপনে, অপরটি দিল্লীতে U.N. Technical Assistantsএর একটী Seminar উদ্‌যাপনে।

আমার রায় লিখিতেছি : – শ্রীকৃষ্ণমাচারী এমন কোন দোষ করেন নাই। যে কোন অর্থমন্ত্রীকে এরূপ ব্যবস্থায় জড়িত হইতেন। সরকারী ক্ষেত্র তথা মুদ্রা ব্যবসায়ী হিসাবে যাহা করা উচিত তাহা করিয়াছে। মুদ্রা না হইয়া অন্য কোন লোক হইলেও এই ব্যবস্থায় অনুরূপ হইত।

সরকারী কর্মচারীরা দোষ করেন নাই। উপস্থিত ব্যবস্থায় যে কোন সরকারী কর্মচারী অনুরূপ ব্যবহার করিবেন। বৈশম্পায়ন্ পাকা লোক হইয়া কাঁচা কাজ করিয়াছেন ; প্যাটেল পাকা কর্মচারী হইয়া কাঁচা কাজ করিয়াছেন ; সুতরাং private ও public sector কাহারও

হয় বা মিং হয় নাই। জীবনবীমা কোম্পানীগুলিতে জাতীয়করণের পূর্ব্বেও এরূপ scandal হইয়াছিল (নতুবা nationalised হইয়াছে কেন?)। আবার nationalisation-এর পরেও এরূপ হইয়াছে এবং আরও হইবে। সুতরাং nationalisation অথবা denationalisation কোনটারই দোষ বা গুণ বাহির হয় নাই। Human failure হইবেই, কারণ মানুষ machine নহে। public interest-এ অনুসন্ধান কমিটি বসানো হইয়াছিল, ঠিকই অর্থাৎ জনসাধারণ বা নরনারায়ণ বুঝিতে পারিল যে বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাহাদের interest কখনই served হয় না—ইহাকে শ্রীনৃসিংহ-দর্শন ছাড়া কী নাম দিব?

আমার ত কোন power নাই—সুতরাং দর্শন বলিয়াই শেষ করিব ও রুজি রোজগারের ধান্ধায় ঘুরিব। কিন্তু যাহাদের power আছে অথচ এই দর্শন হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। তাহারা কেন চুপ করিয়া আছেন? এ সম্বন্ধে জনসাধারণ বা নরনারায়ণ একটু অনুসন্ধান করিবেন কী?

———

দানকর

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

রাজ্যসভার বিগত অধিবেশনে এষ্টেট ডিউটি ও রেলমাশুল বন্টন বিল আলোচনা প্রসঙ্গে দানকর ও মৃত্যুকর মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া একটি খসড়া রচনার কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে আগামী বাজেট অধিবেশনে তাহা উত্থাপন করা হইবে। গত বৎসর যখন ক্যালডর সুপারিশ অনুযায়ী কর পদ্ধতির আমূল সংস্কার করা হয় তখন বামপন্থীদল এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে নব প্রবর্তিত কর ব্যবস্থাতেও অনেক ছিদ্র থাকিয়া গেল এবং দানের মাধ্যমে তাহা রুদ্ধ করিয়া দেওয়া সম্ভব। সুতরাং ব্যয় কর, সম্পদ কর, মুনাফাকরের সহিত দানকর জুড়িয়া দিলে সব ছিদ্র রুদ্ধ হইয়া কর ফাঁকির পথ বন্ধ হইবে। তাহা ছাড়া সম্পত্তি কর হইতে অত্যন্ত কম কর আদায়ের কারণও হইল যে দানের সাহায্যে সহজেই সম্পত্তি হস্তান্তর করা সম্ভব হইবে। সম্পত্তি কর হইতে আয়ের পরিমাণ ছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে ৮৫ লক্ষ টাকা, ১৯৪৫-৪৬ সালে ১৬৩ লক্ষ টাকা, ১৯৫৭ সালে ২১০ লক্ষ টাকা, এবং ১৯৫৬ সালের এপ্রিল অক্টোবর পর্যন্ত ৬৪ লক্ষ টাকা, সুসংবদ্ধ কর কাঠামোর সুপারিশ করিতে গিয়া ক্যালডর সাহেব ব্যয় কর, সম্পদকর, মূলধন লাভকর ও তৎসহ সম্পত্তি করের পরিবর্তে দানকরের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

সুতরাং মিঃ ক্যালডরের সুপারিশ অনুযায়ী সম্পত্তিকরের পরিপূরক হিসাবে দানকর প্রবর্তন করা যাইতে পারে অথচ সম্পত্তিকরের পরিবর্তেও দানকর চালানো যাইতে পারে। অন্যথায় দানের সাহায্যে যেহাতে সম্পত্তিকরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়, তদুদ্দেশ্যে সম্পত্তিকর আইনটিও সংশোধন করা যাইতে পারে। অন্যান্য দেশে যেসব পন্থা গৃহীত হইয়াছে তাহা এপ্রসঙ্গে আলোচনা করা হইল। সম্পত্তি কর, উত্তরাধিকার কর, উইল কর (Legacy duty) তিনটিই মৃত্যুকরের ঘোরফের মাত্র। কাহারও মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি যখন অন্যের ওয়ারিশে বর্তায়, তখন তাহাকেই এই করগুলি দিতে হয়। কিন্তু দানকর মানুষের জীবদ্দশাতেই

সাধারণতঃ দিতে হয়। যে সব সম্পত্তির হস্তান্তরে মূল্যের উল্লেখ থাকে না, সেই সব ক্ষেত্রেই দানকর প্রযোজ্য হয়। মিঃ ক্যালডরও সম্পত্তিকরের পরিবর্তে উইল কর বা উত্তরাধিকার কর অথবা প্রদত্ত পাওয়া সম্পত্তির উপর দানকর বসাইতে চাহিয়াছিলেন।

আলোচ্য তিনটি করের সজ্ঞাও তিনরকম। সম্পত্তি কর মৃতের সকল সকল সম্পত্তির উপরই ধার্য হয়। উত্তরাধিকার কর কেবলমাত্র উত্তরাধিকারগণের প্রাপ্ত অংশের উপর ধার্য হয় আর উইলকর কেবল যতটুকু সম্পত্তি কোনব্যক্তি উইল মারফৎ পায়, তাহার উপর ধার্য হয়। এই করগুলি বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্তি ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রযুক্ত হয়। সম্পত্তি কর বিল ১৯৪৮সালের মার্চ মাসে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয় এবং বিলের আলোচনাকালে বিদায়ী অর্থমন্ত্রী বিলটির সংশোধন ও সংস্কারের আশ্বাস দেন।

যুক্তরাজ্যের একসময় সাতপ্রকার মৃত্যু কর ছিল। বর্তমান সম্পত্তিকর বিলের আওতায় আনিয়া সবগুলিতে একটি বিলে পরিণত করা হইয়াছে। তদানীন্তন চ্যান্সেলার অফ দি এক্সচেকার বিলটি পরিবর্তনের কারণ উল্লেখ করিয়া বলেন, Judged by modern standards of taxation legacy and the succession duties are most unsatisfactory in their present form. The rates are unrelated to taxable capacity, but are flat rates depending on the degree of consanguinity. Thus a son is charged 2%, a brother 10% and a more distant relative 20% regardless of the amount of benefit received .....the legacy and the succession duties also have the drawback that they impose a proportionately heavier burden on the small than on the large estate.

মিঃ ক্যালডারও অনুরূপভাবে সম্পত্তিকরের পরিবর্তে সর্বপ্রকার দানের উপর একটিমাত্র কর, নির্ধারণের সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়, দক্ষতা এবং পরিচালনাগত সুবিধার উপর ভিত্তি করিয়া এই সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি দান করার ক্ষেত্রে গ্রহীতার উপরই কর ধার্যের সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি দানের বা উইলের মূল্যের উপর বিভিন্ন হারে কর ধার্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রহীতার দান গ্রহণের পর সর্বসাকুল্য সম্পত্তির উপর কর ধার্যের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দানের উপর কর রেহাই দিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন—যদি সেক্ষেত্রে গ্রাহকের মোট সম্পত্তির মূল্য ১লক্ষ টাকার বেশী না হয়। যাহাতে সামান্য ভাতা অথবা ছোট খাট দানের উপর অতিরিক্ত কর দিতে না হয়, সেজন্য এক বৎসরের মধ্যে গৃহীত দানকে সেই বৎসরের আয় হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্নহারে সম্পত্তি কর ধার্যের ব্যবস্থা আছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১০লক্ষ টাকার সম্পত্তির উপর ১৬·৯ শতাংশ, অষ্ট্রেলিয়ায় ২০·৬ শতাংশ, সুইডেনে ৩২·৭ শতাংশ যুক্তরাজ্যে ৪০শতাংশ, জাপানে ৫৬·৮ শতাংশ এবং ভারতে ১৫·২ শতাংশ। ভারতে এই করের হার সর্বাপেক্ষা কম।

ক্যালডারের মত গ্রাহকের উপর কর ধার্য করিলে কর ফাঁকি দেওয়া শক্ত হয়। ভারতে কোন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা খুবই শক্ত; সেইজন্য গ্রহীতা বা ওয়ারিশ বা প্রাপকের উপর কর বসাইবার পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ। বিভিন্নদেশে এই কর ধার্যের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে দানকর বলিয়া কোন কর নাই। সেখানে সম্পত্তিকর ও

উত্তরাধিকার কর দুইটিকে একত্র করিয়া সম্পত্তিকরের আওতায় আনা হইয়াছে। সম্পত্তিকরের সর্বাপেক্ষা অসুবিধা হইতেছে যে ইহার শাসনতান্ত্রিক পরিচালনা ও ইহার আদায়ের অসুবিধা। ভারতে সম্প্রতি কয়েকটি নূতন কর ধার্য হইয়াছে এবং এখনও সেইগুলি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই; সরকার এখনও ইহার প্রতিক্রিয়া সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া এমনও আশংকা করা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে দুইবার কর আদায় হইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে ব্যয় কর আইনের কথা বলা যাইতে পারে। ৫ ধারায় যে উপধারায় বলা হইয়াছে "Any expenditure incurred by the assessee by way of, or in-respect of, any gift, donation or settlement or trust or otherwise for the benefit of any other person shall be exempt from expenditure tax."

দানকর হইতে ৩০ কোটি টাকার মত আয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে। ইহা অতিরিক্ত উচ্চাশা সম্পন্ন; তাহা ছাড়া দানকর আদায় করিতে গিয়া ৩কোটি টাকার মত আয় তখনও পাইবে। তাহাছাড়া প্রাপকের সম্পত্তির উপর দানকর হইতে আয় নির্ভর করিতেছে। প্রাপক বিভিন্ন কারণে ভারতবর্ষে সম্পদশালী নহে। উপরন্তু অধিকাংশ দান দাতার জীবদ্দশায় সম্পন্ন হইলে সম্পত্তিকর আদায় ব্যাহত হইতে পারে। এ প্রসঙ্গে কর তদন্তে কমিশনের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। "The gift tax requires considerable experience of the operation of the Estate Duty before it can be introduced. They expressed themselves not in favour of introducing a gift tax in haste."

এ প্রসঙ্গে খ্যাতনামা অর্থনীতিক এবং কর প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডালটন যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "In practice it seems hardly possible either to tax all such gifts as inheritance or effectively to prohibit them altogether." অতএব ভারতে দানকর প্রবর্তনের পূর্বে দানকর সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং মৃত্যুর পূর্বে ও মৃত্যুর পরে বিবিধ প্রকার দানের সুযোগ সুবিধা ও সার্থকতা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া এই কর প্রবর্তন করা উচিত। যদি ক্যালডারের সুপারিশই গ্রহণ করিতে হয় তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দানকর রেহাই দেওয়া উচিত। কারণ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে দানগুলি কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হইবে না।

(১) যদি দৌহিত্র, বৃদ্ধ আত্মীয়স্বজনদের, অবসরপ্রাপ্ত ভৃত্য অথবা কর্মচারীদের ভরণপোষণ ও প্রতিপালনের জন্য কিছু দান করা হয়;

(২) যদি বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে কন্যাকে দান করা হয়;

(৩) কর্মচারীর যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে যদি কিছু দান করা হয়;

(৪) কোন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে যদি কিছু দান করা হয় তাহাও দানকর হইতে অব্যাহতি পাওয়া উচিত। ভারতে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাহা ব্যক্তিগত দানের উপর নির্ভরশীল, শিক্ষা, বিজ্ঞান-গবেষণা, কারিগরি সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এখনও এখনও সরকার কর্তৃক পর্যাপ্ত দানের অভাবে বে-সরকারী আনুকূল্যের উপর নির্ভরশীল হইতে দেখা যায়। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বে-সরকারী দান হইতে বঞ্চিত হইলে তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আনন্দের কথা সরকার ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি কিছু দান করা হয় তাহা

দানকর হইতে অব্যাহতি পাইবে না। আজ ভারতের বিভিন্ন ধর্মমন্দিরে সংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর জীবিকা আইনকারী পণ্ডিতগণ ব্যক্তিগত দানের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এইরূপ ক্ষেত্রেও সরকারকে অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন।

৫) মৃত্যুকালে মুমূর্ষব্যক্তি অনেক সময় শুশ্রূষাকারী আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য, বন্ধু যাহারা উত্তরাধিকারী-সূত্রে আবদ্ধ নয় অথচ যাহার একান্ত ইচ্ছাক্রমে দানগুলি সম্পন্ন হয় সেই সব দানের উপরই এই কর মকুব করা উচিত। অবশ্য এক্ষেত্রে দানের পরিমাণ ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ২৫,০০০ হাজার এবং মোট দান ১লক্ষ টাকার বেশি না হইতে পারে এরূপভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সমাজবাদী সমাজের পথে ভারত

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘ দুশো বছরের বিদেশী শাসন ভারতের অর্থনীতিকে কৃষিকেন্দ্রিক থাকতে বাধ্য করেছিল। অশিক্ষায়, সংস্কারাচ্ছন্নতায় এবং মালিকদের মাথাব্যথে দেশের দুঃস্থতম জনসংখ্যার মাথা তোলবার প্রেরণা বা গরজ কিছুই ছিল না। অগণিত জনগণকে অন্ধকারে থাকতে অভ্যস্ত করবার আয়োজনে বিদেশী শাসন কর্তৃপক্ষ ত্রুটি রাখেননি কোনদিক থেকে এবং এইজন্যই তাঁরা নিজেদের পূর্ণ অনুগামী করে একদল ভারতীয়কে গড়ে পিটে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অপচেষ্টা তাঁদের সফলও হয়েছিল বহুলাংশে।

তারপর একদিন কালের দাবীতে ইংরেজকে বিদায় নিতে হ'ল ভারতবর্ষ থেকে। যাবার সময় সোনার দেশকে তারা খণ্ডিত করে দিয়ে গেল।

খণ্ডিত ভারতবর্ষের যে টুকরো আমাদের মাতৃভূমি, তারই কথা বলছি এ প্রবন্ধে। ইংরেজী শাসন অবসানকালে আমাদের এই ভারত সর্বাঙ্গীন দৈন্যের তাড়নায় বিপর্যস্ত। আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা মহাত্মা গান্ধী তখনও জীবিত, তাঁরই আশীর্বাদ আর উপদেশ পাথেয় করে ভারতের জাতীয় সরকারের শুভযাত্রা আরম্ভ হ'ল। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩১) লণ্ডনে গান্ধীজী কংগ্রেসের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন, সে সংজ্ঞার রূপদানে অনুপ্রাণিত করলেন তিনি অনুচরদের।[১] অহিংসার বিগ্রহ স্বরূপ তিনি, তাঁর কাছে শুধু অস্ত্রের আঘাতই হিংসা নয়, ধনী দরিদ্রকে শোষণ করলে বা ক্ষমতাবান দুর্বলের ওপর অন্যায় অত্যাচার করলে তাও হবে হিংসানীতির পরিচায়ক। তিনি ভারতকে সর্বদিক থেকে শোষণমুক্ত করবার স্বপ্ন দেখলেন এবং দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন যে সাদা চামড়ার প্রভুত্ব অবসানের পর কালো চামড়ার কায়েম হবে

[১] The Congress represents in its essence the dumb and semi starved millions scattered over the length and breadth of the land in its seven akhs of villages. Every interest which is worthy of protection has to subserve to this interest and if there is genuine and real clash, I have no hesitation in saying that Congress will sacrifice every interest for the ake of the interest of dumb millions.

এ তিনি চান না।* দিল্লীর প্রাসাদাবলীর পাশে শ্রমিকদের বস্তির দীনতা তাঁকে অস্বস্তিকর করে তুললো।

বৈধর্তনিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী গান্ধীজী মার্কসবাদের উগ্র শ্রেণী সংগ্রামের পথ বর্জন করলেন। ভারতের জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ যেখানে ভোগ করে শতকরা ৬২ জন লোক, সেখানে আর এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে শতকরা মাত্র ৫ জন লোক। এই অসম ধনবণ্টন ব্যবস্থার তিনি তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি ব্যক্তি-মালিকানার অধীন বৃহৎ যন্ত্রশিল্পকে আখ্যা দিলেন "গতিশীল হিংসা" (violence in motion)। একই সঙ্গে সামাজিক কর্মসংস্থানের ওপর এবং ধনতন্ত্রবাদের ভিত্তিমূল বিশ্লিষ্টকরণের ওপর তিনি জোর দিলেন। শোষণকারীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বললেন, ধনীরা শোষণ বন্ধ না করলে বিপ্লব আসবেই। ভারতের বিশেষ অর্থনৈতিক পটভূমিকায় জীবনযাত্রার সাধারণপ্রবণতার ওপর গান্ধীজি আপেক্ষিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। তাঁর রামরাজ্য সমাজবাদী সমাজের এক বিশিষ্ট উজ্জ্বল রূপমাত্র।

প্রীনেহেরু পরিচালিত জাতীয় সরকার গান্ধীজির তিরোভাব এবং দেশবিভাগের সুবিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনায় হাত দিলেন। বলাবাহুল্য, ভারতের মত আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত দেশে বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ আপাতদৃষ্টিতে 'দুরাশীর সাহস' বলেই মনে হয়। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বৎসরে দেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থার খুব বেশি উন্নতিও সম্ভব নয়, কারণ সাংগঠনিক বা প্রস্তুতিমূলক কাজেই এ সময়টা কাটার কথা। প্রচুর জাতীয় অর্থব্যয় হবে অথচ প্রত্যক্ষ উপকার অবিলম্বে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে না, এরকম অবস্থায় দেশবাসীর দুর্দশা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। কাজেই প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের দায় ছাড়া দেশের লোকের এই বিরক্তির মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রশ্নও পরিকল্পনা রচয়িতাদের ভাবিত করে তুলেছিল। তবু ভারতের জাতীয় সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনামালার কার্যক্রম নিয়ে (১৯৫১-১৯৫৬) কাজে নামলেন এবং আশা করলেন যে, এই পরিকল্পনার কার্যকরিতার ফলে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ধনবাদের বহুলাংশে বিলোপ, জনগণের মানের লক্ষণীয় উন্নতি এবং রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবে।* মোটের উপর ক্রমশঃ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটে ভারতে

---

* Swaraj for me means freedom for the meanest of our countrymen. I am not interested in freeing India merely from the British Yoke. I am bent upon freeing India from any yoke whatsoever. I have no desire to exchange "king log for king stork."

* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে :—The Central Objective of Planning in India is to raise the standard of living of the people and to open out to them opportunities for a richer and more varied life. It must, therefore, aim both at utilising more effectively the available resources, human and material, so as to obtain from them a large output of goods and services, and also at reducing inequalities of income, wealth and opportunity.

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে :—The principal objective of the second five year plan is to secure a more rapid growth of national economy and to increase a country's production potential in a way that will make possible accelerated development in the succeeding plan periods. Immediate need have to be met, but it is essential to think in terms of the more long range dividends that a big and bold programme of development has to offer.... The second five year Plan has to increase the flow of goods and services available and also to carry forward the process of institutional change.

সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠবার আশা প্রকাশ পেলো। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মত আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশের শিক্ষা (কলাশিল্পসহ) স্বাস্থ্য, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন প্রভৃতি 'সমাজসেবা' খাতগুলির উপরও সবিশেষ দৃষ্টি থাকায় এরকম একটা আশ্বাস মিললো যে, ভারতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে মানবীয় মূল্যবোধের ছাপ থাকছে।

প্রথম প্রথম বোঝা না গেলেও এখন ক্রমেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভারত সরকারের নীতি হ'ল ভারতে ব্যক্তি-পুঁজিবাদের ক্ষমতা কমিয়ে আনা। অবশ্য এই নীতির সার্থকতা বিকল্পে সাধারণ দেশবাসীর মানুষের মত বাঁচবার সুযোগলাভের উপর নির্ভরশীল। ভিত্তিমূলক পরিকল্পনার কাজ এখনও সম্ভব হয়নি, আর তার জন্যই পুঁজিবাদের চাপ কমাবার যে সব প্রশংসনীয় চেষ্টা চলছে বর্তমানে, তা সাধারণো স্বীকৃতি পাচ্ছে না। একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, পরিস্থিতি অনুকূল হলে এ সম্পর্কে দেশব্যাপী আগ্রহ, আবেগ এবং সক্রিয় সহযোগিতা অনেক বেশি দেখা যেতো।

সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে দেশের সমস্ত চলতি ব্যবস্থা রাতারাতি ওলট পালট করে দিতে হবে, একথা ঠিক নয়। নূতন ধনোৎপাদন ব্যবস্থায় নূতন নীতির প্রয়োগ এক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন, পুরাতন সঞ্চয় বা ভোগের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ধৈর্যের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া তেমনি দরকার। সমাজবাদে রাষ্ট্রের আয়ত্তে উৎপাদনী ব্যবস্থা থাকা এবং ধনী-দরিদ্রের অসাম্য বিদূরিত হওয়া অত্যাবশ্যক। ভারতে এখন যে ব্যবস্থা চলছে তাতে খুব উদার এবং ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয়করণ নীতির প্রয়োগ হচ্ছে না একথা ঠিক। এর ফলে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠাও বিলম্বিত হতে পারে। তবে ভারতে ভোগ্যপণ্যের প্রচণ্ড অভাব, সরকারী পরিচালনার অভিজ্ঞতার অপ্রাচুর্য্য, কেন্দ্রীভূত শিল্পসংস্থান ক্ষমতা, এসবের জন্যই রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থা সর্বাত্মক দ্রুততা পাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে ভারত সরকারের ঘোষিত শিল্পনীতি (৩০শে এপ্রিল ১৯৪৮)* লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে আবাদী কংগ্রেসের সংকল্প (জানুয়ারী, ১৯৫৫) সামনে রেখেও যেন তাঁরা উপস্থিত ভারতের শিল্পকে তিনশ্রেণীতে ভাগ করলেন এবং মৌলিক, দেশরক্ষা, পরিবহন ও খনিজ শিল্পের মধ্যে কতকগুলি শিল্পে কেন্দ্রীয় পূর্ণকর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ করলেন।

ভারতে ধনিক সম্প্রদায়ের অনেকেই জমিদারীর মুনাফাভোগী ছিলেন। 'ভূমি-অভিজাততন্ত্রের দৌলতে তাঁরা সমস্ত সমাজের ওপর বিচিত্র এক ধরণের প্রভাব বিস্তার করতেন। ভারতে এখন শুধু বংশীয় রাজন্যপ্রথার বিলোপ হয়নি, জমিদারী ব্যবস্থাও লুপ্ত হয়েছে। দেশবাসীর বড় একটা অংশ 'অনুন্নত' করে রাখার যে দুর্নীতি এতকাল চলছিল, এখন আইন করে তারও বিলোপ ঘটেছে। মানুষে মানুষে সামাজিক সাম্য আজ আর ভারতে কবির কল্পনা নয়। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থাকে যাতে করব্যবস্থা নির্ধারিত হয় এইজন্যই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী

---

* এই নীতি ঘোষণাকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলেছেন :—The adoption of the socialist attern of society as the national objective, as well as the need for lanned and rapid development require that all industries of basic and rategic importance, or in the nature of public utility services, should : in the public sector. Other industries which are essential and require ivestment on a large scale, which only the State, in the present rcumstances could provide, have also to be in the private sector; he State has, therefore, to assume direct responsibility for the future velopment of industries over a wider area.

অর্থনীতিবিদ ডাঃ নিকোলাস ক্যালডারকে ভারতে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল অনেকে মনে করেন। বাস্তবিক ক্যালডার সাহেব 'ব্যয়করের (Expenditure Tax) মত কর সংস্থাপনের যে সুপারিশ করেছেন, তাতে এরকম একটা অনুমান অস্বাভাবিক নয়। পুরুষানুক্রমে বিত্তস্থিতির মূলে ভারত সরকার বর্তমানে কুঠারাঘাত করেছেন মৃত্যু কর বা উত্তরাধিকার কর বসিয়ে এবং বর্তমান ধনীদের আয়করের হার বাড়িয়ে অথবা মূলধনী মুনাফা কর (Capital gains tax এবং দান কর (Gift tax) বসিয়ে হাতের নগদ টাকা কমাবার লক্ষনীয় ব্যবস্থা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে নানারকম করের যে চাপ দেখা যাচ্ছে তাতে নগদ টাকার স্বচ্ছলতা সহজে বাজারের ওপর খুব বেশি প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। করভার মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রদেরও বিপন্ন করছে সন্দেহ নেই, তবে পরিকল্পনার যুগে সকলের ত্যাগ স্বীকার অপরিহার্য ব'লে এ অবস্থার অনিবার্যতাও উপলব্ধি করতে হবে। অবশ্য যেসব দুর্নীতি চলছে এই সঙ্গে তা দূরীভূত হওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিল। এই দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য সর্বাত্মক একটা আন্দোলন অত্যাবশ্যক, কারণ এই দুর্নীতি বিদূরণের ওপর জনসাধারণের সহযোগিতা তথা এদেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। আগেই বলা হয়েছে, ধনীদের সম্পদ হ্রাসের প্রচেষ্টায় বিকল্প ব্যবস্থা হ'ল দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি এবং সে উন্নতি হলে তবেই দেশের অর্থব্যবস্থায় সত্যকার সমতা আসবে এবং সমাজবাদ সম্ভব হবে। উৎপাদনী ব্যবস্থার অধিকতর রাষ্ট্রীয়করণ, কর্মসংস্থানের প্রসার এবং সকল সম্ভাব্যক্ষেত্রে সামাজিক অনাচার ও অসমতা দূরীকরণ এই সমাজবাদ স্বরান্বিত করবে।

উপসংহারে গোড়ার কথায় আবার ফিরে যাওয়া যাক। ভারতের সংগঠন বৈচিত্র্যের কথা কোন পরিকল্পনার সময়ই ভুললে চলবে না। এইজন্যই পূর্ণ ইউরোপীয় আদর্শে ভারতকে ঢেলে সাজার চেষ্টা মূর্খতা। ভারতের বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করেই মহাত্মা গান্ধী মানবিক মূল্যবোধ সামনে রেখে এদেশে বিশেষ ধরণের সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন। সে সমাজবাদেও শ্রমজীবীদের স্থান সবার উপরে। আন্তর্জাতিকতার কোন মোহেই গান্ধীজির এই পরিকল্পনা অবহেলা করা উচিত নয়। ভারতের শাসনভার মোটামুটি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের হাতে কংগ্রেস জাতির জনককে ভুললে তা কংগ্রেসের পক্ষে আত্মহত্যারই সমান হবে। ইন্দোর অধিবেশনে (জানুয়ারী ১৯৫৭) সভাপতি শ্রী ইউ, এন, ডেবর ঘোষণা করেছেন, ভারতের সমাজতন্ত্র গান্ধীজীর সর্বোদয় পরিকল্পনার উপর ভিত্তিশীল।* এ ঘোষণা পরিবর্তিত পরিস্থিতি সাপেক্ষভাবে কতটা বাস্তব রূপ পায়, তা সবাই আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন।

---

* We have also to be clear that we do not think in terms of mere material prosperity. The human being is not simply a means of matter. There is an essence in him and this essence of human existence should count far more with the human community. Socialism in India, should therefore, lean more on the side of Gandhiji's Conception of Sarvodaya, even if we cannot fully reach up to Gandhiji's Conception of the new Socio-Economic order.

উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থ নিয়োগের জন্য জাতীয় সঞ্চয়

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ (পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব মন্ত্রী)

বৈষয়িকক্ষেত্রে অল্প-উন্নত একটি দেশের জনকল্যাণব্রতী সরকারকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে উন্নয়ন-পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যথেষ্ট মূলধনের অভাব। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, কুটিরশিল্প ও বৃহদায়তন শিল্প, পরিবহণ ইত্যাদি অনেক বড় বড় কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, লোহা ও ইস্পাত, রাসায়নিক সার, ভারি মৌলিক রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্যও বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, আর বাকি অনেকগুলির কাজ অগ্রসর হচ্ছে। এই সকল পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় ২,০০০কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই সব কাজের জন্য আনুমানিক ৪,৮০০ কোটি টাকা লাগবে ব'লে হিসাব করা হয়েছে। এর ওপর আবার দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে বে সরকারী উদ্যোগেও প্রায় ২,৪০০ টাকা লগ্নী করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

জনকল্যাণে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কতকগুলি সাধারণ পন্থা আছে। তার মধ্যে প্রধান উপায়গুলি হচ্ছে কর ধার্য করা, সরকারী ঋণগ্রহণ, মুদ্রাস্ফীতি এবং জনসাধারণকে অর্থ-সঞ্চয়ে উৎসাহ দান। অর্থ সংগ্রহের প্রথম তিনটি উপায়ের ক্ষেত্রগুলি সীমাবদ্ধ। যেমন, করভারকে সেই পর্যন্তই বাড়ানো যেতে পারে যে পর্যন্ত না সে দেশের শিল্প-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। মুদ্রাস্ফীতি বেশি হলে দেশের আর্থিক কাঠামো দুর্বল হয়ে যায়। সরকারী ঋণের পরিমাণও সীমা ছাড়িয়ে গেলে, ভবিষ্যৎ জাতীয় আয়ের ওপর ব'য়ে ওঠে গুরুভার।

একটা যুক্তিসঙ্গত সীমা পর্যন্ত ঐ সব উপায়ের আশ্রয় আমরা গ্রহণ করলেও, উন্নয়নের জন্য জনসাধারণের 'সঞ্চয়'কে কাজে লাগাবার যে বিপুল সম্ভাবনা আছে, তার সুযোগ আমরা এখনও সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারি নি। এই উপায়টির মধ্যে কিন্তু বিরাট সম্ভাবনা নিহিত আছে—বিশেষতঃ ভারতের মত দেশে, যেখানে কোটি কোটি লোকের বাস। একটা সহজ দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে মাসে মাথা পিছু একটাকা ক'রে সঞ্চিত হলেও, গোটা ভারতের মোট ত্রিশকোটি লোকের হিসাবে সারা বছরের মোট জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২২কোটি টাকা! সোখটাকে আর একটু বাড়িয়ে ধরলে দেখা যাবে যে, জনপ্রতি সঞ্চয়ের পরিমাণ যদি মাসিক দুটাকা ক'রে হয় এবং সেই সঞ্চয়ের টাকাটা যদি জাতীয় পরিকল্পনা-তহবিলে জমা পড়ে, তা হলে শুধু তাই দিয়েই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে বিনিয়োগের জন্য দরকারী সমস্ত টাকাটা উঠে আসে।

আমাদের এই গণতন্ত্র-শাসিত দেশে, দেশের মানুষদের সঙ্গে নিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মূল কথাই হল জনসাধারণকে প্রণোদিত করা, উদ্বুদ্ধ করা। সেইজন্য আমাদের কাজ হ'বে দেশবাসীকে, দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে, তাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে এবং সমষ্টিগতভাবে জাতির সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিজেদের শক্তিকে নিয়োজিত করার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলা। সেইজন্য জাতীয় সঞ্চয়-অভিযানের মর্ম কথাকে গ্রামাঞ্চলের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া দরকার।

(অবশিষ্টাংশ ৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতের জাতীয় গবেষণা মন্দির

অধ্যাপক এম. এল. থ্যাকার

ভারতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিজ্ঞান গবেষণার বিরাট সম্ভাবনা সম্পর্কেও শিল্পপতিগণ অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন; এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। আজ হইতে প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে ভারতের প্রথম জাতীয় গবেষণা মন্দির স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই গৃহাদি নির্মাণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন, কর্মী নির্বাচন প্রভৃতি প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হওয়ায় বর্তমানে এইগুলিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা সুরু হইয়াছে। এই সকল গবেষণা মন্দিরের অধিকর্তা ও প্রবীন অফিসারগণ পরিকল্পনা কমিশন ও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন কারিগরী কমিটির সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

জাতীয় গবেষণা মন্দিরগুলিতে শুধু যে গবেষণাই পরিচালিত হয় তাহা নহে, বড় বড় শিল্প কারখানার পরিকল্পনা, যথা পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের কারখানার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও পরিবেশন করা হইয়া থাকে। শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে এরূপ মৌলিক বিষয়েও গবেষণাগারসমূহে বহু গবেষণা পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল গবেষণা দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, যথা জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, চামড়া, কাঁচ ও মৃত্তিকা, রাসায়নিক দ্রব্য, খাদ্য ও ভেষজ, এখানে শুধুমাত্র সেগুলি সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব। গবেষণাগারের কাজ বিচারের সময় কেবলমাত্র উৎপাদন পদ্ধতি ও বিভিন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধনে গবেষণাগারের সাফল্য বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। গবেষণার যে বিচিত্র, বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিয়াছে, অনুসন্ধান চালাইয়াছে তাহারও হিসাব লইতে হইবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ—দেশের শিল্পসমূহের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সমীক্ষা গ্রহণ ও পরিমাণ নির্ণয়ের কাজও এইদিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি ও কয়লা ব্যবহারক শিল্পসমূহকে সাহায্য দান ছাড়াও ভারতের কয়লা সম্পদ সম্পর্কে ব্যাপক ও সুসংগঠিত ভাবে গবেষণা চালাইবার ফলে নূতন নূতন কয়লা খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উদাহারণ স্বরূপ বলা চলে যে, ঝরিয়ায় প্রায় ৪০ কোটি টন কোক এবং মধ্যপ্রদেশের ঝিলিমিলিতে নূতন ব্রেডিং কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, এতদিন পর্যন্ত যে সকল কয়লা ধাতব শিল্পে ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, গবেষণার ফলে ঐ কয়লাকে ব্যবহারের উপযুক্ত কয়লায় পরিণত করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাণীগঞ্জের আধা পাথুরে কয়লার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব গবেষণার ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতদিন পর্যন্ত মনে করা হইত যে, ভারতে কোক কয়লার পরিমাণ খুবই কম; অথচ বৎসরের পর বৎসর দেশের ইস্পাত শিল্পে এই শ্রেণীর কয়লার ব্যবহার বাড়িতেই থাকিবে। তাহা ছাড়া, কাচে ব্যবহার্য্য বালি, চীনামাটি শিল্পের উপযুক্ত মাটি, টাল্‌ক, অত্যধিক ক্যালসিয়ামযুক্ত চুনাপাথর, জম্মু ও কাশ্মীরের সুগন্ধি বৃক্ষলতা, এবং গোলাপ চাষের উপযুক্ত অঞ্চল সম্পর্কে যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলি শিল্পোন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হইবে।

খনিজ শিল্প—ভারতের বর্তমান প্রসারমান শিল্পগুলির মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের কয়লা সম্পদের এক অংশ মাত্র কোক শ্রেণীর। আবার কোক কয়লার প্রায় সবটাই

পাওয়া যায় বিহারের ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চল হইতে। ইহার ফলে লৌহ খনিজ পিণ্ড প্রভৃতি অন্যত্র প্রচুর পাওয়া গেলেও লৌহ শিল্প কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, দেশের কয়লা সম্পদ বৃদ্ধি করা খুবই সম্ভব। এই কাজ দুইভাবে করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ কোক কয়লার সংগে পাথুরে কয়লা মিশাইয়া এবং দ্বিতীয়তঃ ধৌত করিয়া ভারতীয় কয়লার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নহে বলিয়া যে ধারণা ছিল পরীক্ষায় তাহা ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে বিশেষ পদ্ধতিতে ধৌত করিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ছাড়াও বিদ্যুৎ শক্তি, সার ও রসায়ন দ্রব্যাদি উৎপাদনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমানে দেশে তিনটি সুবৃহৎ কয়লা ধৌত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; আরও দুইটি কারখানা নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে।

ভারতীয় কাঁচা লৌহে কিছু পরিমাণ ফস্ফরাস থাকে বলিয়া ইস্পাত তৈরির পূর্বে উহাকে দুইবার শোধন করিয়া লইতে হয়। গবেষণার ফলে যে নূতন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহাতে মাত্র একবার শোধন করিলেই চলে। নিম্ন শ্রেণীর কয়লা ব্যবহার করিয়া লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন করা সম্ভব কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি ক্ষুদ্রাকার ফার্নেস স্থাপন করা হইতেছে। জামসেদপুরের জাতীয় ধাতু গবেষণা মন্দিরে গবেষণা চালাইয়া নিকেলের পরিবর্তে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহার করিয়া স্টেইনলেস ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া, মধ্যপ্রদেশের যে লৌহ খনিজ পিণ্ডের গুঁড়া এতদিন পর্যন্ত উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা যাইত না জামসেদপুরের গবেষণা মন্দিরের গবেষণার ফলে এক্ষণে তাহাও ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহার করা চলিবে। ভারতে প্রচুর পরিমাণে ফোটাবাইট ও সিলিম্যানাইট পাওয়া যায়। এই দুইটি খনিজ হইতে তাপ-নিরোধক দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ভারতীয় গ্রাফাইট হইতে খুবই উচ্চ শ্রেণীর গ্রাফাইট ক্রুসিবল তৈরি করা যায়। উহা ঢালাই ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহারের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

উন্নত ধরনারের যে সংশোধিত নক্সা প্রণয়ন করা হইয়াছে তদনুযায়ী বয়লার নির্মাণ করিলে তাহাতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ব্যবহার করা যাইবে। তাহা ছাড়া, যে সকল খনিজ পিণ্ডে মূল ধাতুর পরিমাণ কম সেগুলির উৎকর্ষ সাধন করিয়া ধাতু শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। এইদিকে ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড, ক্রোমাইট, উলফ্রাম, পায়রাইটিস্ প্রভৃতি খনিজপিণ্ডের উৎকর্ষ সাধনে উল্লেখযোগ্য কাজ করা হইয়াছে। গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া উড়িষ্যার ভিতিলগড়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পিণ্ড হইতে বিপণনযোগ্য গ্রাফাইট উৎপাদনের কারখানা এবং বিহারের ঘাটশীলায় ইউরেনিয়াম খনিজ পিণ্ড উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটি কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ ম্যাঙ্গানীজ ধাতু উৎপাদনের তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা গিয়াছে। পরীক্ষামূলক ভাবে যে কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে সেখানে দৈনিক ৩২ পাউণ্ড ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হইতেছে।

রসায়ন শিল্প—শিল্পে ব্যবহার্য রসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের বিষয়ে জাতীয় গবেষণা মন্দির সমূহে অনেক নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইয়াছে। কেন্দ্রীয় রাসায়নী গবেষণা মন্দিরে কারবিয়ান নামক জলের খরত্ব শোষক দ্রব্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহা অনুরূপকার্যে ব্যবহার্য পারমুটিট অপেক্ষা বেশী কার্যকরী ও সস্তা। বর্তমানে ভারতে ও ইউরোপীয়

দেশগুলিতে উহার প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে। এই দ্রব্য জলকে খনিজদ্রব্য মুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বর্তমানে রাজস্থানে এই বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে। রঞ্জন প্রস্তুত কার্যে থ্যালিক এ্যানহাইড্রাইড একটি অপরিহার্য্য দ্রব্য। উক্ত গবেষণাগারে আলকাতরা হইতে উহা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।

ধূম্রহীন কয়লা—ভারতের ঘরে ঘরে রান্নাবান্নার কাজে অল্প মূল্যে ধূমহীন কোনও জ্বালানী ব্যবহার করা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে বহুদিন যাবৎ গবেষণা চলিয়াছিল। কয়লা খনি অঞ্চলে স্তূপীকৃত কয়লার আগুন জ্বালাইয়া এইরূপ কয়লা উৎপাদন করা যায় বটে তবে উপজাত রসায়ন দ্রব্যাদি উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া, ঐ কয়লা হইতে প্রচুর ধূম বাহির হইয়া বাতাস কলুষিত করে। হায়দরাবাদ ও জিয়ালগোরার বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা লইয়া পরীক্ষা চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে, নূতন পদ্ধতিতে অতি অল্প ব্যয়েই ধূম্রহীন কয়লা উৎপাদন করা চলে এবং ইহাতে সকল উপজাত দ্রব্যাদি উদ্ধার করা যায়। শিল্পজাত গ্যাস গন্ধক মুক্ত করার দুইটি অনুঘটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃত্রিম রসায়ন শিল্পের পক্ষে দুইটি অনুঘটক বিশেষ কাজে আসিবে। 'লিগনাসরব' নামক এক প্রকার গ্যাস শোষক দ্রব্য বর্তমানে খনির উদ্ধার কার্যের উপযোগী সরঞ্জাম ব্যবহৃত হইতেছে। লিগনাইট ও নিকৃষ্ট কয়লা হইতে উদ্ভিজ্জ তৈল ও ইক্ষুর রস পরিশোধক কার্বন প্রস্তুত করা গিয়াছে। নিকৃষ্ট ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড ও কিউপ্রাস অক্সাইড হইতে জাহাজের তলার রঙে ব্যবহার্য্য ক্ষয় নিরোধক দ্রব্য ম্যাঙ্গানীজ সালফেট প্রস্তুত করা হইতেছে। তাহা ছাড়া এ প্রসঙ্গে ব্যাটারী শিল্পে ব্যবহার্য্য ইলেক্টোলাইটিক ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড উৎপাদনের পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দ্রব্য কাচকে বর্ণহীন করার কাজে, রঞ্জিন মৃৎমাত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

পুণার জাতীয় রসায়ন গবেষণা মন্দিরে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযুক্ত কীটনাশক দ্রব্য নিকোটিন সালফেট উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হইয়াছে। ইহা ঝড়তি তামাক পাতা হইতে তৈরি করা হয়। ভারতে বৎসরে এইরূপ ২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড তামাকপাতা পাওয়া যায়। এই কীটনাশক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য অন্ধ্র রাজ্যের গুন্টুরে একটি কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। কোসিয়ার রক ফসফেট ও হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড হইতে ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়ায় সালফিউরিক এ্যাসিড ব্যবহার অনেক হ্রাস পাইবে। জাতীয় গবেষণা মন্দিরে 'এ্যাসপারজিলাস নাইজার' নামে নূতন ছত্রাক আবিষ্কার করিয়াছে। ইহার দ্বারা চিনি গাজাইয়া অধিক পরিমাণে সাইট্রিক এ্যাসিড উৎপাদন করা যাইবে। লবিটল হইতে ভিটামিন 'সি' উৎপাদনের উন্নতি পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হইয়াছে। দেশের শিল্প ও গবেষণা কর্মীদের সরবরাহের জন্য জাতীয় রসায়ন গবেষণা মন্দিরে এক হাজারেরও বেশী প্রকারের বীজাণু, ছত্রাক ও খামির রাখা হইয়াছে।

চর্মশিল্প—দেশের চর্ম শিল্পের উন্নয়নে মাদ্রাজের কেন্দ্রীয় চর্ম গবেষণাগারের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত গবেষণাগারের কাঁচা চামড়ার উন্নয়ন সাধন, দেশজ দ্রব্যাদির দ্বারা চামড়া রঞ্জন, চামড়ার উপজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, শিল্পে ব্যবহার্য্য চামড়া প্রস্তুত, চামড়া কষাইবার পদ্ধতির উন্নতি সাধন সম্ভব হইয়াছে। কষাইবার দোষে চামড়ায় যে সকল দাগ পড়িত গবেষণার ফলে, সেগুলিও দূর করা সম্ভব হইয়াছে। ইতিপূর্বে খাবি লবণের দ্বারা চামড়া শোধন করা হইত। মাদ্রাজের গবেষণাগারে এক প্রকার মিশ্র লবণ উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং উহা খাবি লবণের তুলনায়

অনেক ভাল। বর্তমানে প্রতি বৎসর চামড়া কষাইবার জন্য বিদেশ হইতে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ওয়াটল ছাল আমদানী করা হয়। ইতিমধ্যেই দেশে উহার পরিবর্তে ব্যবহারের উপযোগী আর চৌদ্দ প্রকার দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় চর্ম গবেষণাগারে কৃত্রিম ট্যানিন, চর্বি-দ্রব্য, বেট, চামড়া কষাইবার প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্যাদি উৎপাদনের পদ্ধতি নিরূপণ করিয়াছে। এখানে উৎপন্ন প্রতি পাউণ্ড চর্বি দ্রব্যের দাম মাত্র ১০ আনা; বিদেশ হইতে আমদানীকৃত প্রতি পাউণ্ড চর্বি-দ্রব্যের মূল্য এক টাকা বার আনারও বেশী পড়ে। ভারতে পরীক্ষামূলকভাবে কৃত্রিম ট্যানিন ও শিগমেণ্ট ফিনিস উৎপাদনের জন্য একটি ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিলে প্রতি বৎসর প্রায় ২ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়া যাইবে। গবেষণার ফলে ই. আই. চামড়া হইতে আধা-ক্রোম. লোয়েড ও পোষাক তৈয়ারীর উপযুক্ত চামড়া তৈয়ারীর প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ৩ হইতে ৬ মাসের পরিবর্তে মাত্র ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যে 'পিট' পদ্ধতিতে সোলের চামড়া কষান সম্ভব হইয়াছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—ক্ষুদ্রায়তন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প বিষয়ে জাতীয় গবেষণা মন্দির সমূহ বহু মূল্যবান আবিষ্কার করিয়াছে। নয়াদিল্লীর জাতীয় পদার্থ গবেষণা মন্দিরে রেডিওতে ব্যবহার্য সিলভারড্ মাইকা ক্যাপাসিটর উদ্ভাবিত হইয়াছে। বর্তমানে একটি পরীক্ষামূলক কারখানায় উহা তৈরি করা হইতেছে। রুড়কীর কেন্দ্রীয় গৃহ নির্মাণ গবেষণা মন্দিরে কালমাটী হইতে ভাল ইঁট তৈয়ার করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। সেখানে হস্ত চালিত এমন একটি ইট কল প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহার সাহায্যে দৈনিক ২ হাজার ইট তৈয়ার করা যাইবে। তাহা ছাড়া, এইভাবে তৈয়ারী ইটের সঙ্কোচনের পরিমাণও খুবই কম। ফেনা-কংক্রিট তৈরির জন্য এক প্রকার দ্রব্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। উহা ব্যবহারের ফলে সিমেণ্টের ব্যবহার হ্রাস পাইবে। দিল্লীর হিন্দুস্থান গৃহ নির্মাণ কারখানায় বর্তমানে উহা ব্যবহৃত হইতেছে।

কেন্দ্রীয় গৃহ নির্মাণ গবেষণামন্দিরের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হইতেছে সিলিকন মিশ্রিত 'ওয়াশ' আবিষ্কার। উহা ব্যবহার করিলে কাদা মাটির গাথুনী ও কাঁচা দেওয়ালের মধ্য দিয়া জল চুয়াইতে পারিবে না। দিল্লীর কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা মন্দিরের চেষ্টার ফলে কাল মাটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে; ইহাতে সড়ক নির্মাণের ব্যয় কম হইবে। কলিকাতার কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃত্তিকা গবেষণা মন্দিরে দেশীয় কাঁচামাল হইতে ভারতে প্রথম ফেনা-কাচ তৈরির সম্ভব হইয়াছে। রেফ্রিজারেশন ও গৃহ নির্মাণ শিল্পের পক্ষে এই কাচ বিশেষ উপযোগী। লাল কাচের চুড়ি তৈরির জন্য সেলেনিয়াম ছাড়াই কাচ উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। চুড়ি শিল্পে উহা বিশেষ লাভজনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কারণ ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ২ কোটি টাকার লাল চুড়ি তৈরি হয় এবং উহার জন্য বিদেশ হইতে আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকার সেলেনিয়াম আমদানী করিতে হয়। মৃত্তিকা শিল্পের উন্নয়নার্থে যে সকল গবেষণায় সাফল্য অর্জন করা গিয়াছে তাহার মধ্যে দেশীয় কাঁচামাল হইতে কেমিক্যাল পোর্সিলেন এবং বোরাকসমুক্ত গলাই করার পদ্ধতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য—মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণা মন্দিরের প্রচেষ্টার ফলে মোটা ও মাঝারী খাদ্যশস্য হইতে সকলের গ্রহণযোগ্য পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার করা সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সুলভ দ্রব্য হইতেও মুখরোচক খাবার প্রস্তুত করা হইয়াছে। ট্যাপিওকা হইতে এমন একটি খাদ্য

দ্রব্য তৈয়ার করা সম্ভব হইয়াছে যাহা চাউল হইতেও অধিকতর পুষ্টিকর ; চীনাবাদাম ও ডাইলের সংমিশ্রনে একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সর্বার্থসাধক খাবার প্রস্তুত করা গিয়াছে। অন্যান্য খাবারের সহিত উহা গ্রহণ করিলে প্রোটিন, খনিজ দ্রব্য (বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম) ও ভিটামিনের অভাব সহজেই পূরণ করা যাইবে। দাল ও কাল ছোলা হইতে প্রস্তুত প্রোটিন রক্তে শর্করার ভাগ হ্রাস করিতে সক্ষম বলিয়া জানা গিয়াছে। রক্তে এই শ্রেণীর প্রোটিনের কার্যকারিতা এক্ষণে গবেষণা করিয়া দেখা হইতেছে। ইহার মূল কার্য্যকরী উপাদানটি নিষ্কাষণের চেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে বহুত্র রোগ চিকিৎসার একটি কার্য্যকরী ঔষধ পাওয়া যাইবে। তিল ও সরিষার খইল হইতে প্রোটেইন হাইড্রোলাইসেট উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। এই দ্রব্য উৎপাদনের জন্য লক্ষ্ণৌয়ে কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণা মন্দিরের সংগে একটি নূতন গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। উল্লিখিত বিষয় সমূহ ছাড়াও ভারতের জাতীয় গবেষণা মন্দিরসমূহে অন্যান্য নানা বিষয়ে গবেষণা চালাইয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে এই সকল গবেষণা মন্দিরের কার্য্য পরিধি আরও ব্যাপকতর হইবে এবং উহাদের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা দেশের শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া আমরা সবিশেষ লাভবান হইব।

———

ভবিষ্যতের সমাজতন্ত্র

শ্রীআকাশ দাসগুপ্ত

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কথা সমাজতন্ত্রবাদী। অধিকাংশ দেশ সমাজতন্ত্রবাদ চায়। এমন কি সবচেয়ে বড় পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাজ্যও এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বা বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের যে রূপ আমরা দেখেছি, বর্তমান সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, শিল্প বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের করভারের চাপ ও ক্রমাগত আধিপত্য বিস্তার, অধিকতর কর্মসংস্থানের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা বোধ প্রভৃতি নানাবিধ কারণে তেমন রূপটি আজ আর চোখে পড়েনা। মার্কিণ যুক্তরাজ্যেও এই পরিবর্তন ঘটেছে, সে দেশ সাম্যবাদের ঘোরতর বিরোধী হলেও তাদের অর্থনীতিবিদকেও বলতে হচ্ছে—অকৃত্রিম পুঁজিবাদের দিন শেষ হয়েছে, এখন মার্কিন যুক্তরাজ্য মিশ্র অর্থনীতির অনুগামী।

গ্রেটবৃটেনও সমাজতন্ত্রবাদের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলো এট্‌লির নেতৃত্বে শ্রমিক সরকারের আমলে। কিন্তু গ্রেটবৃটেনের শ্রমিকদল পুরোপুরি সমাজতন্ত্রবাদী নয়, আর গ্রেটবৃটেনকে রাতারাতি সমাজতন্ত্রবাদী দেশ হিসাবে রূপান্তরিত করলে বদহজম হয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া রয়েছে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশসমূহ হাত ছাড়া হয়ে যাবার ভয়, তখন বৃটেনবাসীদের না খেয়ে মরতে হবে।

বর্তমান পৃথিবীর ঢেউ সমাজতন্ত্রবাদের দিকে। যে বিপুল জনসংখ্যা দিন দিন পৃথিবীর খাদ্য, বাসস্থান ও পরিধেয় সমস্যাকে শঙ্কাকুল করে তুলছে, সেই সমস্যার সাথে যুঝবার ক্ষমতা পুঁজিবাদের নেই। আরও একটা কথা আছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার চায়।

সাধারণ মানুষ কি শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার চায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে থাকবে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের অধীনে? তা কি করে সম্ভব? অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সে চায় যতদূর সম্ভব সমান অধিকার, অন্ততঃ পরিচ্ছন্নভাবে বেঁচে থাকবার মত অধিকার। জনসাধারণকে এটা দিতে গেলেই মালিকদের অনেক কিছু ছাড়তে হবে; এই ছাড়ার মধ্যেই তো সমাজতন্ত্রের বীজ।

এই গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার এলেই পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী দেশগুলির মধ্যে কার্যকলাপের একটা বিচিত্র সংঘাত দেখতে পাচ্ছি। বিচিত্র হলেও এটা স্বাভাবিক। সোভিয়েট রাশিয়ায় ষ্টালিন লোহার ডাণ্ডার গুঁতোয় ব্যক্তি স্বাধীনতা চুরমার করে দিয়েছিলেন। সেখানকার জনসাধারণের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটা 'টুঁ' শব্দ করবার অধিকার না থাকলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ষ্টালিনের আমলেই। অনেক না জুটুক, দামী না মিলুক, মোটা ভাত কাপড়ের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল সেই দেশে। সেই দেশের জনসাধারণ তবুও চুপ করে নেই। তারাও চাইছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ষ্টালিনের বিরুদ্ধে বর্তমান কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের বিষোদ্গার তার পরিচয়। তার চেয়েও বড় পরিচয় ডাডিনসেভের "নট বাই ব্রেড এলোন" বইখানি। বইখানি একদিনে হঠাৎ ছাপাখানার দরজা পার হয়ে দোকানের শো-কেসে এসে দেখা দেয় নি, প্রকাশিত হয়েছে মস্কোর খ্যাতনামা সাময়িক পত্রে "নভি মির"-এ ধারাবাহিক-ভাবে। সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণের আজ মনের কথা, রুটীই জীবনের একমাত্র প্রয়োজন নয়, রুটি ছাড়াও ক্ষুধা মেটানোর জন্ত আরও অনেক কিছু খাবার চাই। সোজা কথায় রাশিয়ার জনসাধারণ আরও ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়।

আমার একজন বাঙ্গালী সাংবাদিক বন্ধু কয়েকবছর আগে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। রাশিয়ার যুবক যুবতীরা ভারতবাসী পেয়েতো মহা খুসী। তারা বন্ধুটিকে বললো, ভারতবর্ষ থেকে আমাদের চিঠি লিখো। বন্ধুবর বললেন, নিশ্চয় লিখবো, তোমরাও লিখো আমাকে। তাদের চিঠি লিখবার কথা বলায় বেচারীরা একটু মুষড়ে পড়লো। এ ওর মুখ চাওয়া চায়ি করতে লাগলো। বন্ধুবর তাদের বিপদ বুঝলেন, বুঝলেন লৌহ যবনিকার ওপারে লৌহযবনিকার অন্তরালের কোন কথা পৌঁছে দেবার গুরুতর ফলাফলের কথা।

আবার দেখুন পুঁজিবাদী দেশের অবস্থা। ফ্রান্স, ইতালি সাম্রাজ্য হারিয়ে প্রায় সমাজতন্ত্রবাদের মুখে। গ্রেটবৃটেনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গরম থাকতে থাকতে এক ধাক্কায় সাম্রাজ্যবাদের অতবড় প্রহরী চার্চিলকে হটিয়ে দিয়ে শ্রমিকদলকে গদিতে বসালো; রাতারাতি কয়লাখনি ও ইস্পাত শিল্পের বৃহৎ অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে গেল; ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, সিংহল, মিশর প্রভৃতি কয়েকটী দেশ স্বাধীনতা পেয়ে গেল। বৃটেনের অধিকাংশ জনমত তখন এসব কিছুই সমর্থন করেছিলো। আর তা' ছাড়া গ্রেটবৃটেনের পক্ষে রাতারাতি সমাজতন্ত্রবাদী হয়ে পড়লে কি মুসকিল দেখা দেবে, তা আগেই বলা হয়েছে। সমাজতন্ত্রবাদকে কতটুকু আসতে দেওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে গ্রেটবৃটেনের রক্ষণশীল দল অলিখিতভাবে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দিলেও শ্রমিকগণ ও জনসাধারণের বর্ধিত বেতন, বোনাস, সুযোগ সুবিধা প্রভৃতির দাবী ক্রমশঃই গ্রেট-বৃটেনকে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

গ্রেটব্রটেনের অবস্থা দেখে আমরা ঠিক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়াকে বুঝতে পারবো না। ওসব দেশে অঢেল জমি, বনসম্পদ ও খনিজ সম্পদ রয়েছে অথচ জনসংখ্যার অভাব। উর্বর মাটিতে কলমের চারা রোপণের মত মাত্র কয়েকশো বছর আগে ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ দেশগুলিতে চাষা রোপণ করা হয়। এখনো সে সব দেশে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ স্পর্শ পর্যন্ত করা হয়নি। সে সব দেশে প্রকৃত অর্থনৈতিক অভাব আসতে এখনো অনেক দেরী। তবুও এর মধ্যে মালিকানা স্বত্বের একচেটিয়াভাবের ফলে এবং কেন্দ্রীভূত শিল্পাঞ্চল সমূহে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক ও কর্মচারীর একত্র মিলনের ফলে শ্রমিক আন্দোলন, ন্যায্য বেতনের দাবী প্রভৃতি দেখা দিয়েছে এবং পুঁজিবাদ অনেকটা মিশ্র অর্থনীতির পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

সমাজতন্ত্রবাদের স্রষ্টা কার্ল মার্কসের আদর্শকে সর্বপ্রথম একটা সার্থক রূপ দেওয়া হয় সোভিয়েট রাশিয়ায় লেনিন, ষ্টালিন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায়। রাশিয়ায় সাম্যবাদের জয়যাত্রা পৃথিবীর বহু সংখ্যক দেশে, বিশেষভাবে অনগ্রসর দেশ সমূহে, এক আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং বহু দেশে সমাজতন্ত্রবাদী আন্দোলন শুরু হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্টরা রাশিয়াকে তাদের পিতৃভূমি বিশেষ মনে করতে থাকে এবং এখনও অধিকাংশ কমিউনিষ্টদের ধারণা যে কমিউনিজম সম্বন্ধে রাশিয়া যা কিছু বলবে বা করবে তাই ঠিক, সেটাই নাকি মার্কসীয় নীতির সঠিক ব্যাখ্যা। মার্কসীয় পথে সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম করার উপায় হল রাশিয়া যে ভাবে অগ্রসর হয়েছে সেই পথ!

কিন্তু এই ধারণা আজ পৃথিবীর অনেক দেশেরই কমিউনিষ্টদের মন থেকে সরে যাচ্ছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণ বাদ দিয়েও যে অন্য ধরণের সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণের কথা চিন্তা করা যায়, একথা তারা ভাবতে শিখেছেন চীন, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গারি ও পোল্যাণ্ডকে দেখে। চীনে মাওসে তুং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে হাত মিলিয়ে কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট গঠন করেছেন. যুগোশ্লাভিয়ায় মার্শাল টিটো সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার ও আন্তর্জাতিক কমুনিজমের প্রভাবমুক্ত কমিউনিষ্ট সরকার গঠন করে বসলেন, আর পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গারি বলে বসলো আমরা রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি চাই; সাম্যবাদী পোল্যাণ্ড তো সোজাসুজি পুঁজিবাদী মার্কিনের কাছে দেশ পুনর্গঠনের জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে বসলো। তারপর আর একটী গুরুতর পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে। এদেশে কমিউনিষ্ট পার্টি গণতান্ত্রিক ভোট যুদ্ধকে বিপ্লবের একটী পথ হিসাবে গ্রহণ করে সুবোধ ছেলের মতই তথাকথিত পুঁজিবাদী কংগ্রেস শাসিত কেন্দ্রাধীনেই কেরালায় রাজ্য সরকারের শাসনভার গ্রহণ করেছেন।

এই প্রবন্ধের এই পর্য্যন্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে দুটী জিনিষ তুলে ধরবার চেষ্টা হয়েছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর যে সব দেশে সমাজতন্ত্রবাদী ব্যবস্থা নেই, তাদের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রবাদ চায়। এবং দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচলিত আছে, সেই সমস্ত দেশের লোকেরা তাদের উপর আরোপিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন চায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ, সিংহল, পাকিস্থান, আফগানিস্থান, মিশর, উগাণ্ডা প্রভৃতি যে সব দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই, সে সব দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ সমাজতন্ত্র চায় স্রেফ বেঁচে থাকবার জন্য; অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাতিভেদ বর্ণবৈষম্য, জমিদার, মিল মালিকের অত্যাচার দূর করবার জন্য। আবার সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারি প্রভৃতি দেশে জনসাধারণ চায় আরও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, তারা তাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই একটা পরিবর্তন চায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদের আজ আর একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। মার্কসের লেখাই আজ আর সমাজতন্ত্রবাদীর বাইবেল নয়, যদিও একথা চরম সত্য মার্কসকে অনেকখানি স্বীকার করতে হবে। আজ তাই দেখছি কমিউনিষ্ট দল ছাড়াও আরও অনেক সমাজতন্ত্রবাদী দলের সৃষ্টি হয়েছে, অনেক দক্ষিণপন্থী দলও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ মেনে চলছেন। সমাজতন্ত্রবাদের পরিবর্তন চলছে, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে এক একটা দেশে এর এক এক রূপ দেখা যাবে। লেনিন-ষ্ট্যালিনও অক্টোবর-নবেম্বর রিভোলিউশনের স্মৃতিকে বাদ দিয়েই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটবে। রক্তাক্ত বিপ্লবের, পাশার কমরেডকে জাগানোর জন্যে গানের ও সস্তার প্রচার পুস্তকের দরকার হবে না, স্রেফ ভোটের জোরেই অনেক কিছু কাজ হয়ে যাবে।

কার্ল মার্কস ঠিক এই জিনিষটা, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর এই পরিবর্তনটা অনুধাবন করতে পারেননি। তাই উনবিংশ শতাব্দীর মার্কসকে উনবিংশ শতাব্দীতেই "ড্যাস ক্যাপিটাল" পড়ে সমাজতন্ত্রবাদী হওয়া ফেবিয়ানেরা চ্যালেঞ্জ করেছিলো। বিজ্ঞান ও মানুষের চেতনার উন্মেষ বর্তমান পৃথিবীকে উনবিংশ শতাব্দী থেকে অনেক পৃথক করে দিয়েছে। সেজন্য মার্কসীয় চিন্তাধারারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। জওহরলাল নেহেরু ঐতিহাসিক হিসাবে কিঞ্চিৎ কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু রাজনীতির নীতি পদ্ধতির প্রবর্তক হিসাবে তিনি একদম অকৃতকার্য হলেও তাঁর একটা কথা সত্য—তিনি যথার্থই বলেন, "একশো বছর আগে মার্কস সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, পরিবর্তনশীল জগতে একশো বছর পরে তার মূল্য কি? তার অনেকটাই তো ভুয়ো হয়ে গেছে।"

এখানেই থামতাম, যদি যুক্তিবাদী না হতাম। সমাজতন্ত্রবাদের রূপের ও সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটবে একথা সত্য। তবুও ভবিষ্যতের পৃথিবী মার্কসকে বাদ দিতে পারবে না। Maine এর Ancient Law যেমন প্রধানতঃ গ্রীস ও রোম নিয়েই লেখা; তারপর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু অধিকাংশ পরিবর্তনকারী স্বীকার করেছেন Maine এর মূল লেখার পর তারা শুধু সংযোজন করছেন, অর্থাৎ জমিতে হাল ধরে বসে আছেন Maine সাহেব, Ancient Law র অন্যান্য লেখকেরা শুধু সেই জমিতে বিভিন্ন রকমের বীজ বপন করেছেন; তেমনি সমাজতন্ত্রবাদের যতই পরিবর্তন হোক না কেন, সে জমিতে চিরকাল হাল ধরে বসে থাকবেন মার্কস সাহেব, আর যাই শুধু জমিতে নূতন নূতন রকমের বীজ ছড়াবে। ঐ হলধরকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে নূতন প্রয়াসের সম্ভাবনা আছে কি?

ভারতের বহির্বাণিজ্য

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার পূর্বে ইতিহাসের পটভূমিকায় ভারতের বহির্বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। যা'কে আমরা আজকাল বহির্বাণিজ্য বলি সেই রকমের বাণিজ্য ব্যবস্থার ভারতে প্রচলন ছিল খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে। সেই সময় থেকে ভারতের সঙ্গে বিদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তৎকালে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে মিশর, রোম, গ্রীস, আরব, চীন ইত্যাদি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এই সময় দুষ্প্রাপ্য বাণিজ্যই বেশী পরিমাণে হ'ত। ভারত থেকে যে সব জিনিষ রপ্তানী হ'তো তার মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র, হাতীর দাঁতের জিনিষ, গন্ধদ্রব্য, ছাপার জিনিষ, মসলা, ধাতুর তৈরী বাসনপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমদানী করা হ'ত আরবীয় অশ্ব, সুরা, খনিজ সম্পদ যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে মহেঞ্জোদরো সভ্যতার অভ্যুত্থান হয়। এই সভ্যতা যে স্থানটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে ছিল সেই ধ্বংস প্রাপ্ত নগর থেকে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত শীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে সেই থেকে নিশ্চয়রূপে প্রমাণ করা যায় যে তৎকালে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে গ্রীস্, মেসোপোটেমিয়া ইত্যাদি দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। প্রাগ বৌদ্ধ যুগে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য প্রভূত উন্নত ধরণের ছিল। বৌদ্ধ যুগে এই ব্যবস্থা অধিক পরিমাণে প্রসার লাভ করে। বেভার জাতকের লেখা থেকে জানা যায় যে তৎকালে ব্যাবিলন ও ভারতের মধ্যে এক বাণিজ্যিক সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল। মৌর্য যুগে সিংহল, চীনও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। মৌর্যযুগে চীন দেশ থেকে মূল্যবান সিল্ক, সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র, ভারতে বহু পরিমাণে আমদানি করা হ'ত, পরিবর্তে ভারত মূল্যবান ধনরত্ন ও মসলীন চীন দেশে রপ্তানী করতো। এইরূপ অবস্থার মধ্যেও ভারতের পক্ষে সকল সময় অনুকূল বাণিজ্য হিসেব থাকতো।

মধ্যযুগে মোগল রাজত্বের সময় ইরান ও অন্যান্য উত্তরের দেশ সমূহের সঙ্গে এক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে বটে, তবে খুব উন্নত ধরণের নয়। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তার কারণ মোগল বাদশাহরা বছরের বেশী ভাগ সময়ই যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাদের রাজত্বের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল লুট-তরাজ করা এবং প্রজা-পীড়ন করে রাজ্য বিস্তার করা। রাজ্য সুশৃঙ্খলরূপে গঠন করার উদ্দেশ্য তাদের মোটেই ছিল না বললে অতি উক্তি করা হয় না।

সমুদ্র পথে ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হওয়ায় ওলন্দাজ, ডাচ, ইংরাজ এবং ফরাসী এই চারটি ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে ইংরাজ ভারতের সমুদয় ব্যবসা বাণিজ্য হস্তগত করে। ইংরাজেরা প্রথম প্রথম ভারতের ঢাকাই মসলিনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বহু পরিমাণে উক্ত বস্ত্র নিজেদের দেশে পাঠাতে থাকে। এর ফলে তাদের দেশীয় ব্যবসায়ে মন্দাবস্থা দেখা দিল, কারণ লোকের দৃষ্টি ভারতীয় বস্ত্রের উপরই বেশী পড়ে। এইভাবে জনসাধারণের রুচির পরিবর্তন হতে থাকে। সেইজন্য উনবিংশ শতাব্দীতে তারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। কোন কোন জিনিষের উপর অধিক মাত্রায় কস্টম চাপান হয়। এর ফলে ভারতের বাণিজ্য ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হয়ে যায়।

ভারতের আধুনিক বৈদেশিক বাণিজ্য আরম্ভ হয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। সুয়েজ খাল খনন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় থেকে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ক্রমোন্নয়ন হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে মন্দাবস্থা দেখা যায়। যুদ্ধের দরুণ আমদানী বন্ধ হওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে উন্নতি হ'তে থাকে। ভারতীয় শিল্প নিজের প্রয়োজন মত জিনিষ উৎপাদন করতে থাকে। আবার যুদ্ধের পরে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হ'তে থাকে। তবে ১৯২০-২২ সালে সর্বপ্রথম ভারতের পক্ষে এক প্রতিকূল বাণিজ্য হিসেব দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাবধি ভারতের পক্ষে এক অনুকূল বাণিজ্য হিসেব ছিল। তৎকালে ভারতকে একটি 'ডলার কুড়ানোর দেশ' বলা হ'ত। ১৯৩০ সালের পর থেকেই ভারতীয় শিল্পে কাঁচামালের আমদানী বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। এর ফলে ভারতের বাণিজ্যিক অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যমান পুনরায় সাধারণ পর্যায়ে ফিরে আসে। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ আমদানীকৃত জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে আমদানীও কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হবার ফলে ভারতের বহু কৃষি-জমি পাকিস্থানে চলে যায় বা হস্তান্তরিত হয়। ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে যথেষ্ট চাপ পড়তে থাকে। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য জিনিষের আমদানী করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ভারত বিভক্ত হওয়ায় বস্ত্র শিল্পে এক প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়। কারণ বস্ত্রশিল্পগুলো প্রধানতঃ নির্ভরশীল ছিল বিদেশী কাঁচা-মালের উপর। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের পক্ষে ২১৯·৩ কোটি টাকার এক প্রতিকূল বাণিজ্য হিসেব দাঁড়ায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৭·১ কোটি এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে ১৪·৮ কোটি টাকার হিসেব ছিল।

১৯৫২-৫৩ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে ভোগ্যপণ্যের আমদানী শতকরা ৪২% ভাগ হ্রাস পেয়েছে। উৎপাদন সামগ্রী এবং মূলধন সামগ্রীর আমদানী শতকরা ৬৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্প্রতি ভারতের শিল্পনীতিতে কিছু রদবদল করা হয়। আমদানী কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধ করা হয়। রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পায়। ১৯৫৭ সালে Five Pronged Drive কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে—যা'তে বহির্বাণিজ্যের দোষে ত্রুটি সংশোধন করে নিশ্চিত ভাবে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি অক্ষুন্ন রাখা যায়। রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এইগুলোকে চূড়ান্ত ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে ; যেমন :—

(১) আমদানী বিশেষরূপে সীমাবদ্ধ করা। একান্ত এবং অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া অন্য কোন রকমের জিনিষের আমদানী বন্ধ করাই এই নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এজন্য জনসাধারণের অসুবিধা হয় বটে, তবে তা নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার। দেশের জাতির স্বার্থে এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন আছে।

(২) দেশী পণ্যের উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য দেশী পণ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা। স্বল্প সময়ের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি করা প্রয়োজন ; সেই জন্য কয়েকটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে (ক) যেখানে সম্ভব সেখানে কার্যের সময় বৃদ্ধি করা (খ) যে সব যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা বর্তমানে আছে তার সঙ্গে নতুন ধরণের যন্ত্রপাতি যোগ দেওয়া কর্তব্য। যদি ঐ সব জিনিষগুলোর মূল্য বিদেশ থেকে আমদানীকৃত তুলনায় মূল্য অধিকও হয় তথাপি ভারতীয় শিল্পে সেগুলো ব্যবহার করা উচিত।

(৩) রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা। এ বিষয়ে আমরা যথাসময়ে আলোচনা করবো।

(৩) আধুনিকতম যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ভারতে আমদানী করা এবং দেয় মূল্য দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি বলে পরিশোধ করা। এই ঋণ পরিশোধের সময় ৫-৭ বৎসর পর্যন্ত ধরা হয়।

(৪) বিদেশী মূলধন সংগ্রহ। বিদেশী মূলধন সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, সোবিয়েৎ দেশ, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা ইত্যাদি থেকে ঋণ হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কলম্বো পরিকল্পনার দ্বারা ভারতীয় বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়। এই পরিকল্পনার গঠন হয় ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে কলম্বো সহরে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিংহল, ভারত, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ এই পরিকল্পনার চুক্তি ভুক্ত হয়। এই পরিকল্পনার যথারীতি কার্য আরম্ভ হয় ১৯৫১ সালের ৩০ জানুয়ারী তারিখে। এই কলম্বো পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত সমগ্র দেশের আর্থিক অবস্থার (তাদের মারফৎ) উন্নয়ন করা। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলো যদি নিজ বাণিজ্যে উন্নতি করতে সমর্থ না হয় সেক্ষেত্রে তারা কলম্বো পরিকল্পনা আওতায় এসে সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হবে।

ভারতের রপ্তানী ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য অন্যান্য দেশের সঙ্গে চুক্তি, বাণিজ্যিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক শিল্প মেলায় যোগ দেওয়া, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী মেলার ব্যবস্থা করা হয়। সুইজারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী চেকোস্লোভিকিয়া, পশ্চিম জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক (Bilateral) বাণিজ্য চুক্তি করা হয়; এর ফলে ভারত তৎকালীন দুষ্প্রাপ্য নিউজপ্রিণ্ট, মূলধন সামগ্রী, ইস্পাতের নানা প্রকারের জিনিষ চুক্তি বলে পেতে থাকে। ১৯৪৯-৫০ সালে মুদ্রামূল্যের পাতন হওয়ায় ভারতের বাণিজ্যে উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর এবং ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মোট মূল্য দাঁড়ায় ৬১১·৩ কোটি টাকা। গত দু'বছরে রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়াও ভোগ্য পণ্যের আমদানী প্রচুর পরিমাণে করা হয়। লাইসেন্স ব্যবস্থা শিথিল হওয়ার দরুণ এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে ভারতের পক্ষে এক প্রতিকূল বাণিজ্য হিসেব দাঁড়ায়। ওদিকে ভারতের গচ্ছিত তহবিলও শেষ হবার উপক্রম হয়েছে। যখন খাদ্য দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করা হয় সেই সময় শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পায়; ফলে কাঁচামালের আমদানী বৃদ্ধি পায়। অন্তর্দেশীয় ব্যবসায়ে উন্নতি হওয়ার দরুণ বিশেষ ভাবে বাছাই করা জিনিষের জন্য আমদানী নীতি কিছু পরিমাণে শিথিল করা হয়।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার জন্য ১৯৫৫-৫৬ সালের আমদানী নীতির কঠোরতা কিছুটা হ্রাস করা হয়। এই সময় উৎপাদন সামগ্রীর চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যায়। সেই কারণে ডলার এলাকা থেকে আমদানীকৃত ৫৫টি বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিষকে যে কোন রকম প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্লাষ্টিক দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, লঙ্কা এবং তামাক শিল্পের উন্নয়নের জন্য রপ্তানী শুল্ক বহু পরিমাণে হ্রাস করা হয়। ভারত সরকার অক্টোবর ১৯৫৭—মার্চ ১৯৫৮ সালের আমদানী নীতির ঘোষণা করেছেন। আমদানীর ব্যাপারে যতদূর সম্ভব মিতব্যয়িতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৬০টিরও অধিক ভোগ্য পণ্যের যেমন তামাক দ্রব্য সাইকেল, ঘড়ি, ফাউণ্টেনপেন, চিনামাটি ও কাঁচের জিনিষ ইত্যাদির আবার অন্যদিকে চেষ্টা করা হচ্ছে যা'তে শিশুদের খাদ্য, জমানদ্রব্য, মদলা, সুপারি ইত্যাদির যেগুলি স্থায়ীভাবে চালু রাখা যায়। বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের আমদানীর জন্য কোন প্রতিবন্ধক নেই। 'নির্দিষ্ট কোটা' শেষ হয়ে

গেলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত একই ঔষধ সমপরিমাণে আমদানী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৌখীন দ্রব্যের আমদানী একেবারে বন্ধ করা হয়েছে। সৌখীন দ্রব্যের মধ্যে ফটো ফিল্ম, ঘড়ি, সাইকেল উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি গেজেট অব ইণ্ডিয়ার এক অতিরিক্ত সংখ্যায় সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে আলোক চিত্রের উপকরণ আমদানী সংক্রান্ত নীতি ভারত সরকার পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং এইগুলো আমদানীর জন্য স্থায়ী আমদানীকারকদের অতিরিক্ত লাইসেন্স মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত করেছেন। গত বছর অক্টোবর মাস থেকে বর্তমান বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত নেগেটিভ, প্রিন্টিং পেপার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানীর যে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছিল তার মোট মূল্যের ৭৫ শতাংশ পরিমাণ আমদানীর জন্য এই অতিরিক্ত লাইসেন্সগুলো মঞ্জুর করা হবে। এইরূপ করবার কারণ বলা যায় ভারতে শিল্পের অভাব। অভাবের একটি কারণ বলা যায় বিদেশী মূলধনের অভাব। রাষ্ট্রিয়করণের জন্য বহু বিদেশী মালিকরা এদেশে নতুনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিতে চান না।

রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য সর্বসমেত ১৪টি রপ্তানী উন্নয়ন সংস্থা (Export Promotion Council) খোলা হয়েছে। এই সংস্থার অধীন যন্ত্র যন্ত্রপাতি, লিঙ্ক, প্লাষ্টিক দ্রব্য, চামড়া, পশম শিল্প, লাক্ষা শিল্প বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া চা পর্ষৎ এবং কফি পর্ষৎ নিজেদের একটি রপ্তানী উন্নয়ন সংস্থার সৃষ্টি করেছেন। ১৯৫৫ সালে যন্ত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য এক বিশেষজ্ঞের দল পাঠান হয় থাইল্যাণ্ড, মালয়, বর্মা ইত্যাদি দেশে। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তাঁরা সেখানকার বাজারে ভারতীয় যন্ত্রের চাহিদা সম্বন্ধে সঠিক পরিসংখ্যান এবং বিবরণ সংগ্রহ করতে পারেন। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রমোশন কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্যকে বর্মায় প্রেরণ করা হয় ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের চাহিদা জানবার জন্য। ঐ সদস্যেরা দু'টি প্রস্তাব অনুমোদন করেন; একটি ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ বৃদ্ধি করা এবং দ্বিতীয়টি মূল্য কম করার পক্ষে। ১৯৫৭ সালে অনুরূপ একটি দল পাঠান হয় পূর্ব আফ্রিকার দেশসমূহে। রপ্তানী উন্নয়ন সংস্থা ল্যাগোস, পোর্ট ল্যাণ্ড, মোম্বাসা ফ্রাঙ্কফার্ট, প্রাগ, জেগরেব, লেপজিগ, কলম্বো, করাচী, ব্যাঙ্কক ইত্যাদি স্থানে ভারতীয় শিল্পের প্রদর্শনী মেলার ব্যবস্থা করে। ভারতের বাণিজ্য এবং শিল্পমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য তিনটি প্রস্তাব উথাপন করেন। যথা—

(ক) ভারতে প্রস্তুত ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের সাধারণ গুণ বৃদ্ধি করা যাতে ঐ গুলো বিদেশী পণ্য দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে সমর্থ হয়।

(খ) ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য প্রতিযোগিতার বাজারে ছাড়ার পূর্বে মূল্য হ্রাস করা।

(গ) ভারতীয় শিল্প কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচার এবং বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইতালী, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভিকিয়া, রাশিয়া, হাঙ্গেরী ইত্যাদি দেশের সঙ্গে ভারতের পুরাতন বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ইতালী ভারতের বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ বর্তমান বৎসরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থা বিগত ১৯৫৪ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে গৃহীত হয়, এবং পর বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু থাকে। পরে একে কয়েকটি কিস্তিতে বাড়িয়ে ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চালু রাখা হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ইতালী থেকে ভারতে ২৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি, লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য, গাড়ী ও কাপড় আমদানী করা হয়। ঐ বছরে ভারত ৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের লৌহ ও

ম্যাঙ্গানীজ পিগু, অভ্র, লাক্ষা, কাঁচা চামড়া, মশলা, কফি, শণ, পাট ও নারিকেল দড়ি রপ্তানী করে। পাকিস্থান এবং যুগোস্লোভ দেশের সঙ্গে নতুন ভাবে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এক বাণিজ্যিক চুক্তি হয়। চুক্তির আবস্থিক সময় ছিল ১৯৫৯ সাল। স্থির হয় যে সোবিয়েৎ সরকার ভারতকে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত (তিন লক্ষ টন প্রথম বছর এবং ৩৫ লক্ষটন অন্য ছবছরে) ও তৈল খনিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগান দেবে।

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতীয় শুল্ক সংস্থা ২০টি স্থানে অনুসন্ধান কার্য চালান। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সম্ভাবনাযুক্ত শিল্পকে সংরক্ষণের আওতায় আনয়ন করা। কয়েকটি শিল্পের সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ান হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় ৭৩৮ কোটি টাকা মূল্যের জিনিষ ভারতে আমদানী করা হয়। পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৯·৭ ভাগ বেশী।

ভারতের রপ্তানী ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় শিল্প সংস্থা সৃষ্ট হয়। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী ১২শে মে ১৯৫৬ সালে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সংস্থার প্রধান কাজ সুষ্ঠু ভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করা। এই সংস্থার মারফৎ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জিনিষ সময় মত যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। এটি যদিও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তথাপি সরকার কর্তৃপক্ষ এর দেখাশুনা করেন। রাষ্ট্রীয় শিল্প সংস্থার প্রারম্ভিক মূলধন ছিল এক কোটি টাকা। সর্বাধুনিক হিসাবে জানা যায় যে এই সংস্থার (সকল প্রকার ব্যয় বাবদ) ৩২, ৬৩, ২১০ টাকা লাভ হয়।

———

ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ স্বভাবতই সঞ্চয়ী ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন। এই ভবিষ্যতের চিন্তাই মানুষকে বড় করে তুলেছে, মহান করে তুলেছে. সমাজ পেয়েছে কত অধিকারের ফলাফল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই মানুষ সঞ্চয়ী হতে পারে না, ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয় না নিজের বা পরিবারের আর সকলের। সেজন্য প্রয়োজন একটা প্রতিষ্ঠানের—যে প্রতিষ্ঠান এই নিরাপত্তা সম্বন্ধে ব্যবস্থা যথেষ্ট ব্যবস্থা কর্তে পারে। সরকার কর আদায় কর্ছেন ও বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তার পরিকল্পনা কর্ছেন, যেমন হাসপাতাল, বিদ্যালয়, বিদ্যুৎ, জলের কল, রাস্তা, বাড়ী ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। এছাড়া আরও অনেক ব্যবস্থার প্রয়োজন যেমন, কাজে অবসর নেওয়ার পর ভাতার ব্যবস্থা, হঠাৎ কোন লোক দুর্ঘটনায় অকেজো হয়ে গেলে তার ও তার পরিবারবর্গের ভাতার ব্যবস্থা। বিনা খরচায় আরও হাসপাতাল বা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। খুব কম ভাড়ায় যাতে লোক বাড়ী পায় তার ব্যবস্থা। ভাল রাস্তা, পানীয় জল, ড্রেন ইত্যাদির ব্যবস্থা। এই সব সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় পড়ে। এই নিরাপত্তা চালু করার জন্যে আছে সামাজিক বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো, বাণিজ্য সংক্রান্ত বীমাপ্রতিষ্ঠানগুলো ও সামাজিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা।

সামাজিক বীমা প্রতিষ্ঠানে—একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে চাকরী না থাকার সময়, অসুস্থতা বা অন্য বিপদ আপনাদের সময় শ্রমিকদের ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। তাতে পরিবার বর্গকে নিয়ে শ্রমিকেরা জীবনের নিম্নতম মান বজায় রাখতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকেরা, ও সরকার টাকা দেয়। প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনের সময় প্রত্যেক শ্রমিককেই ভাতা দেওয়া হয়।

সে কত টাকা দিচ্ছে তার উপর নির্ভর করে না। তাছাড়া শ্রমিকদের মালিক ও সরকারের তুলনায় খুব কমই টাকা দিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক শ্রমিককেই এই প্রতিষ্ঠানে টাকা দিয়ে যোগদান কর্তে হবে।

বাণিজ্য সংক্রান্ত বীমা—শ্রমিকরা ইচ্ছে মত বীমা কর্তে পারে, নাও কর্তে পারে। খুব কম শ্রমিকই এই বীমা করে; জীবনের মানের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই, যেমন টাকা দেবে সেই অনুযায়ী সুবিধে দেওয়া হবে। বীমার সর্তের বেশী কিছু দেবার ব্যবস্থা নেই এই বীমায়।

সাহায্য দানের ব্যবস্থা—সরকারের তরফ থেকে এই সাহায্য দেওয়া হয় কতকগুলি নির্দিষ্ট সর্তে সাহায্য দেওয়ারও ব্যবস্থা নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন অনুযায়ী হয়।

সামাজিক বীমাই হোল সবচাইতে ভাল নিরাপত্তার ব্যবস্থা। শ্রমিক মনে করেনা যে তাকে বিনা সাহায্য করা হচ্ছে। সে টাকা দেয় ও তার পরিবর্তে সমাজের কাছে পায় প্রয়োজনমত নিরাপত্তা। সমাজের কাছে এ হোল তার দাবী। দয়া করে সমাজ থেকে সে সাহায্য নিচ্ছে না। শ্রমিকরা তাদের টাকা দেওয়ার মাত্রা কিছু বাড়িয়ে দিয়ে আরও সুযোগ সুবিধা চাইতে পারে। তা ছাড়া শ্রমিকদের বাধ্য বাধকতা থাকায় সবাইকেই এই প্রতিষ্ঠানে টাকা দিতে হয়, ইচ্ছেমত দিলাম বা দিলাম না—এই ভাব চলে না।

শিল্প প্রতিষ্ঠান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে দুর্ঘটনার সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। শহর উঠার, গাড়ীর সংখ্যাও বেড়ে যাওয়ায় আজ মানুষের হাত পা ভাঙ্গা, অকেজো হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। শ্রমিকরা তাই নিরাপত্তার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছে দিন দিন। প্রথম এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয় জার্মানীতে প্রায় ৭৫ বছর আগে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। তারপর নানান পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনা ছড়িয়ে পড়েছে ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে। আন্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশের বীমা আইনগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা চলেছে ও এই প্রতিষ্ঠান দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, শ্রমিকদের অসুখ-বিসুখে সাহায্য করার, গর্ভবতী নারীকর্মীদের মাহিনাসহ ছুটী, লোক সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়লে সাহায্য করা, অসুস্থ অবস্থায় সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক নিয়ম কানুনের প্রবর্তন করার সাহায্য করেছে।

আমাদের দেশে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের মত মোটেই হয়নি। এর প্রধান কারণ ভারতবর্ষ হোল কৃষিপ্রধান দেশ, শতকরা আশি ভাগ শ্রমিকই গ্রামের চাষী। চাষের কাজ যখন থাকত না বা কাজ যখন কম থাকত, লোকের প্রয়োজনীয়তা কম হয়ে যেত; লোক গ্রাম থেকে চলে গিয়ে শহরে কল-কারখানায় কাজ কর্ত। আবার চাষের সময় চলে আসতো গ্রামে। গ্রামের এই জমি ও যৌথ পরিবারই ছিল তাদের ভরসা ও নিরাপত্তা। সে জন্য কলকারখানার কাজেতে তারা নিরাপত্তার জন্য মাথা ঘামায়-নি কোনদিন। তাদের অসুখ বিসুখে, দৈব-দুর্ঘটনায়, বিপদ আপদে ভরসা গ্রামের বাড়ী ও আত্মীয়স্বজন। এই গ্রামের সঙ্গে শ্রমিকদের যোগাযোগের ফলে শ্রমিকরা বেশীদিন এক কারখানায় কাজ কর্ত না ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা, বা শ্রমিকদের বেতন অনুযায়ী টাকা দেওয়ার কথাও গড়ে ওঠে নি। ১৯২৯ সালে শ্রমিকদের জন্যে যে রয়্যাল কমিশন বসে, সেই কমিশন মত

প্রকাশ করেছিলেন, যে ভারতীয় শ্রমিকদের জন্যে সামাজিক নিরাপত্তার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করাই সম্ভব নয়; কারণ শ্রমিকরা এক কারখানা থেকে আর এক কারখানায় ঘোরার ফলে তাদের ক্ষতির কোন হিসেব পাওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক্ দেশ স্বাধীন হওয়ায় ও আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সরকার আবার মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেন। জাতীয় সরকারের স্বপ্ন—ঝরঝরে, তকতকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বাড়ী থাকবে সারি সারি কারখানার কাছে. আর শ্রমিকরা তাদের পরিবারবর্গকে নিয়ে থাকবে এই বাড়ীগুলোতে। গ্রাম আর সহরের মধ্যে এই টানা-পোড়েন ও গ্রামের উপর নিরাপত্তার ভরসা করে না। শ্রমিকরা আমাদের জাতীয় সম্পদ বেশী নয়, তার ওপর সবে শিল্প গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে. কত রকম সমস্যা রয়েছে দেশে ছড়িয়ে. অতএব খুব বেশী সুযোগ সুবিধে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি এখনও। তবে আশা করা যায়, যেমন চেষ্টা চলেছে ক্রমশঃ নিরাপত্তার ব্যবস্থা ভাল হয়ে উঠবে।

শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রথম সোপান হোল শ্রমিকদের দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ আইন। এই আইন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করা হয়। সে সময় বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় নি। ১৯২৯-৩১ সালে রয়্যাল কমিশন এই আইনের দোষগুণ বিচার করে আরও পরিবর্ধিত ও ব্যাপক করার পরামর্শ দেন। ভারত সরকার এই মতামতগুলি বিচার করে ১৯৩৩ সালে এই আইনটিকে পরিবর্ধিত করেন ও যথাক্রমে ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে কিছু কিছু সংশোধন করেন। কাগজে কলমে এই আইনে শ্রমিকদের দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের যা ব্যবস্থা করা আছে। মফঃস্বলে মালিকরা তা বড় একটা মানেন না। সরকারী কর্মচারীও তেমন নেই যে মালিকদের এই আইন মানার ব্যাপারে বাধ্য কর্তে পারেন; ফলে, আইনের সার্থকতা থাকছে না শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে।

তাছাড়া মালিকরা অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রকাশই কর্চ্ছেন না ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে। অনেকক্ষেত্রে শ্রমিকরা দুর্ঘটনা ঘটলে বাড়ী চলে যায়। তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না; যেহেতু তাদের বাড়ীর ঠিকানা পর্য্যন্ত তারা দিয়ে যায় না। ঠিকেদারদের লোকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আইনে, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা কোন টাকাকড়ি পায়। শ্রমিকদের আইনতঃ ক্ষতিপূরণ আদায় করার কোন ব্যবস্থা না থাকাও মালিকদের আইন অমান্য করার একটা প্রধান কারণ।

এই আইনের একটা বড় ফাঁক হোল অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। শ্রমিকদের যা অবস্থা, অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার বা ওষুধের ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। যাহাই হোক এই আইন সামাজিক বীমার পর্য্যায়ে পড়ে না, কেননা ক্ষতিপূরণের সমস্ত দায়িত্বই মালিকদের। শ্রমিকদের কাছে কিছু নেওয়ার ব্যবস্থা নেই আইনে। ফলে মালিকদের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা আইন মানতে রাজী হয় না। এর পরের ধাপে এল মাতৃত্ব আইন। এ সম্বন্ধে প্রথম আইন পাশ হয় বোম্বাইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। তারপর অন্যান্য প্রদেশে আইন প্রনয়ণ হতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারও ১৯৪১ সালে খনির নারীশ্রমিকদের সম্বন্ধে এক আইন প্রণয়ন করেন। মাতৃত্ব আইন বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। সাধারণতঃ ছেলে হওয়ার আগে ও পরে মিলিয়ে মাস তিনেক ভাতা দেওয়া হয়। দৈনিক ৮ থেকে ১২ আনার

When You Feel Cold

DRINK

A CUP OF INDIAN TEA

AND

For Flavour, Liquor, Quality and Freshness in Tea

ASK

BORAHI TEA COMPANY LTD.

9, Brabourne Road, Calcutta—1

PROPRITORS OF

BORAHI TEA ESTATE

PRODUCER OF

GOOD & QUALITY ASSAM TEA

Telephones : 22 : 2263-4-5

Telegram : Morning tea

মত দেওয়া হয়। এ ভাতা বলতে গেলে আজকালের বাজারে বিশেষ কিছুই নয়। তাছাড়া চিকিৎসারও কোন ব্যবস্থা নেই এই আইনে। ইন্সপেক্টরদের মধ্যে স্ত্রীলোক না থাকায় অনেকক্ষেত্রে এই আইন মানা হয় না।

এই আইনকেও সামাজিক বীমার পর্য্যায়ে ফেলা যায় না কেননা এতে নারী শ্রমিকদের কিছু দিতে হয় না। যা কিছু দায়িত্ব মালিকদের। এর পর সামাজিক বীমা আইনের পর্য্যায়ে প্রথম আইন হোল ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৩ সালে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারদের সঙ্গে আলোচনা করে অধ্যাপক বি. পি. আদারকরকে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি বীমার খসড়া তৈরী কর্তে বলেন। আদারকরের এই খসড়া ১৯৪৪ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠানের ছজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিচার করেন ও অধ্যাপক আদারকরের বেশির ভাগ মতামতের সঙ্গে তাদের মতের মিল হয়। ১৯৪৮ সালে এই খসড়া আইন গৃহীত হোল। ১৯৫১ সালে এর কিছু পরিবর্তন করা হোল। এই আইন সব ফ্যাক্টরীগুলোর উপরই প্রযোজ্য হবে, ২০জন বা তার চেয়ে বেশি কাজ কর্লেই হোল ও যন্ত্রের ব্যবহার থাকলেই হোল। এ আইন শ্রমিক বা আপিসের লোক সবার বেলাতেই খাটবে। মাইনে ৪০০৲র কম হলেই হবে।

এই আইনে যে সব সুবিধে দেওয়া হয়েছে সেগুলো চালু হওয়া সম্বন্ধে দেখাশুনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, ডাক্তার ও শ্রমিকদের তরফ থেকে লোক নিয়ে এক বোর্ড গঠিত হবে। এই বোর্ডের থেকে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা এই পরিকল্পনা চালু রাখার জন্য দায়ী হবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মালিকদের, শ্রমিকদের, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যা টাকা আদায় হবে সেটা নিয়ে একটা ফাণ্ড খোলা হবে। এই ফাণ্ডে শ্রমিকদের বেতন অনুযায়ী কিছু কিছু দিতে হবে। মালিক ও সরকারকেই বেশী দিতে হবে, শ্রমিকদের কাছে সামান্যই নেওয়া হবে ও তা মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নানান রকম সুযোগ সুবিধে দেওয়া হবে। যেমন :—

১। অসুস্থ হয়ে পড়লে বৎসরে ৫৬ দিন, শ্রমিকরা যা বেতন পায় তার অর্দ্ধেক দেওয়া হবে। এই সুবিধে অবশ্য ২দিনের বেশি অসুস্থ থাকলে বা ১৫দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার অসুখে না পড়লে, আর এই পরিকল্পনার জন্য যে ডাক্তারখানা আছে সেখানে চিকিৎসা করাতে তবেই দেওয়া হবে। যক্ষা হলে শ্রমিকদের বিশেষ সুবিধের ব্যবস্থা করা আছে।

২। মাতৃত্বের জন্যে সুবিধে দেওয়া হবে তিনমাসের জন্য অর্দ্ধেক বেতন, তার মধ্যে প্রসব হবার আগে দেড়মাস হওয়া চাই। এই ব্যবস্থা না থাকলে মালিক বা পরিচালকরা গর্ভবতী শ্রমিকদের ছেলে হওয়ার সময় অদি কাজ করাবে ও তাতে তাদের স্বাস্থ ভেঙ্গে যাবে।

৩। অকেজো হয়ে গেলে বা হাত পা ভেঙ্গে গেলে বিভিন্ন রকমের সুবিধে দেওয়া হবে।

৪। যদি কোন লোক কলকারখানায় আহত হয়ে মারা যায় তবে বিধবা ও ছেলেমেয়েদের নানান রকম সুবিধে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

৫। এছাড়া চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে—এই পরিকল্পনার পরিচালকরা যে সব হাসপাতাল ঠিক করে দেবেন সেগুলোতে।

অবশ্য এই সুবিধেগুলো দেওয়ার কতকগুলো সর্ত্ত আছে। সেগুলো শ্রমিকদের মেনে চলতে হবে।

১৯৪২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী দিল্লি ও কানপুরে এই পরিকল্পনার প্রথম রূপ দেওয়া হয়। ভারতের শ্রমিক জগতে এক স্মরণীয় দিন। ক্রমে এই পরিকল্পনা পাঞ্জাব, বোম্বে, নাগপুর, কলকাতা মাদ্রাজ ইত্যাদি শহরেও চালু হয়ে গেছে। উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেল সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে খানিকটা এগিয়ে যাওয়া গেছে এই আইনের মাধ্যমে। এখনও অনেক করার আছে ও এই আইনে যা যা আছে তাও ঠিকমত পালন করা হচ্ছে না। হাসপাতাল বা ডাক্তার প্রয়োজন অনুসারে নেই, শ্রমিকনেতারা যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যাপারেও মালিকরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ছিলেন।

যাই হোক্ আরও একটা আইন সামাজিক নিরাপত্তার প্রচেষ্টাকে দৃঢ় করে তুলেছে। সেটা হোল ১৯৪২ সালের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইন। প্রথম প্রবর্তনের সময় বড় বড় ছটা শিল্পেই এই আইন চালু করা হয়েছিল। এখন আরও অনেক শিল্পের এটা চলছে। শ্রমিকদের প্রায় ছদিনের বেতন প্রতি মাসে কেটে নিয়ে, আর সরকারের তরফ থেকে ছদিনের মত বেতন দিয়ে একটা ফাণ্ড করা হয়। এই টাকাটার উপর সুদ যোগ হোতে থাকে ও বছর বছর জমে শ্রমিকদের অবসর নেওয়ার সময় দিয়ে দেওয়া হয়। এই আইন শ্রমিকদের এক বৎসর কাজ হলে ও ৩০০৲র কম মাইনে হলেই প্রযোজ্য হবে। এটা যদিও ঠিক সামাজিক বীমা ব্যবস্থার মত নয়, কারণ সরকার কিছু এতে দিচ্ছেন না। তাহলেও নিরাপত্তার দিক থেকে এর যথেষ্ট নাম আছে।

কিছুদিন হোল ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান রেলওয়েতে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ওপর পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। নিরাপত্তার দিক থেকে এ ব্যবস্থা খুবই ভাল। কর্মী অবসর নেওয়ার পর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই পেন্সন পাবে, উপরন্তু তার হাতে মাসে মাসে প্রভিডেণ্টের যে টাকা কেটে রেখেছে তাও সুদসমেত দেওয়া হবে। এছাড়া চাকরী কর্তে কর্তে হঠাৎ মারা গেলে কর্মীর স্ত্রী কিছুদিন পর্যন্ত পেন্সন পাবেন।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের রাষ্ট্র স্বাধীনতা পাওয়ার খুব অল্পসময়ের মধ্যেই শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকে বেশ ঝোঁক দিয়েছেন ও এত কম সময়ের মধ্যে যা কর্তে পেরেছেন সেটা বেশ প্রশংসা করারই মত। দেশ আরও শিল্প-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি আমরা এগিয়ে যেতে পার্বো বলে মনে হয় এই নিরাপত্তার ব্যাপারে। তবে শ্রমিকদের পাশ্চাত্য দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মত পরিকল্পনা আশা কর্তে হলে উৎপাদনশক্তি বাড়াতে হবে প্রচুর। শ্রমিক নেতাদের, সমাজহিতৈষীদের ও মালিকদের স্বার্থের কথা না ভেবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি করব মনে করে পূর্ণসহযোগিতা কর্তে হবে সরকারের সঙ্গে। তবেই জাতীয় আয় বাড়বে। শিল্প জগতে জোয়ার আনা যাবে আর এর সুফল শ্রমিকরা আদায় করে নিতে পার্বে দেশবাসীর সমর্থন ও প্রচেষ্টায়। উৎপাদন বাড়ান, শিল্প জগতে পূর্ণশৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা, মালিক ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাই ক্রমে ক্রমে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলবে।

'বর্ত্তমান'

সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যামূলক শিক্ষণীয় পাক্ষিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যা—দুই আনা

বাংলা পরিভাষা

অধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্রকুমার মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

Insurance—বীমা

Lapse—অভিপন্ন হওয়া

Loss—ক্ষতি

„ Actual—গঠিত ক্ষতি

„ Constructive—বাস্তব ক্ষতি

„ Partial—আংশিক ক্ষতি

„ Total—সামগ্রিক ক্ষতি

Maturity—পক্কতা

Mortality Table - মৃত্যুসংখ্যা সারণী

„ Ratio—মৃত্যুসংখ্যা অনুপাত

Nominee—মনোনীত ব্যক্তি বা দাবীদার

Non-tariff—শুল্ক-বহির্ভূত

Paid up—আদায়ীকৃত

Participating—অংশ গ্রহণকারী

Policy—বীমাপত্র

„ Average - গড়পড়তা বীমা

„ Declaration—বিজ্ঞপ্তি

„ Endowment—মেয়াদী বীমাপত্র

„ Floating - চলতি বীমা

„ Limited Payment—নির্দিষ্ট সংখ্যক কিস্তির বীমা

„ Named—নামাঙ্কিত বীমাপত্র

„ Open—অনির্দিষ্ট মূল্য বীমা

„ Time - সাময়িক বীমা

„ Valued—নির্দিষ্ট মূল্য বীমা

„ Voyage—সমুদ্রযাত্রা বীমা

„ With Profits—লাভ সহিত

„ Without Profits—লাভ রহিত

„ Whole Life—আজীবন বীমা

Premium—চাঁদা

„ Quarterly—ত্রৈমাসিক চাঁদা

„ Half-yearly - ষাণ্মাসিক চাঁদা

„ Annual—বার্ষিক চাঁদা

Proposal - প্রস্তাব পত্র

Proof of Age—বয়সের প্রমাণ পত্র

Quiquennial Valuation—পঞ্চবার্ষিক মূল্য নির্ধারণ

Risk Note—দায়িত্ব পত্র

Sea-worthiness—(জাহাজের) সমুদ্র যাত্রার যোগ্যতা

Surrender—প্রত্যর্পণ

„ Value—প্রত্যর্পণ মূল্য

Survivor—জীবিত ব্যক্তি

Tariff—শুল্ক

Theory of Probability—সম্ভাবনা তত্ত্ব

Uberimae Fidei—পারস্পরিক পূর্ণ বিশ্বাস

Underwriter—দায়-গ্রাহক

Unencumbered Policy—দায়মুক্ত বীমাপত্র

Section—71 অনুবিভাগ—9

Export and Import—আমদানী ও রপ্তানী

Ad Valorem duty - মূল্যানুসার শুল্ক

Balance of trade—বাণিজ্য উদ্বর্ত

Bill of Lading (B/L)—বহন পত্র (ব/প)

„ Sight—দর্শনী হুণ্ডি

Bottomry—পোত বন্ধক

Bounty—রাজবৃত্তি, সরকারী আর্থিক সহায়তা

Captain—পোতাধ্যক্ষ

Cargo—পণ্য, মাল

Certificate of Insurance—বীমাকরণ প্রমাণপত্র

„ Origin—উদ্ভব পত্র

Charter—অধিকার পত্র, সনদ

Charter Party—নৌ-ভাটক পত্র

Clearing Agent—নিকাশী এজেন্ট, নিষ্কাশণ অভিকর্তা

Consular Invoice—বাণিজ্যদূত কর্তৃক প্রত্যায়িত চালান

Customs Duty—বহিঃ শুল্ক

Dead weight—অত্যধিক ভারী মাল

Discounting Bills—হুণ্ডি ভাঙ্গান

Discriminating Duty—পক্ষপাত মূলক শুল্ক

Dockyard—পোতাঙ্গন

Dock Warrant—পোতাঙ্গন অধিপত্র

Document against Acceptance (D/A)—স্বীকৃতি সাপেক্ষ দলিল

„ Payment (D/P)—পরিশোধ সাপেক্ষ দলিল

Documentary Bill—দলিলসহ হুণ্ডি, প্রলেখিয় বিনিময় পত্র

Drawback—ফিরতি শুল্ক, প্রত্যাহিক শুল্ক

Dumping—বিদেশে কম মূল্যে মাল চালা

Dutiable goods—শুল্কাধীন মাল
Duty—শুল্ক
Entry—প্রবেশ, প্রবিষ্টি
Export—রপ্তানি
„ duty—রপ্তানি শুল্ক
„ Invoice—রপ্তানি চালান পত্র
Exporter—রপ্তানিকারক
Forwarding Agent—প্রেরক অভিকর্তা, রপ্তানি এজেন্ট
Free Trade—অবাধ বাণিজ্য
Freight—মালের ভাড়া
Import—আমদানি
„ Duty—আমদানি শুল্ক
„ gross—মোট আমদানি
„ quota—আমদানি বরাদ্দ
Importer—আমদানিকারক
Indent—ব্যাদেশ, মাল প্রেরণের আদেশ
„ Closed—ব্যাদেশ
„ Open—অবদ্ধ ব্যাদেশ
Letter of Hypothecation—বন্ধক পত্র
Manifest—নৌপণ্য তালিকা
Mate's Receipt—জাহাজী মাল-রসিদ
Non-dutiable goods—নিঃশুল্ক পণ্য
Octroi—চুঙ্গি, দ্বারদেয় শুল্ক
Port of Shipment—নৌপ্রেষণ বন্দর
Primage—অধিনৌভাটক
Protective Duty—সংরক্ষণ শুল্ক
Respondentia—নৌপণ্য-ঋণ
Ship's Report—নৌ-বিবরণী [জাহাজে মাল উঠান
Shipment—নৌ-প্রেষণ, নৌ-ভরণ, জাহাজে মাল প্রেরণ,
Shipper—পোত বণিক
Shipping Agent—পোত-নিযুক্তক
Shipping Company—নৌ পরিবহন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান
„ Lines—নৌপথ
„ Note—নৌ-প্রেষণ পত্র
Steamer—বাষ্প-পোত, ষ্টীমার
Subsidy—উপদান
Tariff—শুল্ক
Transhipment—বাহান্তরন
Vessel—পোত
Warehouse—মাল গুদাম, পণ্যাগার
„ Bonded—শুল্কাধীন পণ্যাগার
„ Wharf—ভরণ-তট

টাকার মূল্য ও অধ্যাপক বি আর সেনয়

শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত

ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা বিশিষ্ট অর্থবিজ্ঞানী বলে পরিচিত তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক সেনয় নিঃসন্দেহে অন্যতম। বিগত ২৭ শে ডিসেম্বর তারিখে নাগপুর থেকে প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ, তিনি রোটারি ক্লাবে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, ভারতের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ছাঁটকাট একান্ত দরকার! তাঁর ধারণা, ভারত এখন মারাত্মক ধরণের মুদ্রস্ফীতি কবলিত। তিনি বুঝতে চেয়েছেন, বিগত ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে থেকে তের শতাংশ হারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে যেরকম সরকার অধিক মুদ্রার যোগান দিচ্ছেন সেরকম অন্যদিকে ব্যাঙ্কগুলো ঋণ দান বৃদ্ধি করেছেন। অধ্যাপক সেনয় এর মতানুসারে এই পরিবেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। কাজেই পরিকল্পনার ছাঁটকাটের ব্যবস্থা করা দরকার।

যে সময়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করা হচ্ছিল সে সময়ে অধ্যাপক সেনয় সরকার কর্তৃক গঠিত উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। কি ভাবে তিনি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনাটি সঙ্কুচিত করার জন্য দাবী জানিয়েছেন সেটা আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি। যখন তাঁর দাবী গৃহীত হয়নি তখন তিনি পরিকল্পনাটি সঙ্কোচের জন্য প্রবল আন্দোলন চালিয়ে

ছিলেন। কাজেই নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত অর্থনীতি সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক সেনয় জাতির বর্তমান অর্থসঙ্গতি অনুযায়ী পরিকল্পনাটি কাটছাঁট করার অনুকূলে যা বলেছেন তা'তে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছুই নেই।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যখনই কোন পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তখন দেখতে হবে, যে পরিকল্পনাটি তৈরী করা হবে সে পরিকল্পনাটির দ্বারা জাতির ন্যূনতম প্রয়োজন মেটান সম্ভবপর কিনা। যদি সম্ভবপর বলে বিবেচিত হয় তাহলে পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার জন্য যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া যেতে পারে সেজন্য আনুষঙ্গিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। অবশ্যি প্রশ্ন উঠতে পারে, যেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া অসম্ভব বা প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই সেক্ষেত্রে কি ভাবে জাতির ন্যূনতম প্রয়োজন সিদ্ধ করা সম্ভবপর। এই প্রশ্নের সদুত্তর কোন অর্থনীতিবিদ্ দিতে পেরেছেন বলে মনে হয়না। বরঞ্চ কেবল মাত্র জাতির অর্থসঙ্গতি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করার জন্য কোন কোন অর্থনীতিবিদকে অভিমত প্রকাশ করতে দেখা গেছে। এঁরা বলেন, যদি জাতির অর্থসঙ্গতির কথা বিবেচনা না করে কেবলমাত্র জাতির ন্যূনতম প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনা রচনা করা হয় তাহলে সে পরিকল্পনা কার্যকরী করা যাবে না। এঁদের বক্তব্য হল, জাতির ন্যূনতম প্রয়োজনের চাইতে জাতির অর্থসঙ্গতির উপর অধিকতর জোর দিতে হবে। অর্থাৎ জাতির ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে জাতির অর্থসঙ্গতিকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না। বরঞ্চ ন্যূনতম প্রয়োজনের সবটা পূরণ না করেও যাতে পরিকল্পনাটি জাতির অর্থসঙ্গতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় সেজন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে যাঁহারা ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনা করেছেন তাঁরা জাতির ন্যূনতম প্রয়োজনের উপরই সব চাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে পরিকল্পনাটি বলবৎ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য নানাদিকে চেষ্টা করতে হচ্ছে।

অধ্যাপক সেনয় বলেছেন, যদি টাকার দর কমান হয় তাহলে বাইরের বাজারে ভারতীয় পণ্য সুলভ হবে। ফলে রপ্তানী বেড়ে যাবে। এই রপ্তানী বৃদ্ধির সুফল হল এই যে একদিকে যেরকম অধিকতর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাবে সে রকম অন্যদিকে ভারতের জনসাধারণের উপর কোন প্রকার অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার আশঙ্কা নেই। একথা উল্লেখ না করলেও চলে যে, যদি অধিকতর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায় তাহলে আমদানীর ব্যাপারে সুবিধা দেখা দিবেনা। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই অধ্যাপক সিনয় এর এই অভিমতকে সমর্থন করা চলে কিনা। বিগত ১৯৪৯ সালে বাট্টা হ্রাসের পরে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল সে অবস্থার সাথে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের কাছে অধ্যাপক সেনয় এর যুক্তিটি কখনও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবেনা। সে সময়ে আমরা দেখেছি, বাট্টা কমিয়ে দেবার সাথে সাথে জাহাজে বোঝাই চালানের দর কমে গিয়েছিল। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে সমান রাখার জন্য পরবর্তী চালানগুলোর দর টাকার অঙ্কে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা গেল একদিক। অন্যদিকে আমদানীর ব্যাপারে দেখা গেছে, পণ্যের দর অনেক চড়ে গিয়েছিল। ফলে বাট্টা হ্রাসের ফলে যে সব সুবিধা পাবার আশা ছিল সে সব সুবিধা একেবারে উবে যেতে দেখা গেছে। শুধু তাই নয়। বাট্টা হ্রাসের দরুণ আভ্যন্তরীণ দর এমনভাবে চড়ে গিয়েছিল যার ফলে গরীব জনসাধারণের ব্যয়ভার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখনও পর্যন্ত অবস্থার তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। অথচ এর মধ্যে অধ্যাপক সেনয় আবার বাট্টা হ্রাসের প্রস্তাব করেছেন। তাঁর

ধারণা ভারতে সমস্ত প্রকার পণ্যের মধ্যে পাউণ্ড মুদ্রা সব চাইতে বেশী সুলভ। তিনি বলেছেন, বিগত ১৯২৭ সালের সাপে তুলনায় জিনিষপত্রের দাম পৌণে তিনগুণ থেকে ছয় গুণ চড়ে গেছে। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, সে সময়ের তুলনায় টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমে শতকরা ছয়ত্রিশ ভাগ থেকে ষোল ভাগে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পাউণ্ড মুদ্রা এবং টাকার মধ্যে বিগত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যে আনুপাতিক হার ধার্য করা হয়েছিল সে আনুপাতিক হার এখনও বলায় রয়েছে বলে বাইরের বাজারে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী কমে গেছে, এটাই হল অধ্যাপক সেনগুপ্তের আসল বক্তব্য। অধ্যাপক সেনগুপ্তের এই অভিমতটি মেনে নেওয়া কষ্টকর। শুধু তাই নয়। অভিমতটি আদৌ সমর্থন করা চলে কিনা সন্দেহ। ১৯২৭ সালের তুলনায় কেবলমাত্র ভারতীয় টাকার দর কমে যায়নি। পাউণ্ড ডলার, ফ্রাঁক, ইয়েন ইত্যাদি মুদ্রার দরও কমে গেছে। কাজেই এই সব মুদ্রার তুলনায় আমাদের দেশের টাকার দর পৌনে তিন থেকে ছয় গুণ চড়ে গেছে, একথা কিছুতেই বলা চলে না।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের স্থান

শ্রীব্রজবল্লভ রায়

বর্ত্তমান পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্পের স্থান কোথায় তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেহ কেহ বলছেন যে বর্ত্তমান যন্ত্র সভ্যতার চরম উৎকর্ষের দিনে কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের কোন স্থান নাই। অপর পক্ষে অন্যেরা বলিতেছেন যে ভারতের মত অনগ্রসর অর্থনীতির পরিবেশে কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় নাই বরং জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র এবং কুটীরশিল্পের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা এক কথায় হওয়া সম্ভব নয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্পের স্থান নির্দ্দেশের চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রত্যেক দেশেই দুই প্রকারের শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান—যথা বৃহৎ আয়তন শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা, এবং ক্ষুদ্র-আয়তন শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা। বৃহৎ আয়তন শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণ মূলধন, মূল্যবান যন্ত্রপাতি, দক্ষ কারিগর, কলকারখানা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। বৃহৎ আয়তন শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের তুলনায় কম শিল্প শ্রমিক প্রয়োজন হয়। এই কারণে উক্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে মূলধন প্রাবল্য (capital intensive) উৎপাদন ব্যবস্থা বলা হয়। অপর পক্ষে ক্ষুদ্র আয়তন এবং কুটীর শিল্পে কম মূলধন অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ কারিগর, সহজ এবং ক্ষুদ্র আয়তন যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্পে বৃহৎ আয়তন শিল্পের তুলনায় বেশী সংখ্যক শ্রমিকের কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। এই কারণে উক্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে শ্রমিক প্রাবল্য (labour intensive) উৎপাদন ব্যবস্থা বলা হয়।

প্রত্যেক দেশেই মৌলিক শিল্প সমূহ (basic industries) বৃহৎ আয়তন শিল্প ব্যবস্থায় তৈয়ারী হয়। বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে রেল ইঞ্জিন, এরোপ্লেন, বৃহৎ আয়তন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পে তৈরী হওয়ার কথা কেহ চিন্তা করতে পারে না। বৈদ্যুতিক

শক্তি উৎপাদন করিতে এবং মূলবস্তু (capital goods) উৎপাদন করতেও বৃহৎ আয়তন শিল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। বৈদ্যুতিকশক্তি, রেলপথ ও এবং মূলবস্তুর উপর নির্ভর করছে দেশের সত্যিকারের শিল্প উন্নয়ন।

অপর পক্ষে কাপড়, কাগজ, তৈল এবং অন্যান্য শত শত দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভোগ্য বস্তু (consumption goods) বৃহৎ আয়তন অথবা ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প উৎপাদন পদ্ধতিতে দক্ষতার সহিত উৎপাদন করা সম্ভব। ভোগ্য বস্তু উৎপাদন করতে বৃহৎ আয়তন শিল্প উৎপাদন পদ্ধতি বা ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প উৎপাদন পদ্ধতি কোন্‌টি গ্রহণ করা হবে তাহা নির্ণয় করিতে দেশের আর্থিক অবস্থা, জনসংখ্যা, শ্রমিকদের কর্ম কুশলতা ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প উন্নয়ন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সবদেশ সমানে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। কোন কোন দেশ যথা গ্রেটবৃটেন এবং আমেরিকা যেখানে জনসংখ্যার চাপ কম সেখানে বৃহৎ আয়তন শিল্প ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশী। অপর পক্ষে ভারতবর্ষ, জাপান এবং এসিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ যেখানে জনসংখ্যার চাপ বেশী সেসব দেশে ক্ষুদ্র আয়তন এবং কুটীর শিল্পের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বেশী। বৃহৎ আয়তন এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের সহ অবস্থানের কথা আজ সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বৃহৎ আয়তন এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে সহযোগী হয়ে অবস্থান করতে পারে একথাও আজ সকলেই স্বীকার করেছেন। দেশের সুসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন করিতে হলে পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ আয়তন শিল্পের সীমারেখা নির্ধারণ করতে হবে। বৃহৎ আয়তন শিল্পের এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।

ভারতের মত দরিদ্র দেশে মূলধনের প্রাচুর্য্য নাই—কিন্তু বিপুল জনশক্তি রয়েছে। ভারতের অনগ্রসর অর্থনীতি ব্যবস্থায় মত শতকরা ৮০জন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে অন্যান্য শিল্প উন্নত দেশে শতকরা ৪০জন লোক শিল্পক্ষেত্রে, শতকরা ২০জন লোক যানপরিবাহনে শতকরা ২০জন লোক ব্যবসা বাণিজ্যে এবং অন্যান্য কাজে এবং শতকরা মাত্র ২০জন লোক কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত। ভারতের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হলে কৃষির উপর নির্ভরশীল শ্রমিকদের অন্যত্র কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের শিল্পনীতির আদর্শ এমন হওয়া উচিৎ যাহাতে দেশের বেকার জনশক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যায় কর্মে নিযুক্ত হতে পারে। কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠন করা হয় তবে ভারতের নিদারুণ বেকার সমস্যার অনেকখানি সমাধান হবে। বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করে দেখেছেন যে একজন শ্রমিককে বৃহৎ আয়তন শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত করতে আনুমানিক ১০,০০০৲ টাকা প্রয়োজন হয়। অপর পক্ষে একজন শ্রমিককে ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পে নিযুক্ত করিতে মাত্র ৮০০৲ টাকা প্রয়োজন হয়। এছাড়া ভারতীয় শ্রমিকগণ উন্নত দেশসমূহের মত গতিশীল নয়। এই সমস্ত কারণে ভারতের মত অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের এখনও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মূল শিল্পের উন্নয়নের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সত্য কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের

মনে রাখিবেন—

বিশুদ্ধ সরিষার তৈল স্নেহজাতীয় পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণে সমৃদ্ধ এবং সেবনের পর যথাসম্ভব কম অ্যাসিড সৃষ্টি করে

ডাক্তারগণ বলেন "সর্ব্বমঙ্গলার রাধাবিনোদ মার্কা তৈলই"

একমাত্র বিশুদ্ধ তৈল ও স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনরূপ ক্ষতিকর নহে।

—ঃ সকল উৎসবে, স্বাস্থ্যে ও সেবায় ঃ—

উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশী। কারভে কমিটির রিপোর্টে (Karve Committee report) ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং উক্ত শিল্পসমূহ উন্নয়নের নানারূপ সুপারিশ করা হয়েছে। উন্নয়নশীল অর্থনীতি ব্যবস্থায় লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ঘাটতি অর্থনীতি ব্যবস্থা (deficit financing) অবলম্বন করিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনায় টাকা যোগান দিলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় যদি ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি চাহিদার অনুরূপ না হয়। অনেকে কারভে কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন যে কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক হয় নাই। তাঁদের মতে কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প সমূহ দেশের ভোগ্যপণ্যের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাতে পারবে না।

ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্প উন্নয়ন করতে আমরা আমাদের প্রতিবেশী জাপানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে বিশেষভাবে উপকৃত হব। জাপান এসিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিল্পসমৃদ্ধ দেশ জাপানের শিল্প উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্প হইতে আসে। জাপানের শিল্প সমৃদ্ধির জন্য দায়ী জাপানের ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্প। জাপানের জন বহুলতা জাপানকে ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্প উন্নয়নের পথে এগিয়ে দিয়েছে। জাপানে স্ত্রী পুরুষ সবাই ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্পে কাজ করে। ইহার ফলে উৎপাদন খরচ কম পড়ে। বৈদ্যুতিকশক্তি জাপানের দূর গ্রাম অঞ্চল পর্য্যন্ত পৌছেছে। এই বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্পে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো সম্ভব হয়েছে। এর ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উন্নত ধরণের দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। জাপানের যান-পরিবাহন ব্যবস্থা বিশেষ সমৃদ্ধ। এতে ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্প উন্নয়ন আরও সহজ হয়েছে। জাপানে অনেকক্ষেত্রে কুটীর শিল্প বৃহৎ আয়তন শিল্পের সহকারী হয়ে কাজ করে। জাপান প্রমাণ করেছে যে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ আয়তন শিল্পের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি হওয়া সম্ভব।

বৃটিশরাজ এদেশে কায়েম হওয়ার পূর্বে ভারতের কুটীর শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ভারতের কুটীর শিল্পের প্রসিদ্ধি দেশের সীমা ছেড়ে দূর বিদেশে গিয়েও পৌছেছিল। বৃটিশ সরকারের চক্রান্তে এবং উদাসীনতায় ভারতের সুপ্রসিদ্ধ কুটীর শিল্প কালক্রমে ধ্বংস হয়ে যায়। স্বাধীনতা লাভ করবার পর আমাদের জাতীয় সরকার কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ মনযোগ হয়ে উঠেছে। প্রাক-বৃটিশ যুগের শিল্প গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বিশেষ চরম শিল্প উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে—যথা কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্প, আগ্রার হাতির দাঁতের খেলনা ইত্যাদি। শিল্প কুশলতা ভারতবর্ষের লোকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে আসছে। এই কারণে যে অঞ্চল যে শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ সেই অঞ্চলকে সেই শিল্প উন্নয়ন করিবার সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে হবে।

কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের আর্থিক দুরবস্থার কথা কারও অবিদিত নয়। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতাই উক্ত শিল্প সমূহের শুধু মাত্র সমস্যা নয়। কারিগরী এবং সংগঠন জ্ঞানের অভাবেও কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প আশানুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। ইনজিনিয়ারিং, কারিগরী এবং একাউন্টিং ইত্যাদি বিষয়েও প্রয়োজনানুরূপ উপদেশ নেওয়া ক্ষুদ্র আয়তন

শিল্পের পক্ষে সম্ভব হয় না। এছাড়া কি ধরণের দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা প্রয়োজন, কি পরিমাণে উৎপাদন করা উচিত, কি ভাবে বাজারজাত করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেওয়াও উক্ত শিল্প সমূহের পক্ষে সম্ভব হয় না। বৃহৎ আয়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানে রিসার্চ ব্যবস্থা করা ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পপতির পক্ষে সম্ভব হয় না।

ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প সমূহের উপরি উল্লিখিত অসুবিধা সমূহ দূর করিতে ভারত সরকার কলিকাতা, বোম্বে, ফরিদাবাদ এবং মাদ্রাজে চারটি "আঞ্চলিক সংস্থা (Regional Institute) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া ক্ষুদ্র আয়তন এবং কুটীর শিল্প সমূহকে সাহায্য ; উন্নয়ন এবং অর্থ যোগান দিতে ভারত সরকার একটি জাতীয় ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প করপোরেশন '(National Small Industries Corporation) প্রতিষ্ঠা করেছেন। সর্ব শেষে ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প সমূহের উন্নয়নের নানাবিধ বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিকল্পনা করতে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা সমূহের কর্ম্ম পদ্ধতির মধ্যে সমতা আনতে ভারত সরকার একটি ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প বোর্ড (Small Scale Industries Board) প্রতিষ্ঠা করেছেন। সরকারী বহুবিধ কর্ম্ম প্রচেষ্টা এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পপতিদের সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগে কুটীর এবং ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প সমূহকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

———

১৯৫৭ সালে শিল্পোন্নয়নে ভারতের অগ্রগতি

ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর শিল্পায়ন জাতীয় গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া হ'লেও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পায়নের উপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৭ সালে এই লক্ষ্যের প্রতি ভারতের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে শিল্পায়নের অগ্রগতি শুধু যে অব্যাহত ছিল তা নয়, অন্যান্য বছরের তুলনায় শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ও গতি অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে। ১৯৫৬ সালে শিল্পোৎপাদনের সাধারণ সূচক সংখ্যা ছিল ১৩৩ কিন্তু ১৯৫৭ সালের প্রথম ন' মাসে তা বেড়ে গিয়ে হয় ১৪৮·৮।

১৯৫৭ সালে শিল্পোন্নয়নের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ঐ বৎসর বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের জন্য নানা প্রকার কষ্ট দেখা দিলেও কোন শিল্পেই উৎপাদন হ্রাস পায় নি। এমন কি, যে সব শিল্প প্রধানতঃ আমদানিকৃত কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক জিনিষের উপর নির্ভর করে থাকে সেগুলিরও উৎপাদনের হার বজায় থাকে। বৃহৎ শিল্পগুলির উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতির মত নতুন শিল্পগুলিতেও উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোগ্য দ্রব্যে শিল্পও পিছিয়ে থাকে নি, আগের চেয়ে বেশী জিনিষ তৈরি হয়েছে।

কতুন জিনিষ—ভারতের শিল্পায়নের ইতিহাসে ১৯৫৭ সাল একটি স্মরণীয় অধ্যায় যোজনা করেছে। বৎসর ভারতে প্রথম তৈরি হল নানা ধরণের নতুন জিনিষ—সিলিং মেশিন, সারফেস গ্রাইণ্ডার, ক্যাপষ্টান লেদের মত যন্ত্রপাতি, সেলাই কলের সুঁচ, ডিজেল রোলার, মোটরগাড়ীর ক্লাচ, ট্রাকের টুকরা অংশ ইত্যাদি, গ্র্যাফাইট, ক্রুজিম পাথর প্রভৃতির কাঁচামাল আরও কতকি। বৈদেশিক

মুদ্রার অসুবিধা থাকায় বিলম্বে মূল্য শোধের ভিত্তিতে মূলধনী মাল আমদানির ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ১৯৫৭ সালের প্রথম এগার মাসে বিলম্বে মূল্য শোধের ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি আমদানির পঁচাশীটি শিল্প পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। এ-থেকে বোঝা যায় যে, এই ব্যবস্থায় বেশ সাফল্য লাভ করা গিয়েছে। এইভাবে মূল্য শোধের জন্য প্রায় ৭২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা দেওয়ার চুক্তি হয়। সিমেন্ট, চিনি, বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি শিল্প এই ব্যবস্থায় বেশ লাভবান হয়েছে। এই সংগে বিভিন্ন ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় আট কোটি টাকা।

সরকারী উদ্যোগ—বিলম্বে মূল্য শোধ ও অন্যান্য ঋণদান ব্যবসায়ে ছাড়াও সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত ভারী যন্ত্রপাতি, সার, কয়লাখনি ইত্যাদির মত কয়েকটি শিল্পের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সোভিয়েট সরকার পাঁচটি বড় পরিকল্পনা রূপায়নে সাহায্য করার জন্য ৫১ কোটি রুবল ঋণ স্বরূপ দিতে সম্মত হন। ১৯৫৭ সালে ঐ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই টাকার বেশীর ভাগই ভারী যন্ত্র শিল্পে নিয়োগ করা হবে। বিলম্বে মূল্য শোধের ভিত্তিতে এ'বছরই নাঙ্গাল সার উৎপাদন পরিকল্পনার জন্য তিনটি বড় কনট্রাক্ট দেওয়া হয়। অন্যান্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও বিলম্বে মূল্যশোধের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা চালানর কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসে ঐ বছরেই। আর ঢালাই শিল্প পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব হয়। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের মত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিলম্বে মূল্য শোধের ব্যবস্থা করে ভারতীয় উৎপাদকদের পক্ষে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করার পথ সুগম করে দেন।

রৌরকেল্লা ও ভিলাইয়ের নূতন ইস্পাত তৈরির কারখানা গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে ১৯৫৭ সাল থেকেই। সরকারী উদ্যোগে আরও দুটি বড় কলকারখানার সম্প্রসারণও করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালেই ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টার প্রথম পর্যায়ের কাজের ফল পাওয়া যাবে। সিন্দ্রীর সার উৎপাদন কারখানা সম্প্রসারণের কাজও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

১৯৫৭ সালের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ভারী যন্ত্র নির্মাণ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের রূপায়ন। ইহার ফলে ভারত ইস্পাত কারখানা ও ভারী রাসায়নিক দ্রব্য শিল্পে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিষই তৈরি করতে পারবে।

অধিক কর্মসংস্থান—আলোচ্য বৎসরে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পগুলিতে অধিক লোক নিতে হয়েছে। সুতীবস্ত্র শিল্পে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৫৭ সালে চৌদ্দ হাজার লোক নেওয়া হয়েছে। বাইসাইকেল শিল্পে নিয়োগ করা হয়েছে আরও দুহাজার লোক। মোটর শিল্পে লেগেছে আরও একহাজার তিনশ পঞ্চাশ লোক। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে তিন হাজার তিনশ লোক, রসায়ন শিল্পে প্রায় হাজার, সিমেন্ট শিল্পে প্রায় পাঁচশ, রেশন শিল্পে প্রায় দু হাজার আর মেকানিক্যাল ও সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নিয়োগ করা হয়েছে আরও প্রায় চার হাজার চারশ' লোক।

এবার উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে বলা যাক। সিমেন্ট তৈরি হয়েছে ৫৫ লক্ষ টন। ১৯৫৬ সালের উৎপাদনের তুলনায় ৫ লক্ষ ১০ হাজার টন বেশী। পূর্ববর্তী বৎসরের ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ২০ হাজার টনের স্থলে আলোচ্য বছরে মোট করলা উৎপন্ন হয়েছে ৪ কোটি ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন।

ইস্পাতের উৎপাদন ও ১৯৪৬ সালের ১৩,১৬,০০০ টন থেকে বেড়ে হয় ১৩,৪২,০০০ টন। বিভিন্ন মিলগুলিতে ৪৩১ কোটি ৭০ লক্ষ গজ কাপড় তৈরি হয়েছে। ১৯৪৬ সালে তৈরি হয়েছিল ৪৩০ কোটি ৭০ লক্ষ গজ। উৎপাদন খুব বেশী না হলেও কাপড়ের বাজারে যে অচল অবস্থা দেখা দিয়েছিল সেদিক দিয়ে বিচার করলে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। সুতা তৈরি হয় ১৭৭ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী।

অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। প্রায় ৮ লক্ষ সাইকেল তৈরী হয়েছে, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার বেশী। সেলাইকল তৈরি হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার। দাড়ি কামাবার ব্লেড ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৬ লক্ষ ৪০ হাজার। আর মোটরের সংখ্যা ৩২ হাজার ১৩৮ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৩ হাজার ৪০০। রেডিও সেট তৈরি হয়েছে আরও ৩২ হাজার ৪০০, বৈদ্যুতিক পাখার উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দেড়গুণ, মোট ৫ লক্ষ ১৩ হাজার। বৈদ্যুতিক বাতির সংখ্যা ২ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে সাবান (১ লক্ষ ১৫ হাজার টন), সিগারেট (২১০০ কোটি), কাগজ (২ লক্ষ ১০ হাজার টন) আর পেন্সিলও (৭ লক্ষ ৬০ হাজার গ্রোস) উল্লেখযোগ্যভাবে তৈরি হয়েছে।

আরও যন্ত্রপাতি—যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক জিনিষের উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। পাটকলের যন্ত্রপাতি তৈরী হয়েছে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকার। আগের বছরে তৈরী হয়েছিল ৩০ লক্ষ টাকার। ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের সংখ্যা ১২,০১৫ থেকে বেড়ে ১৫ ৪০০ হয়েছে আর বৈদ্যুতিক পাম্পের সংখ্যা ৪৭ হাজার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজারে। অ্যালুমিনিয়াম তৈরী হয়েছে ১,২২৮ টন, আগের তুলনায় ১২৫০ টন বেশী। তামা ও সীসার উৎপাদনও বেশী হয়েছে।

রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে সোডা অ্যাস, কষ্টিক সোডা, সালফিউরিক এসিড, সুপার ফসফেট ও ক্লোরিনের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কাঁচ ও কাঁচের জিনিষপত্রের উৎপাদন ও বৃদ্ধি পায়। রেয়ন তৈরী হয়েছে অনেক বেশী। ১৯৪৭ সাল শিল্পক্ষেত্রে এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। এই কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে ভারত ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে। একদিন বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম হবে আমাদের দেশ।

খনিজ তেলের কথা

পেট্রোলিয়াম কথাটি গ্রীক শব্দ 'পেট্রা' ও 'অলিয়াম' হইতে উদ্ভূত। পেট্রা অর্থ পাথর, আর অলিয়াম অর্থ তেল। কাজেই পেট্রোলিয়াম—এই কথাটি হইতে বুঝা যায় যে, পেট্রলিয়াম এক রকমের খনিজ তেল। খনিজ তেলের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব প্রচলিত আছে। যে মতটি প্রায় সকলেই স্বীকার করেন তাহা হইতেছে এই যে, সমুদ্রের এবং খুব সম্ভবতঃ আবদ্ধ জলের জৈব পদার্থ সম্মিলিত চলানি হইতে খনিজ তেলের সৃষ্টি। বিগত শতাব্দী ধরিয়া ভূস্তরের বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এককালে যেখানে সমুদ্র ছিল সেখানে হয়ত পর্বত গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার অনেক স্থলে ভূভাগ নামিয়া গিয়া সমুদ্র বা হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভূস্তরের এই আন্দোলনের সঙ্গে খনিজ তেলের সৃষ্টি ও গতির ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

যেখানে ভূভাগ বসিয়া যাওয়ায় সমুদ্রের জল আসিয়া প্লাবিত করিয়াছে সেখানে হয়ত মাটির তলানি জমিয়া ধীরে ধীরে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে চাপা পড়িয়াছে অসংখ্য সামুদ্রিক কালক্রমে এই সব জৈব পদার্থ শলি, মাটি ও চুণের সঙ্গে মিশিয়া সমুদ্রের নীচে স্তর গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার উপরে আবার আসিয়া জমিয়াছে নূতন স্তর। এই ভাবে একের পর এক স্তর জমিয়া উঠায় নীচের স্তরের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে উত্তাপও বাড়িয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড চাপ ও তাপে জৈব পদার্থের রাসায়নিক ও জৈবিক পরিবর্তন ঘটে। এই রকম অবস্থায় জৈব পদার্থ হাইড্রোজেন ও কার্বনের যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া খনিজ তেল ও গ্যাসের সৃষ্টি করে। স্তরের অভ্যন্তরে যখন এই পরিবর্তন ঘটে তখন স্তরের উপরে ক্রমেই শলি স্তর জমিয়া উঠে। উপরের চাপ বাড়িতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে উহা ধীরে ধীরে চুণাপাথর বা বালি পাথরের স্তরে রূপান্তরিত হয়। ভূস্তরে নানা কারণে প্রায়ই বিভিন্ন রকমের আন্দোলন ঘটে। ইহাতে তেল বা গ্যাস কণাগুলি নীচের কর্দমাক্ত স্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রস্তর স্তরের নীচে জমিতে থাকে।

এখন এক স্থানে অনেক পরিমাণে তেল বা গ্যাস জমিতে হইলে প্রস্তর স্তরের গঠন কোণাকৃতি বা তরঙ্গাকৃতি হওয়া দরকার। ভূস্তরের বিপুল আন্দোলনের ফলে প্রস্তরের স্তরের গঠন অনুরূপ আকৃতি ধারণ করে বলিয়া, সেখানেই তেল বা গ্যাস জমিয়া উঠা সম্ভব। ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানে এইগুলিকে তেলের ফাঁদ বলে। খনিজ তেলে অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্যই হইল অভ্যন্তরীণ স্তরের এই রকম সংগঠন নির্দেশ করিয়া তেলের ফাঁদ আবিষ্কার করা। ইহার পর ড্রিলিং করিয়া দেখা হয় সেখানে সত্যই তেল বা গ্যাস আছে কিনা। পৃথিবীর অধিকাংশ তেলের খনি এই রকম পলি স্তরের অঞ্চলে অবস্থিত। এগুলি পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় সমান ভাবে ছড়াইয়া আছে। কিন্তু প্রধানতঃ দুর্গম অঞ্চলেই এগুলি অবস্থিত। সুগম অঞ্চলে তেল অনুসন্ধানের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। কাজেই নূতন নূতন তেলের খনি আবিষ্কার ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

ভারত উপ মহাদেশ দুইটি উল্লেখযোগ্য পলিস্তর রহিয়াছে—উত্তর-পশ্চিম পলিস্তর (পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল পূর্বপাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু, রাজস্থান, কচ্ছ ও কাম্বে) এবং উত্তর-পূর্ব পলিস্তর (পূর্ব পাকিস্তানের কিছু অংশ, পশ্চিমবঙ্গ, ও উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসাম ও ব্রহ্ম)। কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই দুইটি পলিস্তরে তেলের জন্য অনুসন্ধান চালান। উত্তর-পশ্চিম পলিস্তরে খাউর, ধুলিয়ান ও জয়ামীরে এবং উত্তর পূর্ব পলিস্তরে ডিগবয়, বদরপুর, নাহারকাটিয়া ও ব্রহ্মের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু পরিমাণে তেল পাওয়া যাইতেছে। অতএব বেশ কিছুকাল এই দুইটি পলিস্তরের মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে তেল সন্ধানের কাজ চলিতেছিল এবং প্রধানতঃ বিদেশী বেসরকারী তেল কোম্পানীগুলিই ইহা করিতেছিল।

সরকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা—ভারত সরকার দেশের অন্যান্য পলিস্তরে তেল পাওয়া যায় কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কারণ ভারতে যে তেল পাওয়া যায় তাহাতে দেশের চাহিদার মাত্র দশ শতাংশ মিটিতে পারে। আমাদের দেশের পেট্রলের চাহিদা মিটাইবার জন্য বৎসরে ৭০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। বর্তমানে ভারতে ৪০ লক্ষ টন পেট্রল লাগে এবং চাহিদার পরিমাণ প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আশা করা যায় ১৯৬২ সালে ৭০ লক্ষ টন পেট্রল লাগিবে।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ তেলের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে একটি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অধিকর্তার অফিস স্থাপন করেন

এবং ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে উহাকে একটি কমিশনে রূপান্তরিত করেন। প্রথমে ব্যাপকহারে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালান হয়। তাহার পর রাজস্থানের বলদ্মীরেড্রিলিং করার প্রস্তাব করা হয়।

কেন্দ্রীয় খনি ও তৈল মন্ত্রী শ্রীকে. ডি. মালব্যের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল রাশিয়া এবং ইউরোপের তেল উৎপাদক দেশগুলি পরিদর্শন করেন। আসাম অয়েল কোম্পানীকে যে অঞ্চল ইজারা দেওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় কি না সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েকজন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানান হয়। তাঁহারা ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার অফিসারদের সহযোগিতায় ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতের নানা স্থানে ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা চালান।

তৈল প্রাপ্তির সম্ভাবনা—সোভিয়েট বিশেষজ্ঞগণ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানান যে আসাম ছাড়াও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে খনিজ তেল পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তেল নিষ্কাশনের পরিকল্পনাসহ একটি বিশদ রিপোর্ট ভারত সরকারের নিকট পেশ করেন। তাঁহাদের মতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তেল পাইতে হইলে একই সঙ্গে বহু স্থানে পরীক্ষা চালাইতে হইবে। যেখানে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা শেষ হইয়াছে সেখানে অবিলম্বে ড্রিলিং করিতে হইবে আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্থানকে ড্রিলিংএর উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।

সোভিয়েট বিশেষজ্ঞগণ আলামুখীতে অবিলম্বে ড্রিলিং করার সুপারিশ করেন। আলামুখীতে ড্রিলিংএর বেশ সুবিধা আছে। তবে ড্রিলিং করিয়া সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা নাই বলিয়া প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ড্রিল করার ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে রুমানিয়ার কয়েকজন বিশেষজ্ঞর সহায়তায় এই কাজ সুরু হয়। এখনও সেখানে ড্রিলিং এর কাজ চলিতেছে এবং সেই সংগে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ড্রিলিং সুরু করার জন্য চেষ্টা হইতেছে।

কিন্তু তেল খোঁজা মানে অন্ধকারে হাতড়ান। ইহার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা, প্রচুর সম্পদ ও অদম্য উৎসাহ। সাধারণতঃ ইহাতে বহু অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু ইহার পরিবর্তে বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া কিছু পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে হইলে একই সংগে বহু স্থানে তেল সন্ধানের কাজ সুরু করিতে হইবে যাহাতে এক স্থানের লোকসান অন্যস্থানের লাভ দিয়া মিটান যায়। এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই যে তেল পাইতে বারবার ব্যর্থ হইলেও এ কথা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারেন না যে ঐ স্থানে তেল নাই—হয়ত তিনি ঠিক জায়গায় খুঁজিতে পারেন নাই।

খাদ্য-সমস্যার আশু সমাধান

শ্রী অচল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে মনে করা গিয়েছিল যে, খাদ্য সমস্যার বোধ হয় একটা সন্তোষজনক সমাধান হ'য়ে গেলো। কিন্তু ১৯৫৭ সালে খাদ্যশস্যের দাম যেমন বাড়তে বাড়তে উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছুলো তখন সমস্ত বিষয়টিকে আবার নতুন ক'রে বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দিল।

১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ এই দু'বছর খাদ্যশস্যের দর বেশ স্বাভাবিক ছিল। ১৯৫৭ সালে ধান ও গমের উৎপাদন সাম্প্রতিককালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৭ সালে ধান উৎপন্ন হয়েছে ২৮১ লক্ষ টন আর গম ৯১ লক্ষ টন। যদিও অর্থনীতির সূত্রানুসারে কোন জিনিষের চাহিদা ও সরবরাহ অনুসারে সেই জিনিষের দাম ঠিক হয়, তথাপি এক্ষেত্রে যে, সে নিয়মটি কার্যকরী হ'চ্ছেনা তা বেশ স্পষ্ট। এক্ষেত্রে সরবরাহ হ'ল বাজারে বিক্রীর জন্য যেটুকু মাল আসছে শুধুমাত্র সেটুকু, আর চাহিদা হ'ল শিল্প প্রভৃতি অকৃষি কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা যা কিনতে চান্। শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে অ-কৃষি জীবিদের সংখ্যা তথা খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে; আর সেই সঙ্গে সহরের জন সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে প্রত্যেক বছর শতকরা ৪·৮ জন করে। উৎপাদন যেমনই হ'ক না কেন বাজারে খাদ্যের আমদানী যদি না বাড়ে তা'হলে এরকম অবস্থায় দাম অবশ্যই বেড়ে যাবে।

এরূপ অবস্থার একমাত্র প্রতিকার হ'ল বাজারে খাদ্য-শস্যের আমদানী বাড়ান। সরকার উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে খাদ্যশস্য কিনে ঘাটতি এলাকায় বিক্রী করতে পারেন অথবা বিদেশ থেকে খাদ্য শস্য আমদানী করতে পারেন। এমন প্রত্যেকের মধ্যেই খাদ্যশস্য মজুত করার বাসনা থাকায় দেশের মধ্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহের চেষ্টা না করে বিদেশ থেকে আমদানীর চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটির সুপারিশ—নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা করাও প্রণিধানযোগ্য। এইভাবে একবার যদি খাদ্যশস্যের দর কমতে থাকে তা'হলে মজুতদারেরাও তাদের মাল বাজারে বিক্রীর জন্য আনবে এবং দর বাড়া বন্ধ হ'বে। যতদিন না বন্যার প্রকোপ বন্ধ করে জলসেচের সুব্যবস্থা হ'চ্ছে ততদিন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, মজুত মাত্রানুকর, খাদ্যশস্য চলাচলের উপর থাকা নিষেধ আরোপ প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এইত গেল ঘটন-ব্যবস্থার কথা; সরবরাহের দিকেও আমাদের লক্ষ্য বিশেষ দিতে হ'বে, কারণ প্রতি বৎসর এদেশে জনসংখ্যা বাড়ছে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ ক'রে। এই সব নতুন মুখের খাবার যোগাতে না পারলে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকব। আমাদের সমস্যা হ'চ্ছে দু'টি:—(ক) প্রতি পাঁচ বছরের মধ্যে দু'বছর প্রাকৃতিক কারণে ভারতে চাষ আবাদ সন্তোষজনক হয় না। (খ) খাদ্যশস্যের উৎপাদন যতই বাড়ুক না কেন তা যদি অকৃষিজীবিদের চাহিদার উপযুক্ত না হয় তাহ'লে সংকট দেখা দেবেই। রাশিয়ার ইতিহাসে এই সংকট "Scissors crisis' নামে বিখ্যাত। প্রথম সমস্যাটি সমাধানের পথ হ'ল উৎপাদন বাড়ান। এই প্রসঙ্গে আমরা উন্নত ধরণে

সার, ব্যবহার, সেচের সুব্যবস্থা প্রভৃতি প্রচেষ্টাগুলির দ্বারা উৎপাদন বাড়ানর পরিকল্পনার কথা স্মরণ করতে পারি।

দ্বিতীয় সমস্যাটি সমাধানের পথ হ'ল নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা করা। এমনকি প্রয়োজন বোধে চীনের মত জমির খাজনা টাকায় না নিয়ে খাদ্যশস্যের মারফৎ নিয়ে সরকারী মজুদাগারে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরে সময় মত ঘাটতি এলাকায় এই খাদ্যশস্য বিক্রী করলে দর বাড়া বন্ধ হ'তে পারে। The Produce (Development and Warehousing) Corporation Bill—1956 কে কার্যকরী করার এইটাই উপযুক্ত সময়। এছাড়া ইতস্ততঃ বিক্ষুপ্ত সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে The Central National Co-operative Development and Warehousing Board ও এই দায়িত্বের ভাগ নিতে পারে।

জিনিষের সরকারী দাম ঠিক দিলেই আর দাম বাড়বে এমন আশা আমরা করতে পারিনা, তাই যদি জিনিষের দাম বাড়তে না দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে তবে অবশ্যই State troding এর (খাদ্য-শস্য তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী) ব্যবস্থা করতে হ'বে। এছাড়া আর যা করা যায় তাহ'ল ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার-প্রচলন গতি নিয়ন্ত্রণ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ নং ধারা অনুযায়ী জমার হারের (Reserve Ratio) পরিবর্তন। মাল চলাচলের সুব্যবস্থা করা ও চালের পরিবর্তে গম প্রভৃতি ব্যবহার করার উপদেশ অত্যন্ত পুরানো হ'য়ে গেছে বলে আর তার পুনরাবৃত্তি না করে এই খানেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ভারতের রাস্তা উন্নয়ন ও মোটরগাড়ী শিল্প

শ্রীসুবল কুমার চক্রবর্ত্তী

ভারতের মোটরগাড়ী শিল্পের কথা জানিতে হইলে প্রথমেই রাস্তা উন্নয়নের কথা জানিতে হইবে। কারণ রাস্তা ব্যতীত মোটরগাড়ী, লরী প্রভৃতি ভারী যান চলিবে কোথা দিয়া? মোটরগাড়ী সরু রাস্তায় ধীর গতিতে চলা সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মোটরগাড়ী শিল্প ও রাস্তার উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শুধুমাত্র মোটরগাড়ী শিল্পের উন্নয়ন করিলেই চলিবে না সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার উন্নয়নও প্রয়োজন।

সুতরাং রাস্তার উন্নয়ন সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন—রাস্তার উন্নয়নের কথা জানিতে হইলে প্রথমে জানিতে হইবে ব্রিটিশ আমলে রাস্তার অবস্থা কিরূপ ছিল এবং স্বাধীনতার পর রাস্তার কতখানি উন্নয়ন করা হইয়াছে। এক কথায় বলা যায় বৃটিশ আমলে রাস্তার বিশেষ উন্নতি হয় নাই এবং এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার উদাসীন ছিলেন। তখন কেবলমাত্র বাদশাহী আমলের রাস্তার কিছু কিছু সংস্কার হইয়াছিল মাত্র। সরকারের রাস্তার উন্নয়নের যে দায়িত্ব ছিল তাহা তৎকালীন বৃটিশ সরকার অবহেলা করেন। পরবর্তী কালে বৃটিশ সরকার একটা আইন করিয়া সমস্ত দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারদের উপর ন্যস্ত করিয়া দিলেন। এই আইন রচনার পিছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল;—ইংলণ্ড হইতে যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য আনীত হইত সেইগুলি রেলের মাধ্যমে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করা হয় আর সেইজন্যই সরকার রাস্তার উন্নয়নের দিকে নজর দিলেন।

রাজ্যগুলিকে রাস্তা উন্নয়নের ভার দেওয়া হইল কিন্তু রাজ্যগুলি সেই ভার আবার জেলা শাসনকর্তাদের উপর ন্যস্ত করিল; ইহার ফলে রাস্তা তৈয়ারীর দিকে কেহ কোন গুরুত্ব আরোপ করিল না। তাহার ফলে ভারতবর্ষে রাস্তার উন্নতি হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রসার লাভ করে। কিন্তু রাস্তার অভাবে জিনিষপত্র পরিবহনের মহা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কারখানাতে কাঁচামাল বহন করিয়া লইয়া যাওয়া আবার কারখানা হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আনার মহা অসুবিধা হয়। শিল্পের প্রসারের ফলে লরী প্রভৃতি ভারী যানের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত হয় কিন্তু রাস্তা সম্বন্ধে সরকারী ঔদাসীন্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

তারপর ১৯২৭ সালে সরকার জয়াকার কমিটির উপর রাস্তার উন্নয়ন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে নির্দেশ দিলেন। ১৯২৮ সালে জয়েকার কমিটি তাঁর রিপোর্টে বলেন যে—রাস্তা উন্নয়নের দিকে সরকারের দৃষ্টি প্রসার করা উচিত। ইহার কারণ হিসাবে বলেন যে, রাস্তায় ভারী যানবাহন চলাচল পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী বাড়িয়াছে কিন্তু রাস্তার অভাব সমপরিমাণ দুষ্ট হয়। সুতরাং উহার ফলে শিল্পের প্রসার বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে। এই রাস্তার উন্নয়ন খাতে ব্যয় করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহের পথও নির্দেশ করিয়া দেন—পরামর্শ দেন যে, পেট্রোল হইতে প্রতি গ্যালন পিছু দুই আনা ট্যাক্স গ্রহণ করুন। কিন্তু ইহার ফলেও বিশেষ রাস্তার উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই।

ইহার পর ১৯৩১ সালে রাস্তা উন্নয়নকল্পে একটি অধিবেশন (Road Congress) হয় কিন্তু তাহা দ্বারাও কোন উপকারই হয় নাই। আবার ১৯৪৩ সালে নাগপুরে রাস্তা উন্নয়নকল্পে একটি অধিবেশন (Nagpur Road Congress) হয়; এবং ইহার পর হইতেই রাস্তার উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হয়। এই অধিবেশনে ৪ লক্ষ মাইল রাস্তা তৈয়ারীর পরিকল্পনা হয়। রাস্তা উন্নয়ন কতরকমভাবে করা হইবে তাহার একটি খসড়া হয়; তাহা এইরূপ :—

(ক) জাতীয় পাকা রাস্তা (National Highways) (খ) রাজ্য পাকা রাস্তা (State Highways) (গ) জেলা পাকা রাস্তা ইহার সহিত সমস্ত রকম জেলা যুক্ত (District Highways which include major and minor district.) (ঘ) গ্রাম্য পাকা রাস্তা (Village High ways). সাত লক্ষ মাইল রাস্তা তৈয়ারী করিলে তবে এক একটি পাকা রাস্তা প্রত্যেক গ্রামের ১।২ মাইলের মধ্য দিয়া যাইতে পারে। অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতির জন্য রাস্তার এই ধরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের দেশে ১ লক্ষ লোক পিছু মাত্র ৭৬ মাইল রাস্তা আছে। ইংল্যাণ্ডে ৯ লক্ষ লোক পিছু ২৬৫ মাইল এবং আমেরিকায় ১ লক্ষ লোক পিছু ২৫০০ মাইল রাস্তা আছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে ভারতবর্ষে ৯৭ হাজার মাইল পাকা রাস্তা এবং প্রায় ১৪৭ হাজার মাইল কাঁচা রাস্তা ছিল। এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও ৩০ হাজার মাইল রাস্তা নির্মাণ হয়। প্রায় ১০ হাজার মাইল পরিত্যক্ত রাস্তার উন্নয়ন সাধিত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার রাস্তা উন্নয়ন খাতে ২৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। ইহা ঠিক হইয়াছে যে ১৯৬০-'৬১ সালের মধ্যে নাগপুরে যে রাস্তা উন্নয়ন পরিকল্পনা হয় তাহার লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইবে।

এই বহুদূর বিস্তৃত দেশে মোটর গাড়ী শিল্পের উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন। ভারতে প্রতি ১৯০০ জন পিছু ১টি করিয়া মোটর গাড়ী আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৪ জন পিছু একটি করিয়া মোটর গাড়ী আছে। জীবনের মানের উন্নতি হইলে ভারতে মোটর গাড়ীর ব্যাপক চাহিদা দেখা দিবে। সুতরাং ভবিষ্যতে ভারত মোটর গাড়ীর একটি বৃহৎ বাজার হইবে। মোটর গাড়ী শিল্পের জন্য যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন তাহার অনেকগুলিই ভারতে বর্তমান এবং অনেকগুলির জন্যই বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমতঃ ভারতে মূলধনের অভাব হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রাদি দেশে কিছু কিছু তৈয়ারী হইতেছে। তৃতীয়তঃ, দেশে শক্তি সম্পদের অভাব হইবে না। চতুর্থতঃ, শ্রমিক কার্য্যের দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সুনিপুণ হইবে।

কলিকাতার নিকটে উত্তরপাড়ায় "হিন্দুস্থান মোটরস্ লিমিটেড্", নামে একটি কারখানা স্থাপিত হয়। এই কারখানায় পূর্বে বিদেশ হইতে আনীত অংশ জোড়া দিত কিন্তু বর্তমানে মোটর গাড়ীর কিছু কিছু অংশ তৈয়ারী হয়। মোটর গাড়ী তৈয়ারীর জন্য রবার টায়ার, টিউব, কাঠ, ইস্পাত, ইঞ্জিন ইত্যাদি দরকার হয়। রবারের টায়ার, টিউব ইত্যাদি পশ্চিমবংগের হুগলী জেলায় 'ডনলপে' এবং অপরাপর স্থানেও তৈয়ারী হয়। ইহা ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও রবারের টায়ার, টিউব প্রভৃতি রবারের যাবতীয় দ্রব্য তৈয়ারী হয়। ভারতে মোটর তৈয়ারীর জন্য ইস্পাতের অভাব হইবে না এবং কাঠের অভাব নাই। শক্তির অভাব এযাবৎ হয় নাই।

বোম্বাই এবং কলিকাতায় মোটর গাড়ী শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে বোম্বাই এ ৬টি এবং পশ্চিমবংগে ৩টি কারখানা রহিয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় স্থানেই ঐ শিল্পের কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্য যে যে অবস্থার প্রয়োজন সেই সকল অবস্থা সমপরিমাণ বর্তমান। ইহা ছাড়া ওখা বন্দরের সন্নিকটে ও মাদ্রাজের কয়েম্বাটুরে মোটর গাড়ী নির্মাণ কারখানা রহিয়াছে। তবে ওখা বন্দরটির বিদেশ হইতে ইঞ্জিন ও কাঁচামাল আনয়নের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে।

পশ্চিমবাংলার উত্তরপাড়ায় এবং বোম্বাই এর মাতুঙ্গাতে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত অংশ জোড়া দেওয়া হয়। বর্তমানে সরকার এই শিল্পের বিশেষ উন্নতির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও সরকারকে পুরাতন কারখানাগুলির সম্প্রসারণ করিতে হইবে। অবশ্য এক সংগে এবং এক রাত্রে এত সব করা সম্ভব হইবে না। তাহার জন্যে অপেক্ষা করিতে হইবে।

কয়লার ভবিষ্যৎ

অরুণ

শক্তি উৎপাদক কয়লার অভাবে আজও যে কোন দেশের শিল্পোন্নয়নের ভবিষ্যৎ কালো হ'য়ে যায়। তাই আমাদের পরিকল্পনায় অতি সঙ্গত কারণেই কয়লা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেশে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ৬০০ লক্ষ টন বেড়ে যাবে বলে হিসাব করা হয়েছে; বে-সরকারী খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ৪৫০ লক্ষ টন আর সরকারী খাতে বৃদ্ধি পাবে ১৫০লক্ষ টন। অর্থের অভাব ছাড়া আর যে সকল সুযোগ সুবিধা এই পরিকল্পনার যথোপযুক্ত রূপায়নে প্রয়োজন তাহাদের সবিশেষ আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

বিগত সাতবৎসরের উৎপাদনের হিসাব দিলে ভবিষ্যতে আমাদের কতটুকু অগ্রসর হ'তে হ'বে তা বোঝা যাবে। এই হিসাব বে-সরকারী ও সরকারী এই দুইভাগে ভাগ করে দেখান হ'ল।

তালিকা—১

বিভিন্ন সময়ে কয়লা-উৎপাদনের হিসাব

সময়	বে-সরকারী বিভাগ	শতকরা হিসাব	সরকারী বিভাগ	শতকরা হিসাব	মোট উৎপাদন
১৯৫০	২৯,১০৪,৯০০	৯১·৯৭	২,৫৯১,১১২	৮০·২	৩২,২৯৬,৯৪৩
১৯৫১	৩১,৪২৮,৩২৬	৯১·২৮	৩,০০২,১২৬	৮·৭২	৩৪ ৪৩০ ৫২২
১৯৫২	৩৩ ০২২,৮৭৭	৯০·৯৭	৩,২৭৮,৯৮৮	৯·০৩	৩৬,৩০১,৮৬৫
১৯৫৩	৩২,৮৩৯,৭২৯	৯১·২৭	৩,১৩৯,৩৬৮	৮·৭৩	৩৫,৯৭৯,১৬৭
১৯৫৪	৩৩ ৮০৮,০৭১	৯১·৮৯	২,৯৮৪,৫২০	৮·১১	৩৬,৭৯২,৫৯১
১৯৫৫	৩৫,৩৫৭,৩০৫	৯২·৫২	২,৮৫৮,৪১২	৭·৪৮	২৮,২১৫,৭১৭
১৯৫৬	৩৬ ৪৪৩,০৪১	৯২·৪২	২,৯৯০,৭৫৫	৭·৫৮	৩৯,৪৩৩,৭৯৬

আলোচ্য তালিকা হইতে আশা করি ইহা প্রমাণ করা কঠিন হ'বে না, যে মোট উৎপাদনের এক সামান্য অংশই সরকারীখনি সমূহ থেকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সরকারী খনি সমূহের উৎপাদন যখন ক্রমহ্রাসমান, তখন বে-সরকারী খনি সমূহের উৎপাদন ক্রম বর্দ্ধমান।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে-সরকারী খনি সমূহ ইহার আভ্যন্তরীন সম্পদের দ্বারা পরিকল্পিত উৎপাদন লক্ষ্যে সহজেই পৌঁছিতে পারিবে। অবশ্য লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীন সম্পদের সাহায্যই যথেষ্ট নয়, ইহার জন্য আরও কিছু পারিপার্শ্বিক সাহায্যের প্রয়োজন, যেমন মাল চলাচলের সুবিধা প্রভৃতি। যদি এগুলি পাওয়া যায় তাবে অতি সহজেই যে-সরকারী খনি সমূহের উৎপাদন ৩০৪ লক্ষ টন হ'তে বেড়ে ৪৫০ লক্ষ টন হ'তে পারবে।

সরকারী খনি সমূহ কিন্তু এত সহজে পরিকল্পিত উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ ১'৫৮% হ'তে পরিকল্পিত লক্ষ্য মোট উৎপাদনের ২০% এ পরিণত হ'তে বিশেষ বেগ পেতে হ'বে। অবশ্য র‍্যাশালাইশনের সাহায্যে ও পরিচালনাগত অন্যান্য ত্রুটী-দূর করে উৎপাদন কিছুটা বাড়ান সম্ভব; নূতন খনিগুলিতে open cast পদ্ধতিতে খনন করলেও উৎপাদন কিছুটা বাড়বে। কিন্তু তারপর? যদি সকল নূতন খনিতে কাজ চালু করতে হয় তাহ'লেও কমপক্ষে ছয় থেকে আট বৎসর সময় লাগে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যে উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হ'বে বলে মনে হয় না।

উৎপাদন যতই বাড়ুক না কেন মাল চলাচলের সুবিধা পাওয়া না গেলে, সে উৎপাদন কোন উপকারেই লাগবে না। এবিষয়ে রেলকর্তৃপক্ষকে বেশ কিছুটা দায়িত্ব বহন করতে হ'বে। ২নং তালিকায় দেখা যাবে উৎপাদনের কতটা অংশ ওয়াগণের অভাবে খনিতেই মজুত করে রাখতে হয়।

তালিকা—২

১৯৫৭ সালের কয়লা উৎপাদন ও মজুতের হিসাব (টনের হিসাবে)

সময়	বে-সরকারী বিভাগ			সরকারী বিভাগ		
১৯৫৭	উৎপাদন	মাসের শেষে মজুতের পরিমাণ	শতকরা হিসাব	উৎপাদন	মাসের শেষে মজুতের পরিমাণ	শতকরা হিসাব
জানুয়ারী	৩,৩১৯,৪১৩	২,৭৩৯,৭৫৭	৮২·৫৪	৩০৭,৭৩৮	৪০,৫৪১	১৩·১৭
ফেব্রুয়ারী	৩,২৪১,৭০৩	২,৯৮৫,৫৭৬	৯২·১০	২৭৬,৯৭৮	৪৩,৮২১	১৫·৮২
মার্চ	৩,৩৫৮,৮৫৩	২,৯৬৪,০৪১	৮৮·২৫	২৯০,৯২৪	৩৬,০৯২	১২·২৮
এপ্রিল	৩,৪২৯,৯৩০	৩,০৪৬,৩২১	৮৮·৮২	২৯৬,১৭৬	৪০,৪৪৮	১৩·৬৬
মে	৩,৫১১,২৬১	৩,২১৮,৭০৫	৯১·৫৬	২৮,২১৩১	২৯,২৪১	১০·৬১
জুন	৩,০৮৩,৮৭৪	৩,২২১,৫১০	১০৪,৪৬	২৪৬,৫২৬	৩০,৮৩৩	১২·৫১
জুলাই	৩,০২,৩৩৭৯	৩,০২৮,৯৮৯	১০০·১৭	২৭২,৭৭১	৩৭,১১০	১৩·৬০

সুতরাং দ্বিতীয় তালিকা হইতে সহজেই বুঝাইতেছে শুধুমাত্র খনি সমূহের কাজ কর্মই নয়, রেলের কাজ কর্মও যথেষ্ট বাড়তে হ'বে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বাংলা ও বিহারের কয়লাখনি গুলির জন্য দৈনিক ৪,৯৬৫টি ওয়াগন পাওয়া যাইবে, ইহা দ্বারা অতিরিক্ত ১০০ লক্ষ.টন কয়লা চালান দেওয়া সম্ভব হ'বে। কিভাবে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হ'বে তা আমাদের জানা নেই, শুধু এইটুকুই জানা আছে যে, ওয়াগনের সুব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কয়লা-খনি সম্পর্কে কোন পরিকল্পনাই বাস্তবে কার্যকরী হ'বে না।

চা-শিল্পে মজুরী বনাম উৎপাদন হার বৃদ্ধি

শ্রীচা-কর

প্রত্যেক শিল্পক্ষেত্রেই শ্রমিকদের মজুরীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। চ-শিল্পেও এই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি হওয়া ভাল। কারণ তাহাতে শ্রমিকরা তাহাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করিবার সুযোগ লাভ করে। তবে বর্দ্ধিত মজুরী উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির মূলে কি প্রতিক্রিয়া আনিল তাহার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মজুরী বৃদ্ধির সহিত যদি শ্রমিকদের উৎপাদন হার বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ভয় বিশেষ থাকে না। তবে উৎপাদন হার বৃদ্ধির সহিত উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষও যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ কেবলমাত্র উৎপাদন হার বৃদ্ধি পাইলে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত যোগান চাহিদার অসমতা বাজারকে মন্দা করিয়া দিতে পারে। উৎপাদন হারের সহিত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইলে বর্দ্ধিত বাজার-মূল্য লাভের তথা মজুরীর অংশ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিবে। চা-এর উৎকর্ষের উৎস দুটী। প্রথম পর্য্যায়ে চা-এর উৎকর্ষ নির্ভর করে পাতা তোলার উপর। ভাল পাতা তোলাকে বলা হয় fine plucking. দ্বিতীয় পর্য্যায়ে উৎপাদন ক্রিয়ার তারতম্যের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর চা তৈয়ার হয়। তবে চা-এর উৎকর্ষ বিশেষ করিয়া পাতা তোলা প্রণালীর উপর নির্ভর করে। এই সম্বন্ধে Plantation Enquiry Commission মন্তব্য করিয়াছেন: A major part of the success in the industry depends on plucking .. when proper leaves are not plucked, cost of manufacture increases. A lot of tea is wasted in plucking out of the coarse leaf in the factory compound. Withered leaf has to be sorted before being put on the rollers. The offgrades and waste tea are a reflection of bad plucking. "The cost of plucking is an expensive iteam in any factory and has to be weighted against any saving in plucking costs likely to accrue from coarse plucking if overall profit is to be considered." দুটী পাতা একটি কুঁড়ী তোলাকে fine plucking বলে। ইহাতে আপাতঃদৃষ্টিতে উৎপাদন হ্রাস জনিত লোকসান হইতেছে মনে হইলেও, শ্রমিকদের ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। কারণ ভাল বাজার মূল্য শ্রমিকদের উচ্চহারে মজুরী লাভের সুযোগ করিবে। আজকাল fine plucking এর উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। এখন দেখা যাউক পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম অঞ্চলে মজুরীর তুলনায় শ্রমিকদের উৎপাদন হার কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হয়। সেই কারণে এখানে ১৯৫০ হইতে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত অবস্থার তুলনা করা হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের পরের কয় বৎসরের প্রয়োজনীয় তথ্য এখনও বাহির হয় নাই।

১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে পুরুষ শ্রমিকদের মজুরী পশ্চিম বঙ্গের দার্জিলিং জলপাইগুড়ি এবং তরাই অঞ্চলে শতকরা ৩৭ হইতে ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে আসাম উপত্যকা ও কাছাড় অঞ্চলে মজুরীর হার শতকরা ৭৬ হইতে ৯০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমিকদের মাথা পিছু উৎপাদন হার বিচার করিলে নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া যায়।

(মাথা পিছু মণ হিসাবে)

সাল	দার্জিলিং	জলপাইগুড়ি	পশ্চিমবঙ্গ	আসাম উপত্যকা	কাছাড়	উত্তরপূর্ব্ব ভারত
১৯৫০	৩·৪৪	৮·৭৮	৬·৭৪	৭·৯০	৭·৬৭	৭·৪৫
১৯৫১	৬·৬০	৮·৪৫	৮·০৬	৭·৯০	৭·৭৮	৭·৯৫
১৯৫২	৬·১৫	৭·৮৫	৭·৪৬	৭·৮৮	৭·০৯	৭·৭৩
১৯৫৩	৫·১৩	৮·৩১	৭·৪৯	৭·৮৫	৭·৩০	৭·৭৪
১৯৫৪	৪·৮৭	৮·১৫	৭·২৩	৮·৪৩	৭·২৯	৮·০০

একমাত্র জলপাইগুড়ি ও কাছাড় ব্যতীত অন্য সব অঞ্চলেই এই পাঁচ বৎসরে মাথা পিছু উৎপাদন হার অল্প বিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্য হিসাবে ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৭·২৮ ভাগ এবং আসামে শতকরা ৬·৭১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কয় বৎসরে একর কিছু শ্রমিক নিয়োগের হার লক্ষ্য করিলে (মাথা পিছু উৎপাদন হার বৃদ্ধির ফলাফল আরও ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

(একর পিছু শ্রমিক সংখ্যা)

সাল	দার্জিলিং	জলপাইগুড়ি	পশ্চিমবঙ্গ	আসাম উপত্যকা	কাছাড়	উত্তরপূর্ব্ব ভারত
১৯৫০	২·০০	১·৬২	১·৭৪	১·৫০	১·১১	১·৫৬
১৯৫১	৩·৯৫	১·৬৫	১·৪২	১·৫৭	১·১০	১·৫০
১৯৫২	১·০৭	১·৬৮	১·৪৮	১·৫২	১·০৮	১·৪৯
১৯৫৩	১·২২	১·৬২	১·৪৯	১·৪৭	১·০১	১·৪৫
১৯৫৪	১·৩৬	১·৬৫	১·৫৬	১·৪৭	১·০৮	১·৪৮

দেখা যাইতেছে এই পাঁচ বৎসরে একমাত্র জলপাইগুড়ি ব্যতীত অন্যান্য সর্বত্র একর পিছু শ্রমিকের হার হ্রাস পাইয়াছে ; শতকরা হিসাবে ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১০·৩৪ এবং আসামে ২০০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আর একটী পরিসংখ্যানও বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। ইহা হইতেছে একর পিছু ফলনের হার।

(একর পিছু মণ হিসাবে)

সাল	দার্জিলিং	জলপাইগুড়ি	পশ্চিমবঙ্গ	আসাম উপত্যকা	কাছার	উত্তরপূর্ব্ব ভারত
১৯৫০	৬·৮৮	১৪·১৯	১১·৬৬	১১·৮৮	৮·৫৮	১১·৬৩
১৯৫১	৬·২৬	১৩·৯৩	১১·৪৬	১২·৩৭	৮·৫৬	১১·৭২
১৯৫২	৬·৫৭	১৩·১৮	১১·০৫	১১·৯৫	৭·৬৫	১১·৫০
১৯৫৩	৬·২৩	১৩·৪৪	১১·১৬	১১·৫৪	৭·৩৯	১১·২৩
১৯৫৪	৬·৬০	১৩·৪৭	১১·২৫	১২·৪০	৭·৮৭	১১·৮৭

কমাত্র আসাম উপত্যকা ব্যতীত সর্বত্র এই একর পিছু ফলনের হার হ্রাস পাইয়াছে। শতকরা সাবে একর পিছু উৎপাদন ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে পশ্চিম বঙ্গে ৪·৩৪ ভাগ হ্রাস াইয়াছে কিন্তু আসামে ৪·৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কয় বৎসরে ফলনের মোট হার পশ্চিম ঙ্গে শতকরা ৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে এবং আসামে ৬·১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

াটমাট একমাত্র জলপাইগুড়ি ব্যতীত অন্যান্য সব অঞ্চলে শ্রমিকেরা তাহাদের কাজে উন্নতি খাইয়াছে। জলপাইগুড়িতে একর পিছু ফলনের হার হ্রাসের কথা মনে রাখিলে শ্রমিকদের ংপাদন হ্রাসের জন্য কিছুটা ক্ষমা করা যাইতে পারে। অবশ্য মজুরীর তুলনায় শ্রমিকদের র্য্যক্ষমতা ঠিকমত বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা তাহার বিচার আমি এই প্রবন্ধে করিতে চাহি না, হা করিতে হইলে আরও সূক্ষ্ম পরিমাপের প্রয়োজন। যথা সম্ভব সহজ লভ্য প্রয়োজনীয় তথ্য ই প্রবন্ধের মাধ্যমে পরিবেশন করিলাম।

BUY

BEST SELECTED "B" GRADE COAL

FROM

SAMLA COLLIERIES LTD.

&

JAIPURIA KAJORA
COLLIERIES LTD.

ENQUIRIES TO :

33, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA.

Phones : 22 { 2465 2466 2468 3347

Gram : { JAIPURIA CALCUTTA

গার্হস্থ্য স্বয়ংক্রিয় সিনেমা প্রোজেক্টর

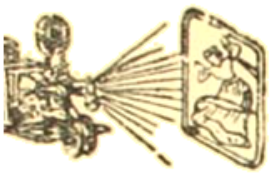

সত্যিকারের সিনেমা দেখিবার আনন্দ ঘরে বসিয়া উপভোগ করুন। এবং চিত্র (সিনেমা হলে) পর্দার বুকে যেমন আপনার প্রিয় তারকাদের চলাফেরা কথা অভিনয় করিতে, নাচিতে এবং গান গাহিতে দেখেন ঘরে বসিয়াও পর্দার বুকে ঐ রকমই দেখিতে পাইবেন। টর্চের অথবা ইলেকট্রিক বাবের আলোর (এ-সি ডি-সি) সাহায্যে প্রতিফলিত হয়। ১০ ফুট পরিমিত রঙীন ও বিচিত্র ফিল্ম বিনামূ ৩য়। অতি সুন্দর ভিলুক্স প্রোজেক্টারের মূল্য মাত্র ১৫৲। বিনামূল্যে বিস্তারিত ব্যবহার পদ্ধতি জানান হ ও ডাকমাশুল ৪৲। প্রতি টাকায় ৮ ফুট রঙীন ফিল্ম ও স্ক্রীনের মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

স্বয়ংক্রিয় ছয়ঘড়া পিস্তল

কোন লাইসেন্সের আবশ্যক হয় না

আমেরিকার মডেলের ন্যায় আপনা হইতেই পর পর ছয়টী গুলি ছোড়া হয়, এইরূপ ভাবে সংযুক্ত পিস্তল। ইহার উচ্চ শব্দ এবং নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ডাকাতদিগকে এবং বন্য পশুদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হয়। সিনেমা-থিয়েটারের অভিনেতাদের অভিনয়ের পক্ষে ইহা সর্বোৎ এবং উপযোগী, শত্রুর আক্রমণ প্রভৃতিতে এই পিস্তল আপনার সবচেয়ে উপযুক্ত সঙ্গী। ফি ২৫টি কার্তুজ দেওয়া হয়। মনোমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। মূল্য ৮৲ ডাকমাশুল ২৲। পিস্তলের খাপ । প্রতি টাকায় অতিরিক্ত ১০০ গুলি দেওয়া হয়।

দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী পুস্তক সমূহ

ও পেটিংস—৩৲, পারফিউমারী মেকিং—৩৲, ইলেকট্রিক এণ্ড রেডিও গাইড—৩৲, দি আর্ট অফ ফটোগ্রা ং, টেলরিং এণ্ড কাটিং—৩৲। ১৪টি ভাষার মাষ্টার—৪৲, প্রতিটি পুস্তকের ডাক ব্যয়—৵৹।

ANAND INDUSTRIES,
119, GOPALPURI ALIGARH U. P.

Gram : "EASIA LAMP" Phone : 55 : 1245

USE

ASIA LAMP

and Flash Light Bulbs

Manufactured by :—

THE ASIA ELECTRIC LAMP Co., Private Ltd.
CALCUTTA—3

উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থ নিয়োগের জন্য জাতীয় সঞ্চয়

(২৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

খুব বেশী দিনের কথা নয়, যখন আমাদের গ্রামবাসীদের পক্ষে তাদের স্বল্প-সঞ্চয়কে লগ্নী করার বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না। সে সময়ে তাদের সঞ্চয়ের টাকা বিনিয়োগ করার প্রধান উপায়ই ছিল সোনার গহনা কেনা অথবা জমি কিংবা বাড়ির পিছনে সেই টাকা নিয়োগ করা। আজ কিন্তু গ্রামাঞ্চলে পোষ্ট অফিসের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং সরকারও পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, ন্যাশন্যাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট, ট্রেজারি সেভিংস্ ডিপজিট সার্টিফিকেট, পঞ্চদশ বার্ষিক অ্যানুয়িটি সার্টিফিকেট, ইত্যাদির মাধ্যমে লোকের সঞ্চিত অর্থকে লগ্নী করবার নানাবিধ সুবিধার বন্দোবস্ত করেছেন। স্বল্পবিত্ত মানুষদের উপযোগী সুবিধা বিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কোনও লোক, এমন কি কোন বালকও যদি একসঙ্গে একখানা পাঁচ টাকা দামের সার্টিফিকেট না কিনতে পারে তা হ'লেও সে ২৫ বা ৫০ নয়া পয়সা কিংবা একটাকা দামের আলাদা আলাদা সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প কিনে, পোষ্টঅফিস থেকে বিনামূল্যে প্রদত্ত সেভিংস্ পোষ্ট কার্ডের ওপর সেগুলোকে এঁটে এঁটে, যখন তার ওপর মোট পাঁচ টাকা দামের সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প আঁটা সম্পূর্ণ হবে, তখন সেটাকে পোষ্ট অফিসে জমা দিয়ে তার বদলে একখানা পাঁচটাকা দামের সেভিংস্ সার্টিফিকেট নিয়ে নিতে পারবে।

অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ছাড়াও, দেশের সমগ্র সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাসের ওপরও স্বল্প-সঞ্চয়-অভিযানের একটা মানবিক প্রভাব আছে। একটা গণতান্ত্রিক রাজ্যের শাসনযন্ত্র শুধু জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত হলেই চলবে না, তা যাতে জনগণের সাহায্যেই পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থাও আমাদের করতে হবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক ধারায় কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা, সমস্ত কল্যাণ-পরিকল্পনার রূপায়ণে তাদের সক্রিয় এবং সচেতন সহায়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটা যাতে নিশ্চিতভাবে করতে পারা যায় তার একটা উপায় হচ্ছে দেশের প্রত্যেকটি লোককে উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলিতে অর্থ নিয়োগে উদ্বুদ্ধ করা। জাতীয় সঞ্চয়-অভিযানে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যখন সূচনা হয়, তার আগে থেকেই জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনার কাজ চলেছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে, অর্থাৎ ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৬-৫৭ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে সারা ভারতে স্বল্প-সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে নীট ২২৫কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য স্থির করা হবে; তাতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অংশ ধরা হয় ৪৩·৭৫ কোটি টাকা। এই সময়ের মধ্যে স্বল্প-সঞ্চয় বাবত সারা ভারতে সংগৃহীত হয় ২৩৯কোটী টাকা আর পশ্চিমবঙ্গে ৪৩·২৫ কোটী টাকা। এতে দেখা যায়, সারা ভারত থেকে যখন লক্ষ্য ছাড়িয়েও আরও ১৪ কোটী টাকা বেশি পাওয়া গেছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে তখন পাওয়া গেছে লক্ষ্যের চেয়ে ৩·৫ কোটী টাকা কম। সুতরাং পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে স্বল্প-সঞ্চয়-অভিযানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে অগ্রসর হতে হচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সারা ভারতের লক্ষ্য স্থির হয়েছে ৫০০কোটী টাকা তোলার এবং পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য ৫০ কোটী টাকার। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ দেড় বছরে, সারা ভারতে সংগৃহীত হয়েছে ১২৮ কোটী টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গে ১২·৯৭ কোটী টাকা। এই দু'টী অঙ্ক থেকেই বোঝা যায় যে, সঞ্চয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে জ্ঞানের সঞ্চার করতে হলে প্রণালীবদ্ধ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

দেশের স্থায়ী অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনা ক'রে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মুখ্যত মৌলিক দ্রব্যগুলি উৎপাদনের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা কম হচ্ছে অপরদিকে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ায় অনেক লোকের হাতে অনেক সময় টাকার পরিমাণ বেশি হয়ে ক্রয়-ক্ষমতা বেড়েছে। এই অবস্থায় নিত্যকার খরচ থেকেই কিছু অর্থ সঞ্চয় করা না হলে অর্থ স্ফীতি-চক্রকে সম্পূর্ণ রোধ করা যাবে না। কাজেই এদেশে সুসংগঠিত একটা সঞ্চয়-অভিযান চালানো আশু প্রয়োজন—শুধু উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলিতে অর্থ-নিয়োগের জন্যই নয়, ভোগ্যবস্তুর মূল্যের স্থিরতা বজায় রাখার জন্যও বটে।

জাতীয় সঞ্চয়-অভিযানকে শক্তিশালী ক'রে তুলতে হলে, আমাদের গ্রামাঞ্চলের সমস্ত রকমের সংস্থাকেই এমনভাবে কাজকর্মে প্রবৃত্ত করতে হবে যাতে জাতীয় সঞ্চয় অভিযানের মূল উদ্দেশ্যটী দেশের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সুতরাং আমার দেশের প্রত্যেকটী মানুষের কাছে এই আবেদন যে, প্রত্যেকেই যেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মহান সঙ্কল্পকে রূপদানের উদ্দেশ্যে অর্থ-ভাণ্ডার গ'ড়ে তোলবার জন্য নিজের উদ্বৃত্ত সঞ্চয় নিয়োজিত করতে দ্বিধা না করেন।

আপনাদের স্বাস্থ্য কামনায়

আমাদের মিলজাত দ্রব্য পরিবেশন করি

উৎসবের আনন্দ পরিপূর্ণ ক'রে তুলবে

কাকাতুয়া	মার্কা	ময়দা
হ্যাপিচিকেন	মার্কা	ময়দা
গোলাপ	মার্কা	আটা
হ্যাপিচিকেন	মার্কা	আটা
যোদ্ধা	মার্কা	আটা

প্রস্তুতকারক :

দি হুগলী ফ্লাওয়ার মিলস্ কোং লিঃ
দি ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলস্ কোং লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টস :

শ ওয়ালেস এণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা, হাওড়া ও সহরতলীর অধিকাংশ বিশিষ্ট মুদী দোকানে নির্ধারিত মূল্যে পাওয়া যায়। গ্রাহকগণকে অধিক মূল্যে আটা ও ময়দা ক্রয় না করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

নিবেদক :

চৌধুরী এণ্ড কোং

৪।৫, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

জামসেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অর্ধশতাব্দী অনুষ্ঠান

কে জানিত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার জঙ্গলাকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম কোনদিন ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বৃহত্তমকেন্দ্রে রূপায়িত হইবে। এই গ্রামটি ছিল সেদিনের সাকচী। সিংভূম জেলায় একটি অতি নগণ্য গ্রাম অরণ্য পল্লী, বনবাসী আদিবাসীদের বাসভূমি। তখন সিংভূম জেলা ছিল বাংলা মুলুকের মাটি। দুইটি নদী—সুবর্ণরেখা ও কারকাই এই গ্রামটির আশেপাশে প্রবাহিত ছিল। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ এই গ্রামটিরই প্রান্ত দিয়া প্রসারিত ছিল। আজ যেখানে টাটানগর রেলষ্টেশন, লোকে হয়তো ভুলিয়া গিয়াছে, ইহাই ছিল কালিমাটি রেলষ্টেশন। কালিমাটি পুরোপুরি রেলষ্টেশনও ছিল না—ছিল ফ্লাগ ষ্টেশন। সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, মর্যাদার আভিজাত্য সিংভূম জেলার এই গ্রামটিকে কোনদিন ভারতের মানচিত্রে স্মরণীয় স্বাক্ষর দান করিবে, কেহই কোনদিন ভাবে নাই।

আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে অর্দ্ধ শতাব্দী অনুষ্ঠানে দুইটি কথা মনে পড়ে। একটি—সাকচী বিহার নয়, বাংলা। জামসেদপুরও বিহারের মাটিতে গড়িয়া উঠে নাই, সমৃদ্ধি লাভ করে নাই বিহারের মৃত্তিকায়। আরও একটি কথা মনে পড়ে, জামসেদপুরের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতে প্রতিভার যোগসূত্র ছিল বাঙ্গালীর ধীশক্তির। উনি ছিলেন স্বর্গীয় প্রমথনাথ বসু। বাঙ্গালার মাতৃভূমিতে বাঙ্গালীর সেবায় যে শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, রাজ্যপুনর্গঠনের সময় স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণ বাঙ্গলাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে ইহাও আজিকার গৌরবোজ্জ্বল স্মরণীয় দিবসে বিস্মরণের কথা নয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়া যদি এই সত্য একবারও উপলব্ধি করিতেন যে রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যাপারে দলীয় রাজনৈতিক মতবাদ তাহাদিগকে মাতাল করিয়াছিল, তাহা হইলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ভারতের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিত না।

১৯০৮ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী এই সাকচী গ্রামে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় জামসেদজী টাটা যখন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া রাস্তা নির্মাণ, রেলপথ-বিস্তার রেললাইন—বিস্তার, ঘর-বাড়ী নির্মাণ করিয়া কারখানার সূত্রপাত করিলেন, তখন অরণ্যবাসী, আদিবাসীরা বিস্ময়ে বিমূঢ় মনে ভাবিয়াছিল তাহাদের সুদিনের কথা। ১৯১১সালে এই ইস্পাত কারখানায় প্রথম পীগ আয়রণ বা লৌহ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। কারখানার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের বহু মুখ ধারা প্রসারিত হয় এবং ১৯১৪ সালে একটি কোক্-চুল্লী, দুইটি ফার্নেস, একটি লৌহ-গলানোর কারখানা, একটি ব্লুমিং মিল, একটি লোহার কড়ি-বড়গা প্রস্তুতের মিল এবং একটি লোহার বার প্রস্তুতের মিল লইয়া এই কারখানাটির প্রারম্ভিক কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯১৯ সালে এই কারখানার আরও সম্প্রসারণ হয়। তখন ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন ইনগট ষ্টীল ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মন্দার বাজার ও বিদেশী প্রতিযোগিতা এই শিল্পটির অগ্রগতি ব্যাহত করে; উদ্যোক্তাদের সাহস ও ধৈর্য, কর্মীদের বেতন হ্রাসের স্বার্থত্যাগ, অংশীদারদের লভ্যাংশ না নেওয়ার ইচ্ছা প্রভৃতি কারণে সেদিনের দুর্দিন দুঃখময় হইলেও দুর্দশায় পরিণত হইতে পারে নাই। এমন কি ১৯২৯সালের সঙ্কটময় পরিস্থিতি অতিক্রম করিতেও উদ্যোক্তরা সমর্থ হইয়াছিলেন। সে সময়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এই শিল্পটিকে সংরক্ষণ দান করেন। ১৯৩৩ সালে দুঃখ দিনের অবসান হয়। পুনরায় লভ্যাংশ প্রদান করা হয় ১৯৩৫-৩৬ সালে, কিন্তু তাহার পূর্বেই ১৯৩৪ সালে শ্রমিকদিগকে একটি বিশেষ বোনাস প্রদান করা হয়। ১৯৩৬ সালে অনুশীলন ও গবেষণার প্রয়োজনে একটি

গবেষণাগার স্থাপিত হয়। এই গবেষণাগারে গবেষণার ফলে টাটা কোম্পানী বিদেশী প্রতিযোগিতার মধ্যেও হাওড়া ব্রীজ ও রেঙ্গুনের পাইপ লাইন নির্মাণের কণ্ট্রাক্ট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

ক্রমোন্নতির অব্যাহত ধারা এই শিল্পটিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে উৎপাদনক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে সক্ষম করিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ১লক্ষ ২শত ৩১হাজার টন পিগ আয়রণ বা লৌহপিণ্ড ১লক্ষ ৮২হাজার টন ইস্পাত ইনগট্ এবং ৮লক্ষ ৩৯ হাজার টন বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য এই কারখানাটিতে দিবারাত্র কাজ চলে এবং যুদ্ধের পরে ইহার সংস্কার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং এই কারখানাটির যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও সংস্কার প্রয়োজন হয় এবং উৎপাদন ক্ষমতা ১৩লক্ষ টন ষ্টীল ইনগট্ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। ১৯৫৫ সালে একটি নূতন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৎসরে ২০লক্ষ টন পর্যন্ত ষ্টীল ইনগট্ প্রস্তুত করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৫সালের ডিসেম্বর মাসে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের কাইজার কর্পোরেশনের সহিত ৬১কোটি টাকার একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। যুক্তরাষ্ট্রের কাইজার কোম্পানী যাহাতে আড়াই বৎসরের মধ্যে সমস্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়া কারখানা নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করেন তাহাও চুক্তিবদ্ধ হয়। এই বৎসরের মাঝামাঝি এই আরব্ধ কাজ সমাপ্ত হইবে আশা করা যায়। আলোচ্য ২০লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন পরিকল্পনা ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক পরিকল্পনার জন্য কোম্পানী ৪ বৎসরের জন্য আরও ১২০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকার মধ্যে ৪২কোটি টাকা বিশ্ব ব্যাঙ্ক সাহায্য করিয়াছে। অবশিষ্ট টাকা যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার বে-সরকারী ব্যাঙ্কগুলি সাহায্য করিয়াছে।

উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জামসেদপুর বিশাল শিল্প সহরে পরিণত হইয়াছে। ১৯০২সালে জামসেদজী টাটা প্রথম শিল্প কারখানা পত্তনের সময়ে তাঁহার পুত্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সুদূর দৃষ্টিভংগির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দোরাবজীকে লিখিয়াছিলেন,—

"Be sure to lay wide streets planted with shady trees, every other of a quick growing variety. Be sure that there is plenty of space for lawns and gardens. Reserve large areas for football, hockey and parks. Earmark areas for Hindu Temples, Mohemmedan Mosques and Christain Churches."

আজ জামসেদপুরের লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ। এই সুবিন্যস্ত শিল্প সহরে কোন কিছুরই অভাব নাই। সর্বাঙ্গীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষি ও কারুকলা চর্চাকেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণা সব কিছুর সমাবেশ এই শিল্প সহরটীকে আধুনিক প্রাণচঞ্চল জীবনের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত করিয়াছে।

টাটা পরিবারে উদ্যম ও উদারতা শিল্পক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে; বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষাপ্রসারে তাহাদের অবদান স্মরণীয়। এই শিল্পগোষ্ঠীর মুনাফার প্রায় তিনভাগ দানের জন্য ব্যয়িত হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য জে, এন, টাটা এনডাউমেণ্ট, স্যার দোরাবজী টাটা ট্রাষ্ট, স্যার রতন দানভাণ্ডার, লেডী টাটা স্মারক ভাণ্ডার এবং জে, আর, ডি টাটা ট্রাষ্ট হইতে বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান মন্দির, বোম্বায়ের সমাজ বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র, টাটা মৌলিক গবেষণাসংস্থা, টাটা ক্যান্সার হাসপাতাল প্রভৃতিতে টাটা কর্তৃপক্ষের দান স্মরণীয় কীর্তি। আজ টাটা ইস্পাত শিল্পের সার্ধশতাব্দী অনুষ্ঠান দিবসে এই প্রকৃত জাতীয় শিল্পটির অব্যাহত অগ্রগতি কামনা করি।

অর্থনৈতিক সমাজে ব্যক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

গত ৩রা মার্চ গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে Forum of free Enterprise-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রী এ.ডি. শ্রফ্ ভারতের বর্তমান বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা রূপায়ণের অন্তরায় সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন। শ্রীশ্রফ বলেন, যে ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট যে উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনার জন্য আসিয়াছে তাহা নহে, কোন রূপ পরিকল্পনা না করিয়াই আমাদের পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে বলিয়াই আমাদের এই সংকট আসিয়াছে। তিনি কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে ভারতীয় আয়কর আইনের ২৩এ ধারা অসঙ্গত ও অসম্মানজনক। তিনি আরও বলেন সরকার জাতীয় আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রায় লম্বা চওড়া বক্তৃতা দেন। কিন্তু পরিকল্পনার দরুণ জাতীয় আয় সত্যি যদি কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তবে পরিকল্পনার জন্য মুদ্রা-স্ফীতি হেতু যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাতে জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় টাকার অংকে বৃদ্ধি পাইলেও আর্থিক আয় প্রকৃতই বাড়ে নাই। গত ২২ মাসে এই পরিস্থিতি অপরিবর্তিত অবস্থাতেই আছে। জীবনযাত্রার মান ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব দ্বিতীয় পাঁচশালা যায় হ্রাস করিতে না পারিলে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে তাহাতে লোকের জীবনযাত্রা দুঃসহ হইয়া উঠিবে। পরিকল্পনা সম্পর্কে লম্বাচওড়া বক্তৃতা ছাড়িয়া বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়া প্রকৃত অবস্থার বিচার করিতে হইবে।

পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের অসুবিধার সম্পর্কে শ্রীশ্রফ বলেন যে আগামী দুই বৎসরে গভর্ণমেণ্ট ১৪১১ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তন্মধ্যে রাজস্ব হইতে ১২২ কোটী টাকা বিদেশী ঋণ ইত্যাদি সমস্ত আয়ের উৎস ধরিয়া দেখা যায় যে ২৫০ কোটী টাকার মত ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। সরকারের আয়ের উৎসের হিসাব কখনও আশাতীত হয় নাই; অথচ ব্যয়ের মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়া সরকারের স্বতঃসিদ্ধ নীতি। যেমন স্বল্প সঞ্চয় হইতে সরকার ১ হাজার মিলিয়ন টাকা আশা করিয়াছিলেন অথচ পাওয়া গিয়াছে মাত্র ৩৫০ মিলিয়ন টাকা। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের তীব্র সমালোচনা করেন এবং সিমেণ্ট বণ্টনের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি ও বণ্টন ব্যবস্থায় গাফিলতির জন্য এই সংস্থা যে দায়ী তাহার উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি সরকারের বর্তমান কর-নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন সরকার অতিরিক্ত কর আদায়ের জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন তাহা ইতিপূর্বে ভাঁটার দিকে চলিতে শুরু করিয়াছে, সুতরাং জোর করিয়া যে জোয়ার আনা যাইবে না তাহা সর্বজনবিদিত।

গ্রন্থ-পরিচয়

Review of Our Second Five Year Plan—Ajit Kumar Roy, M. A., Published by the auther and distributed by B. Sarker & Co, 15, College Street, Calcutta Price 1-50 N. P.

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কাজ কিভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং তাহার পরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়া

অগ্রসর হইতেছে, এই বিষয়ে সরকারী ও বেসরকার পর্যায়ে বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তিকাটির লেখক বঙ্গবাসী কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ অব্ কমার্সের অধ্যক্ষ ডাঃ অক্ষয় কুমার ঘোষাল ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন।

পুস্তিকাটী প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার ছাত্রদের প্রস্তুতির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিত হইয়াছে। ছাত্রগণ ইহার দ্বারা উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করি। আলোচনাগুলি সংক্ষিপ্ত ও ভালই হইয়াছে।

Studies in Economic Geography—by Prof. M. C. Ghosh. Published by S. Mukherjee, 82A, Lake View Road, Cal.-29. Rs. 5/8/-

আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রশ্নোত্তরে অর্থনৈতিক ভূগোল। মুখ্যতঃ পরীক্ষার্থীদের জন্য লিখিত। বইখানি তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ এবং ছাত্রদের বৈতরণী পারের সময় কোন বিঘ্ন ঘটাইবে না, এইটুকু বলিতে পারি। তবে দুঃখের কথা এই যে এত বড় একখানি বই পড়িয়াও ছাত্রদিগকে নোট পড়িতে হইল, পাঠ্য পুস্তক পড়িতে হইল না ইহাই বোধ হয় ছাত্রদের আপশোষ এবং অধ্যাপকের সান্ত্বনা। বইখানি ছাত্রদের উপকারে লাগিবে বিশ্বাস করি।

The Role of Panchayats in India—by U. N. Dhebar.
The Congress Ideology and Programme—by Sadiqu Ali. Published by A. I. C. C. 7, Jantar Mantar Road, New Delhi. Price 15 and 30 N. p. respectively.

প্রথমোক্ত পুস্তিকাখানি ভারতে পঞ্চায়েতের গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে লিখিত। ভারতবাসী প্রকৃত নাগরিক হইয়া নিজ নিজ সমস্যা সমাধানে পঞ্চায়েৎ গড়িয়া তুলিবে ও ইহার সাহায্যে সর্বপ্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ নিজেদের মধ্যেই মিটাইয়া ফেলিয়া সমাজে মৈত্রী ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করিবে এবং সামাজিক নৈতিক আদর্শ প্রতিটি গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে এই উদ্দেশ্য সাধনই পঞ্চায়েতের প্রয়োজন। শ্রীদেবর ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীন ভারতের সমাজ জীবন পঞ্চায়েৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক, ইহাই শ্রীদেবরের আশা।

দ্বিতীয় পুস্তিকাখানি কংগ্রেসের আদর্শ এবং কর্মসূচী সম্পর্কে রচিত। ১৮৮৫ সালে পুণাতে প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অধিবেশনে যে কর্মসূচী ও আদর্শের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ১৯৬৮ সালে গৌহাটী অধিবেশন কালে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেইসব একে একে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহারই বিশ্লেষণমূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীসাদিক আলি এই আলোচনায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। আমরা কংগ্রেসের নীতিতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকেই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

Welfare State in Our Time (Problems of West Bengal)—by Sri Suresh Ch. Roy. Published by Business World, 87, Stiphen House, Cal.-1. Price 75 N. p.

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিতে গিয়া প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায় নানা প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা

আলোচনা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচী আলোচনা করিয়া জনকল্যাণ রাষ্ট্রের গণ-সহযোগিতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি দেশবাসী পরিকল্পনার সুফল নিজেদের জীবনে ভোগ করিতে না পারে এবং উত্তর পুরুষের সমৃদ্ধির স্বপ্নে এ জীবন শুধু ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, তবে এমনিতর আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃস্ফূর্ত গণসহযোগিতা আসিতে পারে না। রাশিয়ার পরিকল্পনার সার্থকতার কারণ এই যে প্রত্যেকটি লোকই তাহাদের জীবনে পরিকল্পনার সুফল ভোগ করিয়াছে। ভারতেও অনুরূপ চিন্তায় পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইবে ইহাই লেখকের অভিমত।

1. The Bahamas—An Economic Survey.
2. Kenya— ,, ,, ,,
3. Uganda ,, ,, ,,
4. Cyprus— ,, ,, ,,
5. Ghana— ,, ,, ,,
6. Trindad— ,, ,, ,,
7. Union of South Africa—An Economic Survey.
8. British Guiane and British Honduras—An Economic Survey.
9. The Khodesias and Nyasaland— ,, ,, ,,
   Published by—Barclays Bank D. C. O.

উল্লিখিত পুস্তকগুলি উপরোক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক বিবরণী। ঐ সকল দেশের জলবায়ু, কৃষি, শিল্প, খনিজ প্রভৃতি অর্থনৈতিক সম্পদের যথাযথ সুষ্ঠু আলোচনা বইগুলির বৈশিষ্ট্য। পরিসংখ্যান ও মানচিত্রের দ্বারা এই আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বইগুলি পড়িতে বেশ ভাল লাগে। সহজ ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন দেশের বিবরণী পড়িতে মন কোথাও নিরস্ত হয় না অথচ সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে অল্প সময়ে তাহা শেষ করিতে পারা যায়। বইগুলি যেকোন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ক্ষুধা মিটাইবে।

খুসীর দেশে—রবিদাস সাহা রায়, মূল্য—১৲ টাকা মাত্র।
গল্পের মিছিল—(ছোট গল্প সংকলন)—সংকলক—শ্রীঅমূল্যকুমার চক্রবর্ত্তী। মূল্য—২৸০ আনা মাত্র। প্রচারক ও প্রকাশক : দিশারী, ৪২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

শ্রী রবিদাস সাহা রায়ের 'খুসীর দেশে' ছেলেদের নাটক। কয়েকটি ছোট ছোট নাটকের সঙ্কলন। খুসীর দেশের হসির ফোয়ারা ছেলেদের মনে ক্ষণে ক্ষণে হাসির জোয়ার আনে। সুকুমার রায়ের অমর রচনার পরিকৃৎ রবিদাস সাহা রায়। বলার ভঙ্গী নূতনত্বে ভরা, লেখার ভঙ্গী চঞ্চল প্রাণের যেন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের উচ্ছাস। বইখানির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

গল্পের মিছিল নাম করা এবং অনামা সাহিত্যিকের গল্প সম্ভারে সমৃদ্ধ একটি গল্প সংকলন। ছোটগল্পের প্রকাশভঙ্গী ইহাতে নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে 'দিশারী' লেখক সমবায়ের প্রতিষ্ঠাতা লেখকরা সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে ইহা আমাদের শুধু নূতন নহে, আশা ও আনন্দের কথা। দিশারীর প্রকাশনা উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইলে বহু নবাগত লেখকও স্বনাম ও সুনাম প্রতিষ্ঠার একটা ভিত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, ইহাই সবচেয়ে বড় কথা! দিশারীর এই উদ্যম সার্থক হোক আমরা কামনা করি।

কৃষি উৎপাদন গতি

	উৎপাদন				উৎপাদন সূচী	
	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা
তণ্ডুল শস্য	৬৮·৭২	৬৬·৬০	৬৫·২৯	৮৮·৬৯	৬১·৬	৮০·৫
খাদ্য শস্য	৫০·২৭	৫৫·১৩	৫৪·৪৬	৫৭·২৫	৪২·৫	৬৭·৫
চাউল	২৭·৭১	২৪·৪৩	২৬·৮৫	২৮·১৪	২৭·২	৩৩·৪
গম	৭·৮৯	৮·৭৮	৮·৪৭	৯·০৭	৮·৩	১১·৬
অন্যান্য তণ্ডুল শস্য	২২·৬১	২২·৪২	১০·০৪	২০·০৪	১৭·০	২২·৫
ইক্ষু (গুড়)	৪·৪২	৫·৭৬	৫.৯৮	৬·৭৫	৬·৩	৭.৮
তূলা (মিঃ বেল)	৩·৯৪	৪·২৩	৪·০০	৪·৭২	৪·২	৬·৫
পাট (মিঃ বেল)	৩·০৯	২·৯৩	৪·২০	৪·২২	৫·৪	৫·৫
মোট উৎপাদন সূচী	১১৪·৩	১১৬·	১১৫·৯	১২৩·০		

ভারতে লোকের হাতে চালু টাকার হিসাবে (কোটি টাকায়)

	বৎসরের শেষ শুক্রবার				বিভিন্ন বৎসরের হ্রাস বৃদ্ধি		
ার যোগান	১৯৫৭	১৯৫৬	১৯৫৫	১৯৫৪	১৯৫৭	১৯৫৬	১৯৫৫
কর হাতে নগদ টাকা	১৫২৬·৭৯	১৪৮৫·৩৪	১৩৮৫·৮৯	১২২৪·৬১	+৪১·৪৫	+৯৯·৪৫	+১৬১·২
র্ত্ত হাতে গচ্ছিত টাকা	৭৩২·৪১	৬৮১·৩৫	৬৪০·১৪	৫৯৭·২০	+৫১·০৫	+৩১·২১	+ ৫২·১
রণের হাতে মোট	১৬·৪১	১১·৯৬	১১·১৪	১০·৩৪	৪·৪৫	+ ০·৮২	+ ০·৭
ার পরিমাণ (১+২+৩)	২২৭৫·৭১	২১৭৮·৬৫	২০৪৭·১৭	১৮৩২·১৫	+৯৭·০৬	+১৩১·৪৮	+২১৫·০

পাইকারী দ্রব্যের মূল্য সূচী

(ভিত্তি—১৯৫৩ : ১০০)

	এপ্রিল	মে	মার্চ	ডিসেম্বর	মে	আগষ্ট	ডিসেম্বর	জানুয়া
	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৭	১৯৫৭	১৯৫৮
। সামগ্রী	১০৩	৮২	৯৩	১০৫	১০৭	১১২	১০৪	১০৭
ন ও ইন্ধন	৯৮	৯৬	৯৭	১০৭	১১০	১১৫	১১৫	১১৪
রর কাঁচামাল	১০৮	৯৪	১১১	১১৯	১২০	১২০	১১৪	১১৪
খাদ্যজাত দ্রব্য	১০২	৯৯	১০৩	১০৯	১০৮	১০৯	১০৮	১০৮
শ্রেণীর পণ্যের গড়	১০৩	৮৯	৯৮	১০৮	১০৯	১১১	১০৭	১০৭

যৌথকোম্পানী প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেডের বার্ষিক বিবরণী

১৯৫৭ সালের ৩০শে জুন যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহার বার্ষিক সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে এবং ঐ বৎসরের লাভ-লোকসানের হিসাব আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসর কোম্পানী ৪,০৪,৯৯০/৯ পাই নীট লাভ করিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৫,১০,৫৩৫/১ পাই। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট বিক্রয় মূল্য ১১৯,০২,৩৫৫/১১ পাই। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা ১৩ ১৫,৮০১৮৮ পাই বেশী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুনাফা হ্রাস পাইয়াছে। অবশ্য মুনাফা হ্রাসের কারণ দর্শাইয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, মজুরী বৃদ্ধি, কর্মচারীদের অধিকতর সুযোগ সুবিধাদান, আবকর ও অন্যান্য করের বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেই মুনাফা হ্রাস পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও প্রভিডেন্ট ফণ্ডে ২৭,৫২১ টাকা আনুষঙ্গিক দান হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর হইতেই ইহা লাভ-লোকসানের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিবিধ করের জন্য ১ লক্ষ টাকা বাদ সাপেক্ষে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। এই বৎসর এই কোম্পানী 'ক্যালকেমিকো রিসার্চ ফাণ্ড' নামে একটি নূতন তহবিলের সৃষ্টি করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গবেষণাগার অথবা অন্যত্র গবেষণার জন্য ১৫,০০০৲ টাকা এই তহবিলে সঞ্চয় করিবার একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

কোম্পানী ১ লক্ষ টাকা কর প্রদানের জন্য রাখিয়া নিম্নোক্তভাবে লাভ বণ্টন করিয়াছেন :—

১।	রিজার্ভ তহবিলে	৪১,০০০৲ টাকা
২।	প্রথম ইস্যু প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৯৲ টাকা হারে (আয়কর রহিত) লভ্যাংশ	১২,০০০৲ ,,
৩।	দ্বিতীয় ইস্যু প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৫০ হারে (আয়কর রহিত) লভ্যাংশ	১২,৫২১৮/০
৪।	অর্ডিনারি শেয়ারের উপর আয়কর রহিত ১২% হারে	১,১৯,২৮৮৬/০
৫।	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের নির্দেশে বায় নির্বাহের জন্য—	
	(১) বোনাস বাবদ	১,১৮,০০০৲
	(২) শ্রমিককল্যাণ ও টিকিট ইত্যাদি বাবদ	১৫,০০০৲
	(৩) অবসরকালে অথবা অক্ষম ও কার্যকালীন মৃত্যু ঘটিলে	৪০,০০০৲
		৩,৫২,৮৮৮/০

উদ্বৃত্ত পত্রটি সমগ্রভাবে কোম্পানীর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সূচিত করিতেছে। আমরা ইহার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশ প্রণীত

সাহিত্য-সন্দর্শন

(পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)

সাহিত্যের রূপ ও রীতিবিষয়ক বাংলায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গ্রন্থ। ইহাতে আর্ট, সাহিত্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, বাগ্‌ভঙ্গি প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বাংলা অনার্স ও এম-এ এবং ইংরেজী এম-এ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া লিখিত।

গ্রন্থখানি সম্বন্ধে অভিমত—

(১) It is a nice handbook on **Principles on Literary Criticism—The Modern Review.** (২) 'গ্রন্থখানি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে একক'—যুগান্তর।

(৩) লেখক বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়াছেন—আনন্দবাজার

(৪) '....This work has earned Prof. Das a place in Bengali Critical Literature comparable to that of Hudson or Worsfold'—**The A.B.Patrika**

(৫) 'গ্রন্থখানিকে বাংলাভাষায় সাহিত্য-দর্পণ আখ্যা দেওয়া যায়' হাওড়া বার্তা

মূল্য ছয় টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা।

মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিঃ

একটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান : রায় বাহাদুর এস, সি, চৌধুরী

অন্যান্য ডিরেক্টরগণ :

শ্রী ডি, এন, ভট্টাচার্য | শ্রী এন, ঘোষ | শ্রী বি, এন, বসু
শ্রী জে, এম, বসু | শ্রী এস, এন, বিশ্বাস | শ্রী কে, সি, দাস

জেনারেল ম্যানেজার :

শ্রী আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ, আই, আই, বি

১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে
সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টের

সুদের নূতন বর্ধিত হার শতকরা বৎসরে
২½% হইতে ৩% পর্যন্ত প্রবর্তন করা হইয়াছে

বিস্তৃত বিবরণ যে কোন শাখা বা অফিসে পাওয়া যাইবে।
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ-কারবারের সুবিধা আছে।

হেড অফিস : ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

ব্রাঞ্চ : মিশন রো, উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, খড়গপুর, কুচবিহার ও আলিপুর দুয়ার (পে অফিস)

রেশম শিল্পী সংঘ

বাংলার খাঁটী রেশমের প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয় :—১২/১ নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

* টাকা প্রতি তিন আনা (উনিশ নয়া পয়সা) রিবেট।
* নূতনতম ডিজাইনের মুর্শিদাবাদী ছাপা শাড়ী, গরদের সার্টিং, কোটিং, তসর, মটকা, বাপ্‌তা প্রভৃতির সাড়ম্বর আয়োজন।
* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় উৎপাদিত।
* কেন্দ্রীয় খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত।

—ঃ খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র :—

(১) ১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(২) ৯৩ নং মহাত্মা গান্ধী রোড,
(৩) ১৫৯/১, রাসবিহারী এভেনিউ

কে, সি, দাশের রসগোল্লা

প্রিয়জনের প্রীতিভোজে উপাদেয় উপাদান

বায়ুরুদ্ধ টিনেও পাওয়া যায় এবং বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া
দূরান্তরেও উপহার হিসাবে পাঠানো যায়।

● ✻ ●

আরও

রসোমালাই ঃ সন্দেশ ঃ দধি ইত্যাদি

•: ✻ :•

রসোমালাই আবিষ্কারক ঃ

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা—৩

শ্রীবিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নবগৌরাঙ্গ প্রেস, ১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ, ৯ হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ণানুক্রমিক বর্ষসূচী—ষষ্ঠ বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩৬৫—মাঘ, ১৩৬৪

লেখক ও বিষয়ের নাম	পৃষ্ঠা
অ	
অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু—	
ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃসংস্কার	১৭, ১১৯
মধ্যবিত্ত শ্রেণী	১৭৩
পাউণ্ড, ষ্টার্লিং ও ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সুদের হারবৃদ্ধি	৫৬৪
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের পরিমাণ	৬২৯
পরিভাষা সমস্যা	৪৩৯
অধ্যাপক শ্রীঅলক ঘোষ—	
অনুন্নত অঞ্চলে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিভূমি	২১
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেন	৭০৪
গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার অন্তরায় ও অসুবিধা	৭২৪
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর—	
ব্যবসা-বাণিজ্যে আর্থিক পরিকল্পনা ও আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ প্রস্তুত	৮৯
শ্রীঅচলকুমার ভট্টাচার্য—	
মূলধনজাত লাভকর	১৪১
আ	
শ্রীআভাস দাশগুপ্ত—	
তাঁতশিল্প প্রসঙ্গ	৩৫১
ডাঃ আর্থার রবার্ট বার্নস—	
বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমস্যা	১১৫
আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত—	
ভারত সরকার ও আমদানী নীতি	৩১৬
শিল্পায়ন ও ভারত	১৯৯
বৃটিশ অর্থদপ্তর ও পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা	৫২২
১৯৫৭-৫৮ সালের রেলওয়ে বাজেট	২৪৮
বিক্রয়কর ও কেন্দ্রীয় সরকার	৪৫৩
রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৬৮৫
তৈল সোনাগায় সম্পর্কীয় চুক্তির অর্থনৈতিক গুরুত্ব	৭৩৩
আমীর রাজা—	
কৃষিপ্রধান ভারতে ভূমি সংস্কার	৭১৩
আন্দ্রেই উত্তিনভ—	
যৌথ খামারের কার্যাদি কে বা কাহারা পরিচালনা করেন	৫৭৫
শ্রীআশীষ বসু—	
ভারতীয় ভূমি-সংস্কার ও ভূদান আন্দোলন	৭০১
উ	
উড়োপাখী—	
সংগ্রাম স্বাধীনতা গণতন্ত্র	৫১, ১৩৫
এ	
শ্রীএইচ. কে. এল. শেট্টী—	৯
গঙ্গাসেতু পরিকল্পনা ও উত্তর বিহার	১৯৭
শ্রীএইচ. এম. প্যাটেল—	
সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন	৩১৬
শ্রীএন. পদ্মনাভন—	
লঘুরক্তচাপীয় বৈদ্যুতিক ট্রেণ	৬৫৪
অধ্যাপক শ্রীএস. কে. ভট্টাচার্য—	
ভারতে সমবায় ব্যাঙ্কিং	৭১৬
শ্রীএ. কে. সরণ—	
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাক্ষার গুরুত্ব	৩৫৮
শ্রীএল. কে. ওঝা—	
ভারতে বস্ত্রশিল্প শিল্পের উন্নয়ন	৪৫৫
ডাঃ এ. আল্লাডোরাই—	
কমনওয়েলথ্ ও উহার ভবিষ্যৎ	৫২৪
ও	
শ্রী ওয়াই. এন. সুখতঙ্কার—	
জাতীয় পরিকল্পনার দায়িত্ব	১৯৪
ক	
অধ্যাপক শ্রীকস্তুরচাঁদ লালওয়ানী—	
১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধন আইন	১৯
ভারতে অর্থনৈতিক যোজনার ভবিষ্যৎ	৪০৯
শ্রীকৃপানন্দ কৃপ—	
ভারত পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি	৬৮
কুমারেশ ঘোষ—	
সেলস্‌ম্যান কে ?	১৪০
সেলস্ ম্যানের জ্ঞান	১৮৯, ২৬০
ডাঃ কে. এন. রাজ—	১
ভূমিসংস্কারের প্রয়োজন কেন	৬৫২
শ্রীকে. ডি. মালবা—	
ভারতে ১৯৫৬ সালে খনিজ উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি	৬২৭
খ	
শ্রীখান্ডুভাই দেশাই—	
শ্রমিকদের প্রতি সুবিচার	৪০
গ	
শ্রীগাই উইণ্ট—	
কলম্বো প্ল্যানের কারিগরী প্রচেষ্টা	৫৭৪
শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য—	
ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের মূলধন সমস্যা	৭১১
চ	
শ্রীচা-কর	
ভারতের চা-ফসলের বহিঃবাণিজ্য	৭১

লেখক ও বিষয়ের নাম — পৃষ্ঠা

ক

শ্রীজেমস সায়ন্ত্রিক—
এক-চতুর্থাংশ কৃষ্ণপৃষ্ঠ নীরস ৫০

শ্রীজন কিংসলি—
১৯৭১ সাল বৃটেনের একটী উল্লেখযোগ্য আর্থিক বৎসর ৭১৯

শ্রীজি. কুরিলেন্‌কো—
১৯৫৩ সালের পূর্বে রুশ-ভারত বাণিজ্য ৫১৮

ত

শ্রী ডি কে. শ্রীনিবাসাচার—
ষষ্ঠী উপত্যকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ৭০৯

ত

তথাগত—
নাবাজী কি বলেন ৩৩

তথ্যান্বেষী—
র্থিক দিক্‌দর্শন ১৪৮, ১৬৭, ২৭৩, ৩২২, ৩৮৭, ৪৭৮, ৭২২, ৭৪৪

দ

শ্রীদামোদর দত্ত—
াতের বাসস্থান সমস্যা ৫১৩

ন

শ্রীনির্মল বসু—
াল্স কমিশনের রিপোর্ট ৬০২

ডাঃ নগেন্দ্র সিংহ—
াতের বাণিজ্য জাহাজ ৪৪৬

প

ারেশনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীর সেনগুপ্ত—
কারবার আইন ও আয়কর আইনে মূলধনের প্রদায়তা ২৮
য়তন ও কুটীরশিল্পের আর্থিক যৌক্তিকতা ১৮০
খানার উৎপাদনের কার্যকাল ২৫০
কারবার আইনের রদবদল ৬২১
তীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমদানী রপ্তানী প্রসঙ্গ ৬৮৭
পরিচালন প্রসঙ্গ ৪২০
াদনশীলতা ৫৩৬

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্রেয়—
াস্পৃহা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৫২৮
ত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় নির্ধারণে কয়েকটি সমস্যা ১১৩

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—
দের উপর পূজাপার্বণের প্রভাব ৫১৬
াগতে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা ৫৬৬

লেখক ও বিষয়ের নাম — পৃষ্ঠা

শ্রমিকদের কাজে অনুপস্থিতি ৬৮
তত্ত্বাবধায়কদের শিক্ষা ৪১

শ্রীপিতাম্বর পন্থ—
পরনার জনমানের পুনরুদ্ধার ১০

শ্রীপ্রফুল্ল বসু—
ভারতে সিমেন্ট শিল্পের অগ্রগতি ৩৭

শ্রী পি. সি. মুখার্জী—
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সার্থক রূপায়নে রেলওয়ের প্রস্তুতি ১৮

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী—
পল্লী পরিক্রমা ২৯

শ্রীপি. এস. লোকনাথন—
আমাদের কর ব্যবস্থা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা ৪২

শ্রীপি. সি. ভট্টাচার্য—
রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ ৪৯

ফ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
অভাবের কারণ ২০

ব

শ্রীব্রজবল্লভ রায়—
স্বয়ংক্রিয়করণ ও আধুনিক শিল্পসমস্যা ৪
ভারতে আঞ্চলিক শিল্পনগর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে ২০
আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও ভারতীয় শিল্পকেন্দ্র নির্বাচন সমস্যা ৪৫

বিশেষ পর্যবেক্ষক—
ভারতের মুদ্রাস্ফীতির গতিপ্রকৃতি ৫৪

শ্রীবি. কে. দত্ত—
ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা ৪৭

বিরূপাক্ষের অর্থনীতি—
১৯৫৭ সাল ৬৭

বি. আর. বিশ্বাস—
ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পরিবর্তনশীল গতিপ্রকৃতি ৪৭

ভ

শ্রীভি. কে. আর. ভি. রাও—
সাধারণ লোক ও বর্তমান বৎসরের বাজেট ২৩
য়্যাডাম স্মিথের ওয়েলথ অব নেশনস্ ৪৯

শ্রীভি. সেখন্ত এম. এস. সি. (অর্থনীতি)—
সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে ২৪

ম

অধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্রকুমার মজুমদার—
বাংলা পরিভাষা ৪৩৯, ৫৭৮, ৬৩০, ৫৩৯, ৭৩

লেখক ও বিষয়ের নাম পৃষ্ঠা

শ্রীমণুভাই দেশাই—
ভারতে শিল্পায়ণের সূত্রপাত ৭৪৮

শ্রীমানস সেন—
রেশম শিল্পী-সংঘ ৭৪৯

মোল্লা নাসিরুল হক—
তাঁতশিল্পের ক্রমবিকাশ ৪৮১

র

শ্রীরণজিৎ বসু—
চীনের মূলধন সমস্যা ও সঞ্চয় ৪৩২

শ্রীরাজা গোপালাচারী—
বাতিল বাঁধা পরিকল্পনা ৫৩১

শ

অধ্যাপক শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়—
বর্তমান বাজেটে মূলধন লাভকর, সম্পদকর ও ব্যয়কর ২৪২

শ্রীশচীন চৌধুরী—
সাম্যের পথে ৩৪৫

স

শ্রীসতীশচন্দ্র দে—
নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা ২৫

শ্রীসুধেন্দুবিকাশ দে—
আমাদের নয়া পয়সা ৫২
রপ্তানীবীমা সংস্থা ৫৫৭
দ্বিতীয় অর্থ কমিশন ও সরকারী রাজস্ব বণ্টন ৭০৬
সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধি ৩৯০
ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কট ৫০৪

শ্রীসুবলকুমার চক্রবর্তী—
ভারতের রেল ইঞ্জিন নির্মাণ প্রসঙ্গে ৫৭৩

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন—
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ও উহার গুরুত্ব ৬১৯

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়—
ভারতের শিল্পনীতি ও বেসরকারী মূলধন নিয়োগ ৬১৫
বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকের উপর জলবায়ুর প্রভাব ৭২৬

শ্রীসুদিনকুমার ভট্টাচার্য—
প্রস্তাবিত জাহাজ নির্মাণ কারখানার স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গ ৪২০

জ্ঞ

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ—
সম্পদ ও সম্ভাতা ১০৯

ক্ষ

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ—
রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অ আ ক খ ৬৫, ৩১২, ৩৬৫

লেখক ও বিষয়ের নাম পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ও বিবিধ

আমাদের অগ্রগতির আর একটি পদক্ষেপ ৯
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার আলোচনা
কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের অগ্রগতি
ভারতের বহির্বাণিজ্য
টাকার বাজার ও চলতি মুদ্রা
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও ক্রেতাস্বার্থ
রাজনৈতিক পরিবেশ
ভারত ও সেচ সম্পদের পরিমাণ ও পরিকল্পনার কর্মসূচী ৩৮
অয়েল প্রেসার ল্যাম্প প্রস্তুত শিল্প ৭৬
ষেল্টিং শিল্প ৭৭
গ্রন্থ পরিচয় ১৯, ১৫০, ২১২, ৩২৬ ৩৯৮, ৬৬৪, ৫৪১
ক্ষুদ্র বীজ থেকে বনস্পতি—
ক্যালকাটা কেমিক্যালের ইতিবৃত্ত ৮৩
লালতামামি ১০১
এবারের বাজেট ১০৯
দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও বেসরকারী ক্ষেত্র ১০৪
চিনি রপ্তানী ১১২
আর্থিক সংবাদ ১৫২, ২১৪, ২৭৫, ৩২৭, ৩৮০ ৩৮৯, ৬৬২, ৭২৪, ৭৪৮
ছোট করলাখনি সমূহের একত্রীকরণ ১৫৪
সমাজতান্ত্রিক বাজারের কথা ১৬৩
দুর্ভিক্ষ না খাদ্য সংকট ১৬৫
তাঁতশিল্প ও ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ১৬৬
পশ্চিমবঙ্গের কলেজী শিক্ষা ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আসন্ন নির্বাচন ১৭১
সোবিয়েতের ১৯৫৭ সালের রাষ্ট্রীয় বাজেট ২০০
শিল্প-বাণিজ্য জগৎ ২১০, ৩৭৪
বর্তমান বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্য ২১৫
পশ্চিমবঙ্গের বাজেট ২১৭
শিক্ষার অবনতি ও তাহার সংস্কার সাধনে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ২১৮
বাজেট বরণ ২২০
পরিকল্পনার অগ্রগতির আর একটি বৎসর ২৮৭
সমাজতন্ত্র ও করনীতি ২৮৮
শিক্ষা ও বৈদেশিক মুদ্রা ২৯১
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি ২৯৭
পশ্চিমবঙ্গে রেশম শিল্পের উন্নয়ন ৩০১
ভারতের কুটির শিল্পের অগ্রগতি — ১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাব ৩০২
তাঁতবস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি ৩০৪

বর্ষসূচী

লেখক ও বিষয়ের নাম	পৃষ্ঠা
ষের পূর্বাভাস	৩০৬
রকর অব্যাহতি হ্রাসের ব্যাখ্যা	৩০৭
ন ও নির্মাণমূলক ক্রিয়াকাণ্ড সমূহের পরিচালনায় অধিকতর সংগঠনিক উন্নতি	৩০৯
রিচালনা শিক্ষা ব্যবস্থার নূতন পরিকল্পনা	৩২০
ইভাষা	৫৪৫
র সংকট না—গোড়ার গলদ	৫৪৭
মিক পদ্ধতির ওজন ও পরিমাপ	৫৫০
ানী উন্নয়ন	৫৫২
কল্পনার মর্মকথা	৫৫৩
রতের হস্তশিল্প	৫৫৬
মাদর উপত্যকার আর একটি অধ্যায়—মাইথন বাঁধের রূপায়ন	৫৬১
রতের ক্ষুদ্রশিল্প	৫৬৯
কাস্লোভাকিয়ার চাষীদের সমাজ বীমা	৫৮০
৫০-৫৫ সালে ভারতে যৌথ কোম্পানীর অগ্রগতি	৫৮৪
র্জাতিক শ্রমসংস্থা	৫৮৭
ক-মালিক সম্পর্ক	৫৯১
শিল্প বাণিজ্য জগৎ ৫৯৪, ৬৫৭, ৭৫০	
নিম কমিশন ও আর ঘন্টন ব্যবস্থা	৬১১
কমিটির রিপোর্ট	৬১৪
ন বীমা কর্পোরেশন	৬১৫
তীয় পুঁজিবাজার ও বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট	৬১৮
য়া ও দূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন	৬২৫
লস্থ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট	৬৩৫
াধারণ আইন—৪৮০	৬৪৮
ণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতি	৬৫০
ল প্রেসার ল্যাম্পশিল্পের সংরক্ষণ প্রত্যাহৃত	৬৬১
ন্তাল রবার ম্যানুফ্যাকচার্স লিমিটেড	৬৬১
তিস দিবস	৬৭৫
ষ ১৯৫৭ সাল	৬৭৫
ভাষা বনাম রাষ্ট্রভাষা বনাম ইংরাজীভাষা	৬৭৯
ল ভারত বাণিজ্য সম্মেলন	৬৮০
কল্পনা অতিরিক্ত উচ্চশাস্ত্রক পরিকল্পনা কমিশনের স্মারকলিপি	৬৮১
তের চিনি রপ্তানী ও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন	৬৮৩
স্থানে মরুর অগ্রগতি রোধ	৬৯৩
র পরিকল্পনা রূপায়নে অসুবিধা—কলম্বো পরিকল্পনার রিপোর্ট	৬৯৪

লেখক ও বিষয়ের নাম	পৃ
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম—কুঞ্জরু কমিটির সুপারিশ	৮৯
ইংরেজী কমিটির রিপোর্ট	৯৮
জীবন বীমা ও লক্ষ্মী	৭২
যৌথ কোম্পানী প্রসঙ্গ	৭২
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একশত বৎসর	৩৩
স্বাধীনতার দশটি বৎসর	৩৩
পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি	৩৩
প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের বিবরণী	৩৪
দেশবিদেশের মুক্ত উৎসব	৩৭
ভারতের পেন্সিল শিল্প	৩৮
বাঙালীর উৎসবের অর্থনীতি	৩৯
পরিকল্পনার সংশোধন	৫
আমাদের রাষ্ট্রচিন্তা	৫
১৯৫৮-৫৭ সালে ভারতের আর্থিক অবস্থা	৪০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বিবরণী	৪০
সুপরিচালিত বিপণন ব্যবস্থা	৪১
খনিজ তৈলের সন্ধানে	৪২
ভারতে কৃষি উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি	৪৪
শিল্পায়নের পথে ভারত	৪৪
দশ বছরে ভারতীয় রেলওয়ের অগ্রগতি	৪৪
কমলাকান্তের দপ্তর (নূতন সংস্করণ)	৪৫
কর্তা-গিন্নী সংবাদ	৪৫
দশমিক পদ্ধতির বাটখারা	৪৫
পরিকল্পনায় ভারত-মার্কিন সহযোগিতা	৪৬
বুলগেরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বল্প সঞ্চয়ের অবদান	৪৬
মহার্ঘ ভাতার ইতিকথা	৪৬
জনসাধারণ ও জীবন বীমা	৪৭
সম্পাদকের	৪৮
ব্যাঙ্ক ধর্মঘট—তাহার সূচনা ও অবসান	৪০
শিক্ষা-মজুরী কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে	৫১
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা—পর্যবেক্ষক	৫৩
১৯৫৭ সালে জীবন বীমার অগ্রগতি	৭২
খাদ্য পরিসংখ্যান কতটা নির্ভরযোগ্য	৭২
সোনারপুর আরাপাঁচ জলনিকাশ পরিকল্পনা	৭৩
আন্দামানের সবুজ সম্পদ	৭৩
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অভিযান	৭৪
ভারতের হস্তচালিত তাঁত শিল্প	৭৪
বিভিন্ন রাজ্যের তাঁতের কাপড়	৭৪
কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য প্রসঙ্গ	৭৫
আমাদের বর্ষশেষ	৭২

কাউতিতে

দুনিয়ার সেরা সাইকেল

প্রতি দিন প্রতি রাত্রে মিনিটে দুটিরও বেশী র‍্যালে-র সাইকেল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও বিক্রি হয়। তার মধ্যে আবার সব চেয়ে কদর পায় র‍্যালে আর রবিনহুড — কেননা দেখতেও সুন্দর, চড়তেও আরাম আর চালু রাখতেও খরচ কম।

র‍্যালে রবিনহুড

SAC-48 BEN

REGISTERED No. C 3462

আদর্শ পথ্য, পানীয় ও খাদ্য

লিলি বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা] চৈত্র • ১৩৬৪ [মার্চ-এপ্রিল • ১৯৫৮

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

ভারতে সর্বাধিক
বিক্রয়ের গৌরব অর্জন
করেছে

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

লক্ষ্মী ঘি'য়ে
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥

বলার মত কাহিনী

আমাদের কথা পাঁচজনকে বল্‌বার মতই। দেশের শিল্পোন্নতির ইতিহাসে আমরা একটা বিশেষ অধ্যায় জুড়ে আছি। ১৯৪৬ সালে আমাদের কারখানা থেকেই ভারতের রিং স্পিনিং ফ্রেম তৈরী হয়। তারপর আরও অনেক প্রথম তৈরীর কৃতিত্ব আমরা অর্জন করেছি—যেমন, ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার ও ওয়াটার টিউব বয়লার। রূপায় বাঁধে ভারতের কয়েকটী বৃহত্তম আকারের স্লুইস গেট তৈরি করেছি আমরাই। হীরাকুদ বাঁধের বিরাট বিরাট পাইপগুলিও আমরাই জুগিয়েছি। ভারতের রেলপথের জন্য নানারকম পরিবহন সরঞ্জাম ও লোকোমোটিভ বয়লার আমরা তৈরী করে থাকি। সিদ্ধিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক যন্ত্রপাতি তাও তৈরি করেছি আমরা। চিনি ও পাট শিল্পের জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি আমরা তৈরী করতে সুরু করেছি। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের জন্য বিভিন্ন উপকরণাদি আমাদের কারখানায় তৈরী হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ও পৃথিবীর সেরা কলাকৌশলের সহযোগিতায় আমাদের প্রত্যেকটী যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। এইভাবে ভারতের মৌলশিল্পের সহায়তায় টেক্সমাকো নিয়োজিত আছে।

টেক্সটাইল মেশিনারী কর্পোরেশন লিমিটেড

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অবস্থায় রোগের প্রকোপে শরীর ও রক্তের পরিচয় হয়, রক্ত এমনভাবে অপবিত্র হয়ে পড়ে। তাই রক্তের প্রকোপের প্রথম উপায়ের বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিভিন্ন জটিল ব্যাধির আক্রমণে জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে।

সারিবাদ্দি সালসা প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ভারতের সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদ্দি সালসা সেবনে বিভিন্ন ফোঁড় পরিষ্কার হয়, ঘোর, পাঁচড়া, হুই ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত জটিল রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, শিরায়ের জিয়া স্বাভাবিক হয়, মুখশ্রী ফুটে পড়ে এবং শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ তাজা রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদ্দি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধি

স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ঘোষ, এম্‌এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এফ-সি-এস (আমেরিকা), ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ বঙ্গবাসী কলেজ অব মেডিসিন।

কলিকাতা অফিস—কবিরাজ রাধাগোবিন্দ ঘোষ, এম্‌-বি (লণ্ডন), আয়ুর্বেদ-আচার্য। ৩৯৷৪, মেছুয়াবাজার-ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

ঢাকা ও মফঃস্বলে-সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান

মাসিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক

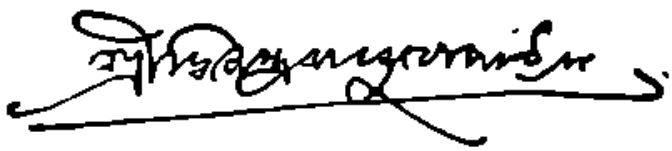

চৈত্র : ১৩৬৪
মার্চ—এপ্রিল : ১৯৫৮

কার্য্যালয় :
২ প্রাইভেট রোড, [illegible], কলিকাতা-২৮
সিটি অফিস
১০২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯

এই সংখ্যার মূল্য বারো আনা

২৭৬ কোটি টাকা

বীমা জগতে এক নূতন অধ্যায়

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন ১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষে ২৭৬ কোটি টাকার ব্যবসা ক'রে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ১৯৫৬ সালে, ব্যক্তি স্বার্থে পরিচালিত বীমা ক্ষেত্র যখন সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেছিল তখন তাদের ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২৩৮ কোটি টাকা! সুতরাং তুলনা করলেই দেখা যায় এই উন্নতি কত কৃতিত্বের।

গত বছরের মাঝামাঝি কর্পোরেশন ২৫০ কোটি টাকা বীমার পরিকল্পনা করেছিল। সে লক্ষ্য তারা ২৭৬ কোটি টাকার বীমা করে অনায়াসেই অতিক্রম করেছে।

সামাজিক এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার উপায় হিসাবে জীবন বীমার জনপ্রিয়তা কর্পোরেশনের এই অসামান্য সাফল্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সত্যিই ৮,০০,০০০ নতুন পলিসি জীবন বীমার জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

কেন্দ্রীয় অফিস: "জীবন কেন্দ্র" জামসেদজী টাটা রোড, বোম্বাই ১

ASP/LIC-27

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা] সূচীপত্র [চৈত্র, ১৩৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাল-তামামি	৮৩
পথে ও পথের প্রান্তে—পথিক	৮৪
হিন্দুযুগে বাঙ্গালীর জীবন যাত্রা	৮৯
অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র—অধ্যাপক কস্তুরচাঁদ লালওয়ানী	৯১
মূল্যবৃদ্ধি সমস্যা—অধ্যাপক শ্রীহিমাংশু রায়	৯৩
দুইটি পরিকল্পনা—শ্রীঅচলকুমার ভট্টাচার্য	৯৫
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কেন্দ্রীয় সরকার—শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত	৯৬
জাতীয় কল্যাণে ট্রেড ইউনিয়নের দান—স্যামুয়েল ওয়াটসন	৯৯
যান্ত্রিক পরিবর্তন ও শ্রমিকদের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া—জন ওয়াল্টন	১০০

We have pleasure to announce that a telephone has been installed in our office at 2, Private Road, Dum Dum, Calcutta-28 and the number is 57-2288

ভারতে জীবন বীমার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি	১০২
পরিভাষা সমস্যা—অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয় জীবন বসু	১০৩
কুটীরশিল্প ও সমবায়—শ্রীগোপাল চক্রবর্তী	১০৫
বাংলা পরিভাষা—অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রকুমার মজুমদার	১০৯
প্রাচীন ভারতীয়গণের সোবিয়েৎ বংশধর—এ, পেরলিম	১১১
ভারতে মেষ ও পশম উন্নয়ন	১১৩
শিল্পোন্নত রুমানিয়া	১১৫
কৃষি-শিল্প বাণিজ্য প্রসঙ্গ	১১৬
অর্থনৈতিক সমাজে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব	১২৩
আর্থিক সংবাদ	১২৪
জাতীয় দিনপঞ্জী	১২৮

সৌন্দর্য্যে ও সংরক্ষণে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট য়্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা : আসানসোল : শিলিগুড়ি : মাদ্রাজ

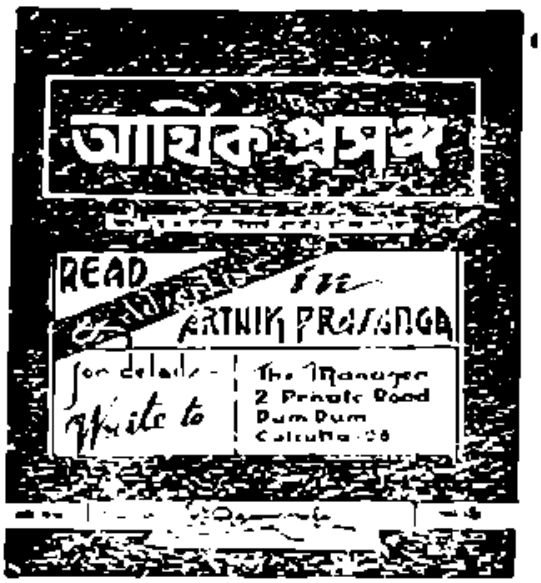

বার্ষিক চাঁদা— ৯৲ টাকা
ষাণ্মাসিক চাঁদা—৪৷৷০ "
ছাত্রদের জন্য :—
বার্ষিক—৭৷৷০ ষাণ্মাসিক—৪৲ টাকা
এই সংখ্যার মূল্য—বারো আনা

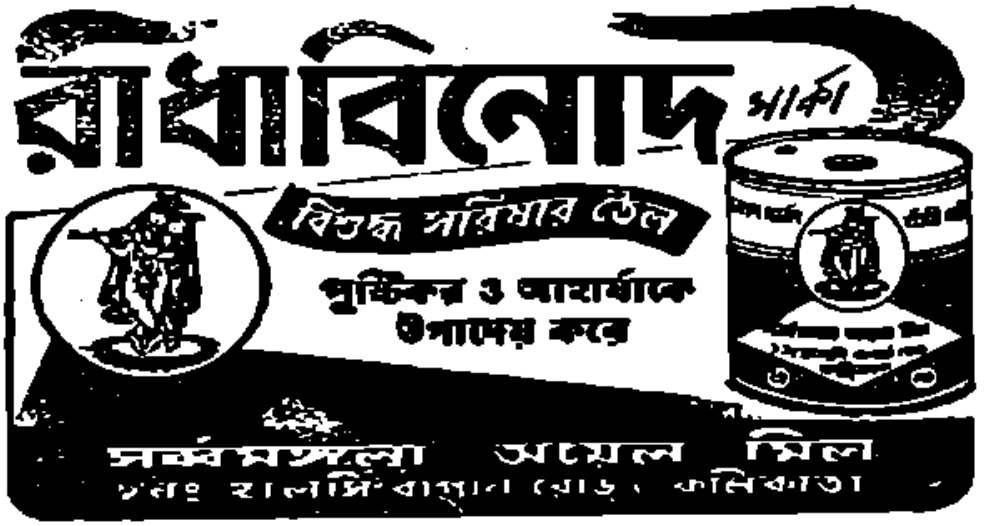

ভূমি থেকে

আরও বেশী খাদ্য শস্য

আহরণ করুন

জাতির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় অন্ততঃপক্ষে আরও এক কোটি ৫৫ লক্ষ টন বেশী খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে। বার বার চাষ করে, বেশী সার ব্যবহার করে, উন্নততর কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন করে, ভালো বীজ ও জলসেচের ব্যবস্থা করে, এই লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে।

পরিকল্পনা

সফল করে তুলুন

প্রগতির জন্য সমৃদ্ধির জন্য

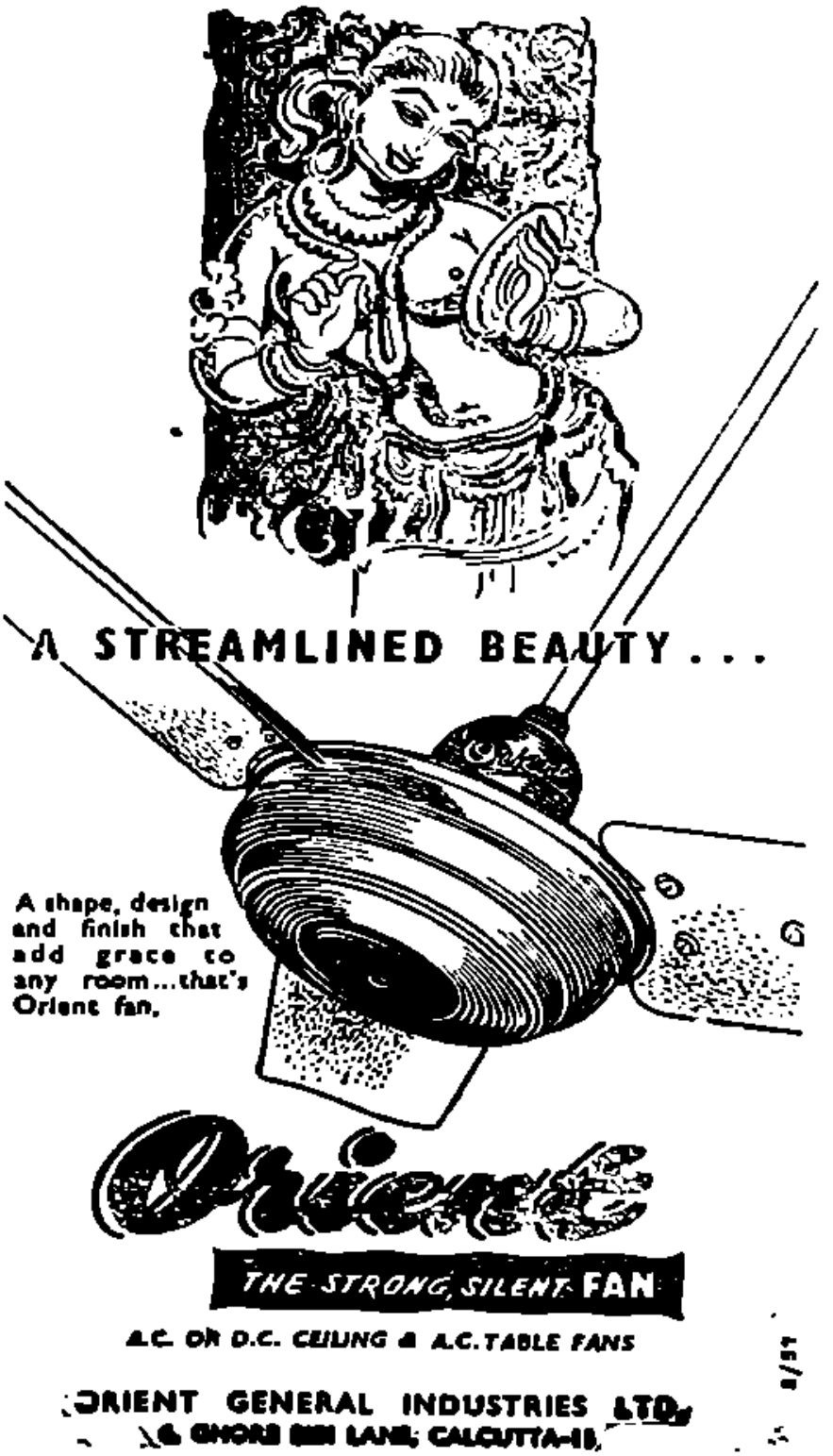
A STREAMLINED BEAUTY . . .
A shape, design and finish that add grace to any room...that's Orient fan.
Orient
THE STRONG, SILENT FAN
A.C. OR D.C. CEILING & A.C. TABLE FANS
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
6 GHORE BIBI LANE, CALCUTTA-13.

মাসিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩৬৪

সাল-তামামি

সৌর জগৎ পরিক্রমায় আমাদের পৃথিবী আর একটী বৎসরের প্রদক্ষিণ শেষ করিল। পৃথিবী নিজের গতিতে যে পরিক্রমার সমাপ্তি করিয়াছে, পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর মাটিতে বাস করিয়াও তাহা টের পায় নাই। শুধু গণনার হিসাব করিয়া চলিয়াছে মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি ক্ষুদ্র অংশে ও ভগ্নাংশে। মানুষ অনন্তকালের কাল সমুদ্রে এই সব ভগ্নাংশের বৈচিত্র্যের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব, বৎসরান্তের পরিবর্তন, মানবজীবনের ছোট-বড় দুঃখ-সুখ, স্মৃতি-বিস্মৃতির অনুভূতি। পৃথিবীর অনন্তকালের পরিভ্রমণে মানুষের জীবনে বর্ষ-বর্ষান্তের পরিবর্তন কি তুচ্ছ দাগ রাখিয়া যাইবে, বিরাট কাল সমুদ্রে কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঊর্মিমালার সৃষ্টি করিবে, তাহার প্রতিক্রিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোন স্বাক্ষর রাখিবে কিনা, জানি না। তবুও প্রতি বৎসরের সমাপ্তির পর নব-বৎসরের উদয় প্রান্তে মানুষের ক্লান্ত ক্লিষ্ট জীবনে প্রতিবার নূতন করিয়া হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষ আশাবাদী; কোনক্রমেই নিজেকে সে নিষ্পৃহ নিষ্ক্রিয় করিতে পারে না ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির সম্ভাবনায় বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলি হইতে। তাই প্রতিদিনই সে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া চলে তাহার ভবিষ্যতের অনাগত দিনগুলির কর্মসূচী। আর বর্ষশেষে সে হিসাব করিতে ব্যস্ত হয় তাহার অতীতে ফেলিয়া আসা দিনগুলির সার্থকতা ও বিফলতার। ব্যক্তিগত জীবনের মতই প্রতি মানুষের জন্মদিনে তাহার অতীতের একটা সামগ্রিক চিত্র তাহাকে আনন্দ-উচ্ছল করিয়া তোলে, সার্থকতার পরিতৃপ্তিতে; তেমনি কখনও বা বেদনা-বিহ্বল করিয়া তোলে ব্যর্থতার স্মৃতিতে।

জাতির জীবনের সামগ্রিক ঘটনাও মানুষের জীবনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে প্রভাবিত করে। আমরা বাঙালী। দীর্ঘ একটি বৎসরের সংগ্রাম-ক্লিষ্ট যাত্রাপথে আমাদের পথের পাঁচালীতে কত কথা, কত গাঁথা ও কাহিনী জাতির জীবনের মালো একটি একটি করিয়া গ্রথিত হইয়াছে তাহাই আবেগ বিহ্বল চিত্তে পর্যালোচনা করি বর্ষশেষের সাল-তামামিতে।

কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে এই একটি বৎসরে; তাহা আজ ভাবিতে ভাবিতে মনে হয় যে, জাতির জীবনে যাহা নিতান্ত সত্য, মানুষের জীবনে যাহা সামান্য প্রত্যাশা, একান্ত কাম্য, সামগ্রিক জীবনে যাহা সর্বাঙ্গীন আকাঙ্ক্ষা—মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, মনুষ্যত্বের মহৎ মর্যাদা, নিরাশ্রয়ের সামান্যতম অবলম্বন, ধরণীর এক কোণে এতটুকু আশা, একটুকু বাসা, শুধু একটুকু ভালবাসা—বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সবচেয়ে বড় কথা—তাহাও বুঝি দূরেই রহিয়া গেল!

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কত আড়ম্বর, চারিদিকে কত উৎপাদন, কত উদ্যোগের কত প্রলাপ, কত আশার অঙ্গীকার, কত আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি—নববর্ষের প্রথম দিনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, আজ বর্ষশেষে তাহার হিসাব-নিকাশ করিতে গিয়া দেখিতেছি মানুষের দুঃখময় জীবন দুর্দশার ক্ষত-চিহ্ন লাঞ্ছিত। জীবনযাত্রার সহজলভ্য উপকরণ আজ মানুষে শতচেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। দুই বেলার দুই মুষ্টি অন্ন ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। পথের ভিখারী

ভিক্ষা-বৃত্তিতে ক্লান্ত ও অবসন্ন। প্রাসাদের মানুষ আজও তেমনি ধনাঢ্যের মত্ততায় মাতাল হইয়া উঠিতেছে, অভিপরিচিত অবস্থায় মানুষকে হেয় করিতেছে; রাজদ্বারে, রাজসভায় সাধারণ মানুষ তেমনি অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনীতিক মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় তেমনি উদাসীন; যে মানুষ শতাব্দীর রাজনৈতিক পরাধীনতার পর অর্থনৈতিক বন্ধন মুক্তির প্রত্যাশায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিল, সে আজও তেমনি অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া চলিয়াছে, অনাগত ভবিষ্যতে অনিশ্চিত সম্ভাবনার দিকে আজও চাহিয়া আছে, মানুষের মর্যাদা কোন দিন পাইবে কি না!

"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো মহাপাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহা প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয় তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীনপ্রতিকার হীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

"অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

এত দুঃখ সুখের মধ্যে সাধারণ মানুষ আজও বাঁচিয়া আছে যে আজিকার অমারাত্রির দুর্গতোরণ একদিন ধরণীর ধূলিতলে কালের নিষ্ঠুর করস্পর্শে ধূলিসাৎ হবে। হয়তো একদিন মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে মানব অভ্যুদয়ের রোমাঞ্চ দিকে দিকে মানুষের বিশ্বাসের মহৎ মর্যাদার সত্য আলোকের বাণী বহিয়া আনিবে। সেই পরম আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ আজও বলিতেছে, "We shall sing, sweetness, to the last palpitations of the evening and the breeze."

বৎসরের শেষ দিনে পুনরাবৃত্তি করিতেছি—মানুষের যেন সুদিন আসে। বৎসরের শেষ দিনে একান্তমনে প্রার্থনা করি চিরলাঞ্ছিত মানুষের দুঃখদিনের তমসার যেন অবসান হয়; পথের মানুষ যেন মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পায়, যেন আশ্রয়হারা না হইয়া মৃত্যুর দিকে পরিচালিত না হয়। নিভৃত অন্তরালের মানুষটিও যেন কক্ষচ্যুত হইয়া দুয়ার বাহিরে আসিয়া পথের ভিখারী না হয়। উপরের তলার মানুষ নীচের তলার লোকটিকে অবহেলা উপেক্ষাভরে পদ-দলিত না করে। স্নেহ-করুণা, দয়া-মায়া, শ্রদ্ধা-প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধনে মানবসমাজের অন্তর্নিহিত ঐক্যতানের সুরটি আবার যেন বাজিয়া উঠে ঈশ্বরের পরম করুণা ধারায়।

পথে ও পথের প্রান্তে—পথিক

চলার পথে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে সব তথ্য ও সংবাদ কাণে আসে, নজরে পড়ে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী একত্র করিলে আমাদের পরিবেশের শোচনীয় অবস্থা অনুমান করা যায়! আমাদের খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই, বাসস্থানের অভাব। আমাদের পাঁচসালা পরিকল্পনা আছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, জাতীয় আয়ও। আমাদের শাসন আছে, পোষণ আছে, শাসানিও। আমাদের স্কুল-কলেজ আছে, বিদ্যাশিক্ষার বালাই নাই। আমাদের শৃঙ্খলা নাই, সংযম নাই, শালীনতা বাহুল্যমাত্র। আমাদের পথ-পরিক্রমায় চৈত্র মাসে যে কয়টী ঘটনা সংবাদপত্রে ও সমাজের এখানে সেখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহারই পর্যালোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উদ্বাস্তু সমস্যা

উদ্বাস্তু সমস্যা আমাদের স্বাধীনোত্তর কালের অন্যতম জটিল সমস্যা। গত দশ বৎসরে টাকার বস্তা বাহির গেছে এই সমস্যার সমাধানে। কিন্তু সমাপ্তি ঘটে নাই; সুরু হইয়াছে সত্যাগ্রহ আন্দোলন। দিল্লী ও কলিকাতায় বক্তৃতার সাফাই চলিতেছে, সমস্যার সমাধান হইতেছে না। হইবেও না এমনিই অনেকের অভিমত। জনসাধারণ প্রত্যহই দেখিতে পান গড়ের মাঠে চৌরঙ্গীর মোড়ে উদ্বাস্তু লইয়া ডাণ্ডাগুলি খেলা। ইহা যে কি মর্মান্তিক দৃশ্য, জাতীয় চরিত্রে কত বড় কলঙ্ক তাহা বলা যায় না। দেশের লোক দেশের মাটিতে স্থান পায় না, দু'মুঠো অন্ন পায় না, প্রতিবাদের পরিবর্তে পায় শাসানি, লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস ও দণ্ডাজ্ঞা!

পুলিশের ব্যর্থতা

আর একদিকে দেখিতে পাই, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ব্যর্থতা। বিধান সভায় বিরোধী দল পুলিশমন্ত্রী ও আই, জির পদত্যাগ দাবী করিয়াছেন। তাহাদের বড় অভিযোগ যে স্বরাষ্ট্রবিভাগ সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ দমনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন—দেশের সর্বত্র ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যাকাণ্ড দিনদুপুরে যেভাবে সংঘটিত হইতেছে এবং তাহার তদন্ত যেভাবে বেমালুম চাপা পড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে দেশবাসীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ নাই। বিংশশতাব্দীর শেষ ভাগে সভ্য-নাগরিক জীবনের এমনি অবস্থা ও অশান্তিকর কার্য-কলাপ সত্যই দুর্বিষহ।

মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

ইহারই পরবর্তী ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের অভিযোগ ও বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাব। কয়েকদিন ধরিয়া বিধানসভা ভবনে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে হৈ-হুল্লোড় করিলেন, তাহা পার্লামেন্টারই পন্থা-সম্মত কিনা তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ নাই। রাজনীতিক হিসাবে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় সঙ্গত কাজ করিয়াছেন কিনা তাহা রাজনীতিজ্ঞের বিচার্য। বিরোধীদল যে অনাস্থা প্রস্তাব খাদ্য ও পুলিশমন্ত্রীর সম্পর্কে দাখী করিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য বিচারের সুযোগও নাই! তবে বাংলাদেশের লোকচক্ষুর সম্মুখে খাদ্য ও পুলিশমন্ত্রীর কার্যকলাপ যেভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে আত্মসম্মান জ্ঞান থাকিলে কোন বালকও মন্ত্রীত্ব আঁকড়াইয়া ঝুলিয়া থাকিত বলিয়া মনে হয় না। ভোটের জোরে দলীয় ক্ষমতা বজায় রাখা যায়, মন্ত্রীও থাকা যায়, কিন্তু মর্যাদা ও সম্মান দেশবাসীর কাছে অটুট থাকে না। ভারতবর্ষে সম্মান রক্ষার দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নহে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীও পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণমাচারীও দলীয় ক্ষমতার সুযোগ না লইয়া পদত্যাগের সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন। বাংলাদেশে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত না হইলেও মন্ত্রীসভার রদবদল অসম্ভব ছিল না; অবাঞ্ছিত তো নয়ই।

খাদ্য অবস্থা

খাদ্য উৎপাদনে অসামর্থ্য এবং খাদ্য পরিকল্পনার কাজে বিভিন্নক্ষেত্রে গলদ আজ সর্বত্রই আলোচনার বিষয়। ডি. ভি. সির কাজে দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব, বাঁধের জল ব্যবহার না হওয়া, বিভিন্ন দপ্তর ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ও খাদ্যনীতিতে টালবাহানা এমনি সব অব্যবস্থার অভিযোগ খাদ্য-ব্যবস্থার জটিলতা নির্দেশ করিতেছে। প্রতিদিন খাদ্য উৎপাদনের সার্থকতা সম্পর্কে ছদ্ম-বদ্ধ বাণী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খাদ্য যদি দুর্মূল্য ও দুর্লভ বস্তু হইয়া দাঁড়ায় তবে সংবাদ পত্রের বাণী পড়িয়া দেশবাসীর যে পেট ভরিবে না, ইহার চেয়ে সত্যকথা আর কি হইতে পারে! খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটির সভাপতি শ্রীঅশোক মেহতা অতি দুঃখে খাদ্য আমদানী করিতে বলিয়াছেন।

সরকারী ভাষা

কিছুদিন যাবৎ সরকারী ভাষা কি হইবে তাহা লইয়া বাগবিতণ্ডা হইতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত ঘটিয়া গিয়াছে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নাই। হিন্দী যে রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যসরকারের প্রয়োজনে কি ভাষা গৃহীত হইবে তাহা বিধান সভায় আলোচিত হইয়াছে। (অবশ্য) স্থির হইয়াছে যে যতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা স্থির না হয়, ততদিন ইংরাজী ভাষা বলবৎ থাকিবে, তবে ১৯৬০ সালের মধ্যে বাংলা ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হইবে ইহা আনন্দের কথা। সংস্কৃত ভারতের প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃতের স্থান সর্বাগ্রে হওয়া উচিত ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিক হইতে—অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে তদনুযায়ী অনুরোধ করিয়াছেন। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদা লাভের যোগ্য কিনা, সেই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় এই আলোচনা হইয়াছে যে হিন্দী অথবা অপর কয়েকটি ভারতীয় ভাষা উপযুক্তরূপে সমৃদ্ধি লাভ না করা পর্যন্ত কেন্দ্রের সরকারী ভাষারূপে ইংরাজী চালু রাখিতে হইবে।

হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা নাই একথা বলা বাহুল্য। ইহা ভারতের বহু ভাষাভাষী অঞ্চলেই যথার্থ স্থান দখল করিয়া তাহাদের অন্তরে নিজস্ব স্থান অধিকার করিতে পারিবে কিনা তাহা যে কোন লোকই বলিতে পারে। তাই বলিয়া ইংরাজী চিরকালই এদেশের শিক্ষার মাধ্যম তথা উচ্চাঙ্গ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বাহন হইয়া থাকিবে এ ব্যবস্থা যে কাম্য নয়, তাহাও অতি সত্য। প্রসঙ্গতঃ আমরা সৈয়দ মুজতবা আলীর সম্প্রতি প্রকাশিত 'ধূপছায়া' গ্রন্থ হইতে উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া বিতর্কের অবসান করিতে ইচ্ছা করি।

"একথা ঠিক যে, আজই যদি আমরা ইংরাজী বর্জন করি, তবে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হব ; কিন্তু কোন দিনই শিক্ষার মাধ্যমরূপে বর্জন করতে পারব না একথা আমরা বিশ্বাস করিনে।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচ্য দেশের অবস্থা আজ কি ? আরব ভূখণ্ড, বিশেষ করে মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কি দিল্লী কলিকাতার চেয়ে অনেক কম ? মিশরে জ্ঞান চর্চার মাধ্যম আরবী, ইংরাজী না ফরাসী ? অজহর মুসলিম শাস্ত্রালোচনার পীঠস্থল—সেখানে যে আরবী মাধ্যম হবে, তাতে আর কি সন্দেহ। তাই সে দৃষ্টান্ত আর দেব না, কিন্তু য়ুরোপী চঙে নির্মিত বাকী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম তো ফরাসী নয়, ইংরাজীও নয়। কিন্তু তারা দিব্য আরবীর মাধ্যমেই এলোপ্যাথি, য়ুরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারীং শিখছে, তাদের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদন (রিপোর্ট) আরবীতেই বেরয়। বিদেশী অধ্যাপকদের আরবী শিখে সে ভাষাতেই পড়াতে হয়। আজারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম কি ফরাসীস্ ? বা তেহরানে ? এই যে চীনে এত বড় রাজনৈতিক এবং সামাজিক নবজাগরণ হয়েছে সে কি রাশানকে মাধ্যম করে ? না, আজ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশান শিক্ষার মাধ্যম, কিংবা চীনারা তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা রাশান ভাষায় আরম্ভ করে দিয়েছেন ? পণ্ডিতজী তাঁর চিন্তার ফল ইংরাজীতে প্রকাশ করেন, কিন্তু মাওসে-তুঙ রাশানে কেতাব লিখেছেন, একথা তো কখনো শুনিনি। জাপানে শিক্ষার মাধ্যম কি ইংরাজী ? জাপানীদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেরোয় কোন ভাষায় ।"

নরওয়ে হুইতেন তাদের ২৯,৫২ ; ৬৪,২৩ জন ভাষাভাষি নিয়ে আপন আপন ভাষায় দর্শন লেখে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে, ডাক্তারী শেখে, ইঞ্জিনিয়ারিং শেখে এবং আমরা ৬০ হাজার হয়েও

চিরকাল ইংরাজীর দাসা হয়ে থাকব। আমার যতদূর মনে পড়ছে—চীনা, ইংরেজী, রুশীয়, জর্মন এবং স্প্যানিশের পরেই পৃথিবীতে বাংলার স্থান।' মাতৃভাষার প্রচলন সম্পর্কে অকাট্য যুক্তিতর্ক সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন আলীসাহেব তাঁহার এই গ্রন্থটিতে। আমরা শত্রু-মিত্রদের বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

ট্রাম ও বাস ভাড়া

ট্রাম ও বাসের ভাড়া সম্পর্কে যে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তদনুযায়ী ভাড়া বৃদ্ধির নমুনা আমরা নিম্নে দিলাম :—

রুট	বর্তমান ভাড়া	(নয়া পয়সায়) যাহা হওয়া উচিত	যাহা এখন হইবে
বালিগঞ্জ হাজরা মোড়	৭	১০	৮
বালিগঞ্জ-এসপ্লানেড	১৩	১৯	১৬
বালিগঞ্জ-ডালহৌসি	১৬	২২	১৯
রাসবিহারী-এসপ্লানেড	৮	১৩	১০
রাসবিহারী-শ্যামবাজার	১৯	২২	২১
এসপ্লানেড-শ্যামবাজার	১১	১৩	১৩
বেহালা-এসপ্লানেড	১৬	২২	১৯
বেহালা-ডালহৌসি	১৯	২২	২২
সাহাপুর-ডালহৌসি	১৭	২২	১৯
গড়িয়া-ডালহৌসি	২৫	৩১	২৮
যাদবপুর-ডালহৌসি	১৯	২৫	২২
শ্যামবাজার-দক্ষিণেশ্বর	১৪	১৬	১৬

ইতিপূর্বে এক পয়সা ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি লইয়া যেসব কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা এখনও চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। এই ভাড়া বৃদ্ধি সঙ্গত কিনা তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ নাই কেহ বলিবে না। বর্তমান অবস্থায় কলিকাতার নাগরিকগণ দিনগত পাপক্ষয় জীবনযাত্রায় যেরূপ গলদঘর্ম হইতেছেন তাহাতে ভাড়া বৃদ্ধি মোটেই সমীচীন নয়। গতবার ভাড়াবৃদ্ধির দরুণ হাঙ্গামার মীমাংসার জন্য বিচারপতি শ্রী পি. বি. মুখার্জীর নেতৃত্বে যে ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয় নাই; সুতরাং বর্তমান রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া একান্ত কাম্য। প্রকৃত তথ্য উপস্থাপিত করা সরকারের নৈতিক কর্তব্য। গত কয়েক বৎসরে এমন কোন ব্যাপক পরিবর্তন হয় নাই যাহাতে ভাড়াবৃদ্ধির প্রয়োজন হইতে পারে। উপরন্তু প্রকৃত তথ্য গোপন করায় ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এমতাবস্থায় ভাড়া বৃদ্ধি করিলে বিক্ষুব্ধ নাগরিক জীবনে ইন্ধন যোগানো হইবে। উদ্দেশ্য সাধন ব্যর্থ হইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদ

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে শালীনতার শৃঙ্খলা সর্বাংশে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়গুলি আজ আর শিক্ষাকেন্দ্র নহে। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ক্ষেত্রভূমি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। কয়েকদিন পূর্বেও আরামবাগ বিশ্ববিদ্যালয়েও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বর্ধমান জেলার প্রধান শিক্ষক প্রহৃত হইয়াছেন। উত্তর কলিকাতার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা শুধু মর্মান্তিক নহে, আতঙ্কের কথাও বটে। ছাত্রেরাই এই হাঙ্গামায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ চিরকালই হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু গুণ্ডামী কখনই ছাত্রদিগকে পাইয়া বসে নাই। এ বিষয়েও পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ সর্বাপেক্ষা বেশী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে—কি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কি কলেজে সর্বক্ষেত্রেই এমন গাফিলতী, অবহেলা ও অযোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন তাহা বিংশ শতাব্দীতে অসহ্য। কিছুদিন পূর্বে বিদ্যালয় শিক্ষকদের "For veting eligibility" লইয়া

যে আন্দোলন ঘটিয়া গেল তাহা যেমনই ছাত্রদের জনক তেমনি অশোভন। শিক্ষা মন্ত্রী কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রবর্তন করা লইয়া পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলি যখন বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নাটকীয় অভিনয় করিতেছেন, ইহার নমুনা সভ্য জগতে বিরল। রাজনীতি আজ সকলকে পাইয়া বসিয়াছে। বিধান সভা ভবনে নির্বাচিত নেতা রাজনীতি করে স্পীকারের দণ্ড তুলিয়া লইয়া টানাটানি করে। শালীনতা বর্জিত ভাষায় চিৎকার করে, মারামারী করে, ধস্তাধস্তি করে; সেখানে পুলিশের গুপ্তচর বাদ বিশেষ প্রয়োজনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রাজনীতি চলে। ৩৲ টাকার গ্রাজুয়েটদের ভোটের ক্রয়-বিক্রয় হয়। নির্বাচন চলে কৌশলে। অবশিষ্ট প্রার্থীর মনোনয়ন হয় পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ী করিয়া অতীত ভবিষ্যতের হিসাব নিকাশ মিলাইয়া। শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্ণধার পশ্চিমবঙ্গ কলেজের অধ্যক্ষগণ। বিশেষ করিয়া বড় কলেজগুলির। তাহারা ডব্লিউ-বি-সি-এস্‌ কর্তৃপক্ষ। বাহুতঃ অধ্যাপকদের প্রতিনিধি মুখ্যতঃ কলেজের মালিক গোষ্ঠী। ইহারা সভা-সমিতিতে উচ্চাঙ্গের বাণী বিতরণ করেন। ভারতীয় আদর্শ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, দেশের ভবিষ্যৎ, জাতির কল্যাণ, নাগরিকের কর্তব্য, মানুষের মর্যাদা, মনুষ্যত্ব এমনি আরও কত নির্ভুল ব্যাকরণ সম্মত ভাষার ছন্দ ও ছটায় সভাকক্ষ শ্রোতার হাত-তালিতে মুখরিত করিয়া তোলেন। অনাচার অবিচার, দুর্নীতি, দুরাচার ইহাদের চক্ষের বিষ। ডেডিকেশন, স্যাংটিটি, ইনটিগ্রিটি প্রভৃতি মুঠাম শব্দ বিন্যাস ইহাদের কণ্ঠস্থ। এ্যাক্টস্‌ কমিশনের নিকট হিসাব নিকাশের সময় ইহাদের মর্যাদা হানি ঘটে। ইহারাও রাজনীতি করেন। স্কুলের শিক্ষকেরা রাজনীতি করিতে করিতে ছুটপাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। সুতরাং যে দেশে উপরতলা হইতে নীচের তলা পর্যন্ত সর্বত্রই রাজনীতির ছড়াছড়ি সেখানে ছাত্রেরাও সেই রাজনীতি যে অনুকরণ ও অনুসরণ করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে!

• • •

এমনি জীবন দর্শনের পটভূমিকায় আমাদের শাসন ব্যবস্থা, শোষণ সংস্থা কায়েমী কায়দায় গড্ডালিকা প্রবাহে চলিয়াছে। এখানে নীচের তলাকে দোষী করিয়া লাভ নাই, জীবনের উচ্চ স্তরে যদি আদর্শের চ্যুতি ঘটে তবে নিম্নস্তরে কলঙ্কের গভীর পঙ্কিল দেশবাসীকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিবে তাহাতে অনুশোচনা থাকিলেও উদ্ধারের পথ নাই।

• • •

আমাদের এই প্রবন্ধ প্রেসে যাবার পূর্বে যে সংবাদ আমাদের পুলকিত করিল তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা সহরে "নিখিল ভারত ফসলী প্রদর্শনীর" আয়োজন বিস্তৃত সংবাদ নিম্নে দিলাম—সমালোচনার প্রয়োজন নাই। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও অনুসন্ধিৎসুগণ অথবা সংশ্লিষ্টগণ উদ্ভাসিত হইবেন, আশা করি।

কলিকাতায় নিখিল ভারত ফসলী প্রদর্শনী—নয়াদিল্লী ১৫ই এপ্রিল—আগামী ২৬শে এবং ২৭শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় নিখিল ভারত ফসলী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। এখানে ২৪টি বিভিন্ন শ্রেণীর পাকা ফসল এবং তরকারীর উপযোগী ফসল মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে সেগুলির জন্য ২৪টি পুরস্কার দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ঐ পুরস্কার ছাড়াও ১৫০০ টাকা মূল্যে আটটি ট্রফিও দেওয়া হইবে। যে রাজ্য সর্বাধিক সংখ্যক পুরস্কার পাইবে তাহাদের একটি বিশেষ শিল্ড দেওয়া হইবে। আশা করা যাইতেছে যে, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, মহীশূর, মাদ্রাজ, বিহার, বোম্বাই এবং অন্ধ্র প্রদেশ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটারী ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, নয়াদিল্লী—এই ঠিকানাতে বা উদ্যান বিদ্যা বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

দেশবাসীকে নিত্য যাহা প্রকারান্তরে পরোক্ষে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহারই বাস্তব স্বীকৃতির আয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষজ্ঞের সংবাদ, খাদ্যত্রাণমন্ত্রী ইহার উদ্বোধন করিয়া খাদ্য-অবস্থার সঠিক পরিচয় দান করিবেন।

হিন্দুযুগে বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

প্রায় সাতশ বছর আগে মুসলমানেরা বাংলা দেশ অধিকার করে। খুব প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে মুসলমান আক্রমণ পর্যন্ত যে সময় তাকেই হিন্দু যুগ বলা যেতে পারে। এই যুগে বাঙ্গালীর জীবন যাত্রা কি রকম ছিল তার কোন পারাবাহিক বিবরণ আমাদের জানা নেই। এই যুগের শেষ পাঁচশ বছরের বিবরণ আমরা কিছু কিছু জানি। তার সম্বন্ধেই আজ দুচার কথা বলব। যুগে যুগে মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের নিয়মকানুনের অনেক পরিবর্তন হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ কিছু কিছু বদলালেও অনেকটা এক রকমই থাকে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা যে বাঙ্গালাদেশের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত হিন্দুযুগেও তার প্রাকৃতিক সম্পদ একই রকমের ছিল। ফলে তখনও বাংলা দেশের উর্বর মাটিতে পর্যাপ্ত ধান ও অন্যান্য শস্য জন্মাত। নানা ফলের গাছ ছিল। তার মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, ডালিম, খেজুর, বাতাপীনেবু ও মধুকের কথা প্রাচীন লিপিতে বহু উল্লেখ আছে। আখের খেত, পানের বরজ ও সুপারির গাছও সারা দেশে ছিল।

এই সকল ফল ছাড়া বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, মাংস, দুধ ও নানা রকমের শাকসব্জী। হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের লোকেরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ শ্রেণী মাছ মাংস খেতেন না—সে প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা এখনকার মত তখনও মাছ মাংস খেতেন। এজন্য অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের নিন্দা করত। প্রবীণ স্মার্ত পণ্ডিত ভট্টভবদেব রাঢ় দেশী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যে স্মৃতির গ্রন্থ লিখেছেন, তাতে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে কয়েকটি নিষিদ্ধ তিথি বাদ দিয়ে অন্য দিনে মাছ মাংস খাওয়া প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনুমোদিত। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে রোহিত, শকুল, শফর ও সাদা আঁশওয়ালা অন্যান্য মাছ খাওয়ার বিধান আছে। প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত জীমূতবাহন ইলিশ মাছের তৈল উপাদেয় খাদ্য বলে উল্লেখ করেছেন। হিন্দুযুগে বাঙ্গালীরা যে মাছ মাংসের কিরূপ ভক্ত ছিল এই সমুদয় উক্তি থেকে তা বেশ বোঝা যায়। মদ খাওয়া নিন্দার বিষয় ছিল, কিন্তু এই কুঅভ্যাস যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। নানা প্রণালীতে মদ তৈরি হত। প্রতি নগরীতে বহু শুঁড়ীর দোকান ছিল।

পোষাক অনেকটা এখনকার মতই ছিল। পুরুষেরা ধুতি পরত। কিন্তু এখনকার মত কোঁচা ঝুলাত না। খাটো কাপড় মালকোচা করে পরত এবং কোমরবন্ধ দিয়ে তাহা মাঝায় আটকে রাখত। মেয়েরা শাড়ী ও ওড়না পরত। মেয়েদের শাড়ী পা পর্যন্ত ঢাকত কিন্তু কোমরের উপরে উঠত না। বুকে কেউ কেউ চোলী পরত, কিন্তু নাভির উপরের অংশ খোলা রাখায় কোন দোষ ছিল না। ঘাঘরার ধরণের জামা কদাচিত দেখা যেত। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই সর্বাঙ্গে নানা রকমের গহনা পরত। মেয়েরা নানা ছাঁদে চুল বাঁধত। আজ কালকার মতই তাদের দেহ প্রসাধনের অনেক উপকরণ ছিল।

বাংলা দেশে নানা রকমের শিল্প ছিল। এদেশের মসলিন বা সূক্ষ্ম কাপড় পৃথিবীর সব দেশের লোকই আদর করত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাংলা দেশে তৈরি চার রকমের উৎকৃষ্ট কাপড়ের উল্লেখ আছে, ক্ষৌম, দুকূল পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক। এগুলি অনেকটা আজকালকার মট্‌কা, রেশমী ও কাপাস সুতার কাপড়ের মত। মাটির পুতুল ও নানা রকমের তৈজসপত্র, পাথর ও লোহা, তাম্র, পিত্তল প্রভৃতি ধাতুর মূর্তি ও অন্যান্য অনেক রকমের নিত্য ব্যবহারের জিনিষ তৈরি হত। কাঠ, শঙ্খ, হাতীর দাঁত প্রভৃতির উপর সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত আসবাবপত্র এবং মণি রত্ন ও সোণা রূপার

গহনা, তৈজসপত্রও বহু পরিমাণে তৈরি হত। এগুলি বাঙ্গালীরা ব্যবহার করত এবং বিদেশে চালান যেত। বাঙ্গালী বণিকেরা ভারতবর্ষের সব জায়গায় ব্যবসা করত। তা ছাড়া, সমুদ্র পার হয়ে দূর দেশ বিদেশে যেত। চাঁদ সদাগর ও তার মধুকর ডিঙ্গার কাহিনী হয়ত কবির কল্পনা মাত্র। কিন্তু বহু বাঙ্গালী বণিক যে ডিঙ্গার বহর নিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বাংলার পণ্য ও শিল্পদ্রব্য নিয়ে ব্যবসা করত এবং ডিঙ্গা বোঝাই করে বিদেশ থেকে ধন সম্পদ নিয়ে ফিরত তাতে কোন সন্দেহ নাই। খুব প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত, বর্তমান তমলুক বাংলার প্রধান বন্দর ছিল। তার পরে সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও এর স্থান অধিকার করে। এসব বন্দরে বণিকদের কিরূপ ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য ছিল স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বেণের মেয়ে' নামক উপন্যাসে তার একটি উজ্জ্বল চিত্র এঁকে গেছেন।

কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের দৌলতে সাধারণ বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা খুব স্বচ্ছল ছিল। কারও ভাত কাপড়ের অভাব হত না। অনেকেই বিলাসিতায় জীবন কাটাতেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এই স্বচ্ছলতা কিভাবে প্রকাশ পেত চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ইৎসিং তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি তখন তাম্রলিপ্তিতে থাকতেন। একবার তাঁর ইচ্ছা হল কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন যে যত জনকে নিমন্ত্রণ করেন তার চারগুণ লোকের মত আয়োজন করতে হবে। কারণ নিমন্ত্রিতদের পাতে যত বেশি জিনিষ পড়ে থাকবে, নিমন্ত্রণকারীর মর্যাদা ও সম্মান ততই বাড়বে। সহজেই বিলাসিতার চরম দৃষ্টান্ত দেখা যেত। পাল ও সেন রাজগণের রাজধানী রামাবতী ও বিজয়পুরের যে বর্ণনা আছে তাতে অসংখ্য বিশাল প্রাসাদ বহু মূল্যবান গৃহসজ্জা, নরনারীর কারুকার্যখচিত বস্ত্র ও রত্ন অলঙ্কারের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।

তখন লোকের অবসর ছিল প্রচুর ও নানা রকমের খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। পাশা ও দাবা খেলার খুব চল ছিল। নাচগানের খুবই আদর ছিল। নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল। পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়ে নর্তক নর্তকীর মূর্তি ও অনেক বাদ্যযন্ত্র খোদাই আছে। এর থেকে সেকালের নর্তক নর্তকীর পোষাক, হাবভাব ও নৃত্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়। ভদ্র-ঘরের মেয়েদের যত্ন করে নাচ ও গান শেখান হত। মন্দিরে মন্দিরে বহু দেবদাসী ছিল। বড় বড় নগরে প্রধান প্রধান গণিকারা সম্মানের পাত্রী ছিল।

কিন্তু বাঙ্গালীরা কেবল আমোদ-প্রমোদই করত না। হিন্দুসমাজে পূজা পার্বণ এবং অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি যে সকল সংস্কারের বিধান আছে তা যথারীতি সকলেই পালন কর্ত। বিবাহে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও এখনকার মত বহু আমোদ-প্রমোদ ও ভুরিভোজের ব্যবস্থা ছিল। বার মাসে তের পার্বন লেগেই ছিল। এখানকার ন্যায় শরৎকালে খুব ধুমধামের সাথে দুর্গা পূজা হোত। এই পূজা উপলক্ষে দশমীতে শরদোৎসব হত। তাতে এবং গ্রাম মহোৎসব প্রভৃতি কতকগুলি অনুষ্ঠানে এমন অনেক ব্যাপার ঘটত যা আজকালকার রুচি অনুসারে অত্যন্ত অশ্লীল বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এ ছাড়া, হোলকা (বর্তমানকালের হোলি), সুখরাত্রিব্রত, দ্যূত প্রতিপদ, পাষাণ চতুর্দশী, কোজাগরী পূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, আকাশপ্রদীপ ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি বহু উৎসবে খুব আমোদ-প্রমোদ হত। সংক্ষেপে বলতে গেলে তখন বাঙ্গালীর দেহে শক্তি, ঘরে অন্ন ও প্রাণে ছিল প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ।

অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র

অধ্যাপক কস্তুরচাঁদ লালওয়ানী

সকালবেলায় বেরুলাম খড়্গপুর থেকে কলকাতায় যাবো বলে। মেল গাড়ীতেই যাবার ইচ্ছা—তাড়াতাড়ি পৌঁছুন যাবে। ষ্টেশনে এসে শুনি, মেল অনেক লেট। ঠিক সেই সময়ই এল একটা এক্সপ্রেস গাড়ী যার এক ঘণ্টা আগেই ছেড়ে যাবার কথা ছিল অর্থাৎ এ গাড়ীও লেট। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সঙ্গে যাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরা সবাই জানেন যে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে না উঠলে এ রেলওয়ের কোন কলকাতাগামী গাড়ী সময় মত আসে না। না আসাটাই নিয়ম; আসাটা তার ব্যতিক্রম। অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ের দু'এক ঘণ্টা পরে গিয়েও লোক বিফল মনোরথ হন নি এমন কথাও শুনেছি। যাই হোক্, নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল। এক্সপ্রেসেই উঠে বসলাম। এটি না পেলে যে বসে থাকতে হত মেলের জন্যে হাঁ' করে।

গাড়ীতে উঠে জনৈক যাত্রীর মুখে এ গাড়ী লেট হবার যে বিবরণ শুনলাম তার সার এই :—জনৈক চাউল ব্যবসায়ী তিন বস্তা চাউল নিয়ে উড়িষ্যা থেকে বাংলার চাউলের ঘাটতি পূরণ ব্যাপারে আংশিক সাহায্য করার মহৎ উদ্দেশ্যে আসছিলেন। পাছে যাত্রীদের অসুবিধা হয় এই জন্যে তিনি কামরার সংলগ্ন ছোট গুদামে চাল মজুত রেখে নিজেও সেখানে আসন স্থাপন করেন। প্রকৃতির বিপর্যয়; জনৈক যাত্রীও কার্যব্যপদেশে গুদামে ঢুকতে যান; কিন্তু গুদাম ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতরে চাউল ব্যবসায়ী আপন কৌশলের তারিফ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন কিনা জানি না; কিন্তু যাত্রীরা ব্যাপার রহস্যজনক মনে করে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ সেই ব্যবসায়ী পুঙ্গবকে মালসহ গুদামে আবিষ্কার করলেন। তার পরেই নাকি দরদস্তুরের পালা আরম্ভ হ'লো। চাউল ব্যবসায়ী দু' টাকায় রফা করতে চান; কিন্তু অত বড় আবিষ্কারের মূল্য দশ টাকার কমে নেওয়াই বা চলে কি করে? এমনি করে নাকি গাড়ী একঘণ্টা লেট হয়ে পড়েছে। তা না হয় হ'ল। কিন্তু এখনও ত তার যবনিকাপাত দেখছি না। গল্প শুনবে কামরায় বসে আরো প্রায় যখন এক ঘণ্টা কেটে গেল তখন দেখলাম, পুলিশের কড়া প্রহরায় তিন বস্তা চাল প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। তিন বস্তা চাউলের উদ্ধারে তিন শতাধিক যাত্রীর খেসারত। কেই বা বলে, আর কেই বা শোনে!

বৃটিশ যুগে শোষণের তীব্র নিন্দা করেছি; স্বাধীন ভারতে তার মূলোচ্ছেদে ঘটেছে কিনা জানি না; তবে ধনী ও দরিদ্র, ভাগ্যবান ও হতভাগ্যদের ব্যবধান যেন কেমন করে বেড়েই চলেছে। আর সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে একটা বিরাট অব্যবস্থা যাতে দেশের অর্থনৈতিক জীবন ক্ষতবিক্ষত দেশের প্রাণ ওষ্ঠাগত। শোষণ ও অব্যবস্থার মধ্যে কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ, জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা সে নিয়ে মাথা ঘামান; কোথায় সংবিধানে 'এ'র বদলে 'বি' এবং 'বি' এর বদলে 'এ' দিলে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব বনাম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যৌগিক উপাদানে কি পার্থক্য ঘটবে সে নিয়ে মডার্ণ রিভ্যুএর পৃষ্ঠায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। আমাদের ক্ষুদ্র মাথার কোঠায় তা ঢুকতেই চায় না। আমরা সোজাসুজি বুঝি যে, শোষণের যুগেও কিছু লোক ধনী হয়েছিল; অব্যবস্থার যুগেও তার ব্যতিক্রম নাই। শোষণের যুগেও জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেনি; আজও পারছে না।

শোষণের যুগে শোষণ চলেছে ঠিকই; কিন্তু দুর্নীতি বোধ হয় জাতির জীবনকে এতখানি বিষাক্ত করে তুলতে পারেনি। আজ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামে ক্ষমতার এমনি আচম্‌কা কেন্দ্রীভাবে

জাতির নৈতিক মান অবনমিত না হয়ে পারিনি। অনগ্রসর যে তাকে এগিয়ে দেওয়া চলে ; তার ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা চলে। দুর্নীতিপরায়ণের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। আজ শুধু এদেশেই নয়, প্রাচ্যের বহুগুলো দেশে পরাধীনতার বন্ধন খসে পড়েছে আপনা থেকেই, বিশ্বশক্তির চাপে, সে সব জায়গাতেই ক্ষমতায় কেন্দ্রীভাবের সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। আর তারই ফলে এই সব দেশে দেখা দিচ্ছে গৃহবিবাদ, অর্থনৈতিক সংঘাত যার ফলে জাতীয়তার ভিত্তি দ্রুত শিথিল হয়ে পড়ছে।

ক্ষমতার কেন্দ্রীভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার এক অবাস্তব স্বপ্ন দেশের ক্ষতি করছে আরো বেশী রকমে। স্বপ্ন কখনো বাস্তব হয় না ; অবাস্তব আদর্শকে দেশকালের অবস্থা বিবেচনা না করে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে ঘটে আদর্শচ্যুতি। একে ত শতছিন্ন জরাজীর্ণ সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থা, তাতে আবার একান্ত দরদী মানুষের নিতান্ত অভাব। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে যারা ছিল তাদের অনেকেই আজ পরলোকগত বা বিতাড়িত। দেশজোড়া আলোড়নে যারা ওপরে উঠেছে তাদের নৈতিক মান ও স্বদেশ প্রেম দেশবাসীকে আজ উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না।

এক্ষেত্রে রুশিয়ার নজীর টানা অবান্তর। বিপ্লবে সেদেশে প্রচুর রক্তমোক্ষণ হয়েছিল। দূষিত রক্ত ত্যাগ করে সমাজদেহ ধারণ করেছিল নবকলেবর। নেতৃত্বও তেমনি ছিল অসাধারণ যার সামনে আজকের রুশনেতারা টু শব্দ করতে পারতেন না। এমনি করে তারা এনেছে অর্থনৈতিক নববিধান। তাছাড়া আদর্শ ছিল তাদের স্থির ; স্বার্থত্যাগে তারা ছিল অটল। কত দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের অর্থনৈতিক জীবন, তাদের নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, আর সেই সঙ্গে নূতন চেতনা।

আর আমাদের—রক্তমোক্ষণের অভাবে সমাজ দেহের সর্বত্র দূষিত রক্ত পুঞ্জীভূত। আদর্শ আমাদের অস্পষ্ট। গান্ধী কি চেয়েছিলেন তা তিনি নিজেও স্পষ্ট করে বুঝতেন কিনা জানি না ; জাতির কাছে তা নিতান্তই অস্পষ্ট। তবে স্থূলভাবে মনে হয় তিনি চেয়েছিলেন এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে যেখানে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব হবে সামান্যতম, আর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের হবে পূর্ণ বিকাশ। বোধ হয়, এই ছিল তাঁর রামরাজ্যের কল্পনা যেখানে সামান্যতম রজকের মতেরও মূল্য থাকবে, আর তারি জন্যে রাজাকে করতে হবে চরমতম ত্যাগ স্বীকার। এ থেকে আজ আমরা কোথায় সরে গেছি তা আর বলে দিতে হবে না।

অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের স্থান কতখানি হওয়া উচিত তা দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে আজ ভাববার দিন এসেছে। এক যোজনা পেরিয়ে আমরা দ্বিতীয় যোজনার মাঝখানে এসে পড়েছি। তবুও একটি সমস্যার সমাধানও আজ সম্ভব হয়নি। না আছে অন্নবস্ত্রের জোগাড়, আর না আছে চাকুরীর সংস্থান। ব্যক্তি পরিচালিত শিল্প বাণিজ্য হতোদ্যম, অথচ সরকারী প্রচেষ্টাও অতি শিথিল! কৃষি কখনো বন্যা তাড়িত, আবার কখনো দুর্ভিক্ষগ্রস্ত। করভারে দেশবাসী জর্জরিত ; তবুও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তুষ্টি নেই। দেশের অর্থনৈতিক জীবন প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। অদূর ভবিষ্যতে যদি আমরা এর একটা সুরাহা করতে না পারি তাহলে প্রকৃতির বিধান আপনা থেকেই কাজ করতে শুরু করবে। সে বিধান অতি নির্মম। রুশিয়া ও চীনে তার নমুনা আমরা দেখেছি। আজ এ সম্বন্ধে স্থির গবেষণার দিন উপস্থিত হয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীহিমাংশু রায়

দাম বাড়ে তখন যখন লোকের হাতে খরচ করার মত টাকা থাকে বেশী। বর্তমানে আমাদের হাতে টাকা এসেছে অনেক, সে অনুপাতে জিনিসপত্রের যোগান নেই। কাজেই দাম বাড়ছে। যত সহজে সমস্যার স্বরূপটি প্রকাশ করে ফেললাম, আসলে কিন্তু তত সহজ নয়।

আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর অনেক বৈশিষ্ট্য। যেমন, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সহাবস্থান (Coexistence), গ্রামীন ও নাগরিক অর্থনীতির স্বাতন্ত্র্যবোধ, খাদ্যদ্রব্যের উপর খরচ হয় আয়ের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ আর দারিদ্র হেতু অধিকাংশ লোকের কাছে ভালো থাকা খাওয়ার কল্পনা হচ্ছে বিলাস।

এ হেন কাঠামোতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার টাকা আসছে বাজারে। খরচের বহরটি সরকারী ক্ষেত্রে অধিক, প্রয়োজনও অধিক। বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রয়োজন কম, কম হলেও মূলধন সংগ্রহ সমস্যাটি কম নয়। কিছুটা এর কারণে, আর বেশীটা ধর্মঘটে বেসরকারী ক্ষেত্রকে অনেক কিছু অসামাজিক পন্থা অবলম্বন করতে হয় সরকারের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করে মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে তোলার জন্যে। যাহোক, পরিকল্পনা তথা ব্যাঙ্ক তথা সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের মাধ্যমে লোকের কাছে টাকা আসছে প্রচুর (সৌভাগ্যের বিষয়, বিশেষ জনদের হাতে বিশেষ পরিমাণ টাকা এসে আটকে যাচ্ছে। বাজারে চাহিদা বাড়িয়ে অনর্থ ঘটাচ্ছে না!)

আয় বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে। বলেছি, এদেশের লোকের আয়ের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ খরচ হয় খাদ্যদ্রব্যে। আয় বাড়াতে রুচিবোধ বেড়েছে। আগে যারা মোটা চাল খেত, তারা সরু চাল ধরেছে; মোটা জামা কাপড় ছেড়ে ধরেছে ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবী। ফলে চাহিদার সৃষ্টি হচ্ছে নতুন সমস্যা।

এতো গেল চাহিদার দিক। যোগানের দিকে খাদ্যদ্রব্যকে কেন্দ্র করেই প্রধানতঃ গড়ে ওঠে মূল্য-কাঠামো। চাহিদা বাড়ার জন্যে, চাহিদার ধরণ পাল্টাবার জন্যে বিশেষ দ্রব্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে মূল্যবৃদ্ধি চক্র; বিস্তৃত হয়ে পড়েছে সর্বক্ষেত্রে। খাদ্য ঘাটতি ঘটছে, উৎপাদন চাহিদার সঙ্গে সমতা রাখতে পারছে না বলে। প্রাকৃতিক কারণ এর মূল কারণ হতে পারে না। "ঘাটতি-ভূত" প্ল্যানরূপ সর্ষের মধ্যেই লুকানো। সবটা আবার জটিল হয়ে পড়েছে গ্রামের অধিকতর স্বাবলম্বিতা আর শহরের লোকের গ্রামীণ দ্রব্যের উপর বিমুখতার জন্যে। গ্রাম আর শহর নিয়ে ভারত। অথচ রুচিগত, চাহিদাগত পার্থক্যের জন্যে পরস্পরের অভাব দূর করা ব্যাপারে উভয়ই অসমর্থ। মূল্যবৃদ্ধি দ্রব্য-কেন্দ্রিক হতে সার্বত্রিক, আর গ্রামীণ ও আঞ্চলিক হতে সার্বজনীন হয়ে উঠেছে।

এতো গেল, যাকে বলে মূলগত কারণ। দেশ যাক জাহান্নামে, নিজের প্রাচুর্য বাড়ুক—যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এ মন্ত্র জপ করার মত শক্তিমান পুরুষের অভাব নেই ভারতে। ওরা যেনের দল। যোগান সঙ্কটের আঠারো আনা সুযোগ নিয়ে তারা সঙ্কটকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। বিত্তবান জন-সাধারণ বাধ্য হয়ে দাবী করছে আরো টাকা। আসছে টাকা, আয় বাড়ছে, বাড়ছে চাহিদা, চলছে.... এ চলার শেষ সব চলার শেষের মতই ঘটবে একদিন! তবে যে চক্রের সৃষ্টি হয়েছে তা চক্রাকারে

আরো এগিয়ে যাবে ভবিষ্যতের দিকে। নিজের গতিতে তো বটেই, তাছাড়া বাইরের শক্তিও গতি যোগাবে।

মূল্যবৃদ্ধি সমূলে ও সুস্থভাবে নির্মূল করা সম্ভব, উৎপাদন বাড়িয়ে আর প্রয়োজনে আমদানি করে। বৈদেশিক অর্থক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তা আর এক দুষ্টচক্র সৃষ্টি করে চলেছে। চলতি সময়ে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করা—বৈদেশিক অর্থের অভাবের জন্যে কঠিন ব্যাপার। এটা বড় কথা হলেও শেষ কথা নয়। বৈদেশিক অর্থের অভাবের জন্যে পরিকল্পনাকে যে ভাবেই কাটছাঁট করা হোক না কেন, (বলা বাহুল্য, এর ফলে 'পরিকল্পনা' শব্দটা মিথ্যে হয়ে যাবে) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে ভয়ানক ব্যাহত হবে। দাঁড়াল এই, টাকার যোগান বাড়বে (পরিকল্পনার শেষ দুবছর পরিকল্পনার বার্ষ টাকার প্রায় অর্ধেক টাকা খরচ করা হবে); আর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনে, আজ আর আগামীতে এবং আমদানীতে দেখা দেবে সঙ্কট। মূল্যবৃদ্ধির যে দুষ্টচক্র রচিত হয়েছে তাতে যোগাবে শক্তি—যোগান সম্পর্কে অধিকতর সঙ্কটের ইঙ্গিত দিয়ে আর যথার্থ সঙ্কট সৃষ্টি করে।

উপায় ? যদি বলি নিরুপায়, মিথ্যে বলা হবে না। পাঠ্যপুস্তকে কত-শত উপায়ের বর্ণনা রয়েছে। আবার প্রতিটির সঙ্গে রয়েছে প্রতিটির সীমাবদ্ধ যোগ্যতার সুস্পষ্ট ঘোষণা। তাছাড়া, উপায়গুলো হচ্ছে বিদেশী উপায়। মিশ্র অর্থনীতিতে, শহর ও গ্রামের বিচিত্র সমন্বয়ে, অনুন্নত গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পরাশ্রয়ী পরিকল্পনায় উদ্ভব হতে উদ্ভূত মূল্যবৃদ্ধিই প্রতিরোধ করার কথা বিদেশী উপায় বলে না। আর বললেই বা কি; বিদেশী উপায় বিদেশেই কি পেরেছে মুদ্রাস্ফীতির উদ্দামতা থেকে বিদেশকে সর্বাংশে রক্ষা করতে ?

তাই বলি, 'মনিটারী মেজার' অবলম্বন করতে গেলে টাকার সরবরাহে ঘটবে সঙ্কোচ। বেসরকারী ক্ষেত্র জানাবে প্রতিবাদ (সরকারী ঋণের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম)। 'ফিসক্যাল মেজার'-এর ব্রেক অল্প কষ চাপাতে গেলে সেক্ষেত্র থেকে আবার উঠবে সোরগোল। তাছাড়া করভারের কিছুটা অন্ততঃ উৎপাদন ব্যয় বাড়াবার সাহায্য করে মূল্যবৃদ্ধির সাহায্য করবে আরো। জনসাধারণ রুখে দাঁড়াবে। দাঁড়াবেই বা না কেন ? পরিকল্পনা বড়, না আজকের অভাবের সত্যিটা বড়, বিশেষতঃ আমাদের মত দুর্নীতিভরা দেশে ? আর সঞ্চয় ? আয় বাড়ছে, আয়ের আগে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। মানে বাড়ছে ব্যয়—লোকের সঞ্চয়ের সুযোগ কোথায় ? কোম্পানীর সঞ্চয় ? করের চাপ আর মূলধন বাজারে সরকারের তীব্র প্রতিযোগিতা কোম্পানী মুনাফা আর সঞ্চয়ের (কালো বাদ দিয়েও) গতিরোধ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি চলবে সঙ্গে সঙ্গে। অবিশ্যি এতে এদের সন্তুলান হচ্ছে না। তার চেয়ে বড় কথা, সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার রুখতে না পারলে দেশের হিত করতে গিয়ে যন্ত্র তাড়াতাড়ি যে এদের অবসর নিতে হবে দেশবাসীর সেবা থেকে।

বাকী থাকে "নন-মনিটারী মেজার।" শুদ্ধ সংক্ষিপ্ত কথায়, ফিজিক্যাল মেজার বা দৈহিক শক্তির প্রয়োগ। আমার মতে এই একমাত্র উপায়। জমি ও কারখানা থেকে সব মাল চলে যাবে সরাসরি সরকারী গুদামে, সেখান থেকে ন্যায্য মূল্য দোকানের মারফৎ সোজা চলে আসবে ক্রেতাদের কাছে। গ্রামের আর শহরের আড়াআড়ি, ধনী আর দরিদ্রের কাড়াকাড়ি—খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে, চলাচল ব্যাপারে—খর্ব করে নিতে হবে অবিশ্যি। কিন্তু কোথায় সে রাম আর সেই অযোধ্যা ?

দুইটি পরিকল্পনা

শ্রীঅচলকুমার ভট্টাচার্য

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন চলেছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকাল। পরিকল্পনা দুইটির মধ্যেকার সম্বন্ধ কিন্তু শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্তের সম্বন্ধ নয় তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি জটিল। প্রাথমিক বিচারে প্রথম পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার যে পার্থক্যগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সেগুলো হল এই : প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে শিল্পের উপর, প্রথম পরিকল্পনায় নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা অপেক্ষা পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বহু নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে এবং হবেও ইত্যাদি এবং সর্বোপরি দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা অধিক আশাব্যঞ্জক। এত বেশী আশাব্যঞ্জক যে ইহা অনেক জ্ঞানী-গুণী-ব্যক্তির বিরূপ সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে।

কিন্তু মনে হয় প্রথম পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যেকার আসল তফাৎ যেটুকু, সেটুকু হ'ল ব্যক্তিগত লাভ ও সামাজিক লাভ বাড়ানোর তফাৎ। মন্তব্যটি বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে, তবে উক্তিটি বোঝবার ও বোঝাবার আগে দরকার যে পটভূমিকায় আলোচ্য পরিকল্পনা দু'টি রচিত হয়েছিল সেই সময়কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এবং বিশেষ করে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গীর সম্যক আলোচনার।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যখন রচনা করা হয়, তখন দেশের চারিদিকে অভাব, শুধুই অভাব—খাদ্যশস্যের অভাব, চাষের জন্য জলের, শিল্পের জন্য কাঁচামালের, সর্বশেষে যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তারও অভাব ; তাই প্রথম পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয় কৃষি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ যেমন সেচ, সমাজ উন্নয়ন ইত্যাদির উপর। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৪ ভাগ (২৩৭৬ কোটি টাকার মধ্যে ৭৯৮ কোটি টাকা)। নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা অপেক্ষা পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন বাড়ানোর প্রতি বেশী নজর দেওয়া হয়। অর্থাভাব ছাড়া নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পক্ষে অপর্যাপ্ত কাঁচামালের সরবরাহও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার শিল্পোন্নয়নের যেটুকু পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার অধিকাংশই বে-সরকারী শিল্পপতিরা নিষ্পন্ন করবেন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। মোট ৩৬৩ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৬০ কোটি টাকা সরকার খরচ করবেন বলে ঠিক করা হয়েছিল, বাকী ৩০৩ কোটি বে-সরকারী খাত থেকে পাবার আশা করা হয়েছিল। অর্থাৎ মূলশিল্প (key industry) অপেক্ষা ভোগ্য শিল্পের (cousumer goods iudustry) উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনার ধারা কিন্তু প্রথম পরিকল্পনা রচনার ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম পরিকল্পনার শেষে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যশস্যের আমদানী হ্রাস পায়, শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী কাঁচামালের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অর্থকরী ফসলের কারবারীদের ব্যয় ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সেই সব কাঁচামাল কিনে নিয়ে শিল্পে ব্যবহার করা প্রয়োজন দেখা দিল, বেকার

সমস্যার তীব্রতার জন্য নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনও দেখা দিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পের মূলধন সংগ্রহ করা কিছুটা সহজসাধ্য হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার রচয়িতাগণ তাই শুরু থেকেই কৃষি অপেক্ষা শিল্পের উপর বেশী জোর দেন, পরিকল্পিত ব্যয়ের ১৮·৫% এই সময় শিল্পোন্নয়নের জন্য ধার্য করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭·৬%। পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ করা ছাড়াও নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। তবে ভোগ্যপণ্যের শিল্প অপেক্ষা মূল শিল্পগুলির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। ভোগ্যপণ্যের উপর বেশী নজর দেওয়া হবে না মূল শিল্পের উপর জোর দেওয়া হবে এটি একটি পুরাতন প্রশ্ন। সোভিয়েট রাশিয়ায় যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করা হয় তখন ভোগ্যপণ্য অপেক্ষা মূলশিল্পের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল, এর ফলে জনসাধারণকে যে বেশ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল একথা ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীমালেনকফ্ এবং সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী শ্রীক্রুশ্চেভ বহু পূর্বেই স্বীকার করেছেন। অথচ ভারতের মত শিল্পে অনগ্রসর দেশের শিল্পোন্নয়নে মূলশিল্পের প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাই প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূলশিল্পের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হল। মূলশিল্পগুলি জাতীয় অর্থনীতির শিরদাঁড়া স্বরূপ। এগুলি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যেমন কম মুনাফা পাওয়া যায়, শেষে তেমনি পাওয়া যায় অত্যধিক মুনাফা। কেন্দ্রীয় সরকার তাই এই শিল্পগুলি স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখার সঙ্কল্প করেছেন। অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও বে-সরকারী খাতে শিল্প সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠন, এর অর্থ হল আমরা সব সময় ব্যক্তিগত লাভ অপেক্ষা জাতীয় লাভের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখব। "Essentially, this means that the basic criterion for determining the lines of advance must not be private profit but social gains and that the pattern of development and the structure of socio-economic relations should be so planned that they result not only in appreciable increases in national income and employment but also in greater equality in incomes and wealth ..." (Planning Commission). দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া ১০ হইতে ১১ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা (যা প্রথম পরিকল্পনায় উহ) ইত্যাদি এই উদ্দেশ্যেরই পরিপোষক।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কেন্দ্রীয় সরকার

শ্রীআশিস্ প্রসাদ সেনগুপ্ত

বিগত ১১ই মার্চ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের এক সাধারণ সভায় স্যার হোমী মোদী বলেছেন, বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের উপর নির্ভরশীল হবার ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তব ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাঁর অভিমত হল, হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আয়তন হ্রাস করতে হবে নতুবা এই পরিকল্পনার সময় আরো বৃদ্ধি করতে হবে। স্যার মোদী এই মর্মে আশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে, যেহেতু পরিকল্পনাটি দেশের সম্পদের হিসাবে রচনা করা হয়নি সে হেতু এর রূপায়ন সাধ্যের বাইরে চলে যাবে।

ডাঃ ভি, কে, আর, ভি, রাও হলেন ভারতের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ। অল্প কয়েকদিন আগে আমেদাবাদে একটা বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে বিশ্বাসঘাতক মনোভাব দেখা যাচ্ছে সেটা সত্যি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে, কি কারণবশতঃ সরকার দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনাটি কাট-ছাঁট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কারণ হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়া ভারতের পক্ষে পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা কষ্টকর। কিন্তু পরিকল্পনাটি কাঁট-ছাঁট করা এক কথা, আর কাঁট-ছাঁটের ফলে যে অবস্থা দাঁড়াবে সে অবস্থার সাথে তাল রেখে চলা—আরেক কথা। ডাঃ ভি, কে, আর, ভি, রাও পরিকল্পনাটি কাট-ছাঁটের পরিণতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেশের নেতৃবৃন্দ এবং কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যদি দেশের উন্নতি সাধন করতে হয় তাহলে পরিকল্পনাটির লক্ষ্য থেকে বেশী দূরে পিছিয়ে গেলে চলবে না। বরঞ্চ বর্তমানে যে সব অন্তরায় দেখা দিচ্ছে সে সব অন্তরায় দূর করার জন্য আরো নির্ভুলভাবে এবং আরো আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে পরিকল্পনা তৈরী করা দরকার।

শ্রীবি, আর, ভগত হলেন কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের উপমন্ত্রী। তিনি বিগত ৩রা মার্চ তারিখে লোক সভায় বলেছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল অংশ রূপায়ণের জন্য মোট নয় শত সাতষট্টি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা দরকার হবে। এই টাকার মধ্যে খুব অল্প পরিমানই বে-সরকারী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে খরচ করা হবে।

আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব আছে সন্দেহ নেই। একথাও অনস্বীকার্য যে, এই অভাবের দরুণ পরিকল্পনার রূপায়ন ব্যাহত হচ্ছে। তবে একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের অজুহাত দেখিয়ে পরিকল্পনা কাট-ছাঁট করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সঞ্চয়ের পরিমাণ আশানুরূপ হয়নি। কাজেই কেবলমাত্র বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের কথা ফলাও করে প্রচার না করে সরকারী এবং বে-সরকারী স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্যি ডাঃ রাও নিজেও স্বীকার করেছেন, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের দরুণ পরিকল্পনাটি পুনর্বিন্যাস করা ছাড়া উপায় নেই। তবে সঙ্গতির পরিমাণ সীমাবদ্ধ এইপ্রকার ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি পরিকল্পনাটি কাট-ছাঁট করা হয় তা হলে ভুল হবে। বরঞ্চ ন্যূনতম প্রয়োজন কি হতে পারে সেটা ঠিক করে খরচের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা দরকার এবং এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যার ফলে এই খরচ মেটান যেতে পারে। দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে অন্তরায় দেখা দেওয়ায় যে সব শিল্পপতি উল্লসিত হয়েছেন ডাঃ রাও তাঁদের কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এইভাবে উল্লসিত না হয়ে তাঁদের পক্ষে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার উদ্দেশ্যে বাধা-বিঘ্ন দেয় করার সঙ্কল্প নিয়ে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে এগিয়ে যাওয়া দরকার। ডাঃ রাও বুঝাতে চেয়েছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র সরকারই কালতু নোট ছড়াননি, শিল্পের প্রসার সাধনের জন্য বে-সরকারী শিল্পপতিদেরও ব্যাঙ্ক থেকে দাদন নিতে দেখা যাচ্ছে। এইভাবে দাদন নেওয়া এবং সরকার কর্তৃক কালতু নোট ছড়ানোর মধ্যে সত্যিকারের পার্থক্য তেমন নেই। বরঞ্চ দুটো কার্যেরই ফলাফল প্রায় একই ধরণের।

কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী বি, আর, ভগত বলেছেন, রাষ্ট্রীয় শিল্পক্ষেত্রে যে সব কর্মোদ্যোগের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা দরকার হবে সেটার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভবপর নয় কারণ এখনও পর্যন্ত এর অনেকগুলো সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চলছে। অবশ্যি যে সব কর্মোদ্যোগের কাজ বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা চলছে অথবা যে সব কর্মোদ্যোগের জন্য বৈদেশিক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনা চালান হচ্ছে সেটা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল অংশের জন্য এবং ইতিমধ্যে যে সব পরিকল্পনার কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে সেগুলোর জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শ্রীভগত বলেছেন রাষ্ট্রীয় এবং বে-সরকারী এই উভয় শিল্প ক্ষেত্রে সমস্ত কর্মোদ্যোগের জন্য এই নীতি অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করা হবে।

কৃতপূর্ব অর্থসচিব শ্রীসি, ডি, দেশমুখ বলেছেন "During the past few months India has been beating a retreat from her goal of socialistic pattern of Society because of the fear that personal incentive is destroyed by increased taxation and secondly because by doing so, "we think some foreign nations will give us a little more help." অর্থাৎ আমাদের দেশ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ থেকে দূরে সরে এসেছে। এই পশ্চাদপসরণ বিগত কয়েক মাসের মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং ব্যক্তিগত উদ্যম বলে যা বুঝায় সেটা শুরুতর করভারে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতাই হল সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবার আসল কারণ। শ্রীদেশমুখ বলেছেন আমেরিকা হলো ভারতের প্রধান আর্থিক সাহায্যকারী। তাই আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভারতে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যমের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হচ্ছে। অবশ্যি সরকার এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিগত কয়েক মাস ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি যাঁরা অধিকতর সঙ্গতিসম্পন্ন তাঁরা ভারত সরকারের কাছ থেকে বেশ কিছুটা সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। এঁদের করভার হ্রাস করার জন্যও সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেখা গেছে। হয়ত অধিকতর পরিমাণে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে ধনতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রভাবিত করার জন্য—ভারত সরকার এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। অবশ্যি প্রয়োজন মেটাবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিম্বা অন্য যে কোন রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভারত সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করতে পারেন। এতে আপত্তি করার কিছুই নেই। কিন্তু তাই বলে সাধারণ লোকের উপর অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা বৃদ্ধি করার নীতি সমর্থন করা চলে না। বিত্তবিত্তদের উপর আয়করের যে নূতন বোঝা চাপান হয়েছে সে বোঝা বহন করার সামর্থ্য বিত্তবিত্তদের আছে কিনা সরকার সেটা ভেবে দেখারও প্রয়োজন অনুভব করেননি।

আবার অন্যদিকে আয়বৃদ্ধির যে সব সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল সে সব সম্ভাবনাও এখন কমে গেছে কারণ সরকারী স্তরে যে সব কাজ আরম্ভ করার পরিকল্পনা ছিল সে সব কাজ সঙ্কুচিত করে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ এখন দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনার শাঁসটুকু কার্যকরী করতে পারলেই সরকার সন্তুষ্ট। অর্থদপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীভগতের মতানুসারে এই শাঁসটুকু হচ্ছে রুরকেল্লা, ভিলাই, এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা; মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানার ফেরো-সিলিকন সম্প্রসারণ কর্মসূচী ভারতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশনের কর্মসূচীর অন্তর্গত কঠোরা, কোরবা, গিদি, মুরাদা, কোরিয়া এবং বর্তমান রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনিগুলো; সিংগারেনি কয়লাখনি; কয়লা ধৌতগারসমূহ; বেঙ্গল

সিগনাইট প্রজেক্ট (খনি অংশ) ; রেলওয়ে উন্নয়ন কর্মসূচী (রেলওয়ে বৈদ্যুতীকরণ কর্মসূচীর সাথে সংশ্লিষ্ট ডাক এবং তার বিভাগের উন্নয়নও এর অন্তর্গত ; বম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বিশাখা-পত্তনম বন্দরের উন্নয়ন ; করবা তাপ উৎপাদন কেন্দ্র । খাপের খেদা অকোলা তাপ উৎপাদন কেন্দ্র সম্প্রসারণ ; হীরাকুদ পরিকল্পনা ; নাঙ্গালভাল্লী পরিকল্পনা ; বিদ্যুৎ সঞ্চরণ, বিতরণ এবং সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ; ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা ; চম্বল পরিকল্পনা ; রিহান্দ পরিকল্পনা ; তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা ; নাজিয়ামঙ্গলম জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা ; সৌরাষ্ট্র তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ; গান্ধেরবল এবং মোহরা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ; বে-সরকারী শিল্পক্ষেত্র যেমন টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কারখানা এবং কয়লা । লোকসভায় বাজেট পেশ করার সময়ে শ্রীনেহেরু বুঝাতে চেয়েছেন, "The economic policies pursued during the last two years have been conducive to the crucial task of mobilizing maximum internal and external resources for the Second Plan while avoiding undue strains." এছাড়া ভবিষ্যতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে কি নীতি অনুসরণ করা হবে সেটা বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, "Although the adjustments in the Plan to ensure stability and balance are unavoidable, the essential objectives of the Plan have to be safeguarded and pursued with unremitting vigour."

জাতীয় কল্যাণে ট্রেড ইউনিয়নের দান

স্যামুয়েল ওয়াটসন

ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কাজই হইল শ্রমিক সাধারণের মজুরি বৃদ্ধি এবং চাকুরির সর্ত ও তাহাদের কর্মজীবনের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাইয়া যাওয়া ।

প্রথম হইতেই ব্রিটেনে ইউনিয়নগুলি—বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যাহারা পথিকৃৎ—তাহাদের সদস্যগণের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ মজুরি আদায়ের এবং সর্বোত্তম চাকুরির সর্ত আদায়ের চেষ্টা করিয়া আসে । এই উদ্দেশ্যেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিকগণ ইউনিয়নসমূহে যোগদান করিয়াছে, তাহারা জানে ইউনিয়নের সদস্য না হইয়া একক চেষ্টায় মালিকগণের সহিত এ বিষয়ে দর কষাকষি করা সম্ভব নয় । এই যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থা ব্রিটেনের শ্রমশৈল্পিক গণতন্ত্রের একটি প্রধান দিক ।

ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সন্তোষজনক আইনসঙ্গত মর্যাদা লাভের সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ হয় প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে । তাহারা এইভাবে শ্রমশিল্পে দরকষাকষি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি লাভ করিতে পারে । সেই হইতে তাহাদের প্রস্তাবিত সর্বক্ষেত্রে অধিকতর মাত্রায় বিস্তার লাভ করিতে থাকে । আন্দোলনের সীমাও এইসঙ্গে ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে থাকে কারখানা এবং যৌথ দর-কষাকষি হইতে উৎপাদন এবং অন্যান্য জাতীয় সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে ।

আজ দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের এমন কোন দিক নাই যেদিকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শক্তি অনুভূত হইতেছে না । ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ব্যক্তিগত এবং সরকারী শ্রমশিল্পে,

পার্লামেণ্টে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্টে, সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহের প্রশাসনিক সংগঠনসমূহে, জনকল্যাণ স্বাস্থ্য, কিংবা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তাহাদের কাজ সমানভাবে চালাইয়া যাইতেছে।

একথা মনে করা ভুল হইবে যে যে কর্তৃত্ব ট্রেড ইউনিয়নসমূহ লাভ করিয়াছে তাহা কেহ কখনও তাহাদের 'হাতে তুলিয়া' দেয় নাই। গত ৪০ বৎসর ধরিয়া তাহাদের এজন্য বহু সংগ্রাম করিয়া আসিতে হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রামের কোন স্তরেই আন্দোলন পরিচালকগণ কখনও ভুলিয়া যান নাই যে ইহা সর্বপ্রথমে শ্রমশৈল্পিক সংগঠন, ইহার কাজ হইল সদস্যদের সেবা করা, রাজনৈতিক শক্তিসমূহের হস্তে রাজনৈতিক যন্ত্র হইয়া থাকা নয়।

এই কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য ইউনিয়নসমূহ ব্যাপকভাবে গণতান্ত্রিক নীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। শ্রমিকগণের ধর্ম এবং বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন সকলেই ইউনিয়নের সদস্য হইতে পারে। রাজনৈতিক মতবাদও ইউনিয়নের সদস্য হইবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে না। কয়েকটি মাত্র ইউনিয়নে কম্যুনিষ্টপার্টির সদস্যগণ উচ্চপদ লাভ করিতে পারে না।

এই সকল ইউনিয়নের উদ্দেশ্যই হইল নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল সদস্যের স্বার্থ রক্ষা করা। যেখানে আপোষ এবং আলোচনা শ্রমশৈল্পিক কলহ মীমাংসার সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয় সেখানে অন্য ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া হয় না। যেখানে তাহা ব্যর্থ হয় সেখানে ইউনিয়নসমূহ —অবশ্য তাহাদের দাবী ন্যায্য মনে করিলে—ধর্মঘটের আশ্রয় হয়।

অবস্থার উন্নতি—গত ৪০ বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের মজুরী ও চাকুরি সর্তের ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হয়। অনেক সুবিধা আজ তাহারা তাহাদের নিজেদের জন্য এবং পরিবার-বর্গের জন্য পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাসব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রসার হইয়াছে। তাহারা আজ পারিবারিক ভাতা পাইতেছে, বিনামূল্যে দুগ্ধ পাইতেছে এবং সন্তানদের জন্য সুলভে স্কুলের খাদ্য ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে।

যান্ত্রিক পরিবর্তন ও শ্রমিকদের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া

জন ওয়াল্টন

স্বদেশে এবং বিদেশে অটোমেশনের প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখার জন্য ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্প্রতি যে বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করেন তাহাতে ২০০,০০০ ইঞ্জিনীয়রিং কর্মীর নেতা উইলিয়াম ক্যাবন বক্তৃতা কালে ঘোষণা করেন অধিকতর মাত্রায় অটোমেশন অপেক্ষা স্বল্প মাত্রায় অটোমেশন সম্পর্কেই শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে ভয় দেখা দিয়াছে।

ব্রিটেনের আর্থিক শক্তি নির্ভর করিয়া আছে তাহার শ্রমশৈল্পিক দক্ষতার উপর। আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বিত না হইলে শ্রমশিল্পের পক্ষে এই কঠিন প্রতিযোগিতার রাজ্যে টিকিয়া থাকা সম্ভব হয়। ক্যাবনের সহিত অন্যান্য বক্তারাও বলেন ট্রেড ইউনিয়নপন্থীরা কারিগরী পদ্ধতির এই পরিবর্তন সম্ভাবনায় খুশী, কিন্তু তাহারা চায় এই পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হইবে ঠিক পথে এবং

সুবিধার একটা ভাগ্য অংশ তাহাদের দিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্বে এবিষয়ে যে আলোচনা হয় তাহাতে টি-ইউ-সি এই কথাই জোরের সহিত বলেন যে অটোমেশনের ফলে ওয়ার্কশপ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্ন দেখা দিবে তাহা প্রত্যেক প্রশ্ন শিল্পের নিজস্ব ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে এবং তৎসম্পর্কে মীমাংসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই ইউনিয়নসমূহ জাতির সাধারণ আর্থিক অবস্থার উন্নতি ত্বরান্বিত করা সম্পর্কে শ্রমিক সাধারণের সহযোগিতা লাভ করিতে পারে।

যাহাতে বড় রকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সে জন্য পূর্ব-পরিকল্পনার প্রয়োজন হইবে। ইউনিয়ন সভ্যগণ মনে করেন যে কোন পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব হইতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখা পরিচালন কর্তৃপক্ষের পক্ষে উচিত কাজই হইবে; এ সম্পর্কে কোন ছল-চুতা করা তাঁহাদের উচিত নয়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রবর্তন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কোন সময়ই তাড়াহুড়া করিয়া গৃহীত হয় না। এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া দেখিবার সময় তাঁহাদের হাতে যথেষ্ট থাকে।

এ সম্পর্কে আতলান্তিকের উভয় পারের ইউনিয়নসমূহের মনোভাব যে এক তাহা বুঝা যায় যখন আমেরিকার ইন্টারন্যাশানাল ইউনিয়ন অব ইলেকট্রিক্যাল, রেডিও অ্যাণ্ড মেশিন ওয়ার্কার্স-এর গবেষণা-ডাইরেক্টর ডেভিড ল্যাসার টি-ইউ-সি সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ল্যাসার, যিনি অটোমেশন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মতামত জানাইবার জন্য বিশেষভাবে ব্রিটেন ভ্রমণে আসেন, তিনি বলেন যে মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অটোমেশন যন্ত্র স্থাপনের পূর্বে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শের ঔচিত্যের কথা বারংবার জানাইয়া আসিয়াছে। সম্মেলনে ল্যাসার ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল অন্যান্য যে সমস্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করেন তাহা হইল অটোমেশনের দরুণ যে সমস্ত শ্রমিক স্থানচ্যুত হইবে তাহাদের জন্য পুনরায় তালিম দানের ব্যবস্থা, বেকার ভাতা বৃদ্ধি ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্যাবলী।

সম্মেলনে প্রায় ৪০টি ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন; ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত সরকারী ব্যবস্থাসমূহে যে যান্ত্রিক পরিবর্তনের কথা হইতেছে তাহার কথাও বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা হয়। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র ব্রিটেনে ট্রাংক টেলিফোন কল্ সম্পর্কে অটোমেটিক ডায়েলিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। কিন্তু এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কথা হইল এই যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সহিত পরামর্শ করার পর এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। ব্রিটেনের ডাকঘর শ্রমিকদের সরকারী মুখপত্র ইহাতে খুশীর ভাবই প্রকাশ করে। পত্রিকায় প্রসঙ্গত বলা হয়, অটোমেশন দরুণ যে সুবিধা লাভ হইবে তাহা মালিক, পণ্য ব্যবহারকারী এবং শ্রমিকদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। টি-ইউ-সি সম্মেলনেও এ সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং বলা হয় যান্ত্রিক পরিবর্তন যে সমস্ত স্থানে সম্ভব হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানে কাজের সময় কমাইয়া ফেলার উপায়ও দেখিতে হইবে।

এই অটোমেশন সম্পর্কিত আলোচনায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন একজন ট্রেড ইউনিয়নপন্থী, একজন শ্রমশৈল্পিক পরামর্শদাতা ও একজন অফিস ম্যানেজার। ট্রেড ইউনিয়নপন্থী—ইনি ব্রিটেনের ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড শিপবিল্ডিং ড্রাফটসমেন-এর একজন কর্মচারী—পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং বলেন স্বদেশে এবং বিদেশে মালিকগণ ক্রমশঃ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যান্ত্রিক উন্নতির সহিত তাল্ না রাখিয়া চলিলে বাজার হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে।

তিনি মনে করেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজার সৃষ্ট হইলে প্রতিযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইবে, এবং সেজন্য শ্রমশিল্পকে অটোমেশন প্রভৃতি ব্যবস্থার মধ্য দিয়া দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় দেখিতে হইবে। ব্রিটেনে অটোমেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে পরামর্শদাতা ও অফিস ম্যানেজার উভয়েই পূর্বে পরামর্শ করার ব্যবস্থার ঔচিত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেন; তাঁহারা সেই সঙ্গে ইহাও বলেন ইহাতে শ্রমিকদের নিকট হইতে অধিকতর মাত্রায় সহযোগিতা লাভ সম্ভব হইবে। পরামর্শদাতা আরও বলেন অটোমেশন উৎপাদন মূল্য হ্রাসের সহায়ক এবং শ্রমিকদের পদোন্নতির সম্ভাবনাও কিছু কিছু বৃদ্ধি করিবে।

সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট ক্যারন—ইনি টি-ইউ-সি সাধারণ পরিষদেরও একজন সদস্য—প্রসঙ্গত বলেন অটোমেশন শ্রমিক জীবনের উপর কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইতেছে। টি-ইউ-সি বহু পূর্ব হইতেই অটোমেশন ও যান্ত্রিক পরিবর্তনের সমগ্র ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আসিতেছে এবং এখনও সে দেখিতেছে। ক্যারন উপসংহারে বলেন অটোমেশন এই সমস্যা সৃষ্টি করিবে কিন্তু টি-ইউ-সি যে কথা বলিয়াছে, তাহা শ্রমনৈতিক সম্পর্কের বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া সমাধান করা অসম্ভব হইবে না।

———

ভারতে জীবন বীমার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

সাম্প্রতিক বিবরণী হইতে দেখা যায় যে ১৯৫৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জীবন বীমা কর্পোরেশন ১৯৫৭ সালে মোট ২৮১ কোটি টাকার বীমা পলিসি গ্রহণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৭৬ কোটি টাকা ভারতের মধ্যে এবং অবশিষ্ট ভারতের বাহিরে সম্পাদিত হইয়াছে। মোট ৭৯৩১৬৮ বীমা পত্রের মধ্যে ৭৮৮১৩৩টি ভারতের মধ্যেই গৃহীত হইয়াছে। এই বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে জীবন বীমা কর্পোরেশন আলোচ্য বৎসরেই সর্বাধিক পরিমাণ বীমা পত্র গ্রহণ করিয়াছে। বেসরকারী হাতে যখন জীবন বীমা ব্যবসা ছিল তখন কোন বৎসরই এত বেশি টাকা বীমা পত্র সম্প্রাদিত হয় নাই। ১৯৫৪ সালে বেসরকারী বীমা ব্যবসা অপেক্ষা ৩৮ কোটি টাকার বেশী ব্যবসা জীবন বীমা কর্পোরেশন সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতে এই বিবরণীটি বিশদ ভাবে পাওয়া যাইবে।

(কোটি টাকায়)

বৎসর	ভারতে	ভারতের বাহিরে	মোট
১৯৫৭	২৭৫·২৮	৫·৭০	২৮১·০৮
১৯৫৬	১৮৭·৬৯	১২·৫৯	২০০·২৮
১৯৫৫	২০৮·০০	২০·৩৩	২২৮·৬৩
১৯৫৪	২৩৬·৩৪	১৭·৬৫	২৫৩·৯৯
১৯৫৩	১৫৫·২০	১৬·৬৬	১৬৯·৮৬

আলোচ্য সংখ্যা বিবরণী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে দক্ষিণ অঞ্চল সর্বাপেক্ষা বেশি বীমা পত্র গ্রহণ করিয়াছে। অন্ধ্র, মহীশূর, মাদ্রাজ এবং কেরালা দক্ষিণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ইহার পরই পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের স্থান। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে বীমার

পরিমাণ বেশি নহে। ইহা হইতে আরও অনুমান করা যায় যে ঐ দুইটি অঞ্চলের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই ; সুতরাং ঐ অঞ্চল দুইটিতে জীবন বীমা ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুযোগ আছে। আলোচ্য তালিকা হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের বীমা ব্যবসায়ের পরিমাণ পাওয়া যাইবে।

(কোটী টাকায়)

অঞ্চল	বীমাপত্রের সংখ্যা	বীমার পরিমাণ	বীমাপত্র প্রতি গড় টাকার পরিমাণ
উত্তরাঞ্চল	৭৪,৭৩৮	৩৩·৯০	৪,৫০০
মধ্য অঞ্চল	৮৯,১৬৬	৩৫·৭০	৪,১০০
পূর্ব অঞ্চল	১,৯২,১৫৯	৬৭·৬২	৩,৫০০
দক্ষিণ অঞ্চল	২,৬৯,৫০৮	৭৪·১৪	২,৭০০
পশ্চিম অঞ্চল	১,৬৫,৪৪২	৬৪·৬৩	৩,৯০০
ভারতের বাহিরে	৫,০৫৫	৫·৪০	১০,৭০০

আলোচ্য পরিসংখ্যান হইতে কয়েকটি তথ্য জানা যায়। একটি, দক্ষিণ অঞ্চলের বেশী লোকই জীবন বীমা করিতে উৎসাহী। আর একটি, ভারতের বাহিরে বীমা পত্রের গড় পরিমাণ ১০ হাজার ৭ শত টাকা। তাহা ছাড়া বিদেশী বীমাকারীদের মধ্যে পূর্ব আফ্রিকা ও মালয়ের ভারতীয়দের মধ্যে বীমা পত্রের সংখ্যা বেশী। কর্পোরেশন মনে করেন যে বৈদেশিক বীমার পরিমাণ ১০ হইতে ১৫ কোটী টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৫৫ সালে বেসরকারী ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি বৈদেশিক বীমা পত্র অপেক্ষা জীবন বীমা কর্পোরেশনের বীমা পত্রের সংখ্যা কম। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কর্পোরেশন পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে কোন নূতন বীমা পত্র গ্রহণ করেন নাই। আলোচ্য বিবরণী হইতে জীবন বীমা কর্পোরেশনের সুষ্ঠু অগ্রগতি বীমা বাণিজ্যের আশাজনক ভবিষ্যৎ নির্দেশ করে।

— ——

পরিভাষা সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীঅরুণ জীবন বসু

এ যুগে দেখা যাইতেছে বাংলাদেশের সর্বত্র 'প্রতিষ্ঠানের' খুব প্রতিষ্ঠা। সম্প্রতি 'প্রতিষ্ঠান' ও 'সুষ্ঠু' শব্দ দুইটির প্রয়োগাতিশয্য লক্ষ্য করিবার মত ঘটে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থে 'প্রতিষ্ঠান' কথাটী ব্যবহৃত হইতেছে। কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি যথা, কলিকাতার পৌর-প্রতিষ্ঠান। হরিণঘাটার সরকারী দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, শিল্পাঞ্চলের কর্ম-প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান, ধনিক সমাজের স্বার্থরক্ষাকল্পে গঠিত প্রতিষ্ঠান, পল্লীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান, মহানগরীর ছোট বড় নানা প্রতিষ্ঠান, বিবিধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের লইয়া গঠিত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান, ভারতের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি। এক প্রতিষ্ঠান শব্দের সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সঙ্ঘ, সমিতি, সংসদ, সংগঠন ও সম্মেলনকে ব্যক্ত করিতে গেলে ব্যঞ্জনার অস্পষ্টতা দোষ ও অপরিচ্ছন্নতা সঞ্চারিত হয় এবং ভাষার প্রকাশ ক্ষমতার অপহ্নব ঘটে। সুতরাং যত্র তত্র প্রতিষ্ঠান কথাটি ব্যবহার না করিয়া বিশেষ বিচার বিবেচনার সঙ্গে তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে। যে ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা সমীচীন, সার্থক ও উপযোগী, শুধু সেই ক্ষেত্রের মধ্যেই ইহাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণ, শাসন, দমন, পরিচালন, নির্ধারণ, স্থিরীকরণ, বিধান এবং এবম্বিধ ভাবপ্রকাশের জন্য ইংরাজী ভাষায় পাঁচটি শব্দ পাওয়া যায়—control, regulate, govern, determine ও rule—প্রসঙ্গ বিশেষে ও ভাষানুষঙ্গ অনুসারে এই শব্দ পঞ্চকের মধ্যে ব্যঞ্জনাগত তারতম্য লক্ষনীয়। Birth-control এর control, Controller of examinations এবং Controller বা Comptroller (of accounts)-এর control হইতে নিশ্চয়ই আলাদা। Control কোথাও শাসন বা নিয়ন্ত্রণ, আবার কোথাও বা পরীক্ষা। তেমনই govern কোথাও শাসন, কোথাও শিক্ষণ ; যথা government, governance—শাসন, governor of a state—রাজ্যপাল, governess—শিক্ষয়িত্রী ; আমাদের শাস্ত্রের মতে অবশ্য সৃজন পালন ও সংহার একই শক্তির ত্রিধারা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তি কেবলমাত্রার মধ্যে অভেদ অবস্থায় বিলীন ছিলেন। শিষ্য, শাস্ত্র, শাস্তা, শাসন সংস্কৃতে একই মূল হইতে উদ্গত। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে regulate যদি হয় নিয়মাধীন করা, তবে regulation এর বাংলা প্রতিশব্দ কি হইবে ? Rule এবং Law বুঝাইতে যে শব্দযুগল ব্যবহৃত হইবে (ডাইসীর বিখ্যাত গ্রন্থে Rule of law, বাক্যাংশটি পাওয়া যায়—সেখানে আইনের শাসন বলিয়া অনুবাদ করা চলে। তবে অন্য ক্ষেত্রে Rule ও Law প্রায় সমার্থক ; সুতরাং Rule এবং law শব্দের তর্জমা করিতে অনুরূপ দুইটি বাংলা প্রতিশব্দ চাই) regulation এর প্রতিশব্দ তাহা পৃথক হইবে না কি ? Rule, Law ও regulation এই তিনটি শব্দের অনুরূপ তিনটি আলাদা বাংলা প্রতিশব্দ চাই, অথচ তাহাদের মধ্যে যে ভাব-নৈকট্য আছে নির্বাচিত প্রতিশব্দ-ত্রয়ের মধ্যে সেই নৈকট্যও পরিস্ফুট হওয়া দরকার। Determine শব্দের মধ্যে কি কালগত ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত নাই ? ইহা যেন অতীতের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। যে সব শক্তি পূর্ব হইতেই ক্রিয়া করিতেছে এবং ক্রমশঃ তাহাদের প্রভাব সঞ্চিত ও নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত করিতেছে তাহাদের কথা বলিতে গিয়া প্রাক্তনকর্ম, পূর্ব সংস্কার, এমন কি জন্মান্তরে আসিয়া ঠেকিতে হইতে পারে। Determinism এর মধ্যে নিয়ম নিয়ন্ত্রণের যে ভাব আছে অতীত কালগত (অব্যবহিত ও সুদূর) প্রভাব তাহার অন্তস্তলে লুক্কায়িত নাই কি ?

উল্লিখিত ইংরাজী শব্দ-পঞ্চকের মধ্যে আরও একটী রহস্য আছে। দেখা যাইবে যে প্রসঙ্গ-বিশেষে এই নিয়ন্ত্রণগুলির, প্রসঙ্গ-বিশেষে ইহা বাহ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নিয়ম-নীতি কখনও কখনও বাহির হইতে জোর করিয়া ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়—ঠিক যেন পলাতক ছাত্রকে জোর করিয়া পাঠশালায় পুনরায় প্রেরণ করা হয়, অথবা ক্লান্ত বলদকে কৃষক বা চালক তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাড়না করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সানন্দে যেন নিজের অন্তরের প্রেরণায় কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল - যেমন আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সন্তান-সম্প্রদায়। রাজার শাসন ও ধর্মের শাসনের মধ্যে এই পার্থক্য। যখন Control ও regulation হয় external ও objective তখন 'দমন' ও 'শাসন' হয় তাহাদের যোগ্য বাংলা পরিভাষা।

মনস্তত্ত্বে ও যৌন-বিজ্ঞানে ইংরাজী repression ও suppression কথা দুইটী এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। আর যখন আনিবার প্রেরণা আসে ভিতর হইতে (subjective) তখন বিধি-নিষেধ যত কঠোর ও তিক্ত হউক না কেন 'সংযম' ও 'নিয়ম' এই শব্দ-যুগলই হইবে উক্ত ভাবের উপযুক্ত বাহন। পরিভাষা প্রয়োগের কালে অভিধানিক প্রতিশব্দ না খুঁজিয়া আগে প্রসঙ্গটীকে উত্তমরূপে অনুধাবন করিয়া শব্দের পূর্ণ তাৎপর্য ও ভাষানুষঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তাহার পরে ঠিক শব্দটী বাছাই করা সহজ হইবে।

— ——

কুটিরশিল্প ও সমবায়

শ্রীগোপাল চক্রবর্তী

ভারতের কোন গ্রাম বা সহরে ঢুকলেই নজরে পড়ে কোন-না-কোন চত্বর জুড়ে ঘরে ঘরে কাঁসা, ঘুঙুর, পেতলের বাসন, টিনের বাক্স মগ প্রদীপ তৈরী হচ্ছে; কুমার পাড়ায় বাড়ী বাড়ী চাক ঘুরছে, তাঁতীর তাঁতশালায় কাপড়, গামছা, মশারী বুননের কাজ চলছে; লাঙ্গলের ফালি, কোদাল কাস্তে খুরপী খন্তা বটি গড়বার কাজে কামার শালা হাতুড়ি ও হাফরের শব্দে কম্পিত হচ্ছে; মুচিরা নীরবে চামড়ার ব্যবসায়ে এখনও কষ্ট ক্লিষ্টে বাঁচবার চেষ্টা করছে; তেলী বা কুলু পাড়ায় ঘানী চলছে; গেরস্ত ঘরে ঢেঁকীতে ধান ও চিড়ে কুটা হচ্ছে; আখ, খেজুর বা তালের রস পাকে চড়েছে, গুড় হবে; বাঁশ, বেত ও শোলার কতই না প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী হচ্ছে। তা ছাড়া পশম, রেশম শিল্প, কারু শিল্প দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের সকল জায়গার এই একই চিত্র।

পরিবারের লোকজনের মিলিত চেষ্টায়, প্রয়োজন বোধে ২।৪ জন আশেপাশের কর্মী সঙ্গে নিয়ে গ্রাম গঞ্জের কারিগর স্বাধীনভাবে কুটির শিল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে দর্পের সঙ্গে শুধু আভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্য সরবরাহ করে ভারতকে ঐশ্বর্যময়ী করেছে। এই সুদৃঢ় অর্থ-নৈতিক কাঠামোর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—শিল্পায়নের কাজ যদিও ঘরে ঘরে চলতো, কিন্তু সংযোগ বিহীন ভাবে মোটেই নয়; কামার, কুমার, ছুতার, স্বর্ণকার, চর্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে ছিল অপূর্ব সংগঠন। কেবল উৎপাদক নয়, প্রতি শিল্পের মহাজন ব্যবসায়ীদের মধ্যেও সংঘশক্তি বিস্ময়কর ছিল। প্রত্যেক শ্রেণী নিজস্ব আইন-কানুন রচনা করতো এবং স্ব স্ব নেতার অধীনে তা কঠোর ভাবে প্রতিপালন করা হতো। প্রতিটি শিল্পই ছিল প্রায় বংশগত, সাধারণত পিতার পেশা পুত্র গ্রহণ করতো; ফলে সুদক্ষ শিল্পী পরিবার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকতো। এক একটি শিল্প স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। ভারতীয় সমাজে জাতি ও শ্রেণীগত বন্ধনের যত আঁট ছিল, রাষ্ট্রীয় বন্ধনের প্রভাব কখনই তত প্রবল হয়ে ওঠেনি।

দেশজোড়া সেই গৌরবময় গ্রামোদ্যমের মূলে কুঠারাঘাত করেছে ইংরেজ। দু'শ বছরের সে-বিপর্যয়ের ইতিহাস কা'রো অজানা নেই। একদিকে রাজশক্তির আনুকূল্যের অভাব, অপরদিকে শিল্প বিপ্লবের অদম্য প্রতিযোগিতা শিল্পোদমের সেই শক্ত বাঁধুনি একেবারে শিথিল করে দিয়েছে। সম্পূর্ণ ধ্বংস না হলেও গ্রামে গ্রামে কর্মের সে আর স্পন্দনা নেই। পরিবারের গণ্ডির মধ্যে ছাড়া-ছাড়া ভাবে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে বেঁচে আছে। একজোট হয়ে কাজে এগোবার মত আত্মবিশ্বাস অনেকেই হারিয়ে ফেলেছে। দশ বছর হয়ে গেল বিদেশী নাগপাশ খসে গেছে। যুগ প্রগতির সঙ্গে তালরেখে গোটাগ্রাম বা কয়েকটি পার্শ্ববর্তী গ্রামমিলে এক একটি পরিবারের মত হয়ে মনোৎপাদনের কাজে নতুন করে লাগবার মত আগ্রহ এখনও দেখা দেয়নি। অর্থ-উপার্জন, শক্তি-উপার্জনের ক্ষেত্রে এই অসম্মিলিত প্রয়াসই আমাদের জাতীয় জীবনের দৈন্যদশার প্রধান কারণ। লোক বেড়েছে অনেক, চাহিদা বেড়েছে তার চেয়ে আরো অনেক। সংগঠনহীন দুর্বল হাতিয়ার নিয়ে বিপুল চাহিদা ও প্রতিযোগিতার বাজারে গ্রাম্য কারিগরদের এঁটে ওঠা অসম্ভব। জীবিকা অর্জনের পথকে সুগম করতে হলে জনজীবনে সচেতন ও সক্রিয় সহযোগিতার একান্ত আবশ্যক। এই সহযোগিতার বাস্তবরূপই সমবায় সংগঠন।

ভারতের সংবিধানে দেশকে কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ গড়বার কল্পনা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি। এই কারণেই রাশিয়ার মত প্রাইভেট সেক্টার বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাইভেট সেক্টারকে স্বাধীনতা দেওয়া ঘোর বিপদজনক। সমাজে ধনবান ও বিত্তবানদের হাতে অর্থ ও সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে, উৎপাদনের উপকরণ ক্রমশঃ তাদের করায়ত্ত হয়ে যায়। তাই সরকারী তত্ত্বাবধানে মূল ও ভারী শিল্পগুলি ক্রমশঃ গড়ে তুলবার চেষ্টা চলছে, এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন। গ্রামীন অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের কথা নতুন করে ভাবতে গেলে সমবায়ের বিকল্প কোন সংস্থার কথা মনে জাগে না। ধনিক গোষ্ঠীর সর্বগ্রাসী বুনিয়াদ ক্ষুধার সামনে অসহায় কৃষক, দুর্বল কারিগর ও ক্রেতাসমাজ জার্মানী, গ্রেটবৃটেন, ডেনমার্কে—সমবায় সংস্থার পত্তন ক'রে শুধু আত্মরক্ষা করেনি, হৃতগৌরব অনেকখানি ফিরিয়ে এনেছে। ১৯৪৮ সালে ডেনমার্কে দুধের যত কারবারবার হয়েছে তার শতকরা ৯০·৪ ভাগ সমবায় ভেয়ারী সংস্থা পরিচালন করেছে। ঐ একই বৎসরে মাখন ও ডিম রপ্তানী বাণিজ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠানের অংশছিল শতকরা ৫৫·৫ ও ৩০·১ ভাগ। মোটকথা, ডেনমার্কে যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী ও রাসায়নিক সারের কারবারবারের শতকরা ৫৩·১ ও ৩৮·৫ ভাগ সমবায় সমিতির পরিচালনাধীন। বিত্তহীন জনসাধারণের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দৃঢ়প্রচেষ্টা বড় বড় পুঁজিপতিদের প্রভাবপ্রতিপত্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে এই ভাবে ডেনমার্কে প্রতিহত করা হয়েছে। সুসংহত প্রাথমিক সমিতিতে গোটাদেশ ছেয়ে আছে।

গত দুই মহাযুদ্ধে আমাদের সহরগুলোর গা'ঘেসে যন্ত্র ও বিদ্যুৎ শক্তির সহায়তায় ছোট ছোট অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে। গেঞ্জির কল, রকমারী চুড়ী, বোতাম, চিরুনীর কারখানা; ছুরি, কাঁচি, প্লাষ্টিকের খেলনা, খেলাধুলার বহুবিধ উপকরণ, বৈদ্যুতিক সংযোগের ছোটখাট সাজসরঞ্জাম, সাইকেলের অংশ ইত্যাদি কতজিনিষেরই না ছোট কারখানা বৃহৎশিল্পের পাশে দাঁড়িয়ে উঠেছে। অথচ দেহের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এযাবৎ তিনটি দুরূহ সমস্যার ভোগ কোরে আসছে—প্রথমত:—সরকারী আনুকূল্য ও সহানুভূতি থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত রয়েছে; দ্বিতীয়ত:—চরম অর্থাভাবের মধ্যে দিন কেটেছে এবং পণ্য বিক্রীর অনিশ্চয়তা সদাসর্বদা তাদের নিরুৎসাহ করেছে; :—সংগঠন হীনতার ফলে প্রতিযোগিতায় মার খেয়েছে, পণ্য উৎপাদনে উৎকর্ষ রক্ষা করতে সক্ষম হয় নি। বর্তমান স্বাধীন সরকার প্রথম দুই বাধা যথাসাধ্য দূর করবার চেষ্টা করছেন। আমাদের নিত্যব্যবহার্য ও অত্যাবশ্যক উপকরণ সমূহ এবং যেসব সামগ্রী ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে উৎপাদন করা সম্ভবপর তা' বিকেন্দ্রিত আকারে গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠুক—উৎপাদনের কাজে আধুনিক হাতিয়ার ব্যবহৃত হোক, সুষ্ঠুভাবে কারবারবার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করতে শিখুক; মূলকথা আত্মশক্তিতে নিজের পায়ে দাঁড়াক—এটাই সরকারের ইচ্ছা। প্রথম অবস্থায় স্থায়ী ও চালু মূলধন যথাসাধ্য সরবরাহ করতে সরকার উন্মুখ। ছোটখাট শিল্পের কারবারীকে এখন সরকার ব্যক্তিগত জামিনে হাজার টাকা এবং অতিরিক্ত অপর একজন জামিনের বিনিময়ে ৫০০০৲ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ শতকরা তিনটাকা সুদে দিতে চান। সমবায় সমিতি শতকরা আড়াই টাকা সুদে ঋণ পাবার অধিকারী। সরকারী নীতির কল্যাণেই আমাদের পুরাতন তাঁত, খাদি, রেশম পশম ও কারুশিল্প এবং নারিকেল ছোবড়ার শিল্প পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সংগঠন গড়ে তুলবার দায়িত্ব প্রধানত কারিগর ও শিল্পকর্মে রত ব্যক্তিদের। পারস্পরিক সহযোগিতার আকুলতা সরকার এনে দিতে পারে না। সরকার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে মাত্র। ভারত সরকার শিল্পসমবায়কে নানাভাবে

অর্থ সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছেন—শেয়ার ক্যাপিটালের শতকরা ৭৫% টাকা দুই বছরের ঋণ স্বরূপ এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের শতকরা ৭৫% ভাগ টাকা ১০ বছরের ঋণ হিসেবে দিতে চান। সমবায় বিভাগের কর্মাধ্যক্ষের দরুণ যে খরচ পত্র হবে তার ৫০% ভাগ দানস্বরূপ দিবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট-ব্যাঙ্কের সহায়তা, বল্প সুদে সরকারী সাহায্য পরাধীন আমলে দেশীয় কুটির শিল্প কখনও ভাবতে পারেনি। অথচ জনচিত্তে তেমন আলোড়ন দেখা দিচ্ছে না। জনবলই আমাদের বড়ো বল। আত্মসচেতন জনতার শক্তির সহযোগিতা ও মিলনের মধ্যেই আমাদের সত্যকারের মুলধনের উৎস লুকিয়ে আছে। কিন্তু বাংলায় এই বিরাট শক্তি কেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে না তার কারণ অতি স্পষ্ট।

গ্রাম্য কৃষক ও কারিগরদের অশিক্ষা ও জড়তা সমবায় সংস্থা গড়বার পথে প্রধান বাধা হয়ে আছে। দেশ দুনিয়ার বাজারের কোন খবর তারা রাখে না, কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংগঠন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের ক্ষমতা তাদের নেই, সঠিক হিসাবপত্র রাখতে জানে না। আমাদের স্কুল কলেজে সমবায় মূলক মনোভাব গড়ে তুলবার মত কোন শিক্ষা চালু করা হয়নি। ডেনমার্কের শিক্ষা ব্যবস্থাই দেশজোড়া সমবায় গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে মর্যাদা দেবার বাসনায় যদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়ে থাকে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঐ একই কারণে সমবায় শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মচারী মফঃস্বলে পাঠাবার জন্যে কয়েকটি বিদ্যালয় খুলেছেন। সমবায়মূলক কর্মধারা দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসবার জন্যে সরকার গত কয়েক বছরে বহুঅর্থ ব্যয়ে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে দেশ বিদেশে পাঠিয়েছেন। ফিরে এসে তাঁদের অনেকে তথ্যমূলক গ্রন্থ লিখেছেন, সংবাদপত্রের পাতায় সুচিন্তিত প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন; দুঃখের বিষয় নিজেদের মানুষ ও মাটি নিয়ে সমবায়ে আত্মনিয়োগ করেন নি। কৃষক ও কারিগরদের সাথে ওতপ্রোত ভাবে মিশে কাজে না লাগলে সমবায়ের পথে ওদের অনুপ্রাণিত করা সুকঠিন। সে ঐকান্তিকতার অভাব আছে।

সমবায় গড়বার যে আকাঙ্ক্ষা ইদানীং দেখা দিয়েছে তাতে সন্তোষলাভ করা মুস্কিল। প্রকৃত চাষী ও কারিগরদের নিজের গড়া সমবায় বড়ো একটা দানাবেঁধে উঠছে না; এদের জনকয়েককে জড়িয়ে নিয়ে জোতদার ও ব্যবসায়ীদের সমবায় সমিতি গজিয়ে উঠেছে। ব্যক্তির পরিবর্তে সমবায় বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা করতে সরকার অধিকতর আগ্রহী। গ্রামগঞ্জের ছোটখাট 'ধনবান্' ও শক্তিমান্ কারবারী ব্যক্তিরা এই সরকারী নীতির সুযোগ নেবার প্রলোভনে সমবায় সংস্থা গড়ে তুলবার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন; পুঁজির সাশ্রয় হলে কারবার ভাল চলবে এই আশা। সমবায়ের আদর্শ এখানে অপ্রধান, অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই মূলকথা। "অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকা নির্বাহের উপায় করিব; শুধু টাকায় নয়, মনে ও শিক্ষায় সকলে মিলিয়া বড়ো হইব।" সমবায়ের এই সমিতি গড়ে উঠেছে এবং উঠছে; কিন্তু অধিকাংশই তাঁতবস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণাধীন সমিতি, ঠিক উৎপাদকদের সমিতি বলতে যা বোঝায় তা নয়। সস্তা হিসেবে তাঁতীরা সুতো পাচ্ছে, সুলভে সুতো যাতাতে পারছে, তৈরী কাপড় নিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে না; সমিতির সংগে সংশ্রব এর বেশী নয়। দরিদ্র চাষী ও কারিগরদের অর্থসাহায্য একান্ত প্রয়োজন এবং সর্বাগ্রে দেওয়া দরকার। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনার যা-কিছু সুযোগ এদের ডিঙিয়ে গ্রামগঞ্জের বিত্তবানদের করায়ত্ত হচ্ছে। সমবায় বিভাগের প্রচলিত আইন-কানুন এর জন্য অনেকটা দায়ী। ঋণ পরিশোধ যোগ্য ব্যক্তির বিষয়-

আশার সহায়-সম্পদ অনুসন্ধান করে ঋণদান করতে গেলে তেলে মাথাতেই তেল পড়বে, তাতে আর সন্দেহ কি ? পুরাতন এই নিয়মের আশু পরিবর্তনের কথা সরকার এখন ভাবতে সুরু করেছেন—ঋণ পরিশোধ যোগ্য ব্যক্তির (credit worthy person) পরিবর্তে ঋণ পরিশোধ যোগ্য কর্মে (credit worthy activities) নিয়োজিত আছে কি না সেটাই হবে বিচার্য বিষয়। যারা উৎপাদক কর্মে নিযুক্ত আছে এবং যে উদ্যোগ অদূর ভবিষ্যতে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায় এমন কর্মপ্রচেষ্টায় সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করলে প্রকৃত কারিগরদের মধ্যে কর্মপ্রেরণা অবশ্যই বেড়ে যাবে। এতে উৎপাদন বাড়বে আবার কর্মক্ষেত্রের বিস্তার হবে। কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈরী ক'রে জীবিকানির্বাহ করে এমন অনেক লোক মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জিলায় ছড়িয়ে আছে। তাঁতী বাস করে না এমন জিলা বোধ করি বাংলায় নেই। আর্থিক সংগতির যোগ্যতা বিচার করে ঋণ দিতে গেলে এদের অধিকাংশই ঋণ পাবার অযোগ্য গণ্য হবে। অথচ শিল্পের প্রাণশক্তি বিচার করলে ঋণ দিতে কোন বাধা থাকে না।

এ যাবৎ একশেণীভুক্ত লোক নিয়ে গ্রামাঞ্চলে প্রধানত ঋণদান সমিতি গড়বার চেষ্টা হয়েছে। এতে গ্রামের ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে, আর সমিতির সভ্যসংখ্যাও তেমন বাড়েনি। গ্রামের প্রাথমিক সমিতি কেবল ঋণদান নিয়ে ব্যাপৃত থাকিলে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। মালটি-পারপাস সমিতিই গ্রামের উপযোগী ; এই সমিতি গ্রামের ব্যাঙ্কের কাজ করবে। গ্রামবাসীর স্বল্প সঞ্চয় নিশ্চিন্তে এখানে জমা রাখতে পারা যাবে আর প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য খরিদ বিক্রীর দায়িত্ব নিতে পারবে। গ্রামের সকলেই সভ্য হবার যোগ্য হবে। সর্বার্থসাধক প্রাথমিক সমিতি গড়ে তুললে সকল শ্রেণীর কারিগর ও কৃষকের এতে স্থান হবে। কয়েকটি মালটি পারপাস সমিতি মিলে একটি করে বিপণন সমিতির স্থাপনা করা উচিত। এতে খরিদ বিক্রীর সমস্যা বহুলাংশে বিদূরিত হবে ; গ্রামের টাকা হুহু করে সহরে ছুটবে না, দালাল ফড়িয়া শ্রেণীর অনেকটা অবলুপ্তি ঘটবে।

আর এই কাজে সমবায় নীতি ও কর্মধারায় অভিজ্ঞ সরকারী কর্মচারী থানায় থানায় নিয়োগ করে চাষী ও কারিগরদের সমবায় সংস্থার গুণাগুণ, পরিচালন পদ্ধতি। হিসাবপত্র রাখবার নিয়মকানুন হাতে ধরে শিখিয়ে দেওয়া দরকার। গ্রামের প্রাথমিক সমিতিগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও সাধারণের আস্থাভাজন না করতে পারা পর্যন্ত গ্রামবাসীর মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব ও অভ্যাস আনা সুকঠিন। গরীব মানুষ তার প্রাণপাত করে জমানো স্বল্প সঞ্চয় তরসা করে রাখবে কোথায়। অভাবী সংসারে সময় অসময়ে টান লেগেই থাকে, কাজেই তার প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম চোখের সামনে দেখতে চায়। এই কারণেই প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্ক বা সর্বার্থসাধক সমিতির প্রয়োজন এখন সবচাইতে বেশী। গণতন্ত্রকে সার্থক রূপ দিতে গেলে ক্ষমতা ও কর্মের বিকেন্দ্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। রাজনীতির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েৎ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে, আর সমবায় সংস্থা হবে ভারতীয় অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ। যদি গ্রামীন অর্থনীতিকে সুগঠিত সমবায়ের আওতায় আনা সম্ভব না হয় তবে আজকের ভারতজোড়া সমষ্টি উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হবে, আর পারস্পরিক সহযোগিতায় জনগণ যদি সচেতন ও সক্রিয় হয়ে না উঠে তবে গণতন্ত্রের ভারতে মৃত্যু ঘটবে। স্বাবলম্বী, সহযোগী ও অবিরোধী সমাজ সমবায় ছাড়া গড়ে তোলা অসম্ভব। ভারতবাসীর আর্থিক জীবনে এটা রূপায়িত করতে পারলে ভারত বিশ্বশান্তির পথ প্রদর্শক হবে। কর্মপ্রার্থী শিক্ষিত সমাজের উপরেই এতবড় গুরু দায়িত্ব বহুলাংশে নির্ভর করছে। আজ গ্রামে গ্রামে শিক্ষিত চাষী ও শিক্ষিত কারিগর একান্তভাবে চাই। তারাই হবে সমবায় সংগঠনে পুরোধা-প্রাণ্য নেতা।

বাংলা পরিভাষা

অধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্রকুমার মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

Section 8—অনুবিভাগ ৮

Banking & Currency—ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও মুদ্রা

Abrasion (of coin)—মুদ্রাক্ষয়, অপঘর্ষণ

Alloy—খাদ, মিশ্র ধাতু

Alternative standard—বিকল্প মান

Appreciation of money—অর্থের মূল্যবৃদ্ধি

Appraiser—মূল্য নির্ধারক

Bank—ব্যাঙ্ক, অধিকোষ

„ charges—ব্যাঙ্ক প্রভার

" draft—ব্যাঙ্কের হুণ্ডি

" rate—ব্যাঙ্কের হার

" " policy—ব্যাঙ্কহার নীতি

" reference—ব্যাঙ্কের সুপারিশ

" return—ব্যাঙ্কের বিবরণী

Bank Agricultural—কৃষি ব্যাঙ্ক

" Central—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অধিকোষ

" Clearing—নিকাশী ব্যাঙ্ক

" Credit—দাদনী ব্যাঙ্ক

" Exchange—বিনিময় ব্যাঙ্ক

" Indigenous—দেশী প্রথার ব্যাঙ্ক

" Industrial—শিল্প ব্যাঙ্ক

" Joint-stock—যৌথ মূলধন ব্যাঙ্ক

" Reserve—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

" Scheduled—অনুসূচিত ব্যাঙ্ক

Banker—শ্রেষ্ঠী, ব্যাঙ্ক মালিক

Banking—ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

Bankruptcy—দেউলিয়া

Bill of Exchange—বিনিময় পত্র, হুণ্ডি

Bimetallism—দ্বিধাতুমান

Blocked currency—অবরুদ্ধ বিদেশী পাওনা

Brassage—মুদ্রা নির্মাণ বাবদ

Bullion—(স্বর্ণ বা রৌপ্যের) বাট বা পিণ্ড

Chancellor of Exchequer—অর্থমন্ত্রী, অর্থসচিব

Cheap money—সুলভ মুদ্রা

Cheque—চেক

" Bearer—বাহক দেয় চেক

" Blank—নিরক্ষ চেক, সাদা চেক

„ Crossed—রেখিত চেক, রেখাঙ্কিত চেক

" Payable to order—আদিষ্ট চেক

Cheque post-dated—উত্তরতিথি চেক, পরবর্তী তারিখ বিশিষ্ট চেক

" stale—গতমেয়াদ চেক

Circulating medium of exchange—প্রচলিত বিনিময়-মাধ্যম

Clearing House—নিকাশ ঘর, চেক নিকাশ ঘর, চেক মিটাইবার ব্যাঙ্ক

Coin—মুদ্রা

„ Bad—নিকৃষ্ট মুদ্রা

„ Base—হীন মুদ্রা

„ Current—প্রচলিত মুদ্রা

„ Counterfeit—জাল মুদ্রা

„ Standard—প্রামাণিক মুদ্রা, মানমুদ্রা

Coinage—টঙ্কণ

„ Free—অবাধ টঙ্কণ

„ Gratuitous—নিঃশুল্ক টঙ্কণ

„ Restricted—সীমাবদ্ধ টঙ্কণ

Consolidation of debt—ঋণ একত্রীকরণ

Controller of Currency—মুদ্রা নিয়ন্ত্রক, মুদ্রা নিয়ামক

Conversion of loans—ঋণ রূপান্তরকরণ

Convertible—পরিবর্তনযোগ্য

„ paper money—পরিবর্তনযোগ্য কাগজী মুদ্রা

Counterfeit—জাল, নকল

Credit—জমা, ধার, প্রত্যয়

Creditor—ঋণদাতা, উত্তমর্ণ

Crossing—রেখাঙ্কন

„ General—সাধারণ রেখাঙ্কন

„ Restrictive—নিয়ন্ত্রিত রেখাঙ্কন

„ Special—বিশেষ রেখাঙ্কন

Currency—মুদ্রা

„ Composite—মিশ্র মুদ্রা

„ Deflation of—মুদ্রা সংকোচন

„ Devaluation—মুদ্রামূল্য হ্রাস

„ Hard—দুর্লভ মুদ্রা

„ Inflation—মুদ্রাস্ফীতি

„ Soft—সুলভ মুদ্রা

„ Notes—পত্রমুদ্রা

„ System—মুদ্রা ব্যবস্থা

Dear money—দুর্লভ মুদ্রা

Debt—ঋণ

Debt Conciliation—ঋণ মীমাংসা
" Liquidation—ঋণ পরিশোধ
" Recovery—কর্জ্জ এয়াদীল
" Redemption—ঋণ-মুক্তি, ঋণ-মোচন
" Repudiation—ঋণ অস্বীকার
„ Public—সরকারী ঋণ
Debtor—ঋণী, খাতক, অধমর্ণ
Declared value—ঘোষিত মূল্য
Deed of acquittance—অভিমুক্তি পত্র, রেহাই নামা, ফারখতি
„ Assignment—স্বত্বনিয়োগ পত্র
„ Mortgage—বন্ধকীপত্র, রেহন নামা
Defalcation—আত্মসাৎ, তহবিল তছরূপ
Deffered annuity—বিলম্বিত বার্ষিকী
Deficit—ঘাটতি, ঊনতা
Deflation—সংকোচন, অবসার
Demand deposit—চাহিবামাত্র দেয় আমানত
Demonetisation—বিমুদ্রীকরণ
Deposit—গচ্ছিত, ন্যাস, আমানত
„ Cash—নগদ আমানত
„ Current—চলতি আমানত
„ Fixed—স্থায়ী আমানত
„ Warrant—আমানত পত্র
Depositor—আমানতকারী
Depreciation of money—অর্থের মূল্যহ্রাস
Devaluation—মূল্যহ্রাস
Discount—বাটা
Dishonoured—অস্বীকৃত, অনাদৃত
Double standard—দ্বিমান
Draft—হুণ্ডি
Drawee—হুণ্ডিগ্রাহক
Drawer—হুণ্ডিপ্রেরক, হুণ্ডিকর্ত্তা
Endorse—পৃষ্ঠাঙ্কণ করা, সহি করা
Endorsement—পৃষ্ঠাঙ্কণ, সহি, স্বত্বান্তরকরণ
„ General—সাধারণ স্বত্বান্তরকরণ
„ Partial—আংশিক „
„ Special—বিশেষ „
„ Restrictive—নিয়ন্ত্রিত „
Endorser—সহিদাতা
Exchange—বিনিময়
„ Rate—বিনিময় হার
„ Ratio—বিনিময় অনুপাত
„ Foreign—বৈদেশিক বিনিময়
Exchequer—সরকারী কোষ
Expenditure—ব্যয়
Federal Finance যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা
Fiat Money—সরকারী হুকুমে প্রচলিত পত্রমুদ্রা
Fiduciary Paper money—প্রত্যয়ী পত্রমুদ্রা
Finance—অর্থ
„ Act—অর্থ আইন
„ Minister—অর্থমন্ত্রী, রাজস্বমন্ত্রী
„ Public - রাজস্ববিজ্ঞান
Financing—অর্থ ব্যবস্থা
„ Deficit—ঘাটতি অর্থব্যবস্থা
Financial Adviser—আর্থিক পরামর্শদাতা অর্থোপদেষ্টা
„ Year—আর্থিক বৎসর
Fixed Account—স্থায়ী হিসাব
Forced Currency—হুকুমতী মিক্কা
Free Banking—অবাধ ব্যাঙ্ককার্য
„ Coinage—অবাধ টঙ্কণ
„ Mintage—নিঃশুল্ক মুদ্রাচালাই
Function of money—অর্থের প্রকার্য
Fund—নিধি, কোষ, তহবিল
Funded debt—স্থায়ী ঋণ, নিহিত ঋণ
General Price level—সাধারণ মূল্যস্তর
Gilt edged—স্বর্ণসমান, সর্বোত্তম
Gold standard—স্বর্ণমান
„ Reserve – স্বর্ণমান কোষ
„ Bullion standard—স্বর্ণপিণ্ড মান
„ Exchange „ —স্বর্ণবিনিময় মান
„ Specie „ —স্বর্ণমুদ্রা মান
„ Reserve fund—স্বর্ণ সংরক্ষণ কোষ
Government Paper—সরকারী ঋণপত্র
„ Securities—সরকারী প্রতিভূতি

'বর্ত্তমান'

সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যামূলক শিক্ষণীয় পাক্ষিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যা—দুই আনা

প্রাচীন ভারতীয়গণের সোবিয়েৎ বংশধর

এ. পেরশিন

সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্র দুইটিতে "আফঘোন" নামে একটি জনগোষ্ঠী রহিয়াছে। ইহারা প্রাচীন ভারতীয়গণেরই উত্তরপুরুষ বলিয়া সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে। এই "আফঘোন"রা যে ভাষায় কথা বলে তাহা মূলতঃ একটি ভারতীয় উপভাষা এবং তাহাদের ভাষায় অসংখ্য হিন্দি, গুজরাটি ও পাঞ্জাবী শব্দের ব্যবহার আজও পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় প্রচলিত রহিয়াছে। কালক্রমে এই "আফঘোন"রা তাজিক ও উজবেক জন সাধারণের সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি আত্মসাৎ করিয়া লইলেও, ইহারা তাহাদের ভারতীয় পূর্বপুরুষদের স্মৃতির ভগ্নাংশ বহন করিয়া চলিয়াছে ভাষায়, লোককাহিনীতে ও গাথা-ইত্যাদিতে। ইহাদের ভারতীয় পূর্বপুরুষরা সম্ভবতঃ খাইবার গিরিদ্বারের মধ্য দিয়া কাবুল নদীর উপত্যকা পার হইয়া এই অঞ্চলে আসিয়া বসবাস সুরু করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই "আফঘোন"রা হইল সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অধিজাতি।

তাজিক ও উজবেক সোবিয়েৎ প্রজাতন্ত্র দুইটির এলাকায় স্তালিনাবাদ ও তেরমেজ্ অঞ্চলের মধ্যবর্তী কোন কোনস্থানে এমন কিছু লোক চোখে পড়িবে যাহাদের গায়ের রং স্থানীয় অধিবাসীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কালো। ইহারা নিজেদের "আফঘোন" বলিয়া থাকে। সুতরাং, সাধারণতঃ ইহাদের আফগান বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়। এমন কি, নৃকুলবিজ্ঞানীরাও এপর্যন্ত এইরূপই ভাবিয়া আসিয়াছেন। মধ্য-এশিয়ার জাতি-অধিজাতিগুলির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, একেকটি জাতিগোষ্ঠি এক দেশ হইতে অন্যদেশে গিয়া বসবাস সুরু করিয়াছে। তাই আফঘোনদের পূর্বপুরুষরা যে আফগানিস্তান হইতেই এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, সেরূপ ধরিয়া লওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু অতি সম্প্রতি তরুণ সোবিয়েৎ ভাষাতাত্ত্বিক আই. ওয়ান্‌দ্বি এই আফঘোনদের সহিত দীর্ঘকাল কাটাইয়া এবং তাহাদের ভাষা অনুশীলন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহারা যে-ভাষায় কথা বলে তাহা মূলতঃ একটি ভারতীয় উপভাষা। আফঘোন-ভাষায় অসংখ্য হিন্দি, গুজরাটি ও পাঞ্জাবী শব্দের প্রচলন রহিয়াছে। আফঘোনদের নিজস্ব কোন লিপি নাই। কিন্তু ইহাদের ভাষা ও পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত লোক-গাথা-কাব্য-কাহিনী-ইত্যাদি অনুশীলন করিয়া ওয়ান্‌দ্বি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে আফঘোনরা ভারতীয়দেরই বংশধর। সোবিয়েৎ নৃকুল-বিজ্ঞানীরাও নূতন করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইবার পর মনে করিতেছেন যে ওয়ান্‌দ্বির এই সিদ্ধান্ত মূলতঃ সঠিক।

সোবিয়েৎ মধ্য এশিয়ার এই আফঘোন অধিজাতির অন্তর্ভুক্ত সাত শত লোকের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। গিসার, শাখ্‌রিনাউ, শুব্‌চি, সারি-আসিয়া, দেনাউ, রেগার, ইত্যাদি পাশাপাশি জেলাগুলিতে ইহাদের বসবাস। উজবেক ও তাজিকদের মতোই, ইহাদের প্রধান পেশা হইল চাষবাস। যৌথখামারের মারফতে ইহারা প্রধানতঃ তুলা উৎপাদন করিয়া থাকে। আফঘোন

পরিবারগুলি যথেষ্ট পরিমাণে গবাদি-পশুর মালিক এবং অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। বলা বাহুল্য, তাজিক ও উজবেকদের সহিত একই গ্রামে দীর্ঘকাল ধরিয়া পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে আকখোনরা অনেকখানি তাজিক ও উজবেক রীতিনীতি, সামাজিক আচার ও প্রথা এবং সংস্কৃতি আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। ধর্মের দিক দিয়া ইহারা সুন্নী-মুসলমান। কিন্তু, বিবাহ-ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ইহারা এমন কতকগুলি ক্রিয়াচার পালন করে যাহার সহিত তাজিক ও উজবেক ক্রিয়াচারগুলির কোন মিল নাই।

আজকাল আকখোনদের ছেলেমেয়েরা তাজিক ও উজবেক ছেলেমেয়েদের সহিত একসঙ্গে একই স্কুলে পড়াশোনা করে। সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতির দিক দিয়া আকখোনরা প্রাচীন ইহুদীদের কতকগুলি প্রথা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে: যেমন, মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু মৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিতে পারিবে না। আকখোন মেয়েরা আকখোন পুরুষ ছাড়া কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে না—যদিও পুরুষরা তাজিক বা উজবেক মেয়েদের বিবাহ করিতে পারে। অর্থাৎ, আকখোনদের মধ্যে মেয়েদের অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা ঢের বেশি।

কিন্তু আকখোনদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল তাহাদের ভাষা। নারী-পুরুষ সকলেই স্বচ্ছন্দভাবে তাজিক ও উজবেক ভাষা বলিয়া থাকে, অনেকে রুশ ভাষাও জানে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তাহাদের নিজস্ব ভারতীয় উপভাষাকেই তাহারা ব্যবহার করে এবং সমস্ত পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে তাহারা নিজেদের ভাষা ব্যবহার করার নিয়মটিকে কড়াকড়িভাবে মানিয়া চলে। এই ভাষার কোন লিপি না থাকায় পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে ইহা প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইহার ফলে উচ্চারণগত বিকৃতি প্রায় ঘটে নাই বলিলেই চলে। যেমন, হাত, আঁখ (চোখ), মু (মুখ), গা (গাই), ঘোড়ে (ঘোড়া), আগ (আগুন), পানি, দিন, রাত, ইত্যাদি উত্তর ভারতীয় শব্দগুলি এবং আরও অসংখ্য হিন্দি, পাঞ্জাবী ও গুজরাটি শব্দ তাহারা হুবহু উচ্চারণে ব্যবহার করে। লোককাহিনী, গাথা ও ছড়া-প্রবাদ-ইত্যাদিও তাহারা এইভাবে মুখে মুখে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। উত্তর-ভারতীয় লোককাহিনীগুলির সহিত এগুলির নিখুঁত মিল রহিয়াছে।

এই আকখোনদের ভারতীয় পূর্বপুরুষরা কাহারা? কিভাবে তাহাদের এই ভারতীয় পূর্বপুরুষরা এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন? প্রথমেই এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ট্রান্সককেশাস হইতে ভোল্গা নদীর নিম্নাংশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া—এবং প্রধানতঃ আস্ত্রাখানে যে-বহুসংখ্যক ভারতীয় বণিক ব্যবসায়সূত্রে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করিয়াছিলেন ও জন-বহুল এক ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই আকখোনরা হইল তাঁহাদেরই উত্তরপুরুষ।

কিন্তু নৃকুল-বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক বিচার-বিশ্লেষণে প্রমাণিত হইয়াছে আস্ত্রাখানের এই প্রাচীন ভারতীয়দের সহিত আকখোনদের কোন মিল নাই। তবে কি ইহারা আরও কয়েক শতাব্দী পূর্বে ভারত হইতে মধ্য-এশিয়ায় আগত লিউলি, জুলি, কাভোলো ইত্যাদি যাযাবর (জিপ্‌সি) অভিজাতিগুলির বংশধর? না, তাহাও নহে। আস্ত্রাখান-ভারতীয়দের সহিত অথবা তাঁহাদের পূর্ববর্তী ভারতীয় যাযাবর অভিজাতিগুলির সহিত আকখোনদের কোনরকম জুকুলগত, ভাষাগত ও নৃ-সংস্কৃতিগত (অ্যান্থ্রোপোকাল্‌চারাল্) মিল নাই।

ইহারা যে নিজেদের "আফঘোন" বলে, সেইখান হইতেই নৃকুল-বিজ্ঞানীরা আসল সূত্রটি বাহির করিয়াছেন। ইহারা অন্ততঃ তিন পুরুষ ধরিয়া সোবিয়েৎ মধ্য-এশিয়ায় বসবাস করিতেছে। কিন্তু তাহার পূর্বে ইহাদের ভারতীয় পূর্বপুরুষরা কয়েক পুরুষ ধরিয়া আফগানিস্তানেই বসবাস করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা অতিবৃদ্ধ, তাহারা পেশোয়ার ও কাবুল শহরের স্মৃতি এখনও ভোলে নাই। এমন কি, এই শহরগুলির আশে পাশে তাহাদের কিছু কিছু আত্মীয়স্বজনও রহিয়াছে বলিয়া তাহারা দাবি করে। আফঘোনদের একটি গাথায় উত্তর-ভারত হইতে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত যাতায়াতের পথের একটি নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা হইতে ওয়ান্‌স্কি ও অন্যান্য নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন: অন্ততঃ পাঁচ-ছয় পুরুষ পূর্বে—অর্থাৎ মোটামুটি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে—উত্তর-ভারতের কোন একটি জনগোষ্ঠী কোন কারণে (সম্ভবতঃ জীবিকার তাগিদে) খাইবার গিরিদ্বার পার হইয়া কাবুল নদীর উপত্যকা-অঞ্চলে আসিয়া বসবাস সুরু করেন। পরে ইহাদের একাংশ আরও উত্তর-পশ্চিমে আগাইয়া গিয়া তেরমেজের নিকটে আমুদরিয়া নদী পার হইয়া ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া গিয়া গিসার উপত্যকা হইতে বর্তমান স্তালিনাবাদ পর্যন্ত এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেন।

বলা বাহুল্য, আফঘোনদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ গবেষণা—অনুসন্ধানের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। এখনও অনেকগুলি নৃতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যেমন: ভারতের বহু ভাষার মধ্যে এই উপভাষাটির সঠিক স্থান কোথায়? দেড়শত বৎসর পূর্বের এই ভারতীয় দেশত্যাগীদের মধ্যে হিন্দী, পাঞ্জাবী ও গুজরাটি—এই তিন ভাষাভাষী লোকই ছিলেন কি-না? এই জনগোষ্ঠীর আদি নৃকুলগত বিন্যাসটিই বা কিরূপ ছিল? ইত্যাদি। এইসব প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীরা বিশেষ উৎসাহের সহিত গবেষণা-অনুশীলনের কাজ চালাইয়া যাইতেছেন।

ভারতে মেষ ও পশম উন্নয়ন

সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৬০ কোটি মেষ আছে। আর, ভারতে উহাদের সংখ্যা হইতেছে ৪ কোটি। অর্থাৎ এ বিষয়ে ভারতের স্থান পঞ্চম। মেষ হইতে বাৎসরিক প্রায় ৬ কোটি পাউণ্ড পশম সংগৃহীত হয় এবং ৯ কোটি টাকা মূল্যে বিদেশে বিক্রয় করা হয়। মেষের চামড়ার মূল্য বাবদও অতিরিক্ত ৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, মেষ পালকেরা অতিরিক্ত মেষ বাজারে বিক্রয় করিয়া বাৎসরিক ৩০ কোটি টাকা লাভ করে।

দেখা যায় যে, যেখানেই মেষ পালন করা হয়, সেখানেই চাষবাস বাড়ে। কারণ গোবরের তুলনায় মেষের নাদি চাষির অধিক পক্ষে দ্বিগুণ উপকারী সার। হিসাব করিয়া জানা গিয়াছে যে, একটি মেষ হইতে প্রতি বৎসর ঐরূপ ১৪ হইতে ১৯·৬ মণ সার পাওয়া যায়।

উত্তর ভারতের শুষ্ক সমতল ভূভাগ এবং উত্তর বোম্বাইয়ের জোরিয়া অঞ্চলের মেষ হইতেই বেশী পশম পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে সর্বাধিক মেষ বাস করে বিন্ধ্য পর্বত ও নীলগিরি পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায়।

রাজস্থানে ২০ লক্ষাধিক মেষ আছে এবং বিদেশে রপ্তানির এক তৃতীয়াংশ পশমই এই রাজ্য হইতে সংগৃহীত হয়। এখানকার চোকনা জাতীয় মেষের পশম দ্বারা উৎকৃষ্ট কার্পেট প্রস্তুত হয়।

ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পশম পাওয়া যায় বিকানীরের মেষ হইতে। পশম সরবরাহ ক্ষেত্রে উহার

পরেই উত্তর বোম্বাইয়ের জোরিয়া শ্রেণীর মেষের স্থান। পাঞ্জাবের লোহী শ্রেণীর মেষের লোম দৈর্ঘ্যে বেশ বড় হইলেও খুবই অমসৃণ। এই জাতীয় মেষের মাংস সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া, উহারা যথেষ্ট দুগ্ধও দেয়।

দাক্ষিণাত্যের মন্দা জাতীয় মেষের মাংসও বেশ ভাল। সেখানকার ছোট বাম্বুর জাতীয় মেষ চাষীবাসের সংগে সংগে পালন করিলে যথেষ্ট লাভ হয়।

পশম শিল্প—ভারতে কার্পেট, কম্বল, ও অন্যান্য দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে বাৎসরিক প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পশম ব্যবহৃত হয়। তথাপি দেশে উৎপন্ন কম্বল দ্বারা প্রতি ৩০জন ভারতীয়ের মধ্যে মাত্র একজনের প্রয়োজন মিটান সম্ভব। পশমী কাপড় ও হোসিয়ারী শিল্পের অবস্থা অনেকটা ভাল। কারণ দেশের চাহিদা মিটাইয়াও উহা কিছু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা করা যায়। রাশিয়া ভারত হইতে গরম কাপড় ক্রয় করে। আর, এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যে পাঞ্জাব হইতে পশমী হোসিয়ারী দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়। এই শিল্পের অধিকতর উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটি পশম উন্নয়ন পরিষদ গঠন করিয়াছেন।

ভারতের গরম কাপড়ের কারখানাগুলিতে ভাল কাপড় উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রায় ১১ কোটি টাকা মূল্যের ভাল জাতের কাঁচা অথবা আধা-তৈয়ারী পশম আমদানী করিতে হয়। ভারতে ভাল জাতের পশম উৎপাদন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ বিভিন্ন রাজ্যে গবেষণা চালাইতেছেন। উহার ফলে জানা গিয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে পশমের গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব হইবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা—দেশে মেষ ও পশমের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ সুরু করিয়াছেন। উন্নত ও সঙ্কর জাতীয় মেষের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার জন্য হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও সৌরাষ্ট্রে তিনটি মেষ প্রজনন কেন্দ্র খোলা হইবে।

১৯৫৬-৫৭ সনে দেশে ১৪টি মেষ ও পশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে আরও ১৬৬টি কেন্দ্র খোলা হইবে। ১৯৬১ সনের মধ্যে ঐরূপ ৩২৬টি কেন্দ্র স্থাপন বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ১৯৫৭-৫৮ সনে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এবং বোম্বাইয়ের মেষ প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে পশমের সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত কাজও সুরু করা হইবে।

শিল্পোন্নত রুমানিয়া

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত রুমানিয়া ছিল একটি অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু ঠিক যুদ্ধের পর হইতেই ইহাকে একটি শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলিতে থাকে। এ পর্যন্ত ১০০টি নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত ২০০টি কারখানা স্থাপনের পথে। তন্মধ্যে রহিয়াছে যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা, তৈল খনির জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা, রেলগাড়ী, কৃষি যন্ত্রপাতি, খনিজ পদার্থ উৎপাদন, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ঔষধ এবং ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন কারখানা। এই দেশে জাতীয় অর্থনীতির কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার পরিচয় নিম্নের তুলনামূলক হিসাবে সঠিকভাবে পাওয়া যাইবে।

মাথা পিছু উৎপাদনের পরিমাণ

	১৯৩৮ সাল		১৯৫৪ সাল
বিদ্যুৎ	৭২·৪ কিলোওয়াট আওয়ার	হইতে	২৮০·৪ কি: ও: আ:
ঢালাই করা লোহা	৮·৫ কিলোগ্রাম	,,	৩৩·২ কি:
ইস্পাত	১৮·২ কিলোগ্রাম	,,	৪৪·৩ কি:
অপরিশোধিত তৈল	৪২২·৭ কিলোগ্রাম	,,	৬২১·৩ কি:
সিমেন্ট	৩২·৭ কিলোগ্রাম	,,	১২০·৩ কি:
বস্ত্রাদি	৬·৭ বর্গমিটার	,,	১০·৯ ব: মি:
চিনি	৬·১ কিলোগ্রাম	,,	৮·৬ কি:
চামড়া	৬·৯ বর্গমিটার	,,	১৪·১ ব: মি:

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, রুমানিয়া আজ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান এবং অপরিশোধিত তৈল উৎপাদনে একাদশ স্থান অধিকার করে। এই তৈল উৎপাদনের পরিমাণ বাৎসরিক এক কোটি ১০ লক্ষ টন।

কৃষি উৎপাদনও পিছাইয়া নাই। ১৯৩৮ সালের তুলনায় ট্রাকটারের সংখ্যা ৮ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের চাষযোগ্য অর্ধেক জমিতে সমবায় চাষ ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। তুলা, গম, যব, শাকসব্জি, কারিগরী যন্ত্রপাতি, মদ এবং ফল উৎপাদনের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতীয় অর্থনীতিতে সর্বস্তরে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হওয়ায় রুমানিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে ৭০টি দেশের সহিত তাহার বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং বিদেশের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণও ১৯৪০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যাদিই রপ্তানি বাণিজ্যে সর্বাধিক পরিমাণ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কথাও রাষ্ট্র ভুলিয়া যায় নাই। প্রত্যেক ৪০০ রুমানিয়াবাসীর জন্য একটি করিয়া গ্রন্থাগার এবং প্রত্যেক পাঠকের জন্য ৪০টি হিসাবে বই রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক ১৬ জনের মধ্যে একজনের বেতার যন্ত্র আছে। ১৯৫৭ সালে প্রত্যেকটি লোক অন্তত ৫টি নাটক, কনসার্ট, থিয়েটার বা চলচ্চিত্র দেখিয়াছেন।

কোম্পানি আইনের কার্যকারিতা ও পরিচালনা

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী শ্রীসতীশ চন্দ্র ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ১৯৫৬-৫৭ সালের কার্যকারিতা ও পরিচালনা সম্পর্কে প্রথম বৈধ রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে কোম্পানি আইন পরিচালনা বিভাগ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মহাকরণে সদর দপ্তর স্থাপিত। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কানপুরে এক একটি করিয়া আঞ্চলিক অফিস এবং প্রতি রাজ্যে কোম্পানি রেজিষ্ট্রারের অফিস রহিয়াছে। আঞ্চলিক অফিসের কাজ হইল নিজ নিজ এলাকার বিভিন্ন রেজিষ্ট্রারের অফিসের কাজকর্ম তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করা, যৌথ প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি রিপোর্ট করা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে পরামর্শ দেওয়া ও সহায়তা করা।

রেজিষ্ট্রারগণ বর্তমানে আর শুধু দলিল-রক্ষক নয়। তাঁহারাও যৌথ প্রতিষ্ঠানের বিবরণী ও দলিল পরীক্ষা করেন এবং নূতন আইন যাহাতে মানিয়া চলা হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ঐ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯৫৮-৫৭ সালে মেমোরান্ডাম ৮৪৮টি নূতন কোম্পানি এবং গ্যারান্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ ২৯টি নূতন কোম্পানি নূতন আইনানুসারে রেজিষ্ট্রী করা হয়। আলোচ্য বৎসরে ২২৭টি সরকারী কোম্পানি বে-সরকারী কোম্পানিতে পরিণত হয়। ঐ বৎসরে ডিরেক্টার বোর্ড কোম্পানি পরিচালনার দিকে অধিক মনোযোগী হন। পনেরটি ম্যানেজিং এজেন্ট তাহাদের কাজ ত্যাগ করে।

ঐ বৎসরে রেজিষ্ট্রারগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ বৈঠক আহ্বানের জন্য এবং বার্ষিক হিসাব তৈয়ারী ও দাখিলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানি রেজিষ্ট্রারগণ ফাইল ও রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার দলিল পান। পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, উহাদের অধিকাংশই নির্দিষ্ট ফরম অনুসারে তৈয়ারী হয় নাই, বা উহাদের তথ্যাদি সম্পূর্ণ ও নির্ভুল ছিল না বা উহাদের সহিত যোগ্য লোকের স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট ছিল না। সন্তোষের বিষয় এই যে, নূতন আইনানুযায়ী রচিত বার্ষিক রিপোর্ট মোটামুটি ঠিকই হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানিগুলি ৩৬৫০টি বিশেষ প্রস্তাব পাশ করেন এবং এইসব প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টার ছিলেন ৫২৫০ জন। প্রায় তিন হাজার জন ডিরেক্টার লাভজনক পদে নিযুক্ত ছিলেন। উহার অর্ধেক ডিরেক্টার মাসে ৫০০এর কম মাহিনা পাইতেন ২৬০০ ডিরেক্টারের ৬ হাজার আত্মীয়ের সম্পর্কে প্রস্তাব পাশ করা হয়।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানি আইন পরিচালনা বিভাগ ১৩১০টি মামলায় যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। উহার মধ্যে ৭৩৮টী মামলা ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে দায়ের করা ছিল এবং ৫৭২টি মামলা ১৯৫৬-৫৭ সালে রুজু করা হয়। এইসব মামলায় ৪৫৯টি কোম্পানি জড়িত ছিল। আলোচ্য বৎসরে ৭০০টী মামলায় আদালতে মীমাংসা হয়, অথবা প্রত্যাহৃত হয় অথবা অন্যভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ৫৭৭টি ক্ষেত্রে দোষীর সাজা হয়। ঐ বৎসরের শেষে ৬০৭টী মামলা বিভিন্ন আদালতে অমীমাংসিত ছিল। আলোচ্য বৎসরে ৩৩০টী কোম্পানি

দেউলিয়া হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহা ছাড়া, রেজিষ্ট্রার ৬৫৪টী কোম্পানির নাম তাঁহাদের তালিকা হইতে কাটিয়া দেন এবং ১৪১টী কোম্পানি কারবার গুটাইয়া ফেলে।

যে সকল কোম্পানি আইনের ৪৯১ হইতে ৬০৮নং ধারাগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়। হিসাব দাখিল ছাড়া আর কোন বিষয়ে এই ধারাগুলি ১৯১৩ সালের আইনের ধারা হইতে স্বতন্ত্র নয়। আলোচ্য বৎসরে বিদেশী কোম্পানিগুলির বার্ষিক হিসাব তৈয়ার ও দাখিলের অসুবিধার দিকে কোম্পানি আইন পরিচালনা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিশেষ বিবেচনার পর সরকার আইনের কোন কোন ধারা সংশোধন করেন। এই বৎসরে ২৭টী বিদেশী কোম্পানি এদেশে তাহাদের শাখা অফিস খুলে। উহাদের বেশীর ভাগ ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ।

কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অগ্রিম বাণিজ্য চুক্তি

১৯৫০ সালের পশ্চিমবঙ্গ পাটজাত দ্রব্য আইন অনুযায়ী এ রাজ্যে বর্তমানে পাটজাত দ্রব্যের অগ্রিম বাণিজ্য চুক্তি নিষিদ্ধ রহিয়াছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অবাধে এই দ্রব্যের অগ্রিম বাণিজ্য চলিতেছে; তবে কাঁচা পাটের অগ্রিম বাণিজ্য চুক্তি অবশ্য হস্তান্তরযোগ্য নহে এইরূপ নির্দিষ্ট ডেলিভারী চুক্তি বাদে, সমগ্র দেশেই নিষিদ্ধ। যে চুক্তি অনুযায়ী কোন পাট কলে সরাসরিভাবে বা উহার জেটিতে অথবা রেলওয়ে সাইডিংয়ে এই পাট ডেলিভারী দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে এবং উহা যদি ইস্যিওর করা থাকে তবে সে চুক্তি নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হয়।

অগ্রিম লেনদেন বাজার কমিশন কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অগ্রিম বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে কোন কোন সমিতিকে অনুমোদন দেওয়া হইবে সে সম্পর্কে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর যে সুপারিশ করিয়াছিলেন ভারত সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুযায়ী স্থির হয় যে, কলিকাতা সহরের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এণ্ড হেসিয়ান এক্সচেঞ্জ লিমিটেড কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অগ্রিম বাণিজ্য চালাইবে। আরও স্থির করা হয় যে, কিছু সময়ের জন্য এক্সচেঞ্জের আওতার বাহিরে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের হস্তান্তর যে নির্দিষ্ট ডেলিভারী চুক্তি অনুমোদন করা হইবে।

কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকার ১৯৫২ সালের অগ্রিম বাণিজ্য চুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) আইন বলে কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এণ্ড হেসিয়ান এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে তিন বৎসরের জন্য কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অগ্রিম বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিয়াছেন। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অন্য কোন প্রকার অগ্রিম বাণিজ্য বেআইনী হইবে। ২৯শে মার্চ, ১৯৫৮, হইতে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইতেছে এবং গেজেট অব ইণ্ডিয়াতে এ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

বাগিচা তদন্ত কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত

কফি ও রবার শিল্প সম্পর্কে বাগিচা তদন্ত কমিশন যে সকল সুপারিশ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্ত গেজেট অব্ ইণ্ডিয়ার অতিরিক্ত সংখ্যায় স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। কফি আবাদ কফি বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন সরকার তাহা মানিয়া লইয়াছেন। তবে কফি রপ্তানি ব্যবসায়ের ভার সরাসরিভাবে কফি বোর্ডের উপর অর্পণ করিবার প্রস্তাব সরকার পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করেন নাই। সরকার স্থির করিয়াছেন

যে, বর্তমান রপ্তানি ব্যবস্থার সংশোধন করিয়া বিদেশী আমদানীকারকগণকে দেশের রেজিষ্টার্ড ব্যবসায়িগণের সঙ্গে কফি বিক্রয়ে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে। সেই সঙ্গে-পরীক্ষামূলক-ভাবে বোর্ডকে রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত কফির একটা অংশ সরাসরিভাবে বৈদেশিক ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে।

নূতন রবার বাগিচায় কেবলমাত্র অধিক উৎপাদনক্ষম রবারের বীজ বপন করিতে দেওয়া সমীচীন বলিয়া কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছিলেন সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের বাগিচা শিল্প যথা—চা, কফি ও রবার শিল্পের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অন্যান্য সমস্যা পর্যালোচনা করিয়া ন্যায্য মূল্য, ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা, উন্নয়ন প্রভৃতি সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য সরকার বাগিচা তদন্ত কমিশন গঠন করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্বে চা শিল্পের সুপারিশ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। রবার ও কফি শিল্প সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত এখন প্রকাশ করা হইল।

কফি শিল্প—কফি শিল্পের উন্নয়নের ব্যবস্থা সুসংহত করিবার জন্য কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন, কফি বোর্ড কফি বাগিচার আকার নিয়ন্ত্রণ করিবে না, সরকার ইহা মানিয়া লইয়াছেন। এখন হইতে নূতন কফি বাগিচা এবং কফি চারা পুনরায় রোপণ করিবার জন্য কফি বোর্ডের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে উপযুক্ত জমিতে কফির চাষ এবং উন্নত শ্রেণীর কফি চারা রোপণ করা সম্ভব হইবে।

কফি রপ্তানি—কফি বোর্ডের পরিচালনাধীনে কফি রপ্তানি বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত বলিয়া কমিশন মনে করেন। কারণ ছোট রপ্তানিকারকগণ বোর্ডকে উপযুক্ত মূল্যে কফি বিক্রয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে না। স্থির হইয়াছে যে, কফি বোর্ড রপ্তানির উদ্দেশ্যে কফি বিক্রয় পদ্ধতির সংস্কার করিয়া এই বিক্রয়ের ব্যাপারে স্থানীয় রেজিষ্ট্রীকৃত রপ্তানিকারকদের সহিত বিদেশী আমদানীকারকদেরও যোগদানের অনুমতি দিবেন। রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত কফির কিছু অংশ বোর্ড সরাসরিভাবে বিদেশী আমদানীকারকদের নিকট বিক্রয় করিবেন। পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গুড়া কফি রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বোর্ড সিদ্ধ কফি এবং গুড়া কফির রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করিতে সম্মত হইয়াছেন;

সমবায় সমিতিগুলিকে সুবিধাজনক মূল্যে কফি সরবরাহের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে সরকার তাহা বন্ধ করিবেন না। কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, সমবায় সমিতিগুলিকে নিলামের মূল্যে কফি দেওয়া উচিত। ইহা ছাড়া মূল্য অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। এদেশে গুচরা কফি যে মূল্যে বিক্রয় হয় তাহা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে পাইকারী মূল্য অপেক্ষা অনেক কম। সরকার এজন্য কোন সাহায্য তহবিল গঠন করা প্রয়োজন মনে করেন না। কমিশন মূল্য সাহায্য তহবিল গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন কফি উৎপাদকগণ তাহা পছন্দ করে না। কমিশন বলিয়াছিলেন যে, রপ্তানির নিলাম এবং কফি গুদামজাত অবস্থায় জল কণা শোষণ করায় ইহার ওজন বৃদ্ধি হেতু যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে উল্লিখিত দুইটি তহবিল গঠন করিতে হইবে।

কফি বোর্ড দেশের বিভিন্নকেন্দ্রে কফি তৈয়ারের ও বিক্রয়ের যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা অব্যাহত থাকিবে এবং সম্ভব হইলে সেগুলিকে বাড়ান হইবে। এই কারণে কমিশনের সুপারিশ

অনুযায়ী কফি বোর্ডের অধীনে স্বতন্ত্র কফি গুঁড়া উৎপাদন ও বিক্রয় সংস্থা স্থাপনের আবশ্যকতা নাই। উৎপাদন অতিরিক্ত কফি দেশের অভ্যন্তরে বণ্টনের জন্য কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সমবায় সমিতিসমূহকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। কমিশনের সুপারিশ মতে কফি বোর্ড ইতিমধ্যেই উহাদের প্রচার ব্যবস্থার সংস্কার করিয়াছেন। কমিশনের মতে, কফি উৎপাদন অঞ্চলসমূহে কফি হাউসগুলি আর রাখার আবশ্যকতা নাই। উহার পরিবর্তে চলমান গাড়ী ও চলচ্চিত্রের মারফতে এবং শহর, পল্লী অঞ্চল, মেলা ও প্রদর্শনীতে প্রচারণার দ্বারা অধিকতর সুফল পাওয়া যাইবে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কফির শোধন ব্যয় এবং অনুমোদিত এজেন্টদের দেয় কমিশনের চলতি হার পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইবে। উক্ত কমিটি প্রয়োজনবোধে দস্তুরীর ন্যায্য হার সুপারিশ করিবেন।

শুল্ক নির্ধারণ—কমিশন কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্কের সমান হারে কফির উপর কোনও রপ্তানি শুল্ক ধার্যের সুপারিশ করিয়াছেন। বর্তমানে কফির উপর কোনও রপ্তানি শুল্ক ধার্য নাই। সরকার এই সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বিভিন্ন জাতীয় কফির উপর বিভিন্নহারে উৎপাদন শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব কমিশন করিয়াছেন। সরকারের মতে তাহা কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

রবার-চাষ

রবার বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত একমাত্র অত্যুৎকৃষ্ট বীজই রবার ক্ষেত্রে বপন সম্পর্কিত কমিশনের সুপারিশ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। রবার চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে কমিশন এইরূপ সুপারিশ করেন যে, যাহাদের অনধিক ৫০ একর ক্ষেত্র রহিয়াছে তাহাদের অতিরিক্ত ২৫ হাজার একর জমিতে এবং যাহাদের বড় বড় রবার ক্ষেত্র আছে তাহাদেরও অতিরিক্ত ২৫ হাজার একর জমিতে রবার চাষ আরম্ভ করার অনুমতি দেওয়া উচিত। ক্ষুদ্র উৎপাদকদের অতিরিক্ত ৪৬ হাজার একর জমিতে রবারের চাষ আরম্ভ করায় জন্য রবার বোর্ড ইতিমধ্যেই লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছেন। অপর দিকে, বড় বড় উৎপাদকরা অতিরিক্ত জমিতে রবারের চাষ সুরু করিতে আগ্রহশীল নহেন। এই কারণে ছোট ও বড় উৎপাদকদের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে জমি বরাদ্দের আবশ্যকতা নাই। কমিশনের মতে, খাঁটি রবারের উৎপাদনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কৃত্রিম রবারের উৎপাদন সূচী প্রণয়ন করা উচিত। কৃত্রিম রবারের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে রবার আবাদী শিল্পের স্বার্থ যাহাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

সমবায় উন্নয়ন—বহু স্বার্থসাধক সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ দিবার জন্য কফি ও রবার বোর্ড কর্তৃক বিশেষ অফিসার নিয়োগের যে সুপারিশ কমিশন করিয়াছেন সরকার তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। এই সমবায় সমিতিগুলি বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সাহায্য করিবে। রবার ও কফি উৎপাদকগণকে বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্র উৎপাদকগণকে রাসায়নিক সার সরবরাহের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের উদ্যোগে উভয় শিল্পে একটি করিয়া সমবায় সরবরাহ সংস্থা স্থাপনের জন্য কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। সরকার মনে করেন, সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন রাজ্য সরকার যে সকল সমবায় সংস্থা গঠন করিতেছেন সেগুলি কফি ও রবার উৎপাদকদের চাহিদার দিকেও নজর দিতে পারিবে।

রাজ্য সরকারগণকে কৃষিজীবীদের জন্য সমবায় সংস্থা গঠনকালে কফি ও রবার উৎপাদকদের বিষয় বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানান হইতেছে। কোন একটি সংস্থাকে বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার দিলে বিশেষ সুবিধা হইবে না কারণ বর্তমান সার সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

চা, কফি ও রবার শিল্প সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য স্বতন্ত্র সংস্থা গঠনের সুপারিশ কমিশন করিয়াছিলেন কিন্তু সরকার উহা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না। বর্তমানে এই শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং শ্রমিক, উৎপাদক ও ব্যবহারকদের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই শিল্পগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ইহাতে চা, কফি ও রবার এই তিনটির বিধিবদ্ধ বোর্ডের মধ্যে সংহতি বিধান সম্ভব হইয়াছে। কফি ও রবার পুনর্বোপণের জন্য একটি তহবিল খোলার সুপারিশ সহ কমিশনের কতগুলি সুপারিশ এখনও সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। কয়েকটি সুপারিশ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

১৯৫৬-৫৭ সালে কৃষি উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ১৯৫২-৫৭ সালে কৃষি উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ = ১০০ এই ভিত্তিতে সারা ভারতে কৃষি উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৫৬-৫৭ সালে ১২৩ হইয়াছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ছিল ১১৫·৯ অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে কৃষি উৎপাদন ৬ শতাংশের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে প্রতি বৎসর ৫·৪ শতাংশ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেদিক দিয়া বিচার করিলে প্রথম বৎসরের ফল খুবই আশাব্যঞ্জক।

আলোচ্য বৎসরে খাদ্যশস্য প্রায় ১৯৫৩-৫৪ সালের মতই সর্বাধিক পরিমাণে (৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টন) উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টনের তুলনায় উহা ৫ শতাংশের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে বাণিজ্যিক শস্য ১৮ শতাংশ অধিক উৎপন্ন হইয়াছিল। তুলা ও ইক্ষুর ক্ষেত্রে উৎপাদন যথাক্রমে ১০ ও ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৯৫৭-৫৮ সালে শস্যের অবস্থা সন্তোষজনক নয় বলিয়া উক্ত বিবরণীতে জানান হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ পূর্বাঞ্চল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় অনাবৃষ্টির ফলে ধান ও বাজরার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তবে বাণিজ্যিক শস্যের অবস্থা গত বৎসরের তুলনায় অনেকটা ভাল। ১৯৫৭ সালের "অধিক খাদ্য ফলাও" অভিযান জোরদার করার জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে ঋণ ও সাহায্য স্বরূপ ২৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

জমি সংস্কার—উক্ত বিবরণীতে আরও জানা গিয়াছে যে, আলোচ্য সময়ে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংস্থা মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও বিহারে ৬৬,২৪৯ একর জমি সংস্কার করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালের পর হইতে এ পর্যন্ত ১৬ লক্ষাধিক একর জমি সংস্কার করা হইয়াছে।

সেচ—ছোট ছোট সেচ কাজের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে

বিভিন্ন ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা ও নলকূপের সাহায্যে সেচের পরিকল্পনা অনুসারে মোট ২২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা যাইবে।

সার—১৯৫৬ সালে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টন অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে সর্বাধিক পরিমাণে (৮ লক্ষ টন) এই সার ব্যবহার করা হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

কেন্দ্রীয় সার ভাণ্ডার হইতে সরবরাহের জন্য ১৯৫৭ সালে ৭ লক্ষ ২০ হাজার টন অ্যামোনিয়া ও সালফেট পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টন আমদানি করা হইয়াছিল। অ্যামোনিয়াম সালফেট ছাড়া সরবরাহের জন্য ৬৩ হাজার টন ইউরিয়া, ৩৫ হাজার টন অ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট এবং ৯ হাজার টন ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ১৯৫৭ সালে পাওয়া গিয়াছিল। বীজ তৈরি ও উন্নত বীজ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে সাহায্য স্বরূপ ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা এবং ঋণ হিসাবে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

জাপানী প্রথায় ধান চাষ—জাপানী প্রথায় ধান চাষ ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ১৯৫৩ সালে এই প্রথায় ৪ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছিল কিন্তু, ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৪ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই পদ্ধতিতে ৬০ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ডেয়ারী—বোম্বাই ও কলিকাতার দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনায় সন্তোষজনক কাজ হইয়াছে। দিল্লীর দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনাটি খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে।

মৎস্য চাষ—মৎস্য চাষ সম্বন্ধে গবেষণা ও শিল্প ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে ১৯৫৫ সালের তুলনায় সমুদ্র হইতে ২০ শতাংশ অধিক মাছ ধরা হইয়াছে। এ বিষয়ে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, কারিগরি সহায়তা মিশন ও নরওয়ের বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য লওয়া হইতেছে।

ভূমি সংরক্ষণ—আলোচ্য বৎসরে ভূমি সংরক্ষণের কাজ আরও ব্যাপকভাবে চালান হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ভূমি সংরক্ষণের ১১৫টি পরিকল্পনার জন্য সাহায্য ও ঋণ বাবদ ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই উদ্দেশ্যে ১৫৩টি পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য আনুমানিক ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। বর্তমানে দেশে ভূমি সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য আটটী কেন্দ্র আছে কুশী নদীর অববাহিকা সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য নেপালের ছাতরাতে একটী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন মঞ্জুর করা হইয়াছে। যোধপুরের বনায়ন ও ভূমি সংরক্ষণ কেন্দ্রটীর সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রে রাজস্থানের মরুর গতিরোধ ও বনায়নে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে।

সমবায়—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সমবায়ের উন্নয়নের দাবী জাতীয় সমবায় ও গুদাম বোর্ড, কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে সাহায্য স্বরূপ ২ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা এবং ঋণ বাবদ ৯১ লক্ষ টাকা দিবার পরিকল্পনা বোর্ড মঞ্জুর করিয়াছেন। অনুরূপভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্যসরকারগণকে সাহায্য করিতেছেন। সমবায়ের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করা গিয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি প্রায় ২৪ কোটী টাকা ঋণস্বরূপ দিয়াছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে

ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫ কোটী টাকা। বর্তমান বৎসরে ১০০ কোটী টাকা ঋণ দেওয়া হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ঋণের পরিমাণ ১৪০ কোটী টাকা হইতে পারে। ১৯৫৭-৫৮ সালের কর্মসূচী অনুযায়ে ৪২৭টী সমবায় বিপণন সমিতি, ১৪৫৫টী গুদাম নির্মাণ, ৩টী সমবায় চিনি মিল স্থাপন এবং ৭টী রাজ্য গুদাম নির্মাণ কর্পোরেশন গঠন করা হইবে।

কৃষি-গবেষণা—দেশে কৃষি উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কৃষি, পশুপালন, পরিসংখ্যান প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণায় ১৮৯টী পরিকল্পনা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ অনুমোদন করেন। এই পরিকল্পাগুলি রূপায়নের জন্য মোট ১ কোটী ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

কৃষি সম্প্রসারণ—আলোচ্য বৎসরে সারা দেশে ৫৬টী সম্প্রসারণ শিক্ষা কেন্দ্রে, ১৫টী প্রাথমিক কৃষি বিস্তালয়, ১৯টী ওয়ার্কশপ, ২৭টী গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শাখা এবং ২০ গ্রুপ লেভেল ওয়ার্কশপ শিক্ষণ কেন্দ্রে পুরাদমে কাজ করিতেছিল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থাতে ভারতবর্ষ সদস্য হিসাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত সংস্থার সকল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেই ভারতের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। কারিগরি সাহায্য প্রসঙ্গেও বিদেশের সংগে সহযোগিতা করিয়াছে।

ভারতে কৃষিশস্যের উৎপাদন

	একর			উৎপাদন		পূর্ববৎসরের
খাদ্যশস্য	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৬	ইউনিট	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৫-৫৬	তুলনায় বৃদ্ধি অথবা হ্রাস
চাউল	৭৮,১৭৪	৭৬৮৬৪	টন	২৮,১৪২	২৬,৮৪৩	+৪·৮
গম	৩২,৮২১	৩০,৩৮৬	„	৯,০৬৮	৮,৫৬৯	+৫·৮
তন্তুশস্য						
কার্পাস	১৬,২১১	১৮,০১৮	বেল	—	৪,১২৩	
পাট	১,৪১৩	১,৬৩৪	„	—	৪,২২১	
মেস্তা	২২৫	১৯৪	„	—	১,৪১৪	
তৈলবীজ						
চীনাবাদাম	১২,৫১৮	১১,৪২১	টন	৩,৬৫১	৪,০৮৬	
তিল	৩,২৫৫	৪,০১৭	„	—	৪৫১	
সরিষা	৬,২১১	৬,৩১৭	„	১,০১৭	৮৪৮	
আবাদী শস্য						
চা	—		পাউণ্ড	—	৮৪৮,৫৫৬	
কফি	—		„	—	৫৮,৬৫৩	
দবাঘ	—		„	—	৪৯,৫৪০	
ইক্ষু (গুড়)	৫,০২২	৪,৭২০				

অর্থনৈতিক সমাজে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

ভারত চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক অধিবেশন

গত ৩১শে মার্চ ভারত চেম্বার অভ কমার্সের বার্ষিক বিবরণী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীকে, এ. ঢনঢনিয়া সভাপতিত্ব করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও ত্রাণমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন প্রধান অতিথি ছিলেন। শ্রীঢনঢনিয়া তাঁহার সভাপতির ভাষণে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি সরকারী নীতির সমালোচনা করিয়া বলেন যে বর্তমান সরকারী নীতি দেশের মূলধন সংগঠন, বেসরকারী সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সংকোচ সাধন করিয়া টাকার সরবরাহ, ব্যাঙ্কের দাদন এবং শেয়ার ও সিকিউরিটির বাজারে মন্দা সৃষ্টি করিয়াছেন। মূল্য বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাইয়াছেন এবং শিল্পে মন্থর বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন এবং বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট সৃষ্টিও করিয়াছেন। তিনি সরকারের আয় ও সম্পদ বণ্টন নীতিরও সমালোচনা করেন এবং প্রসঙ্গত বলেন যে ১৯৫৫ সালেও গ্রেট বৃটেন ও ক্যানডার সমর্থিত করনীতি প্রয়োগ করিতে সাহস করেন নাই। অথচ ভারতে তাহা সঙ্গে সঙ্গেই পুরোপুরিভাবে চালু করা হইয়াছে। ইহাতে বড় শিল্প ছাড়া মাঝারী ও ছোট শিল্পের গতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তিনি গ্রামাঞ্চলে বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে কর নির্ধারণের প্রস্তাব করেন। সরকারীক্ষেত্রে ব্যয় নীতিও তিনি সমালোচনা করেন এবং বলেন যে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট মিতব্যয়িতার সুযোগ আছে। বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ফলে দেশকে যে অতিরিক্তভাবে ঋণজালে জড়িত করিয়া ফেলা হইতেছে এবং তাহার পরিণাম যে ভয়াবহ তাহার উল্লেখও তিনি করেন।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যার সঙ্গীন অবস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ইহার সমাধান কতকটা সম্ভব। কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা অসুবিধা ও অন্তরায় সম্পর্কে তিনি বলেন যে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যকে রাজনীতির উর্ধ্বে রক্ষা করিতে হইবে এবং জাতির সমষ্টিগত কল্যাণে সর্বপ্রচেষ্টা নিযুক্ত করিতে হইবে।

খাদ্য-ত্রাণমন্ত্রী শ্রীযুত পশ্চিমবঙ্গের বেকারদের দুঃখে দুঃখিত হন এবং সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেন। তিনি মিশ্র অর্থনীতির সার্থকতা সম্পর্কে বলেন, যে ভারতে ইহার সার্থক সমন্বয় সম্ভব হইবে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা বলি, সবই সত্যি। পশ্চিমবঙ্গের বেকারদের জন্য দুঃখ শ্রীঢনঢনিয়ার বিন্দুমাত্র নাই। ফ্লাইড ষ্ট্রীটে মাড়োয়ারী গদির পরিসংখ্যান লইলে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাহা ছাড়া ঐ সব গদিতে সমগুণসম্পন্ন একজন মাড়োয়ারী কত পায় ও বাঙ্গালী কত পায়, তাহাতে বিস্ময়কর চিত্র উদ্ঘাটিত হইবে। এ বিষয়ে শ্রীসেনেরও মাথাব্যথা নাই। আর একটি বিষয়, পল্লী অঞ্চলে কর ভারের প্রয়োগ। বর্তমানে তাহা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। অবশিষ্টটুকুর ব্যঞ্জনা ও বর্ণনা ভালই।

ইণ্ডিয়ান ল্যাম্প ম্যাণ্ট্রীজ এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা

গত ২৪শে মার্চ ভারতীয় বৈদ্যুতিক ল্যাম্প প্রস্তুতকারকদের বার্ষিক সভা সম্পন্ন হইয়াছে। বিদায়ী সভাপতি তাঁহার ভাষণে শিল্পের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন, সরকারী নীতির সমালোচনা করেন এবং শিল্পদ্রব্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে অসুবিধা ও অন্তরায় বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই শিল্পের অগ্রগতি বিশেষত উৎকর্ষ ও উৎপাদনে ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়ভাবে লক্ষিত হইলেও এখনও ভারতে বিদেশী প্রস্তুতকারকদের প্রতিযোগিতা এখনও এই শিল্পের অন্তরায়স্বরূপ। ক্রেতাদের মনে বিদেশী দ্রব্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে এখনও প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে যদিও স্বদেশী দ্রব্য মানে ও গুণে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। ইহা ছাড়াও তিনি কাঁচা মালের সরবরাহ সম্পর্কে অসুবিধা ও রপ্তানির সুযোগ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর শ্রীসতীশ চন্দ্র দে ও ভারতীয় মানক সংস্থার শ্রীএ. কে. সেন বক্তৃতা করেন।

শ্রীসেন বলেন যে, শিল্পের উচিত এই সংস্থার ছাপ দিয়া স্বদেশী ল্যাম্প বিক্রয় করা—যাহাতে ক্রেতাগণ দ্রব্য সম্পর্কে উৎকর্ষ মানের পরিচয় পায়। অবশ্য তাহাতে সভায় অনুকূল মনোভাব লক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য বৎসরের জন্য শ্রীএস. কে. রায় (বেঙ্গল ল্যাম্পের) সভাপতি নির্বাচিত হন।

বঙ্গীয় কাঁচদ্রব্য প্রস্তুতকারী সমিতির বাৎসরিক অনুষ্ঠান

২৯শে মার্চ কাচদ্রব্য প্রস্তুত কারীদের ত্রয়োদশ বাৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে বিদায়ী সভাপতি শ্রী ও, এম, সোমানী তাহার বিশদ ভাষণে কাঁচ শিল্পের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়া বর্তমান সমস্যা আলোচনা করেন। তিনি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কাঁচশিল্পের অগ্রগতি সম্পর্ক আলোচনা করেন এবং আমদানী নীতি পরিপ্রেক্ষিতে কাঁচমালের অভাব, পরিবহনে অব্যবস্থা, কোয়ার্টিস্ ভাঙ্গা মেশিনের অসুবিধা, রেলভাড়া, কাঁচশিল্পে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রবর্তন, শ্রমিক সমস্যা, রপ্তানির সুযোগ-সুবিধা, রাষ্ট্রীয় শ্রমিক বীমা ও এই শিল্পের উন্নয়নে কাঁচ ও চিনামাটি গবেষণাগারের অবদান সম্পর্কে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন। তাঁহার মতে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা জুটিলে এই শিল্পটি সমৃদ্ধির শীর্ষ স্থানে উঠিবে।

তাঁহার বক্তৃতার পর শ্রীসতীশ চন্দ্র দে, শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। চলতি বৎসরের নির্বাচিত সভাপতি শ্রী পি, এন, তালুকদারের অনুপস্থিতিতে শ্রী ডি, এন সেন সভাপতিত্ব করেন এবং কাঁচ শিল্পের অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস লইয়া এক সরল আলোচনা করেন।

আর্থিক সংবাদ

ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট হইতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্য অনুযায়ী ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইয়াছে ১১,০১০ কোটি টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে উহার পরিমাণ ছিল ১০,৭৮০ কোটি টাকা। ১৯৫৪-৫৫ সালের তুলনায় এই দুই সালের আয় যথাক্রমে ৭৩০ কোটি টাকা এবং ২০০ কোটি টাকা অধিক।

১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্য অনুযায়ী মাথাপিছু আয়ের পরিমাণও ১৯৫৪-৫৫ সালের ২৭১·৯ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে ২৭৩·৬ টাকা এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ২৮৪·০ টাকা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় আয় সম্পর্কে পত্রের পঞ্চম সংখ্যায় উপরোক্ত তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

আরও প্রকাশ যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কৃষি ও কৃষি ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যাদি সমভাবে সাহায্য করিয়াছে। নিম্নে ১৯৫৮-৫৯ সালের মূল্য অনুযায়ী জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের হিসাব দেওয়া হইল :

বৎসর	জাতীয় আয় (কোটি টাকা হিসাবে)	মাথাপিছু আয় (টাকা হিসাবে)
১৯৫৮-৫৯	৮৬৫০	২৪৬·৯
১৯৫৯-৬০	৮৮২০	২৪৮·৬
১৯৬০-৬১	৮৮৪০	২৪৬·৩
১৯৬১-৬২	৯১০০	২৫০·১
১৯৬২-৬৩	৯৪৬০	২৫৬·৫
১৯৬৩-৬৪	১০,০৩০	২৬৮·৭
১৯৬৪-৬৫	১০,২৮০	২৭১·৯
১৯৬৫-৬৬	১০,৪৮০	২৭৩·৬
১৯৬৬-৬৭	১১,০১০	২৮৪·০

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ১৯৬১-৬২ হইতে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় ১৮·৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে উহা ৫·১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাথাপিছু আয়ও ঐ সময়ে যথাক্রমে ১১·১ শতাংশ এবং ৩·৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্তমান বৎসরের মূল্য অনুযায়ী ১৯৬৬-৬৭ সালে জাতীয় আয় হইয়াছে ১১,০১০ কোটি টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ছিল ৯,৯২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সালের তুলনায় এই দুই সালের জাতীয় আয় যথাক্রমে ১৮০০ কোটি এবং ৩৮০ কোটি টাকা অধিক। মাথাপিছু আয় ১৯৫৯-৬০ সালে ছিল ২৫৪·২ টাকা। উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে ২৬০·৮ টাকা এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ২৯৪·৩ টাকা হইয়াছে।

পাট উৎপাদন বৃদ্ধি

লোকসভায় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন জানান যে, ১৯৪৭ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশে পাট উৎপাদনের পরিমাণ (প্রতি গাঁইট ৪০০ পাউণ্ডের হিসাবে) গড়ে যথাক্রমে ১,১৮,১০০ গাঁইট, ৫৫,৮০০ গাঁইট, ২৯০০ গাঁইট, ৩১,৪০০ গাঁইট, ১৬,৪০০ গাঁইট এবং ১২,৪০০ গাঁইট বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পাট উৎপাদনের যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে পৌঁছিবার জন্য সরকার কতগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে পাটশস্যের জন্য সার প্রয়োগ বৃদ্ধি, উন্নত বীজ সরবরাহ, আধুনিক চাষবাস, চাষরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, এবং পাট উন্নয়ন কর্মীদের শিক্ষণ ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১৯৫২ সালের পর হইতে বিভিন্ন খামার হইতে নিম্নরূপ উন্নত বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে—

১৯৫১-৫২ সাল	৮৭১ মণ	১৯৫৫-৫৬ সাল	১,৩৫৯ মণ
১৯৫২-৫৩ ,,	১,১২২ ,,	১৯৫৬-৫৭ ,,	১,৭০৮ ,,
১৯৫৩-৫৪ ,,	৯০৩ ,,	১৯৫৭-৫৮ ,,	২,৬১৬ ,,
১৯৫৪-৫৫ ,,	৯৭৩ ,,		

জীবন বীমা কর্পোরেশনের অর্থ-বিনিয়োগ

লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে উপ-অর্থমন্ত্রী শ্রী বি. আর. গুপ্ত বলেন যে, ১৯৫৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে বর্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জীবনবীমা কর্পোরেশন সরকারী ঋণপত্র, শেয়ার প্রভৃতি খাতে নিম্নলিখিত পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছেন—

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সিকিউরিটি	৪০,০২,৬১,৪১৬ টাকা
আধা-সরকারী সিকিউরিটি	১,৭৫,৪৩,৪৩২ ,,
ডিবেঞ্চার লোন ইক	১,৩৫,৬১,০৩৪ ,,
প্রেফারেন্স শেয়ার	২,২০,৮৫,৩৭৮ ,,
অর্ডিনারী শেয়ার	১০,৮৯,৭৯,৫১৯ ,,
	৫৯,২৪,০৬,২৪০ টাকা

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরকারী ও আধা-সরকারী সিকিউরিটিতে জীবন বীমা কর্পোরেশন মোট ৪১,৭৮,০৫,০০৮ টাকা এবং সরকারী প্রচেষ্টায় কোম্পানির শেয়ারে ১,৮৩,৬৩২ টাকা নিয়োগ করিয়াছেন। ঐ সময়ে বে-সরকারী প্রচেষ্টায় মোট ১৫,১৪,৪৮,৩০০ টাকা নিয়োগ করা হয়।

ঘিয়ে বনস্পতির ভেজাল—লোকসভায় ঘিয়ে ভেজাল সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সংস্কৃতিক মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর জানান যে, মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণা মন্দির ঘিয়ের নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহাতে ভেজাল হিসাবে ৫০ হইতে ১০০ ভাগই বনস্পতি থাকে। তিনি আরও বলেন যে, গবেষণা মন্দির এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন নাই। কারণ খাদ্যে ভেজাল নিবারণ আইন (১৯৪৪) অনুযায়ী ঘিয়ে ভেজাল নিবারণের দায়িত্ব বিভিন্ন রাজ্য সরকারের। সেজন্য বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে কফি রপ্তানি—লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীনিত নিম কানুনগো জানান যে, ১৯৫৬-৫৭ সাল ও ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারত হইতে পশ্চিম জার্মানীতে ২,০০৮ টন কফি রপ্তানি হইয়াছে। ঐ সময় সোভিয়েট ইউনিয়নে কফি রপ্তানি হইয়াছে ১,৫০০ টন। ১৯৫৬ সালের পূর্বে ঐ দুইটি দেশে কফি রপ্তানির পরিমাণ নগণ্য ছিল।

বিস্কুটের মান প্রচার—ভারতীয় মানক সংস্থা বিস্কুটের মান প্রচার করিয়াছেন। বিস্কুট বলিতে নানা রকমের জিনিষ বুঝায়। সেজন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বিস্কুটের জন্য পৃথকভাবে মান নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। তবে কয়েকটি গুণ সকল শ্রেণীর বিস্কুটের অবশ্যই থাকা দরকার। এই সাধারণ গুণগুলিই উক্ত মানে জানান হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিস্কুট তৈরির উপকরণ উহা পরীক্ষার পদ্ধতিও এই মানে বলা হইয়াছে। বিস্কুট যাহাতে ব্যবহারকের নিকট ভালভাবে পৌছায় সেজন্য ঠিকমত প্যাকেট তৈরি করা এবং প্যাকেটের উপর বিস্কুট সম্বন্ধে কিছু বিবরণী দিবার নির্দেশও এই মানে দেওয়া হইয়াছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি—লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে অর্থ মন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই জানান যে, গত বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে বর্তমান বৎসরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ২ কোটি ৫৫ লক্ষ

৮৬ হাজার টাকার দশমিক মুদ্রা বাজারে ছাড়া হইয়াছিল। গত বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে বর্তমান বৎসরের ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকার পুরাতন মুদ্রা বাজার হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। (বর্তমান বৎসরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদের টাকশালে যে পুরাতন মুদ্রা জমা দেওয়া হইয়াছে তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই)।

১৯৫৭-৫৮ সালে ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকার পুরাতন মুদ্রা গলান হইয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রায় ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ ৯ হাজার টাকার দশমিক মুদ্রা তৈরি হইবে।

জীবন বীমা ব্যবসা—লোক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে উপ-অর্থমন্ত্রী শ্রী বি, আর, ভগৎ ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশন নূতন জীবন বীমার কাজ কি পরিমাণে সম্পন্ন করিয়াছে তাহা মাস ও এলাকা হিসাবে নিম্নরূপ হিসাব বিবৃত করেন :—

	উত্তরাঞ্চল	মধ্যাঞ্চল	পূর্বাঞ্চল	দক্ষিণাঞ্চল	পশ্চিম অঞ্চল
			(কোটি টাকা হিসাবে)		
১৯৫৭ সালের জানুয়ারী—ডিসেম্বর	৩৩·৯০	৩৫·৭১	৬৮·০৫	৭৪·১৪	৬৪·৭০
১৯৫৮ সালের জানুয়ারী—২৪শে মার্চ	৩·৬৯	২·৪১	৪·৭২	৬·৮৭	৫·৭৫

পণ্যদ্রব্যের সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যমান

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পণ্যদ্রব্যের যে সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যমান নির্ধারণ করিয়াছেন তদনুযায়ী ২৯শে মার্চ অন্তক সপ্তাহে এই মূল্যমান (১৯৫০ সালের মার্চ অন্তক বৎসর = ১০০) ০·৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ১০৬·১ হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে উহা ছিল ১০৫·৬। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে মূল্যসূচী সংখ্যা গড়ে ছিল ১০৫·৪। পূর্ববর্তী মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীতে উহা ছিল ১০৪·৭। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে উহা ছিল ১০৫·৬। ১৯৫৭-৫৮সালে উহার গড় ছিল ১০৮·৪ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী উহা ছিল ১০৫·৩। বোম্বাইয়ে এলাচের মূল্য (১৩ শতাংশ) অড়হরের মূল্য (১১ শতাংশ) মাদ্রাজের কালো গোলমরিচ (১০ শতাংশ), বোম্বাইয়ের মুসুর (৯ শতাংশ), কলিকাতার পেঁয়াজ (৮ শতাংশ), মহলের জোয়ান এবং বোম্বাইয়ের মুগ (৭ শতাংশ করিয়া), ধানবাদের গম, ভিসাগাপত্তনের ভুট্টা এবং বোম্বাইয়ের আদা তৈল (৫ শতাংশে), কমলালেবু (৪ শতাংশ), সরিষার তৈল এবং চা (৩শতাংশ করিয়া), ছোলা (২ শতাংশ), চাউল, রাগী, কলাই, বাদাম তৈল এবং লবণের মূল্য (১শতাংশ করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় 'খাদ্যদ্রব্যের' মূল্যসূচী সংখ্যা ০·৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ১০৩·৪ হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী উহা ১০২·৫ ছিল। তবে এই সময়ে ডিম (৭ শতাংশ) হায়দরাবাদের জোয়ার (৬ শতাংশ), বজরা, কাজুবাদাম, কফি এবং লঙ্কার মূল্য এক শতাংশ করিয়া হ্রাস পাইয়াছিল।

আলোচ্য সপ্তাহের 'তামাকের' মূল্যমান পূর্ব সপ্তাহের ন্যায় (১৩) অপরিবর্তিত ছিল। জ্বালানী দ্রব্য, বিদ্যুৎ, আলোক এবং লুব্রিকান্টের মূল্য পূর্ব সপ্তাহের ন্যায়ই (১১৪·৫) অপরিবর্তিত ছিল। শিল্পে ব্যবহৃত কাচামালের মূল্যসূচী সংখ্যা ০·৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ১১২.৭ হইয়াছে।

পূর্ব সপ্তাহে উহা ছিল ১১১·৮। রেয়নের সূতা (৬ শতাংশ) তিসির তৈল এবং তামার মূল্য ১ শতাংশ করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় 'অর্ধোৎপাদিত' দ্রব্যমূল্য ০·২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ১০৭·১ হইয়াছিল। 'উৎপাদিত দ্রব্য' মূল্যমান ০·৪ শতাংশ হ্রাস পাইয়া ১০১·৪ হইয়াছে।

দ্রব্যসামগ্রীর পাইকারী মূল্যমান সূচী

ভিত্তি বৎসর—১৯৫২-৫৩=১০০

সপ্তাহ শেষে শনিবার	সর্বপ্রকার পণ্যের গড়	খাদ্যসামগ্রী	ইন্ধন, আলানি ইত্যাদি	শিল্পের কাঁচামাল	কারখানাজাত দ্রব্য
পরিমাপ	১০০০	৪০৪	১৫৪	২৯০	২৪৯
১৯৫৩-৫৪	১০১·২	১০০·১	৯৮·২	১০৭·৪	১০০·৭
১৯৫৪-৫৫	৮৯·৬	৮২·১	৯৫·৬	৯৪·৬	১০০·১
১৯৫৫-৫৬	৯৯·২	৯৪·৬	৯৭·১	১১০·৬	১০১·৬.
১৯৫৬-৫৭	১০৫·৮	১০১·৭	১০৬·১	১১৬·৮	১০৫·৮
জানুয়ারী, ১৯৫৭	১০৭·৮	১০৪·৫	১০৫·৮	১২১·০	১০৭·৪
ফেব্রুয়ারী	১০৮·১	১০৩·১	১০৬·৬	১১৭·০	১০৬·২
মার্চ	১০৫·১	১০১·৭	১০৬·৫	১১৬·৮	১০৫·৩
এপ্রিল	১০৭·৩	১০৫·৪	১০৭·৮	১১৭·২	১০৬·১
মে	১১০·৩	১০৮·৬	১১২·৩	১২১·৬	১০৮·১
জুন	১১১·৮	১০৯·৬	১১১·৮	১২১·২	১০৯·৫
জুলাই	১১২·৪	১১২·১	১১৪·৯	১২২·৩	১০৯·০
আগষ্ট	১১০·৯	১১০·৫	১১৪·৯	১১৮·২	১০৯·৬
সেপ্টেম্বর	১০৮·৭	১০৭·১	১১৫·০	১১৪·৯	১০৮·৯
অক্টোবর	১০৮·৯	১০৭·০	১১৪·৬	১১৫·৫	১০৯·২
নভেম্বর	১০৮·৬	১০৬·৭	১১৫·১	১১৬·৪	১০৮·৩
ডিসেম্বর	১০৬·৩	১০২·৯	১১৪·৮	১১৪·৮	১০৭·৭
জানুয়ারী, ১৯৫৮	১০৫·৬	১০২·২	১১৪·৪	১১২·৮	১০৭·৬
ফেব্রুয়ারী ১, ১৯৫৮	১০৪·৬	১০০·৬	১১৪·৫	১১৩·২	১০৭·৭
৮, „	১০৪·১	১০০·০	১১৪·৫	১১০·৫	১০৭·৪
১৫, „	১০৪·৮	১০০·৯	১১৪·৮	১১১·৯	১০৭·৯
২২, „	১০৪·৯	১০১·৩	১১৪·৮	১১০·৮	১০৭·৭

জাতীয় দিনপঞ্জী

১লা চৈত্র জাতীয় দিনপঞ্জীর এক বৎসর পূর্ণ হইল। দিনপঞ্জী সংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুসারে গত বৎসর ২২শে মার্চ (১লা চৈত্র ১৮৭৯ শকাব্দ) এই দিনপঞ্জী গৃহীত হয়।

কয়েকটি সরকারী ব্যাপারে জর্জিয়ান দিনপঞ্জীর সংগে সংগে জাতীয় দিনপঞ্জীও ব্যবহার করা হইতেছে। যেমন ইণ্ডিয়া গেজেটে জর্জিয়ান ও জাতীয় দিনপঞ্জী দুইটি অনুসারেই তারিখ দেওয়া হয়; আকাশবাণী হইতে বিভিন্ন ভাষায় প্রথম সংবাদ প্রচারের সময় দুইটি তারিখই ঘোষণা করা হয়; সরকার প্রচারিত দিনপঞ্জীগুলিতে জাতীয় জর্জিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুসারে তারিখ দেওয়া থাকে এবং সরকার জনসাধারণের সংগে পত্রালাপকালে উভয় তারিখই দিয়া থাকেন।

এ পর্যন্ত অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশ রাজ্যে কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী ব্যাপারে জাতীয় অব্দিয়ান দিনপঞ্জী অনুসারে তারিখ দেওয়া হইতেছে। ভারতে বহু প্রকারের পঞ্জিকা প্রচলিত রহিয়াছে বলিয়া সেগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান এবং একটা সঠিক পঞ্জিকা চালু করার উদ্দেশ্যে পঞ্জিকা সংস্কার করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ভারত সরকার সাতজন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটি অসামরিক কাজে শকাব্দ ব্যবহারের সুপারিশ করেন।

শকবংশীয় রাজারাই ভারতে প্রথম শকাব্দ প্রবর্তন করেন। একমাত্র "শকবিষি" (জ্যোতিষী) ব্রাহ্মণগণ দিনপঞ্জী তৈরি করার জন্য এই শকাব্দ ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা মানুষের কোষ্ঠী তৈরি করার সময়ও এই শকাব্দের উল্লেখ করেন।

অব্দিয়ান দিনপঞ্জী হইতে শকাব্দ ৭৮ বৎসর পিছনে রহিয়াছে। জাতীয় দিনপঞ্জীর প্রতিটি মাসের প্রথম দিন অব্দিয়ান দিনপঞ্জী অনুসারে কোন কোন তারিখ হয় তাহা নিম্নে দেখান হইল—

চৈত্র (৩০ দিন)—২২শে মার্চ (সাধারণ বৎসরে)
২১শে মার্চ (লিপ ইয়ারে)
বৈশাখ (৩১ দিন) – ২১শে এপ্রিল
জ্যৈষ্ঠ (৩১ দিন)—২২শে মে
আষাঢ় (৩১ দিন)—২২শে জুন
শ্রাবণ (৩১ দিন)—২৩শে জুলাই
ভাদ্র (৩১ দিন)—২৩শে আগষ্ট
আশ্বিন (৩০ দিন)—২৩শে সেপ্টেম্বর
কার্তিক (৩০ দিন)—২৩শে অক্টোবর
অগ্রহায়ণ (৩০ দিন)—২২শে নভেম্বর
পৌষ (৩০ দিন)—২২শে ডিসেম্বর
মাঘ (৩০ দিন)—২১শে জানুয়ারী
ফাল্গুন (৩০ দিন)—২০শে ফেব্রুয়ারী

Statement about ownership and other particulars about ARTHIK PRASANGA

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	104, Amherst Street, Calcutta-9 from Naba Gouranga Press
2.	Periodicity of its publication	MONTHLY
4.	Printer's Name	Dwijendranath Mukherjea
3.	Nationality	Indian (Bengalee)
	Address	from Naba Gouranga Press 104, Amherst Street Calcutta.9
5.	Publisher's Name	Dwijendranath Mukherjea for Economic Studies & Journals Private Ltd
	Nationality	
	Address	2 Private Road, Dum Dum, Cal-28
6.	Editor's Name	Dwijendranath Mukherjea
	Nationality	Indian (Bengalee)
	Address	2, Private Road, Dum Dum Cal-28
7.	Names and addresses of individulas who own the newspaper and shareholders holding more than one per cent of the total capital.	1. Dwijendranath Mukherjea 2. Sm. Sujata Mukherjea 3. Prahlad Agarwala 4. Achal Banerjee 5. Paritosh Banerjee

I, Dwijendranath Mukherjea, hereby declare that the particulars given about are true to the best of my knowledge and belief.

Date 21. 3. 58 Signature of Publisher Sd/-D. Mukherjea

অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশ প্রণীত

সাহিত্য-সন্দর্শন

(পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)

সাহিত্যের রূপ ও রীতিবিষয়ক বাংলায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গ্রন্থ। ইহাতে আর্ট, সাহিত্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, বাগ্‌ভঙ্গি প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বাংলা অনার্স ও এম-এ এবং ইংরেজী এম-এ ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া লিখিত।

(১) It is a nice handbook on **Principles on Literary Criticism**—*The Modern Review.* (২) 'গ্রন্থখানি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে একক'—পুরাতন

(৩ লেখক বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়াছেন—আনন্দবাজার

(৪) '...This work has earned Prof. Das a place in Bengali Critical Literature comparable to that of Hudson or Worsfold'—*The . . B. Patrika*

(৫) 'গ্রন্থখানিকে বাংলাভাষায় সাহিত্য-দর্পণ আখ্যা দেওয়া যায়'—হাওড়া বার্তা

মূল্য ছয় টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : **দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা।**

ডায়াপেপ্‌সিন

হজমের অতিরিক্ত হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য্যই করা উচিত ডায়াপেপ্‌সিন সেই কার্য্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপ্‌সিন বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বল লাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপ্‌সিন ঠিক ঔষধ নহে, দুর্ব্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায়ক মাত্র।

ইউনিক্সন ড্রাগ
কলিকাতা

শ্রীবিনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নবগোপাল প্রেস, ১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ, ৯ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যে হাঁস সত্যি সত্যিই সোনার ডিম দেয়

গল্পের ঘুঘুবাবু মানুষকে খুব চালাক ছেলে বলা যায়। তার বাবা বেশ সম্পন্ন চাষী। এ জন্যে যে তার বাবা খাটুনিতেই সব টাকা পয়সা ফুরিয়ে যাবেন। আর এই কথাটাই ও বুঝতে পারে না, কারণ, তার মাইনর মশাই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, টাকা ফুরিয়ে যেন লাভ হয়না। তা ছাড়া, চোর ডাকাতে এগুলো নিয়ে যেতে পারে, আর এতে নিজের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু বাবা যে রকম বাঁধি, তাতে একথা বুঝিয়ে বলার সাহস তার কোনদিন হয়নি। তবে এখনি ও সুযোগ পেলো। গ্রামে এক বাড়ীতে চুরী হওয়ায় ও সাহস করে বলে ফেললো যে "বাবা, বুদ্ধিমানের মতো টাকা খাটানোর অর্থ, অর্থনীতি প্রসঙ্গে পড়াশুনা। আয়বর্ধক টাকা খাটে না।" বাবা, এই পরামর্শ শুনে সবে ছেলের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, কিন্তু মনু বুদ্ধিমানের মতোই কথা বলেছিলো। নিজের জীবন ও সম্পত্তিকে কে না ভালোবাসে? জাতীয় পরিকল্পনা সঞ্চয় সার্টিফিকেটে অথবা অন্যান্য বহু সঞ্চয় পরিকল্পনায় টাকা খাটানোর অর্থ হোল, আপনি আয়করবিহীন সুদ পাচ্ছেন আর ভারত সরকার এর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন। তাছাড়া, জাতির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে এই টাকা লাগবে বলে আপনি বেশ গর্বও অনুভব করতে পারেন।

১২ বছরের জাতীয় পরিকল্পনা সঞ্চয় সার্টিফিকেট
★ বছরে, করযোগ্য শতকরা ৫.৪১ টাকা সুদ
★ যে কোন পোষ্ট অফিসে৫৲ টাকা থেকে ৫০০০৲ টাকায় সার্টিফিকেট অনায়াসেই পাওয়া যায়
★ ভারত সরকার এগুলির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন।

এই সঞ্চয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সরকারী সিকিউরিটি :
১০ বছরের ট্রেজারী ডেভিলপমেন্ট ডিপোজিট সার্টিফিকেট
পোষ্ট অফিস মেজিসেন্স ব্যাঙ্ক ডিপোজিট

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

জাতীয় সঞ্চয় অভিযানের আরও বিস্তারিত সংবাদ জানতে পারেন

REGISTERED No. C 3462

আদর্শ পথ্য, পানীয় ও খাদ্য

লিলি বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

আর্থিক প্রসঙ্গ

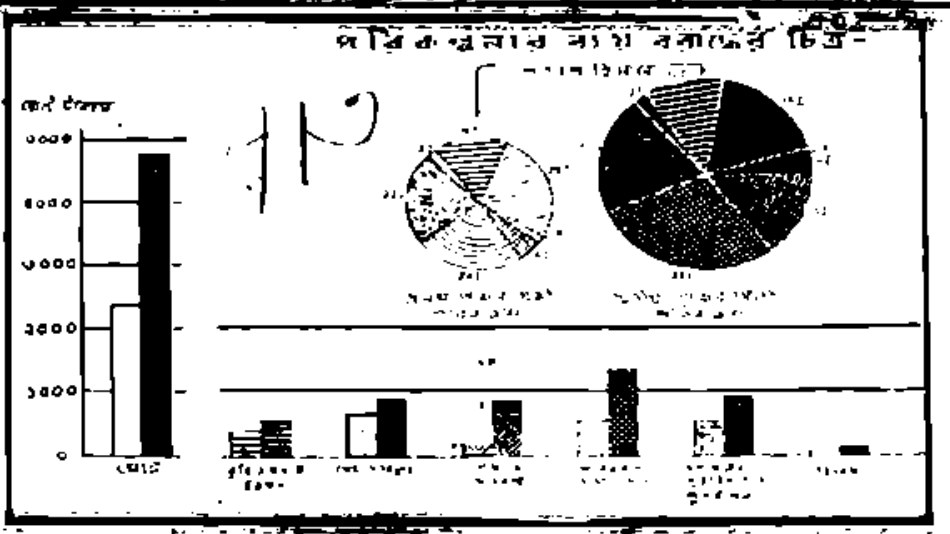

সপ্তম বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা] বৈশাখ • ১৩৬৫ [এপ্রিল-মে • ১৯৫৮

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

ভারতে সর্বাধিক
বিক্রয়ের গৌরব অর্জন
করেছে

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

লক্ষ্মী ঘিয়ে
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস ভোমজী · কলিকাতা ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, স্বাধীনতা ও বাস্তবতার মধ্য দিয়েই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কার্যকরী করে তোলা যায়। কবিগুরুর শিক্ষায় এই আদর্শ আজ দেশের শিক্ষাবিদরা পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন। বিগত ১৯৫৮ সাল থেকে এই আদর্শ রচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা খাতে রূপায়িত হয়েছে। দু' বছর থেকে এগার বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা যাতে কারিগরী বিদ্যার মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করে, সেই ব্যবস্থাই রয়েছে এই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনায়।

ইতিমধ্যেই ৭০০র বেশি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালু করে স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী কৃষি ও বিভিন্ন হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে এই ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ১,১৫০ হবে বলে আশা করা যায়। পাঁচ বছর পরে এই সব নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাতে উচ্চ বিদ্যালয়ের (হাইস্কুলের) শিক্ষাদান অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও চালু হবে। আগেকার প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় যেখানে শিক্ষার্থী পিছু বছরে খরচ পড়ত প্রায় ২৩০ টাকা, নতুন এই বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেখানে খরচ পড়বে প্রায় ২৯১ টাকা। বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা যাতে কারিগরী বিদ্যায় আরও দক্ষ হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গে তার সুযোগ-সুবিধা আরও ব্যাপকভাবে দেখা দিচ্ছে। এছাড়া যাঁদের লেখাপড়ার বয়স পার হয়ে গেছে কিংবা সাংসারিক কারণবশে আরম্ভ থেকে যাঁরা এতদিন লেখাপড়ার সুযোগ পাননি সেই সব বয়স্কদের জন্যও বিশেষ সামাজিক শিক্ষা ও মুক্তকলাপ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে—যাত্রা, কথকতা, কবিগান, মুক্তাঙ্গন শিবির ইত্যাদির মধ্য দিয়েও তাঁদের নানারকম সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় করেছিলেন ২·৯৭ কোটি টাকা—১৯৫৮ সালে ব্যয় করেন ১২·৩৮ কোটি টাকা। এইভাবে দুই শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা ও শিক্ষা-বিস্তারের মধ্য দিয়েই

গড়ে উঠবে

সোনার বাংলা

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক প্রচারিত

জাতীয় পরিকল্পনা ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার ...

সকল যুগেই, বিশেষতঃ এই জাতীয় পরিকল্পনার যুগে, দেশের সমৃদ্ধিসাধন বহুলাংশে বহির্বাণিজ্যের প্রসার সাপেক্ষ। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের প্রসার বর্তমানকালে নির্ভর করে দেশের উন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর।

বহির্বাণিজ্য ব্যাপারে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অভিজ্ঞ কর্মচারী মারফৎ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ববিধ সাহায্যদানে পারদর্শী।

পৃথিবীর যাবতীয় উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্রে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নিজস্ব এজেন্ট ও করেস্পণ্ডেন্ট আছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীসিদ্ধেশ্বর[illegible]

বৈশাখ : ১৩৬৫
এপ্রিল—মে : ১৯৫৮

কার্য্যালয় :
৫/১, প্রাইভেট রোড, বরানগর, কলিকাতা- ৩৬
সিটি অফিস
১০৭, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯

এই সংখ্যার মূল্য বারো আনা

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে সমস্ত রোগের সম্বন্ধে সহজে সন্দিহান হওয়া যায় না, রক্ত প্রকোপের জন্যেই তার সৃষ্টি হয়ে থাকে; তাই রক্তকে প্রথমেই প্রথম চিকিৎসা করা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিভিন্ন সন্দিহান মারাত্মক রোগের কীটাণু সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সারিবাদি সালসা প্রায় সর্ব প্রকার রক্তদুষ্ট রোগের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত দোষের মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদি সালসা সেবনে বিষাক্ত দোষ পরিষ্কার হয়, ঘোষ, পাচড়া, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্বপ্রকার চর্মরোগ, যাহা ৩ হতে কীটাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত দূষিত রোগ সম্পূর্ণ নির্মূলিত হয়, শিরাগুলি বিশুদ্ধ স্বাভাবিক হয়, মুখশ্রী দৃষ্টি পায় এবং শরীরে প্রকৃত বিশুদ্ধ সুস্থ রক্ত সঞ্চালিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধি

ডাক্তার শ্রীযুক্তবাবু ঘোষ, এম.বি, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম-বি-এস (লন্ডন), এম-বি-এস (আমেরিকা), ডাক্তারদের সংক্রমণজনিত দূষিত রোগের বিশেষজ্ঞ।

কলিকাতা ব্রেঞ্চ—ডাঃ হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-বি (লন্ডন), আয়ুর্বেদ-আচার্য্য। ৩৯নং মেছুয়াবাজার ঘোষ, কলিকাতা-৭

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা

শাখা ৩ এজেন্ট-পৃথিবীর প্রায়

সেদিন আমার মনে হোল যে আমি সত্যিই দেশের খানিকটা সেবা করলাম

আমি এক গ্রাম্য হাসপাতালের ডাক্তার। গোপালের একমাত্র ছেলের যেদিন অসুখ করলো, সেই দিনটি আমি ভুলতে পারবোনা। ওর যেমন চিন্তিবার সীমা ছিলোনা, আমারও তেমনি চিকিৎসা করার লাভ-সন্তোষ ছিলো সামান্য। ভগবানের ইচ্ছায় অবশ্য ছেলেটি ভালো হয়ে গেলো। কৃতজ্ঞ গোপাল সেদিন বুঝলো যে হাতের কাছে একজন ডাক্তার থাকার অর্থ কি। যাদের এই সুযোগ নেই তাঁদের পক্ষে হাসপাতালের প্রয়োজন যে কতখানি তা আমি গোপালকে বুঝিয়ে বললাম। তাঁদের সঞ্চিত অর্থ এমন কত ছেলের জীবন বাঁচাতে পারে। সে দিন সন্ধ্যেবেলায় এক হাঁড়ি টাকা নিয়ে এসে ও যখন বললে যে একে **জাতীয় পরিকল্পনা সঞ্চয় সার্টিফিকেট** কিনে দিতে হবে, তখন আমি যেমন আশ্চর্যান্বিত হলাম, তেমনি আমার আনন্দও হোল। আমার মনে হোল যে, আমি যেন দেশের খানিকটা সেবা করতে পারলাম। **জাতীয় পরিকল্পনা সঞ্চয় সার্টিফিকেটে** অথবা অন্যান্য যে সকল পরিকল্পনায় টাকা পাঠানোর অর্থ হোল, আপনি আয়করবিহীন সুদ পাচ্ছেন, আর ভারত সরকার এর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকছেন। আপনার টাকা আপনার কাছেই ফিরে আসছে। এইরকমভাবে টাকা খাটালে যেমন আপনার লাভ হয় তেমনি জাতিরও লাভ হয়। আপনার এই টাকা দিয়ে আরও হাসপাতাল, স্কুল, রাস্তা ঘাট ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়।

১২ বছরের জাতীয় পরিকল্পনা সঞ্চয় সার্টিফিকেট
*** ৮ বছরে, করবিহীন শতকরা ৫·৪১ টাকা সুদ**
*** যেকোনপোষ্ট অফিসে৫্ টাকাথেকে ৫০০০৲ টাকার সার্টিফিকেট অনায়াসেই পাওয়া যায়**
*** ভারত সরকার এগুলির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন।**

অন্য সঞ্চয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সরকারী সিকিউরিটি :
১০ বছরের ট্রেজারী সেভিংস ডিপোজিট সার্টিফিকেট
পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট

DAS/1303

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

জাতীয় সঞ্চয় কমিশনার নাগপুর অথবা আপনার রাজ্যের আঞ্চলিক জাতীয় সঞ্চয় অফিসারের কাছে এই স্কীম সম্পর্কে নিয়ম কানুন ও বিস্তারিত সংবাদ জানতে পারেন

PANAMA

safety razor BLADES

OUTSHAVE and OUTSELL any other make

Panama safety razor blades are now better than ever. Easily the most popular brand on the market. Panama blades give you more for your money—*in smooth and comfortable shaving.*

★

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা] সূচীপত্র [বৈশাখ, ১৩৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার ও সংশোধন	১৩১
আর্থিক দিক্‌দর্শন—তথ্যসেবী	১৩৩
ভারতে সেচ ও বিদ্যুৎ কর্মসূচীর অগ্রগতি	১৩৮
প্রতিবেশী দেশে বাণিজ্য সফর—আমাদের অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক	১৩৯
কর ধার্যের নূতন পদ্ধতি ও ভারতীয় অর্থনীতিতে ইহার প্রতিক্রিয়া—শ্রী এ. ডি, শ্রফ	১৪৯
সম্পত্তি শাস্ত্র—রাজা রাজেন্দ্রলালা মিত্র	১৪৭
সভ্যতার সমস্যা—শ্রীআভাস গুপ্তগুপ্ত	১৫০
স্বল্প সঞ্চয় উৎসব—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৩
স্বাধীন ভারতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১৫৫
চেকোস্লোভাকিয়ার কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৫৮
ভারত ও সমবায় আন্দোলনের বনিয়াদ—শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১৫৯
পরিভাষা সমস্যা—অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু	১৬২
বাংলা পরিভাষা—অধ্যাপক শ্রীধনীরকুমার মজুমদার	১৬৪
আমেরিকায় ভারতের ব্যাঙ্কনীতি	১৬৭
ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুতের পরিমাণ	১৬৯
অর্থনৈতিক সমাজে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব	১৭০
পাটশিল্পে দশমিক পদ্ধতির প্রবর্তন	১৭৪
আর্থিক সংবাদ	১৭৫
গ্রন্থ পরিচয়	১৭৯

সৌন্দর্য্যে ও সংরক্ষণে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট য়্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা : আসানসোল : শিলিগুড়ি : মাদ্রাজ

বলার মত কাহিনী

আমাদের কথা পাঁচজনকে বলবার মতই। দেশের শিল্পোন্নতির ইতিহাসে আমরা একটা বিশেষ অধ্যায় জুড়ে আছি। ১৯৪৬ সালে আমাদের কারখানা থেকেই ভারতের রিং স্পিনিং ফ্রেম তৈরী হয়। তারপর আরও অনেক প্রথম তৈরীর গৌরব আমরা অর্জন করেছি—যেমন, ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার ও ওয়াটার টিউব বয়লার। তদুপরি বাদে ভারতের কয়েকটা বৃহৎ আকারের স্লুইসগেট তৈরি করেছি আমরাই। গঙ্গাবুদ বাঁধের বিরাট বিরাট পাইপগুলিও আমরাই জুগিয়েছি। ভারতের রেলপথের জন্য নানারকম পরিবহন সরঞ্জাম ও লোকোমোটিভ বয়লার আমরা তৈরী করে থাকি। সিমেন্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক যন্ত্রপাতি তাও তৈরি করেছি আমরা। চিনি ও পাট শিল্পের জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি আমরা তৈরী করতে সুরু করেছি দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের জন্য বিভিন্ন উপকরণাদি আমাদের কারখানায় তৈরী হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ও পৃথিবীর সেরা কলাকৌশলের সহযোগিতায় আমাদের প্রত্যেকটী যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। এইভাবে ভারতের মৌলশিল্পের সহায়তায় টেক্সম্যাকো নিয়োজিত আছে।

টেক্সটাইল মেশিনারী কর্পোরেশন লিমিটেড

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা] [বৈশাখ, ১৩৬৫

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার ও সংশোধন

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রসর ও গণতান্ত্রিক উপায়ে মিশ্র অর্থনীতির পটভূমিকায় যে পরিকল্পনা পরিচালিত হইতেছে তাহার সফল রূপায়ণ প্রতিটি দেশবাসীর একান্ত কাম্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা উচ্চাশাসম্পন্ন এবং অধিকতর আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজনে দেশবাসীর নিকট গুরুভারও বটে। ইহার অর্থ সংস্থানের প্রয়োজনে যেমন বিদেশের উপর মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে, তেমনি আভ্যন্তরীন উৎসের উপর চাপও পড়িয়াছে। করভার বৃদ্ধি, অতিরিক্ত শুল্ক, পরোক্ষ করের অধিকতর প্রসার যেমন দেশবাসীর জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনি আর্থিক অবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও জাতির অর্থনৈতিক প্রয়োজনে জাতীয় জীবনের নব নব উন্মেষণার ক্ষেত্রে, জাতীয় অভ্যুত্থানের বিরাট পটভূমিকায় ইহার প্রয়োজন ও সাফল্য অনস্বীকার্য। সেক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রসাধন, আর্থিক কষ্ট এবং সাময়িক অস্বাচ্ছন্দ্য হয়ত দেশবাসীকে ক্ষণে ক্ষণে বিমূঢ় করিয়া তুলিবে, হয়ত বৈপ্লবিক মতবাদে উত্তেজিত করিবে, কিন্তু ভবিষ্যতের সমৃদ্ধতর ভারতের মহত্তর জীবনের আদর্শের পরিকল্পনায় ইহা ব্যতীত যে গত্যন্তর নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার রূপায়নের পথে যে সব অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা চলিয়াছে লোক সভায়, পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন অধিবেশনে, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভায় ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাম্প্রতিক অধিবেশনে। সর্বত্রই ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে যে পরিকল্পনার বরাদ্দকৃত ৪৮০০ কোটি টাকা পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিকে সফল করিতে হইলে পর্যাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। ব্যয়ের পরিমাণ লোক সভার এষ্টিমেট কমিটির মতে আরও ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং এতখানি অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে পরিকল্পনার সংশোধন ও সংস্কার অবশ্য প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। কমিশনের মতে (পরিষদের তাহাই সিদ্ধান্ত) বর্তমান পরিকল্পনাকে ক ও খ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইবে।

পরিকল্পনার 'ক' অংশের জন্য মোট ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। যে সমস্ত পরিকল্পনা কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, যে সমস্ত পরিকল্পনার কাজ বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং যে সমস্ত পরিকল্পনা কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না সেই সমস্ত পরিকল্পনা

এবং "পরিকল্পনার সাহায্যে" এই ক' অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পরিকল্পনা 'খ' অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং এই অংশের জন্য মোট ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্য নিরূপণ ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্মারক-লিপিতে বলা হইয়াছে, যে, বর্তমানে আয়-ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে পরিকল্পনার সমগ্র কার্যকালে অর্থ সম্বলের মোট পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪,২৬০ কোটি টাকা। এই পরিমাণ অর্থের মধ্যে দেশের বাজেট হইতে পাওয়া যাইবে ২,০২২ কোটি টাকা, বিদেশ হইতে সাহায্য বাবদ পাওয়া যাইবে ১,০৩৮ কোটি টাকা এবং ঘাটতি ব্যয় হইবে ১,২০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ন্যূনপক্ষে যাহাতে ৪,৫০০ কোটি টাকার অর্থ সম্বল পাওয়া যায়, তাহার জন্য অতিরিক্ত ২৪০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই ২৪০ কোটি টাকার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া, ৬০ কোটি টাকা ঋণ ও স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা হইতে এবং ৮০ কোটি টাকা ব্যয় সম্পর্কে মিতব্যয়িতার সাহায্যে ও বকেয়া কর ও ঋণের অর্থ আদায় করিয়া সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ইহা হইতেই বোঝা যায় যে পরিকল্পনা কমিশন ও উন্নয়ন পরিষদ বরাদ্দকৃত ৪৮০০ কোটি টাকার হ্রাস করিতে ইচ্ছুক নহেন, অবশ্য পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দের ত্রুটির জন্য এবং পরবর্তীকালে পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত ব্যয় সম্ভাবনার কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে উপরোক্ত ৫২০০ কোটি টাকা (অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকা ধরিয়া) শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে কিনা! জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ পরিকল্পনাটিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া একটিতে ৪৫০০ কোটি টাকা ধরিয়া যাহা পরিকল্পনার সার ভাগ রূপায়ণের প্রয়োজনে ও আরব্ধ কর্মসূচীর রূপায়ণে ব্যয়িত হইবে এবং দ্বিতীয়টিতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীগুলির জন্য ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে ৪৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও অনিশ্চিয়তা দেখা দিয়াছে বলিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশন পরিষদের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে অর্থ সম্বলের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ৪২৬০ কোটি টাকা সম্ভাব্য সংস্থান; সুতরাং পরিকল্পনার প্রথম অংশের মধ্যেই সংশয় রহিয়া গিয়াছে। ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে যে ১২০০ কোটি টাকা সংস্থানের প্রস্তাব ছিল তাহা এখনও আছে। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় বর্তমান মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর সম্ভব কি না এবং তাহার পরিণতি কতখানি বিপদজনক তাহা চিন্তা করা উচিত। নূতন প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষকরের ফলে আভ্যন্তরীণ উৎস হইতে আশানুযায়ী অর্থসংস্থান সম্ভব কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরের জন্য ১৮০৪ কোটি অর্থের মধ্যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হইতে ৪২০ কোটি টাকা, রেলের উদ্বৃত্ত হইতে ১২১ কোটি টাকা, ঋণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে ৪০০ কোটি টাকা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, আমানত ইত্যাদি বাবদ ৪০ কোটি টাকা, বৈদেশিক সাহায্য ৬০০ কোটি টাকা এবং ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে ২৮০ কোটি টাকা—মোট ১৮০৪ কোটি টাকার হিসাব করা হইয়াছে।

পূর্বেই ঘাটতি কুফলের কথা বলিয়াছি। বৈদেশিক সাহায্য যে অনিশ্চিত তাহা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি। দেশবাসীর জীবনযাত্রার উপর অধিকতর চাপ পড়ায় ক্ষুব্ধ সকলে টান পড়িয়াছে। নানাবিধ করের ফলে টাকার বাজারে যে অনটন দেখা দিয়াছে তাহাতে ঋণ সংগ্রহ আজ আর তেমন সহজ নয়; কাজেই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার সাফল্য যেমন সকলেই কামনা করে তেমনি সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠে। এত বড় পরিকল্পনার সাফল্য যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনিবে তাহার জন্য ব্যাপক গণসহযোগিতার প্রয়োজন। একদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রচার, অন্যদিকে উপরের তলার মানুষের সঙ্গে নীচের তলার মানুষের পার্থক্যের ক্রমবৃদ্ধি, উপরের তলার মানুষের অর্থের প্রাচুর্য আর নীচের তলার মানুষের নিত্যদিনের অভাব-অনটন ক্রমশঃই একের সঙ্গে অন্যের সহযোগিতা ঘনিষ্ট না করিয়া দূরত্বের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্যালোফের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এই বিদেশীর দৃষ্টিভঙ্গীতে কাগজে পরিকল্পনার রূপ ও বাস্তবের রূপদানের সেতু নির্মাতা হইবেন নানা স্তরের শাসক ও কর্মী গোষ্ঠী। ডিক্টেটরী শাসনে দলের লোকেদের যে সমর্থন ও কর্মশক্তি পরিকল্পনা রূপায়নে পাওয়া যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহা না পাওয়াই সম্ভব। ঘাটতি ট্যাক্সই হউক, ঘাটতি খাটুনীই হউক, তুমি ঘন্টন বা শিল্পপ্রসারের নীতিই হউক পদে পদে শুধু বুঝাইতে হইবে যে জনমতের সুদৃঢ় সমর্থন একান্তভাবে চাই—শুধু তাহাই নহে, সেই সঙ্গে স্থির পদক্ষেপে পরিকল্পনার কাজে অগ্রসর হইতে হইবে যাহাতে জনসাধারণের "দেখে—প্রত্যয়" হয়, ফলের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ সহজ হয়। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় স্বাধীনোত্তরকালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব বাড়তির দিকে। জনমানসের সঙ্গে সরকারী অনুগ্রহ নির্ভরশীল কর্মী, বিলাস-বহুল বেতন-ভোগী কর্মচারী আজও সহযোগিতা গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। স্বাধীনতার আবহাওয়া সৃষ্টি একটা প্রাথমিক কথা। বৃটিশ আমলের আমলা-রাজ মনোবৃত্তি ও আচরণের অবসানের কথা, গান্ধীজী ও কংগ্রেস একসময় বলিয়াছিলেন। উপরতলায় অর্থনীতি ও রাজনীতির চেয়েও যদি গণতন্ত্র সার্থক করিতে হয় তবে নীচের তলার বুনিয়াদ পাকা সর্বজন-গ্রাহ্য, সর্বজনীন করার প্রয়াস দরকার। অতি উচ্চাশাব্যঞ্জক পরিকল্পনা রূপায়নের প্রয়োজনে কমিশন বহু বিঘোষিত গণসহযোগিতার পরিকল্পনা আজও সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই। আমরা এই অতি সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আর্থিক দিগ্‌দর্শন

তথ্যসেবী

দানকর—সম্প্রতি দানকর আইনটি লোক সভায় আলোচিত হইয়াছে এবং বিলটি লোকসভা কর্তৃক গৃহীতও হইয়াছে। গত ১৯৫১ সালে ভারতে সম্পত্তি কর বা উত্তরাধিকার কর নামে একটি কর প্রবর্তিত হয়। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য ছিল যে বিত্তশালী ব্যক্তিদের মৃত্যুর পরে যাহাতে ঐ সম্পত্তির একটা অংশ কর হিসাবে সরকার পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ উত্তরাধিকারী যাহাতে মৃতের সম্পত্তি অধিকারী হইয়া পুনরায় ধনাঢ্যের গর্বে স্ফীত হইবার সুযোগ না পায়, অনার্জিত সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে না পারে অথচ সমাজে আর্থিক সাম্যের

প্রতিষ্ঠা হয়, তৎক্ষণাৎ সম্পত্তি করের প্রবর্তন হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিবার জন্য অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে ধনী ব্যক্তিরা মৃত্যুর পূর্বে বেনামীতে কখনও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে দান হিসাবে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিয়া যায়।

১৯৫৬ সালে ক্যালডর সর্ববেতভাবে বিভিন্ন করের প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। তাহার ফলে ১৯৫৭ সালের বাজেটে সম্পত্তিকর, লাভকর, ব্যয়কর প্রভৃতি কতকগুলি নূতন করের প্রচলন হয়। কিন্তু তাহাতেও অর্থনৈতিক সাম্য অথবা কর ফাঁকি বন্ধের উদ্দেশ্য কিছু পরিমাণে ব্যর্থ হইতে থাকে। ঐ সকল ছিদ্র বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দান করের প্রবর্তন করা হইল। আলোচ্য আইনে বলা হইয়াছে যে যদি দানের পরিমাণ ১০০০০ টাকার অধিক হয়—তাহা হইলে তাহা এই করের আওতায় পড়িবে। এমন কি যদি একই ব্যক্তিকে এক বৎসরে পৃথকভাবে তিনবারে ৩০০০ হাজার টাকা করিয়া দান করা হয় তবে সেক্ষেত্রে ৫০০০ হাজার টাকার দানের উপর কর ধার্য হইবে। তাহা ছাড়া যদি কেহ দানের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য কম বলিয়া দেখান তাহা হইলে যেটুকু কম বলিয়া দেখানো হইল তাহাও দান করের আওতায় আসিবে। যদি কেহ নিজের সম্পত্তির অংশ বিশেষ দান হিসাবে হস্তান্তর করেন তবে সেই অংশ বিশেষের মূল্যও দানের পর্যায়ে গৃহীত হইবে। আবার যদি কেহ ঋণ মকুব করিয়া দায়াবদ্ধ সম্পত্তি ঋণ গ্রহীতাকে প্রত্যাবর্তন করেন তবে তাহাও দান বলিয়া গণ্য হইবে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীগুলি দান করের আওতায় আসিবে; কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। নির্ভরশীল আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ অথবা আত্মীয়ের বিবাহের জন্য ১০০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত দান দানকর মুক্ত হইবে। স্ত্রী-সন্তানবর্গ ও পোষ্য ব্যক্তিদের জন্য ১০০০০ হাজার টাকার বীমার উপর দেয় প্রিমিয়াম দান বলিয়া গণ্য হইবে। কোন ব্যক্তিকে উইলের সাহায্যে ১০০০০ হাজার টাকা দান করিলে তাহাও দানকর মুক্ত হইবে। স্ত্রীকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দান করিলে তাহা দানকর মুক্ত থাকিবে। তবে স্ত্রীকেও দেয় ঐ অর্থ স্ত্রী যদি পুনরায় দান করিয়া থাকেন তবে তাহা স্বামীর দান বলিয়া গণ্য হইবে।

আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় যে স্ত্রীকে বৎসরে ১ লক্ষ টাকা দান, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী সমূহকে প্রাইভেট লিমিটেড হইতে পৃথক করিয়া বিচার করা এবং বাৎসরিক অনধিক ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত যে দানকর মকুবের ব্যবস্থা আছে তাহাতে যেমন খানিকটা অন্যায় হইয়াছে তেমনি কতকটা ফাঁকির সুযোগও রহিয়া গিয়াছে। তথাপি অর্থনৈতিক সমতা সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে সমর্থনীয় বলিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাব

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যা চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা প্রতিনিয়তই আশ্বাস বাণী শুনিতেছি যে কোন ভয় নাই, যথাসময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে; অথচ খাদ্য মূল্য সীমা অতিক্রম করিয়াছে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অনাহারের সম্মুখীন হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান বৎসরে ১২ লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটতি আছে। এই ১২ লক্ষ টন ঘাটতি প্রধানত চাউলের ঘাটতি। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা চাউলই মুখ্যতঃ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। তাহাদিগকে যদি চাউলের পরিবর্তে অধিকাংশটাই গম এবং সামান্য মাত্র চাউল দেওয়া হয়, তবে তাহা ঘাটতি খুব

করিতে সমর্থ হইবে না। কেন্দ্রীয় সরকার বলিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গকে ৬ লক্ষ টন গম ও ১ লক্ষ টন চাউল দিবেন। সুতরাং মোট ৭ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতিতে সাহায্য করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার। বাকী ৫ লক্ষ টনের ব্যবস্থা এখনও অনিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশিষ্ট খাদ্য ঘাটতির জন্য কি করিবেন তাহা অবিলম্বে ঘোষণা করা উচিত। তাহা ছাড়া যে ১২ লক্ষ টন ঘাটতির হিসাব করা হইয়াছে তাহা জনপিছু ১৫·৩ আউন্স হিসাবে। পল্লীবাসীরা আউন্সের ধার ধারে না, তাহারা প্রতিদিন তিন হইতে চার বার খাদ্য গ্রহণ করে এবং প্রতিবারই চাউল দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য। সুতরাং ঘাটতি পরিকল্পিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১২ লক্ষ টন হইলেও ইহা তদপেক্ষা অনেক বেশী এবং ইহাকে গমের সাহায্যে পূরণ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। আজ ইহা সুস্পষ্ট যে কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রাজ্য সরকার খাদ্য সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছেন। শুভ মনোবৃত্তির নিতান্ত অভাব ঘটিয়াছে এবং দেশের সমস্যা সম্বন্ধে নিদারুণ অবহেলার মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

বস্ত্র-শিল্পের সংকট

ভারত পৃথিবীর মধ্যে বস্ত্রশিল্পের মধ্যে অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ। যুদ্ধোত্তর কালে এবং স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে এই শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে আশাতীত পরিমাণে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য প্রায় অতিক্রম করিতে চলিয়াছে কিন্তু এসব হইলে কি হয়, উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে চাহিদা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই এবং বাজারও সম্প্রসারিত হয় নাই। বহুল প্রচারিত এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল, ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সফর প্রভৃতি নানান প্রচেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু ভারতের বস্ত্রকে বিদেশের বাজারে এমন কি প্রতিবেশী দেশেও আশানুযায়ী বিক্রয় করিতে পারা যায় নাই। ইহার ফলেই প্রায় প্রতিটি মিলে প্রতি গুদামে মজুত জমিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে কাপড়ের কলসমূহে উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে।

কয়েকদিন পূর্বে বঙ্গীয় মিল-মালিক-সমিতির ত্রৈমাসিক সভায় শ্রী বি, কে, বিড়লা তাঁহার সভাপতির ভাষণে বলেন বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি যেটুকু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা দেশের বস্ত্র শিল্পকে বর্তমান সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বর্তমান সঙ্কটের ফলে কাপড়ের কলসমূহে উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে। ভারতের প্রায় সব মিলই এই সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এই সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে কাপড়ের উপর আরোপিত উৎপাদন শুল্ক সাধারণভাবে আরও হ্রাস করা এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ও কড়াকড়ি শিথিল করা দরকার। বিভিন্ন মিলে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত তুলার 'কোটা' প্রয়োজনমত বাড়ানো দরকার। তাহা হইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জন্য আরও অধিক পরিমাণ মিহি কাপড় তৈরী করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনীতির উপর উহার ক্রমবর্ধমান চাপ অনুভূত হইতেছে। ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ ৯ শত কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ১২ শত কোটি টাকায় উঠিয়াছে। সঙ্গে জুটিয়াছে দেশের জটিল খাদ্য সমস্যা। ইহার ফলে সর্বত্র এক প্রবল অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে। ক্রমবর্ধমান ঘাটতি বাজেটের জন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি যাহাতে দেখা না দেয় তৎপ্রতি সরকারের সচেতন হওয়া উচিত। বস্ত্রের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও দেশ বিদেশের বাজারে মাল সস্তা করার জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন ও শ্রমের পরিমাণ নির্ধারণ করার

প্রয়োজনীয়তা আছে। পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্র শিল্প ট্রাইবুনাল (যাহার রায় শীঘ্রই বাহির হইবে) এবং বস্ত্র শিল্পের উপর বেতন বোর্ড স্থাপন সংক্রান্ত তদন্তের প্রসঙ্গে শ্রী বিড়লা বলেন যে বস্ত্রশিল্পে বেতন দানের হার এই মুহূর্তে বৃদ্ধি করা অত্যন্ত অদূরদর্শিতা হইবে। ১৯৫১ সালের শেষ ভাগ হইতে অত্যধিক উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা ইত্যাদি নানা কারণে এই শিল্প অত্যন্ত জটিল সঙ্কটের মধ্যে চলিয়াছে।

শ্রী বিড়লা তাঁহার ভাষণে যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য। বস্ত্রশিল্প অন্যতম সমৃদ্ধ শিল্প ৪০ কোটি ভারতবাসীর গ্রাসাচ্ছাদনের অব্যবহিত পরেই পরিধানের প্রয়োজন মিটাইতে ইহা অপরিহার্য। সেই শিল্পটিকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে জাতীয় জীবনে জাতির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় আসিবে। দেশবাসীর ক্রয়-ক্ষমতা আজ ভাঁটায় চলিয়াছে, কিন্তু এমন একদিন আসিবে যেদিন জাতির জীবনমান উন্নত স্তরে পৌঁছিবে, সেদিন শুধু মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণই বাড়িবে না, রুচির পরিবর্তন ঘটিবে। আভিজাত্যের, শালীনতার, সম্ভ্রমের, নূতন নূতন প্রয়োজন বস্ত্রশিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতি জাতীয় জীবনের একটা দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করিবে। সেদিন সুদূরে নহে। সেদিন প্রতিবেশী দেশেও প্রগতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উজ্জ্বল আলো জ্বলিয়া উঠিবে। সুতরাং সেই অনাগত দিনে উজ্জ্বল জীবনের প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বস্ত্রশিল্পের উন্নতির ভিত্তি এখন হইতেই রচনা করিতে হইবে। তজ্জন্য সমবেত প্রচেষ্টা ও সুসংহত সহযোগিতা এখনই প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা আজ যে ভয়ানক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা যেমন সরকারী ক্ষেত্রকে বিচলিত করিয়াছে, তেমনি বেসরকারী ক্ষেত্রেও উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে। ভারতের বেকার সমস্যা আজ একটা জাতীয় সমস্যা। ইহার সমাধান জাতীয় পটভূমিকায় নির্ধারণ করিতে হইবে। আজ পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বেকার সমস্যা লইয়া যে আলোড়ন ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহার সমাধান শুধু পশ্চিমবঙ্গের ভিতরেই করিলে চলিবে না, পশ্চিমবঙ্গের বাহিরেও যথোচিত দৃষ্টি দিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয়ের মিলনক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল বলিয়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে যেমন শিল্পপতি আসিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোক আসিয়া রুজি-রোজগারের প্রত্যাশা করিতেছে। তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে শুধু বাঙ্গালী কর্মপ্রার্থী নহে, অন্যান্য রাজ্যের লোকও কর্মক্ষেত্রে ভিড় জমাইয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে, প্রতিষ্ঠান-বিশেষে ভিন্ন রাজ্যের শিল্পপতি ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীকে নিয়োগের আগ্রহ দেখাইয়া পক্ষপাতিত্বের অবাঞ্ছিত নিদর্শনের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতের অন্য রাজ্যেও শিল্প আছে, সেখানেও বাঙ্গালী নিয়োগের প্রতিবাদ আছে। ভারতের সমস্ত রাজ্যেই ডোমিসিল প্রশ্নটি বাঙ্গালী নিয়োগের পথে কণ্টক স্বরূপ। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য ঐরূপ কোন অন্তরায় নাই। তাহার ফলে বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী যেমন উপেক্ষিত, বাংলার ভিতরে বাঙ্গালী তেমনি অনাদৃত। এই অনাদর ও উপেক্ষার সমাধানের হয়তো একটা বৈপ্লবিক

নীতিও আছে। কিন্তু তাহা প্রাদেশিকতায় কলঙ্কিত করিবে, এই ভয়ে বাঙ্গালী এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার এখনও তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বেকার সমস্যার প্রতিকারের প্রচেষ্টায় এই রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবেদুস সত্তার যে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান কেন্দ্রের মারফৎ লোক সংগ্রহের প্রস্তাব করেন। কয়েক দিন পূর্বে এই সম্পর্কে একটি আলোচনা চলে। তিনি একটি আইন-প্রণয়ন করিয়া বাধ্যতামূলক ভাবে কর্মসংস্থান কেন্দ্র মারফৎ লোক-নিয়োগের প্রস্তাবও করেন। তাঁহার প্রস্তাবটি সাধু; কিন্তু সমস্যা সমাধানে ইহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য তাহা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার যে সরকারী হিসাব পাওয়া যায়, তাহাতে এই বৎসর প্রথম তিন মাসে ৪৮৭২৮ জন বেকার কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম রেজেষ্ট্রী করিয়াছে। এই বৎসর মার্চ মাস পর্যন্ত কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রের চাকুরী প্রার্থীর তালিকায় মোট নাম ছিল ১৬৩১০৪ জনের। তন্মধ্যে ম্যাট্রিক পাশ করেন নাই এমন লোকের সংখ্যা ১২৩৬২৭ জন, ২৬৮১৯ জন ম্যাট্রিক পাশ, ৭৬৬২ জন ইণ্টারমিডিয়েট পাশ, ৭৩ জন ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৩৭ জন চিকিৎসা বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট এবং অন্যান্য গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৫৩৮৭। আরও জানা যায় প্রতি মাসে প্রায় ১৮০০০ লোক চাকুরী পাইবার আশায় নাম লিখাইতেছে কিন্তু তাহাদের শতকরা ৯ ভাগকেও কাজে লাগান যাইতেছে না। মাত্র ৫৭০০ লোককে প্রতিমাসে কাজে লাগাইতে পারা যাইতেছে। বাঙ্গলা দেশে বেকারের সংখ্যা যদি ১২ লক্ষ হয়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলি উহাদের মাত্র সিকি ভাগের খবরদারী করিতেছে। ১৯৫৬ ও '৫৭ সালে যথাক্রমে ১৫৬৫৭৪ ও ২১০৫৭৮ জন বেকারের নাম রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছিল।

বেকার সংখ্যার ইহাই প্রকৃত পরিসংখ্যান নহে। বহুলোক বেকার থাকিয়াও নৈরাশ্যের সফলতা জানিয়া কর্ম-কেন্দ্রে নাম লেখায় নাই। কর্মকেন্দ্রের হয়রানির তিক্ত অভিজ্ঞতা অনেকের বিরক্তির সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানেও পক্ষপাতিত্ব নাই, ইহাও সত্য নহে। তাহা ছাড়া আরও ২।১টি মাস পরে স্কুল ফাইন্যাল, ইণ্টারমিডিয়েট, উপাধি ও স্নাতক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যা যে আরও সঙ্গীন হইবে এবং পরিসংখ্যানের বিরাটত্ব অংকবিশারদের শ্রমসাধ্য বস্তু হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

লোক নিয়োগের প্রচেষ্টা ও বেকার সমস্যার সমাধান, দুইটি পৃথক সমস্যা। একটিকে অন্যটির সহিত জড়াইয়া ফেলিলে সমস্যার সমাধানে উদ্দেশ্যের পার্থক্য ঘটিবে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যকে এড়াইয়া যাওয়া হইবে। জাতির উৎপাদন বৃদ্ধি না হইলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় না। কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান না গড়িয়া উঠিলে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল প্রয়োজনে যে সামান্য সংখ্যক লোক-নিয়োগ হইবে তাহাতে বেকার সমস্যার সমাধানের কোন নির্দিষ্ট ইংগিত নাই। মাত্র কয়েকজন লোকের চাকুরীর জোগাড় করিয়া দেওয়া যাইবে। ইহাতেও পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে এবং থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। Merit, Capacity, ability ও necessity ইহার মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তরায় বা আবশ্যিক গুণ তাহা শিক্ষণীয় গবেষণার বিষয়-বস্তু হইতে পারে; কিন্তু লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার বিচার করা হয় না, ইহা সর্বজনবিদিত। সুতরাং আলোচ্য পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সরকারী উদ্দেশ্যের কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলাম না এবং এ-হেন পটভূমিকায় সরকারী ও বে-সরকারী অফিসের অফিসার, মালিক, বড়বাবু ও হেড্‌-এ্যাসিট্যাণ্ট এমন কি মন্ত্রী ও ম্যানেজিং ডিরেক্টার কাহাকেও দোষী না করা নিরাপদ মনে করি।

ভারতে সেচ ও বিদ্যুৎ কর্মসূচীর অগ্রগতি

সম্প্রতি সংসদ সদস্যগণের মধ্যে কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের ১৯৫৭-৫৮ সালের যে রিপোর্ট প্রচার করা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় বারি ও বিদ্যুৎ কমিশন বিভিন্ন নদীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশদ পর্যালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ক্যানালের সাহায্যে মাদ্রাজের সহিত কলিকাতার সংযোগ রক্ষার জন্য একটি রিপোর্ট তৈয়ারী করা হইয়াছে এবং সেজন্য কত ব্যয় হইবে তাহারও একটি মোটামুটি হিসাব ঐ রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে। কোথায় কোথায় সম্ভাব্য পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হইবে সে সম্বন্ধে কমিশন একটি খসড়া রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন এবং আটটা নদীর অববাহিকায় সেচ কার্য চালাইবার কিরূপ সুবিধা আছে সে বিষয়েও প্রাথমিক রিপোর্ট তৈয়ারী করা হইয়াছে। তাম্রপর্ণী ও ভাগোই নদীর অববাহিকা এবং মহানদীর উপর নৌচলাচল সম্পর্কিত রিপোর্টও তৈয়ারী করা হইয়াছে।

যে সকল পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ প্রায়, সেগুলির বাড়তি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কমিশন করিয়াছেন এবং দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন হীরাকুদ ও ভাকরা বাঁধ হইতে পৌনে দুই কোটি টাকার যন্ত্রপাতি অন্যান্য পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন। পুণাস্থিত কেন্দ্রীয় বারি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কেন্দ্র জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। সেই সমস্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ওয়াজিরাবাদে যমুনা নদী নিয়ন্ত্রণ, বোম্বাই বন্দরে পলি নিবারণের ব্যবস্থা, কেরল রাজ্যের কুট্টানাদ উন্নয়ন পরিকল্পনা কলিকাতার লবণ হ্রদ এলাকা সংস্কারের উদ্দেশ্যে হুগলী নদীতে ড্রেজারের সাহায্যে মৃত্তিকা উত্তোলন সমস্যা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রূপায়নের উদ্দেশ্যে গবেষণাকেন্দ্রে সম্প্রসারণের ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

দেশের বারি-বিদ্যুৎ সম্পদ পরিমাপের জন্য পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিমমুখী নদী, দক্ষিণ ভারতের পূর্বমুখী নদী, মধ্যভারতের নদী, গঙ্গার অববাহিকা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকার যে পর্যালোচনা আরম্ভ করা হয় তাহা শেষ হইয়াছে। নেভেলিতে একটি তাপজাত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে প্রাথমিক কাজ শেষ করা হইয়াছে এবং ইহাকে ৫০ কোটি টাকা মূল্য ঋণ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। কমিশন বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ২৭টি নদীর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের নদীসমূহ ও ব্রহ্মপুত্র নদী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান হইতেছে।

খালের জল সম্পর্কে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ—বিশ্বব্যাঙ্কের মাধ্যমে খালের জলের বিরোধ সম্পর্কে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে বিশ্বব্যাঙ্কের সহকারী সভাপতি মিঃ ডবলিউ. এ. বি. নাইলিক ভারত ও পাকিস্তান পরিদর্শন করেন। আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তি হইতে পারে এমন কতকগুলি বিষয়ে অভিমত জানিতে চাহিয়া তিনি উভয় সরকারের নিকট পত্র লিখেন, উভয় সরকার ব্যাঙ্কের নিকট তাঁহাদের অভিমত জানাইয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫৮) মিঃ আইলিফ পুনরায় ভারত ও পাকিস্তান পরিদর্শন করেন এবং উভয় সরকারের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা দ্বারা বিরোধ মীমাংসার উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করেন, কিন্তু এই আলোচনার ফলে এ পর্যন্ত কোন নিশ্চিত প্রস্তাব গ্রহণ সম্ভব হয় নাই।

প্রধান পরিকল্পনাগুলির অগ্রগতি—কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল পরিকল্পনার জন্য অর্থ সরবরাহ করেন, সেগুলির কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসের (১৯৫৭) মধ্যে হীরাকুদ বাঁধ হইতে ১ লক্ষ একর জমিতে সেচের সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়। প্রধান বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে ৮৫,৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শক্তি বিশিষ্ট তিনটি ইউনিট স্থাপন করা হইয়াছে। ৩১,৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শক্তি বিশিষ্ট চতুর্থ ইউনিট নির্মাণের কাজ

(শেষাংশ ১৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রতিবেশী দেশে বাণিজ্য সফর

আমাদের অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক

যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরে অন্যান্য দেশের মত ভারতের বহির্বাণিজ্য এক বিশেষ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৪৭ সালে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলো তখনও যুদ্ধোত্তর ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়নি। তখনও হয় কারখানাগুলো বোমা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে নয়ত পরাজিত দেশের কলকারখানা নিয়ে যুদ্ধের খেসারতের জন্য টানাটানি চলছে আর ঠিক এ সময়ে ভারত বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা পেল। ভারত বিভাগ রাজনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা সামাজিক আলোড়ন যতখানি এনেছিলো তার চেয়ে বেশী এনেছিল দুই পক্ষেরই অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা আর উদ্বাস্তু সমস্যার বোঝা ও দেশব্যাপী বেকারত্ব।

রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার পর দেশের নেতারা দেখলেন আধুনিক ছাঁচে অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করতে না পারলে রাষ্ট্র শক্তিশালী হবে না, সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়বে না; আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এত বড় একটা বিশাল দেশে সর্বস্তরে আধুনিক মনোভাব গড়ে ওঠা সহজ নয়। সরকার এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক শক্তির দ্রুত বৃদ্ধি ও পরিবর্তন চাইলেন। কিন্তু কলকারখানার লাজ-সরঞ্জাম যোগাবার মত উপাদান কোথায়? ইস্পাত নেইত মেশিন তৈরী, খাবার নেইত বাবুগিরি! ইস্পাতের কারখানা বসল, বড় বড় ড্যাম তৈরী হল, সারের কারখানা বসল অন্যান্য যেসবকারী শিল্পকেও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগী হতে বলা হ'লো; কিছু উৎপাদন বাড়লও। এখন অত কাণ্ড করতে গেলে শুধু ট্যাক্স দিলেই তো চলবে না, সস্তায় মাল তৈরী করে অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নামতে হবে, তবেই সে মাল কাটান সম্ভব হবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি করা যদিও শক্ত, তার চেয়ে বেশী শক্ত বিদেশের বাজারে ভিন্ন ভিন্ন পণ্য প্রতিযোগিতা ক'রে কাটান। পশ্চিমী দেশগুলো অনেক বৎসর থেকে নানাভাবে বিদেশী বাজার দখল করে বসে আছে। যুদ্ধের পর দেশকে পুনর্গঠন করতে তারা আমেরিকার কাছে প্রচুর ঋণ ও দান পেয়ে এতদিনের চেষ্টার খানিকটা শুধিয়ে নিয়েছেন। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সোজা নয়। অনেক দিন থেকেই ভারত চা, পাট, চামড়া, খনিজ ও কৃষি কাঁচামাল নিয়ে ব্যবসা করছে। সুতরাং তারও একটা বিশেষ বাজার ছিল। তাছাড়া এসব জিনিষ সকল দেশেরই প্রয়োজন। কারণ, এগুলি অনেক জিনিষ উৎপাদনের উপাদান। তা সত্ত্বেও কোরিয়ার যুদ্ধের চাহিদার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই সব পণ্য বিদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রী করা কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু তা'বলে দেশ গঠন ফেলে রাখা যায় না।

যুদ্ধে আমেরিকা একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি; তাই আজকে তারা উৎপাদন ক'রে বৈজ্ঞানিক উন্নতির উচ্চ স্থানে আবার উঠতে সক্ষম হ'লো এবং তার ফলও তারা ভোগ করবার সুযোগ পেল। উৎপাদন বেড়ে গেল কিন্তু সারা পৃথিবীর ক্রয় শক্তি হ্রাস পেল। আমেরিকা তখন তার উৎপাদন শক্তি চালু রাখতে ও অর্থনৈতিক অবসাদ যাবা দিতে একটা বিরাট দানছত্র খুলতে বাধ্য হল। ভারত অবশ্য এই সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বাদ পড়েনি—প্রতিবেশী না হ'লেও উইলকি সাহেবের

'ওয়ান ওয়ার্ল্ডে'র অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু এই অনুদান আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়—যার ফলে সমস্যা মিটে না। আমাদের অবস্থা টালির জলের মত খরচ হয়ে গেল। খরচ ত হয়ে গেল কিন্তু আমাদের তাতে কি অভাব মিটল ? অর্থনৈতিক কাঠামোর নতুন রূপ দিতে গিয়ে মাসে মাসে আমাদের শত শত কোটি টাকা বিদেশের বাজারে চলে যাচ্ছে, কিন্তু রপ্তানি কি সেই অনুপাতে বেড়েছে ? মোটেই নয়, আর তা বাড়ান খুবই শক্ত ; চলতি পণ্য ছাড়াও নতুন নতুন পণ্য বিদেশী বাজারে বিক্রী করতে হবে।

পশ্চিমী দেশ অন্যান্য দেশে ব্যবহার্য দ্রব্যের সঙ্গে কলকব্জা বিক্রী করে, আমরা তাদের কি বিক্রী করতে পারি ? যে কটা জিনিষ বিক্রি করি তা মান্ধাতার আমল থেকে বিক্রি করছি আর হাতে গুনা যায়। তাছাড়া তা নিয়ে উন্নত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে অনেক বেশী মালের আমদানী ও রপ্তানী করে। আজ অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়ী প্রণালীতে রাজনীতির প্রভাব আছে বলে কয়েকটি দেশ অনগ্রসর দেশগুলোকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবসায়ের মধ্যে দিয়ে তোষামোদ করছে।

ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর অবস্থা ভারতের চেয়েও খারাপ। বেশীর ভাগ দেশই শিল্প প্রধান নয়, তাদের চাহিদাও কম, ক্রয়শক্তিও খুব সামান্য। দেশ শিল্প প্রধান না হ'লে দেশের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পায় না। জনসাধারণের ক্রয় শক্তি না বাড়লে জাতির ক্রয় শক্তি বাড়ে না। প্রায় দেশেই জনস্বার্থকে প্রয়োজনের অনেক নীচের ধাপে সরিয়ে রাখা হ'য়েছে, আর দরিদ্র দেশের জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ কয়েকজন রাজা আমীর ওমরাহের খেয়াল ও বিলাসিতা চরিতার্থ করতেই খরচ হয়ে যায়। যদি জাতীয় আয় সমতানুলকভাবে বণ্টন না হয় তবে জাতির ক্রয়শক্তি খুবই কম হয়, জাতি গঠনের মূলধন পাওয়া কষ্টসাধ্য হয় ; জাতির পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার তার নিজের ঘরের বাজার, সেই বাজার যদি জনগণের ক্রয় শক্তিকে বাড়িয়ে না তুলে কেবল বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে জাতীয় শিল্প প্রাণ পায় না, বহুমুখী হয় না।

ভারত প্রতিবেশী বাজারে তার উৎপাদনের ছিটে ফোঁটা পণ্য বিক্রী করতে পারে। তবে প্রতিবেশীদের মধ্যে চীনের কথা স্বতন্ত্র ও তার ক্রমবর্ধমান শিল্প-প্রাধান্য এসিয়ার দেশগুলোর বহির্বাণিজ্যে বিশেষ শক্তি যোগাতে সক্ষম হবে। একথা সত্য যে কয়েক বৎসর ভারতের বহির্বাণিজ্যের নীতি ও ব্যবস্থার দর্শন প্রচুর বিদেশী মুদ্রার অপব্যয় হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ইহা স্বীকার করেছেন ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিদেশী পণ্য আমদানী অনেক পরিমাণে বন্ধ রেখে বিদেশী বাজারে ভারতীয় পণ্য বিক্রীর বিশেষ ব্যবস্থা করেও ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে না ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছোট ছোট হাল্কা যান্ত্রিক দ্রব্য, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, বাড়ী তৈরী করা, জল সরবরাহ করা, কিংবা কলকারখানার সরঞ্জাম বিদেশে রপ্তানির জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এর জন্য Engineering Export Promotion Council নামে একটি আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। এই কাউন্সিলের প্রতিনিধিদল নানা অনুন্নত প্রতিবেশী দেশে বাজারের তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন। সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট শিল্পপতিরা এই প্রতিনিধি দলে আছেন। এই প্রতিনিধিদল তাঁদের অনুসন্ধান বিবরণীতে নানান তথ্যের আবিষ্কার করেছেন। রাজনৈতিক শাসন, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সকল দেশে ভারতের কোন্ কোন্ পণ্য কিভাবে, কাহাদের দ্বারা বিক্রয় করা যায় তার বিবরণী দিয়েছেন। তাঁদের বিবরণী যেমন তথ্যমূলক তেমনি কার্যকরী।

সম্প্রতি এই রকম একটি প্রতিনিধিদল মধ্য ও পশ্চিম প্রাচ্য দেশে ভ্রমণ করেছেন। তাঁরা আফগানিস্থান, পারস্য কূলে বাহারেণ, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন জর্ডান ও মিশরদেশে গিয়েছিলেন। তাঁরা মাত্র পাঁচ সপ্তাহ কাল এইসব দেশে কাটিয়ে এসেছেন। মাত্র পাঁচ সপ্তাহ এতগুলো দেশের বাজার অনুসন্ধান করবার জন্য পর্যাপ্ত কিনা তাঁরাই বলতে পারবেন। যাহোক তাদের বিবরণীতে তথ্যমূলক আলোচনা দেখতে পাচ্ছি।

মধ্যপ্রাচের দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার খানিকটা মিল থাকলেও রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অনেক গরমিল দেখা যায়। শুধু যে ভারত আকারে বৃহত্তর, খনিজ পদার্থে ধনী ও শিল্প ব্যবস্থায় অগ্রণীল তা নয়, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমতার উদ্দেশ্যে কর ব্যবস্থায় ও রাজস্ব খরচায় ভারতের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মূলগত পার্থক্য আছে। তা সত্বেও এই প্রতিনিধিদল মনে করেন ভারত কয়েক বিষয়ে যত্নশীল হ'লে ঐ সকল দেশে ভারতের যান্ত্রিক দ্রব্য বিক্রী করা যায়। তবে তাঁরা যে সব বাধার উল্লেখ করেছেন তা খুব সহজ বাধা নয়—যেমন মূল্য হ্রাস, ধারের ব্যবস্থা, পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা, প্রচারের দ্বারা ভারতের পণ্য বিক্রয়কে সাহায্য করা প্রভৃতি।

যাহোক এসকল দেশে শিল্পগতি মন্থর হ'লেও যান্ত্রিক দ্রব্যের প্রয়োজন বেড়ে চলেছে, তবে কতখানি বাড়বে তা অনুমান করা খুব কঠিন। কোন কোন দেশ পঞ্চবার্ষিকী ও সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়েছে বটে, তবে তা প্রথমতঃ খুব প্রগতিশীল নয়, দ্বিতীয়তঃ এই পরিকল্পনায় জনস্বার্থের বিশেষ প্রাধান্য নেই।

এসব দেশে বেশীর ভাগই পাহাড় ও অনুর্বর মরু। আবাদী জমি ৫ থেকে ৭½ ভাগের বেশী নয়। তা সত্বেও চাষ আবাদ থেকে পাঁচ ভাগের মধ্যে চার ভাগ লোক জীবিকা অর্জন করে। শিল্প বলতে তেল, তুলা, শুষ্ক ফল কিছু কাপড় কল, কাঁচের কল প্রভৃতি ছোট ও মাঝারী সংস্থা আছে। পেট্রোল ছাড়া বেশীর ভাগ দেশেই অন্য খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না। কয়েকটি দেশ নূতন কল কারখানা খুলছে এবং এর সাজ সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করছে। বাইরে থেকে অংশ নিয়ে এসে ট্রাকটার, রেফ্রিজারেটর মোটর গাড়ী তৈরী করছে। নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধের কারখানাও আছে। কোন কোন দেশ লেদ, মিলিং, ড্রিলিং প্রভৃতি মেশিন তৈরী করবার কাজে হাত দিয়েছে। পারস্য ও মিশর এদের মধ্যে অগ্রগামী।

এসব দেশের শিল্প সংস্থা পশ্চিমী শিল্পসংস্থার চেয়ে আকারে ও উৎপাদন শক্তিতে অনেকাংশে ছোট। সেই জন্য পশ্চিমী উৎপাদনের সঙ্গে এদের উৎপাদন প্রণালীর কোন মিল নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে এসব দেশের অনেক সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য ভারতীয় যান্ত্রিক পণ্য ঐ সকল দেশের প্রয়োজনের উপযোগী হবে।

কল কারখানার সরঞ্জাম ছাড়াও বহু প্রকারের ব্যবহার্য দ্রব্য যেমন, সেলাইকল, বৈদ্যুতিক পাখা, রেডিও, ডিজেল পাম্প, গৃহ নির্মাণ সরঞ্জাম, বাগান তৈরীর যন্ত্রপাতি এসব দেশে আমদানি হয়। অনেক শহরে জল সরবরাহের দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য পাইপের বিশেষ চাহিদা আছে। বৈদ্যুতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য তার ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির চাহিদাও আছে। এছাড়া কৃষি যন্ত্রপাতি, ঢালা পাইপ, বোল্ট্, নাট, বালতি প্রভৃতি আমদানি হয়।

আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থান কৃষি প্রধান দেশ। এদের ক্রয় শক্তি খুবই কম এবং যা কেনে তা কম দামী হওয়া চাই। পয়সা নেইত স্রাও আকর্ষণ জন্মাবে কোথা থেকে। সরকারী দপ্তরগুলোই খুব বড় খরিদ্দার এবং তারা স্থানীয় ভাবেই কেনা কাটা করে। ডিজেল এঞ্জিন, বাড়ী তৈরী করবার সরঞ্জাম, কাপড় ও চিনির কলের যন্ত্রপাতি, ট্র্যাকটার প্রভৃতি আমদানি হয়। তালা, পাইপ, হারিকেন লণ্ঠন, বালতি, সেলাইকল, বৈদ্যুতিক বাল্ব, পাখা, এলুমিনিয়মের জিনিষ পত্র, ইস্পাত জাল, পিন, ফাইল, বোল্ট, নাট, লেদ, ড্রিল মিসিন প্রভৃতি বিক্রী হবার সম্ভাবনা আছে। এসব জিনিষ এখন রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি হয়। পাকিস্থানও কিছু ব্যবসা করে। আমাদের প্রতিনিধিরা মনে করেন আমাদের মুদ্রার হার পাকিস্থানির চেয়ে একটু চড়া আছে; আর তাছাড়া ও দেশে ব্যবসা বাড়াতে বিশেষ বাধা নেই।

পারস্য আর একটি দেশ। এদেশ কাবুলের মত পেছিয়ে নেই, শিল্পের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। ভারত পারস্যের সঙ্গে অনেকদিন ধরে বাণিজ্য করছে। ভারত চা, মসলা, কাপড়, পাটজাত দ্রব্য পাঠায় আর নিয়ে আসে শুকনো ফল ও গাছগাছড়া, কার্পেট প্রভৃতি। এখন পারস্যে ভারত যান্ত্রিক পণ্যও বিক্রী করতে পারে, যেমন, কৃষি যন্ত্রপাতি, ট্রেলার, বৈদ্যুতিক মোটর, ডিজেল এঞ্জিন, কাপড় কলের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। ইরাণের বাজার পেতে হলে প্রতিযোগিতায় কোমর বাঁধতে হবে, ইংরাজ, জার্মান, রাশিয়া, জাপান আরও অনেক দেশের সঙ্গে। কিছুদিন আগে একটি ভারতীয় কোম্পানী জল সরবরাহের পাইপের টেণ্ডার দিয়েছিল। জিনিষ পছন্দ মত থাকা সত্বেও একটি ইতালীয় কোম্পানীর সঙ্গে দামে পেরে উঠল না। প্রতিনিধিদল দর সম্পর্কে বেশ হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন। আরও বলেছেন কোথাও কোথাও ধারে কারবার করতে হবে। এটা একটা "ডেফারড্ পেমেণ্ট"এর যুগ। বিক্রয়কেন্দ্রে প্রচারশীল স্থানীয় লোকের সাহায্য নিতে হবে। রেডিও ও খবরের কাগজের মারফৎ প্রচারের একটা সোরগোল করবারও নির্দেশ দিয়েছেন। আরও বলেছেন যে এবিষয়ে আমাদের দূতাবাসের সক্রিয় সাহায্য করতে হবে। সরকারের কাছে নানা প্রকারের সুবিধা পাওয়ার কথা বলেছেন।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয়েই আমাদের যত্নবান হ'তে হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এছাড়াও আমি মনে করি যে ভারত যতই যত্নশীল হ'ক না কেন বাইরের বাজারে যান্ত্রিক পণ্য বিক্রয় করা ভারতের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ও সহজসাধ্য হবে না। কারণ এই প্রচেষ্টার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পগতির সামঞ্জস্য নেই। যদি রাতারাতি রপ্তানি বাড়াতেই হয় তাহলে চলতি পণ্যের রপ্তানি বাড়ান সহজ সাধ্য হবে।

ভারতের যান্ত্রিক শিল্পের ভিত্তি এখনও এ রকম সুদৃঢ় হয়নি যে ভারত শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যান্ত্রিক পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রী করতে পারে। পশ্চিমী দেশগুলো শতকরা গড়ে ২২।২৫ ভাগ যান্ত্রিক দ্রব্য বিদেশে বিক্রী করে। তাদের উৎপাদন অনেক বেশী ও বাজারও বড়। নানা প্রকারের বিক্রয় কৌশলও তাদের আয়ত্বাধীন। উপরন্তু যে ইস্পাত আমরা তৈরী করি কিম্বা ইস্পাতজাত জিনিষ তৈরী করি তা আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পর্যাপ্ত নয়। ৫০০৲ কোটীর টাকার কল কারখানার মাল বৎসরে আমাদের দরকার হয় কিন্তু আমরা ৫ কোটীর মত উৎপাদন করি। দেশের বাজার যখন সজাগ থাকে বাইরেরর বাজারে মাল যাওয়া মুস্কিল।

মূল্য হ্রাস করা ভারতের পক্ষে কঠিন। পশ্চিমী দেশের তুলনায় আমাদের মুদ্রাস্ফীতি ও শ্রমমূল্যও অনেক কম। পশ্চিম দেশের তুলনায় শ্রমিকদের অন্যান্য সুবিধা নেই বললেই চলে। ভারতীয় শ্রমিকের জীবন ধারণের মান অতিশয় নিচু। শিল্পপতিরা বলেন মুনাফার অংশ এত কমে গিয়েছে যে বেসরকারী শিল্পে সংস্কার মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হ'য়ে পড়েছে। সরকার ব্যাপকভাবে কর হ্রাস করবেন না কারণ সরকারের শাসন ব্যবস্থায় চলতি খরচ ও মূলধনী ব্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মুদ্রাস্ফীতি ও উচ্চ শ্রম মূল্য সত্বেও পশ্চিমী দেশ প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হচ্ছে! কারণ তাদের উৎপাদন পদ্ধতি উচ্চাঙ্গের ও উৎপাদন প্রচুর ও বহুমুখী। যাই হ'ক পরিশেষে আমি এই কথায় বলব যে এরকম প্রচেষ্টার ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

কর ধার্যের নূতন পদ্ধতি ও ভারতীয় অর্থনীতিতে ইহার প্রতিক্রিয়া

শ্রী এ, ভি, শ্রেষ্ঠ

অনেক চিন্তার পর আমার মনে হইয়াছে যে দেশবাসীর আস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে ভারতীয় করব্যবস্থার সম্যক সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। সকল প্রকার করের সমবেত প্রয়োগ পদ্ধতি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি ও বাস্তব জীবনের ঘটনা সংঘাতের কার্য-কারণের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান করনীতির উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমটি হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য অর্থসংস্থান করা—যাহাকে আমি তলাহীন বালতি বলিয়া ইতিপূর্বে আখ্যা দিয়াছি এবং দ্বিতীয়টি, কর ফাঁকির সকল ছিদ্র বন্ধ করা। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য দুইটির কোনটিই যথোপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

প্রথমতঃ দেখা যাক, নূতন কর-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কি? নূতন কর-ব্যবস্থা শুধু কর প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত করে নাই, ইহাকে গভীরতর করিয়াছে। ইহার ফলে অনেকগুলি নূতন করের সৃষ্টি হইয়াছে এবং করের হার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন বিভিন্ন করের বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ ব্যক্তিগত আয়ের উপর ইনকাম্‌ট্যাক্স ও সুপারট্যাক্স আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে যাহাদের বাৎসরিক আয় তিন হাজার টাকা পর্যন্ত তাহারা ও বর্তমানে আয় করের আওতায় আসিয়াছে। বহুদিন পর্যন্ত নিম্নতম হার ছিল ৪ হাজার ৮ শত টাকা। গত বৎসর হইতে যাহাদের আয় আরও বেশী তাহাদের অর্জিত আয়ের উপর ৭৭ শতাংশ এবং অনুপার্জিত আয়ের উপর ৮৪ শতাংশ কর ধার্য করা হইয়াছে। অনুপার্জিত আয়ের মধ্যে পড়ে লভ্যাংশ, বাড়ী হইতে আদায়ীকৃত ভাড়া ইত্যাদি।

যৌথ কোম্পানীর উপর ইনকাম-ট্যাক্স ও কর্পোরেশন ট্যাক্স ধার্য করা হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কোম্পানী সমূহের উপর শতকরা ৪৫ ভাগের কিছু বেশী কর আদায় করা হইত। বর্তমানে ইহাই ৫১ শতাংশাধিক ধার্য করা হইয়াছে। সম্প্রতি মূলধন লাভ কর ধার্য করা হইয়াছে। ১৫০০ টাকার অধিক লাভ হইলে শতকরা ২৫ শতাংশ মূলধন লাভ কর দিতে হইবে। ভারতে এই করটীর প্রয়োগ অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক প্রথায় করা হইয়াছে। অন্যান্য দেশেও এই কর আছে। কিন্তু সে সকল দেশে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্র যাহাতে সঙ্কুচিত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই কর বসান হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যাইতে পারে। সেখানে মূলধন বিনিয়োগের কাল যতই কম, করের বোঝাও ততই বেশী। আবার দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইহা সেই অনুপাতে হ্রাস পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে যখন দ্রুত এবং বৃহৎ শিল্প উন্নয়নের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী তখন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মূলধন লাভ করের প্রয়োগ নিতান্তই অসঙ্গত। নূতন নূতন শিল্পের ক্ষেত্রে ৩।৪ অথবা আরও অধিককাল পর্যন্ত কোন লভ্যাংশ পাওয়া যায় না। সুতরাং লভ্যাংশ যখন আসিতে সুরু করে তখন যদি বিনিয়োগকৃত সম্পত্তির ও সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে, এবং যখন কোনও লাভই হয় নাই, সেই সময়কালীন বিনিযুক্ত মূলধনের সুদের হিসাব বিচার করা হয়, তবে যখন লাভ হয় তখন তাহাকে প্রকৃত লাভ হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায় না। সুতরাং যদি মূলধন লাভ-কর ধার্য করিতেই হয় তবে ইহা এমন ভাবে করিতে হইবে যে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনরকম অন্তরায় বা উৎসাহ হ্রাসের সৃষ্টি না করে। ভারতে ইহা সমভাবে প্রযুক্ত

হইয়াছে—মূলধন ৬ মাসের জন্য বিনিয়োগ করা হউক কিংবা ৬ অথবা ১৬ বৎসরের জন্য বিনিয়োগ করা হউক সর্বক্ষেত্রে করের হার হার ২০ শতাংশ।

লভ্যাংশ ও বোনাসের উপরও করধার্যের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। ছয় শতাংশ পর্যন্ত লভ্যাংশের উপর কর দিতে হয় না। কিন্তু ছয় হইতে দশ শতাংশ পর্যন্ত লভ্যাংশ ঘোষণার জন্য অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শাস্তিমূলক কর দিতে হয়। এইভাবে ১০ হইতে ১৮ শতাংশ লভ্যাংশের উপর শতকরা ২০ টাকা এবং ১৮ শতাংশের উপর হইতে শতকরা ৩০ টাকা অতিরিক্ত কর দিতে হয়। এই ধরণের লভ্যাংশের উপর কর আদায় প্রাইভেট লিমিটেড্ কোম্পানীগুলির উপর অন্যায়ভাবে প্রযুক্ত হয়; এই কোম্পানীগুলি ভারতীয় আয়কর আইনের ২৩-এ ধারার তালিকাভুক্ত। আমার মতে ভারতের Statue Book এ লিখিত যতগুলি আইন আছে আয়কর আইনের ২৩-এ ধারার মত আর কোন ক্ষতিকর আইন সেখানে নাই। মাঝারি ধরণের শিল্পগুলির উপর এই ধারাটি অবর্ণনীয় ক্ষতি করিয়াছে। ভারতের মত অর্থ নৈতিক অবস্থাপন্ন দেশে যেখানে নূতন মূলধন সংগ্রহ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, যেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রবোজকগণ বাজারে এখনও সুপরিচিত নহেন, যাহারা এখনও বাজার হইতে মূলধন আদায় করিবার মত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন নাই,—যাহারা সবেমাত্র নূতন চিন্তাধারা অনুপ্রাণিত হইয়া নব নব শিল্পের সৃষ্টিতে নূতন উদ্যম ও উদ্দীপনা লইয়া ভারতের শিল্পক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের উপর এই করভার নিতান্ত অসঙ্গত। এই সকল শিল্প উদ্যোক্তারা সাধারণতঃ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হইতে কষ্টে-সৃষ্টে উঞ্ছবৃত্তির সাহায্যে সামান্যতম মূলধন লইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। এদের কঠোর পরিশ্রমের পরিণতিস্বরূপ যখন লাভের আশা দেখা দেয় তখনই ২৩-এ ধারার প্রয়োগ হয়। তখনই আইন অনুযায়ী দাবী করা হয় যে, কর প্রদানের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে শতকরা ৬০ ভাগ তাহার অবশ্যই বিতরণ করিতে হইবে। তাহার অর্থ এই যে, যে সামান্যতম মূলধন সে দুর্দিনে সংগ্রহ করিয়াছিল তাহার উপর ৫০ শতাংশ বিতরণ করিয়া তাহার উপর ট্যাক্স দিয়া আর যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাও শাস্তি-মূলক কর দিবার পর নিঃশেষ হইয়া গেল। আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বলিতে পারি কিভাবে ২৩-এ ধারা এইসব শিল্পের ক্ষেত্রে ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে। আমি জানি এইসব শিল্পের মূলধন সরবরাহের সমস্ত উৎস টানিয়া লওয়া হয়। ফলে, ইহাদের সম্প্রসারণের আর কোন সুযোগ থাকে না। সুতরাং স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, যে শিল্পগুলি প্রকৃতই সম্প্রসারণশীল, যাহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ অথচ যাহাদের উদ্যোক্তাগণ টাকার বাজারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নহেন, এমন কি ব্যাঙ্কের সহিত যাহাদের সম্যক পরিচিতি ও সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠে নাই, করনীতির ফলে তাহাদের শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ দুর্যোগময়।

সম্পদকর প্রযুক্ত হইয়াছে ব্যক্তি ও যৌথ কোম্পানীর ক্ষেত্রে। ২ লক্ষ টাকার অধিক সম্পত্তির উপর এই কর ধার্য করা হয়। ইহা স্তরে স্তরে বিভিন্নহারে আদায় করা হয়। ২ লক্ষ হইতে ১২ লক্ষ সম্পত্তির উপর অর্ধ শতাংশ, ১২ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ সম্পত্তির উপর ১ শতাংশ এর তাহার উপরে দেড় শতাংশ। সাধারণতঃ সম্পত্তি বিক্রয়ের সময় কর দিতে হয় না; সুতরাং কর আদায়ের বৎসরে আয়ের উপর এই কর আদায় করা হয়। সম্পদকর যদি আয়কর ও অতিরিক্ত করের সহিত একত্রে গ্রহণ করা হয় তবে ইহার বোঝা অত্যন্ত বেশী হইয়া দাঁড়ায়। এমন অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে যে যাহাদিগকে বিগত বৎসরের আয়কর, সম্পদকর ও অতিরিক্ত কর দিবার জন্য মোট আয়ের শুধু একশত ভাগই প্রদান করিতে হয় নাই, অধিকন্তু এই করের ঋণ শোধ করিবার জন্য সম্পত্তির

কিছু অংশ বিক্রয় করিতেও হইয়াছে। সুতরাং সম্পদকর আমাদের দেশে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। ইহা একপ্রকার 'ক্যাপিট্যাল লেভি'। ক্যাপিট্যাল লেভি অন্যান্য দেশেও প্রযুক্ত হইয়াছে কিন্তু সেখানে এইরূপ বাৎসরিক হারে আদায় করিবার ব্যবস্থা নাই। সাধারণতঃ কোন জরুরী প্রয়োজনে অথবা কোন এক বিশেষ বৎসরের আর্থিক সংকুলানের জন্য ইহা আদায় করা হয়। যদি কাহাকেও জীবনের ২৫।৩০ অথবা ৩৫ বৎসর বয়সে সম্পদকর দিতে হয় তবে তাহার অর্থ এই যে তাহাকে সঞ্চয় করিতে না দিয়া উপরন্তু দরিদ্র করিয়া ফেলা হয়।

যে সব লোক আজ সম্পদকর দিতেছে তাহারা প্রধানতঃ বিত্তসম্পন্ন এবং তাহাদের নিকট শিল্প সংগঠনের নূতন উদ্দীপনা আশা করা যায় অথবা এইসব লোক সরকারের আর্থিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সরকারী ঋণ পত্রে বিনিয়োগ করিতে উৎসাহী হয়। ইহাদের নিকট হইতে সম্পদকর আদায়ের ফলে শুধু ইহাদেরই আর্থিক সামর্থ হ্রাস প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, জাতীয় আয়ও হ্রাস পায় এবং তৎসঙ্গে জাতীয় আর্থিক কাঠামোর অবনতি ঘটে।

ইহা ছাড়া যৌথ কোম্পানীর উপর সম্পদকরের প্রয়োগও অযৌক্তিক এবং ন্যায়ের দিক দিয়া অসঙ্গত। যখন এমন কথা বলা হয় যে যৌথ কোম্পানী সমূহ রক্ষণশীল মনোভাবের সহিত মূলধন বিনিয়োগ করিয়া অর্জিত মুনাফা পুনরায় যাহাতে শিল্পে বিনিয়োগ করিয়া শিল্প সম্প্রসারিত করিতে পারে এইরূপ নীতি অনুসরণ করা উচিত তখন সম্পদকর প্রয়োগের ফলে সে নীতিতে ব্যতিক্রম ঘটানো হয়। তাহার কারণ যৌথ কোম্পানীর সম্পদের হ্রাস হয়। যৌথ কোম্পানীর সম্পদ প্রকৃতপক্ষে অংশীদারদের সম্পদ। সুতরাং যৌথ কোম্পানীর সম্পত্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পদের হ্রাস হয়। সম্প্রতি কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে সম্পদকর যদি অন্যায় হইয়া থাকে তবে অন্য কোন করের সম্পর্কে অনুকূল মত পাওয়া গেলে উহা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে। সুতরাং উপরোক্ত উক্তি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সম্পদকর প্রবর্তনের ফলে বাঞ্ছিত ফললাভ হয় নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে এই সকল কর প্রয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য হইল যথাসাধ্য সরকারী আয় বৃদ্ধি করা। যতদিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ আদায় করা সম্ভব হইবে ততদিন পর্যন্ত ইহার কুফল বুঝিতে পারা যাইবে না; কিন্তু এমন একদিন আসিবে যেদিন আয়ের পরিমাণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম হইয়া পড়িবে, তখন ইহার যাথার্থ বুঝিতে পারা যাইবে।

ইহার পরেই ব্যয়কর। ইহা একটি অত্যন্ত খারাপ কর। যখন কোনব্যক্তি ইন্‌কাম্ ট্যাক্স, ওয়েল্‌থ্ ট্যাক্স বা সম্পদকর দিয়া রাষ্ট্রের সমস্ত দায় শোধ করিয়াছেন, তখন যদি তাহার হাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ থাকিতে দেখা যায়, তাহাকে বলা হইল যে 'তুমি তোমার আয়ের অবশিষ্ট অর্থটুকুও শান্তিতে ব্যয় করিতে পারিবে না, ভোগ করিতে পারিবে না।' আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু গবেষণা করিতেছেন; তিনি আমাকে একদিন বলিলেন যে ব্যয়কর খ্রীষ্টজন্মের এক শতাব্দী পূর্বে রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট অগাষ্টাস্ ব্যয়কর প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আমি সরকারের বহু প্রচেষ্টার প্রশংসা করি; কিন্তু আমাদের সরকারের ইতিহাসে প্রতি এতখানি মমত্ববোধ আজ আমি প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক খ্রীষ্ট জন্মের এক শতাব্দী পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল, আজ তাহা আমাদের সরকার দেশবাসীর নিকটে আবার তুলিয়া ধরিলেন!

ইহার পর সম্পত্তি কর। এতদিন পর্যন্ত এই কর কোন মৃতব্যক্তির এক লক্ষ টাকা অথবা তাতোধিক মূল্যের সম্পত্তির উপর চার হইতে চল্লিশ শতাংশ হারে নির্ধারিত হইত। বর্তমানে ইহাকে পঞ্চাশ

হাজার করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যাহার আয় আছে, সম্পত্তি আছে, তাঁহাকে বাঁচিলেও কর দিতে হইবে, মৃত্যুর পর ইহলোকের সমস্ত মায়া কাটাইয়া গেলেও সরকারের মোহিনী মায়ার আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে দানকর আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। ১০ হাজার টাকার বেশী কোন বৎসর কেহ যদি দান করে, তাহা হইলে সেই দানের উপর তাহাকে দান কর দিতে হইবে। তবে আইনটি পড়িয়া মনে হয় যে ইহার স্রষ্টা এবং রচয়িতা নিশ্চয়ই কোন প্রিয়তম অনুগত স্বামী; তাঁহার ভাল বাসার নিদর্শন হিসাবে স্ত্রীকে একলক্ষ টাকা দানের উপর দানকর মুকুব ব্যবস্থা এই আইনে রাখিয়াছেন। এই আইনের দুইটি ধারা বিশেষভাবে আলোচ্য—একটি ধারা এমন জবর যে এই সম্পর্কে যখন আমি দিল্লীর কর্তা ব্যক্তিদের দৃষ্টির আকর্ষণ করি, তখন তাহারাও বিস্ময় বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং বলেন যে তাঁহারা আইনটি ভাল করিয়া দেখেন নাই। এই ধারাটিতে আছে যে যদি কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী অথবা বেসরকারী কোম্পানী অথবা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক কারণে কিছু সাহায্য করে তবে তাহা দান বলিয়া পরিগণিত হইবে। যে ব্যক্তি সাধারণ নির্বাচনের সময় তাহার নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহের জন্য নিতান্ত শুভাকাঙ্খী বন্ধুদের নিকটে সাহায্য প্রার্থী হইলেন, সেই ব্যক্তি যদি নির্বাচনে জয়লাভ করিবার পর ঐ সাহায্যের উপর দান কর দিতে বলেন, তবে তাহা সৌজন্যসূচক হইবে কিনা তাহাই প্রশ্ন! এই বিলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যাহা আমাদের অর্থনীতির উপর সমধিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে। সাধারণতঃ প্রত্যেক লোকই তার নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি একটু দুর্বলতা অনুভব করে এবং তাহার অনুবর্তী হইয়াই সেই সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য সে উৎসুক হইয়া উঠে। সেইজন্যই পারসী, হিন্দু কিম্বা মুসলিম অথবা খ্রীষ্টান প্রত্যেকে আপনার সহজাত প্রবৃত্তিতে নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। আইন করিয়া সহজাত প্রবৃত্তির আবেগ রোধ করা যায় না। সুতরাং যদি আইন করিয়া সম্প্রদায়গত দান—যাহার সাহায্যে স্কুল, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে, তাহা যদি কর প্রয়োগে রোধ করা যায়, তবে সমাজের সমূহ ক্ষতি হইবে। কিন্তু দান করের রচয়িতাগণ, মনে হয় "কে-বা তাহার কথা শোনে" এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

এই সমস্ত কর ছাড়াও আভ্যন্তরীন শুল্ক (excise) বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া দেশবাসীর আয়ের উপর 'বোঝার উপর শাকের আঁটির' সৃষ্টি করিয়াছে। গত ১০ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাই আভ্যন্তরীন শুল্কের হার ৫০·৮০ কোটি টাকা হইতে ১৯৫৮-৫৯ সালে ৩০৪ কোটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চিনি, সিমেন্ট, ইস্পাতের ইনগট, তামাক, দিয়াশলাই, সিগারেট, কাগজ, বনস্পতি, মোটর স্পিরিট ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক বা আভ্যন্তরীন শুল্ক প্রয়োগের ফলে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন যাত্রা ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের মেরুদণ্ড। যে কোন দেশে—গণতান্ত্রিক দেশে মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার প্রতি সম্যক গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের দেশে ইহারা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর উপর অর্থনৈতিক চাপের বিষময় প্রতিক্রিয়া গভর্ণমেণ্ট একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই।

(ক্রমশঃ)

১৮৪ বৎসর পূর্বে বাংলা ভাষায় প্রথম অর্থনীতির প্রবন্ধ

সম্পত্তি শাস্ত্র

৺রাজা রাজেন্দ্র লালা মিত্র

একদা শ্রদ্ধেয় পরলোকগত অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার রাজেন্দ্রলালা মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু বার্ষিকে সভাপতিত্ব করেন। তখন তাঁহার অনুরোধে তাঁহাকে ৺রাজেন্দ্রলালার 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পড়িবার জন্যে দিই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তাহার ধন বিজ্ঞান পরিষদে রাজেন্দ্রলালা লিখিত অর্থনীতির উপর প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন। পরে তাঁহার পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলালা ভারতের প্রথম অর্থনীতিজ্ঞ। তিনিই দেশীয় ভাষায় অর্থনীতি প্রথম প্রচার করার গৌরব রাখেন। 'সম্পত্তি শাস্ত্র' এই প্রবন্ধ তিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহে—১৭৭৪' সালের বৈশাখ মাসে প্রথম আলোচনা করেন—কাজেই এই প্রবন্ধ ১৮৪ বছর আগে প্রকাশিত হয়; পরপর তিনটী সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয়। ইংরেজ রাজত্ব যখন কায়েম হয়নি তখনও বাঙালীর বাংলা ভাষায় অর্থনীতির উপর প্রবন্ধ রচনা স্বাদেশিকতার কত বড় নিদর্শন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সম্পাদক, আঃ প্রঃ

সম্পত্তি শাস্ত্র—তাহার লক্ষণ—যে শাস্ত্রে সর্ব্বসাধারণে ধনোপার্জ্জন করিবার নিয়ম সকল প্রাপ্ত হয় তাহার নাম সম্পত্তি শাস্ত্র।

ধন—যাহা আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে এবং যাহার বিনিময়ে আমরা প্রয়োজনীয় বা সন্তোষজনক অন্য পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারি তাহার নাম "ধন"—কতিপয় পদার্থ আমাদের মনের সন্তোষ আপাততঃ করিতে পারে কিন্তু তৎপরিবর্তনে তোষজনক বা প্রয়োজনীয় অন্য পদার্থ পাইতে পারা যায় না; যথা বায়ু সূর্য্যকিরণ এবং জল। অপর কতক পদার্থ যে কেবল মনের তোষই সাক্ষাৎ উৎপন্ন করে এমত নহে কিন্তু যে যে বস্তুতে আনন্দ জন্মে তাহাও উৎপন্ন করিয়া থাকে, যথা, বাদ্য, জ্বালান কাষ্ঠ, বস্ত্র, লবণ, লোহা, মুদ্রা প্রভৃতি। অবস্থা ভেদে কদাপি পূর্ব্বোক্ত প্রকার পদার্থও বিনিময় হয়। সুতরাং তখন ধন পদবাচ্যও হইতে পারে।

এ প্রদেশে অনেকে কেবল স্বর্ণ ও রজতকে ধন বোধ করেন। তাঁহাদিগের পক্ষে ধনের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ অতি বিস্ময়জনক হইতে পারে; কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য ব্যক্ত হইবেক। যাহার নিকট এক তোলক মাত্র স্বর্ণ কি রজত নাই কিন্তু সে যদ্যপি যথেষ্ট বস্ত্র বা কার্পাস বা অন্য কোন বিনিময়ের বস্তুর স্বামী হয়, তবে তাহার নিকট অত্যল্প স্বর্ণ বা রজত না থাকিলেও তাহাকে সম্যক ধনশালী কহিবার বাধা থাকে না। ফলতঃ সুবর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার মূল্য কাল্পনিক মাত্র, এবং পৃথিবীতে তাহা না থাকিলে কোন প্রকার ধনের অভাব হইত না। পূর্ব্বে এতদ্দেশে কপর্দক ধনরূপে ব্যবহৃত ছিল; অধুনা 'বেঙ্ক নোট' নামে প্রসিদ্ধ কাগজ খণ্ড ধনের প্রতিনিধি রূপে গণ্য হইয়াছে; কোন কোন দেশে মুদ্রিত চর্ম্মখণ্ড বা লৌহ খণ্ডও ঐ পদাভিষিক্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মূল্য কাল্পনিক অর্থাৎ এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের কল্পিত ঐ বস্তুর স্বাভাবিক বিনিময়ের ধর্ম্মের অনুসারে নিরূপিত হয় নাই। প্রস্তুতকরণের পরিশ্রম অনুসারে যে সামগ্রীর যে মূল্য নিরূপণ

হয়, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত যে পরিমাণে বদল করা যাইতে পারে তাহাই তাহার যথার্থ বিনিময় মূল্য : ইহার অনুপাত যে কোনও মূল্য নিরূপণ হয় তাহা কাল্পনিক মাত্র।

অসাধারণ ধর্ম্ম—যে গুণে বিষয় সকল আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়, যেমন বায়ুর অসাধারণ ধর্ম্ম প্রাণ রক্ষা করণ, জলের পিপাসা বারণ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ইহারা শিল্প কর্ম্মেও বিশেষে উপযোগী হয়। আলান কাষ্ঠের অসাধারণ ধর্ম্ম এই যে তাহাতে আমাদের খাদ্য দ্রব্য অন্ত-ব্যঞ্জনাদির পাক কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

এই গুণকে যখন মানব ব্যবহার সম্পাদন বিষয়ে স্থূলরূপে বিবেচনা করা যায় তখন ইহাকে বিষয়ের "আন্তরিক অসাধারণ ধর্ম্ম" বলা যায়।

আমাদের আবশ্যক পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইলে যখন কোন বিষয় তদ্ভিন্ন বিনিময় করা যায় তখন তাহার সেই গুণ সম্পত্তি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা "বিনিময়ের অসাধারণ ধর্ম্ম" বলিয়া থাকেন এবং ঐ ধর্ম্মকে 'মূল্য' শব্দে কহেন। যে সকল বস্তু সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচুর হইয়া অবস্থিতি করে। এবং যাহারা মনের বাসনা পূরণে মানব হইতে কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ করে না, তাহাদিগকেই 'আন্তরিক অসাধারণ' ধর্ম্মশালী বস্তু কহা যায়, যথা বায়ু এবং দিনকর কিরণ।

প্রকারান্তরের যে কতিপয় বস্তু মানবীয় চেষ্টা সহকারে তদীয় কার্য্য সম্পাদনে বিশিষ্ট শক্তিযুক্ত, এবং কোন কোন বিশেষ স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় তাহাদেরই সর্ব্বদা বিনিময়ে অসাধারণ ধর্ম্ম থাকে। যেমন খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র, ধাতু এবং মণিমুক্তাহীরকাদি 'আকরোৎপন্ন বস্তু বা' তদ্ভাত পদার্থ। শেষোক্ত দ্রব্যজাত পদার্থ যে বিনিময়ে অসাধারণ ধর্ম্মশালী তাহা সপ্রমাণ করা যাইতেছে। দেখ, যে বস্তুতে পূর্ব্বে কোন বিশেষ গুণ প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু পরিশ্রম দ্বারা যদি আমি তাহাতে সেই গুণরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারি—তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে ঐ অসাধারণ ধর্ম্মযুক্ত বস্তু সমূহে আমার অল্পস্ব সাধারণ স্বত্ব জন্মে। এবং এই বস্তু সমূহের সংগ্রহে আমরা বহু পরিশ্রম করিয়া থাকি তৎতুল্য আর কোন বস্তু না পাইলে কদাচ তাহার স্বত্ব পরিত্যাগ করি না। যদি কাহারো এই বস্তু লইতে আবশ্যক হয় তাহা হইলে ইহার তুল্য পরিশ্রমে সংগৃহী বস্তুর বিনিময় স্বরূপে আমারে দিয়া তাহা অবশ্যই পাইতে পারেন। কিম্বা ইহার তুল্য বা অতিরিক্ত পরিশ্রম না করিলে যে বস্তু পাইতে পারি না এমত কোন বস্তু দিয়া তাহা লওয়া আবশ্যক। দেখ যদি পরিশ্রম করিয়া একটা মৎস্য ধরি, তাহা হইলে কোন বস্তুর উপকার নিরপেক্ষে তাহা আমি কদাচ কোন প্রতিবাসিকে দিই না। বায়ু ও সূর্য্য কিরণ আমরা কোন বস্তু বিনিময় না করিয়া অনায়াসেই করিতে পারি, সুতরাং তৎপরিবর্ত্তেও তাহা আমি দিতে পারি না। এক মুহূর্ত পরিশ্রমের মূল্যে যাহা আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই তাহাও আমরা নিষ্প্রয়োজন অন্যকে দিতে কদাচ স্বীকৃত হইনা। একদণ্ড পরিশ্রম সংগৃহীত বস্তু লইতে যদি গ্রহীতা একমুহূর্ত পরিশ্রমে অর্জ্জিত দ্রব্য বিনিময় করিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি তাহা কদাচ পাইতে পারেন না ; কিন্তু সেই দ্রব্য যদি আমার না থাকে তাহা প্রকারান্তরে পাইবার চেষ্টা করি।

আর এ বিষয়ে স্পষ্ট দেখিতেছি, কৃষকেরা তাহাদের পরস্পর পরিশ্রম সাহায্যে ক্ষেত্রে যে সকল শস্য উৎপন্ন করে, সেই শস্য তুল্যাংশ করিয়া লইবার বাসনায় তাহারা সমভাবে ঐ ক্ষেত্রে শ্রম বিনিময় করিয়া থাকে। এইরূপ রূপা দিয়া সোনা পরিবর্ত্ত করিতে বাসনা করিলে লোকে স্বর্ণ হইতে

অধিকাংশ রৌপ্য দিয়া থাকে। কারণ রজত সংগ্রহ করিবার পরিশ্রম অপেক্ষা সুবর্ণ অর্জ্জনের শ্রম অনেক অধিক। এবং ঐ রূপা লোহা দিয়া বিনিময় করিতে গেলে তাহারা তদপেক্ষা লোহা অধিকাংশ অবশ্যই দিবেন। কারণ রূপা সংগ্রহ করণের শ্রম লৌহ সংগ্রহের পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ।

অধিকন্তু দেখা যাইতেছে যে যে বস্তুর সামান্যাকারে বিনিময়ের অসাধারণ ধর্ম্ম থাকে, আর তাহা লোকেরা বিনিময় করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে তদুপার্জ্জনে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল সেই প্রকার অধিকল পরিশ্রম করিতে হয়; কেননা দ্রব্য উৎপন্ন করণের পরিশ্রমই ঐ দ্রব্যের মুক্ত প্রকৃত মূল্য।

সে যাহা হউক, এ নিয়ম কোন কোন ক্ষণিক আকস্মিক অচিরস্থায়ি বিষয়ে অসঙ্গত হইয়া থাকে। উৎপাদ্যমান উপস্বত্ব বিষয়ে মনে মনে যত পরিমাণ স্থির করা যায়, কখন কখন তাহা হইতে অধিকাংশও উৎপন্ন হইয়া উঠে। এস্থলে সেই উৎপন্ন বস্তুর স্বামী, বস্তুর নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতমূল্য হইতে ন্যূনমূল্যে তাহা বিক্রয় করা উচিত বোধ করেন। এতাদৃশ স্থলে উপস্বত্ব অতিরিক্ত হওয়াতে তাহার বিনিময়ের অসাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ মূল্য পূর্ব্ববৎসম না থাকিয়া ন্যূন হইয়া পড়ে। এতদ্বৈপরীত্যে যখন উপস্বত্ব উৎপন্ন হইয়া উৎপাদকের শ্রম সফল না করে তখন বিক্রেতারা পরস্পর সেই বস্তুর স্বাভাবিক মূল্য হইতে মূল্য বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং ক্রেতারা সেই বস্তুর প্রকৃতমূল্য হইতেও অধিক মূল্য দেয়। ফলতঃ বস্তু অত্যল্প প্রস্তুত হইলেই গ্রাহক অতিরিক্ত হয়, তখন তাহার বিনিময়ের মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং যখন বস্তু অধিক হয় ও গ্রাহক শ্রেণীর হ্রাস হয়, সুতরাং তাহার মূল্য ন্যূন হয়। এইপ্রকার ক্ষণিক নিয়মের অধীন হওয়াতে কোন বস্তুর মূল্য চিরস্থায়ী হয় না। সচরাচর উৎপন্ন কোন বস্তুর বিনিময়ের মূল্যের সার্ব্বকালিক প্রথা তাহার মূল্য উৎপাদক শ্রমের প্রতি নির্ভর করে, অর্থাৎ শ্রম পরিমাণে বস্তুর মূল্য নিরূপণ হয়। যে বস্তু প্রস্তুত করণে অধিক পরিশ্রম তাহার মূল্য অধিক হয়, ও যাহার উৎপাদনে অল্প শ্রম তাহার মূল্যও অল্প।

উৎপত্তি প্রস্তুত করণ—যে কর্ম্মদ্বারা আমরা কোন প্রস্তুতে বিশেষ মূল্য সংস্থাপন করিতে বা মানবীয় প্রয়োজন সাধনে কোন বিশিষ্ট শক্তি বিন্যাস করিতে পারি, তাহার নাম "উৎপত্তি প্রস্তুত করণ।" আমরা লোহা জন্মাইতে পারি না; কিন্তু আকরোৎপন্ন অব্যক্ত ধাতু-শিল্প হইতে নির্ম্মল ধাতু বাহির করিতে পারি, পরে তাহা হইতে ইস্পাত, এবং ইস্পাত হইতে ছুরিকাদি তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই। এই সকল কর্ম্মের নাম উৎপত্তি। এই শ্রমসাধ্য উৎপত্তি দ্বারা দ্রব্যভেদে লৌহের বিশেষ বিশেষ বিশেষ মূল্য ব্যবস্থাপিত হয়। যে বস্তুতে এইরূপ মূল্য সংস্থাপন করা যায়—তাহার নাম "উৎপন্ন" বা প্রস্তুত বস্তু।

মূলধন—পরিশ্রম দ্বারা বস্তু প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে আদৌ যে সকল প্রয়োজন হয় তাহার নাম "মূলধন"। এই লক্ষণানুসারে বস্তু প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে কার্পাস মূলধন নামে বিখ্যাত হইবে। যে যে পত্রদ্বারা এই বস্তু প্রস্তুত করা যায় তাহা এবং যাহার অবলম্বনে শ্রমীবস্তু উৎপন্ন করণ সময়ে প্রতিপালিত হয় তাহাও, মূলধন পদবাচ্য। পরিশ্রম সহকারে উৎপন্ন বস্তু যাহা হইতে পুনঃ সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে যথা শ্রম-সাধ্য সূত্র যাহা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাতেও মূলধন নাম প্রয়োগ করা যায়।

———

সভ্যতার সমস্যা

শ্রীআকাশ বাসগুপ্ত

আজকাল দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই সুপরিকল্পিত পন্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে ঝোঁক দিয়েছে। সব দেশই চায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি। কিন্তু এই উন্নয়নের বেগের মধ্য দিয়েই যে এক প্রবল সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে, সে কথা চিন্তা করেছেন কি?

ধরুন, আমাদের কয়েকটী প্রাচ্য দেশের কথা। ভারতবর্ষ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি চায়। পাকিস্থান, ব্রহ্ম, চীনও সকলেই ভারতবর্ষের মত উন্নতি চায়। ফলে দেখুন কি হয়েছে। ভারতবর্ষ যেমন পাটশিল্পের উন্নতির চেষ্টা করছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতীয় পাটজাতদ্রব্য ও পাকিস্থানী পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে সংঘাত বেধেছে। ভারতবর্ষ বস্ত্রশিল্প প্রসারের সাথে সাথে ব্রহ্ম ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় সুতীবস্ত্র রপ্তানী করতে চায়। যুদ্ধোত্তর জাপানে শিল্প পুনর্গঠনের পর সে দেশও চায় ঐ সমস্ত অঞ্চলে সুতীবস্ত্র রপ্তানী করতে। সুতীবস্ত্রের উৎপাদনের উন্নতির ফলে ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়েছে। এই উন্নয়নের অর্থনীতি বা Economics of Developmentএর শেষ কোথায়, কে জানে? যদি প্রত্যেকটা দেশই অধিক উৎপাদন করতে চায়, তাহলে তাদের পণ্য কে কিনবে? এটা ভাবা দরকার।

এ সমস্যা এখনই দেখা দিয়েছে। যে সমস্ত দেশ শিল্পে উন্নতির আকাঙ্খী, তারা এক এক করে দেশের নানা রকম শিল্পের উপর সংরক্ষণের সুবিধা (Protection facility) চাপাচ্ছে। ফলে আর একদেশের রপ্তানী বাণিজ্য নষ্ট হচ্ছে। ভারতবর্ষের কথা ধরুন। কয়েক বছর আগেও এদেশে বৃটেন থেকে কত রকম বাইসাইকেল এবং মার্কিন যুক্তরাজ্য থেকে মোটরগাড়ী ও সেলাইকল আমদানী হতো। কিন্তু ভারতবর্ষে এই শিল্পগুলির উপর সংরক্ষণ চাপাবার ফলে ভারতবর্ষে গ্রেট-বৃটেনের সাইকেলের বাজার ও মার্কিন যুক্তরাজ্যের মোটরগাড়ী ও সেলাইকলের বাজার নষ্ট হয়ে গেছে। উন্নয়নের অর্থনীতিতে এই অসুবিধা। একের উন্নতিতে অপরের ক্ষতি। সেজন্য উন্নয়নেরও একটি অর্থনৈতিক সীমারেখা আছে, যার বাইরে গেলে পস্তাতে হবে। ভারতবর্ষের রেডিও শিল্পের আজকে অন্ততঃ সেই অবস্থা হয়েছে। যুদ্ধের ঠিক পরে এদেশে কয়েকটি রেডিওর কারখানা গড়ে ওঠে। গভর্ণমেণ্টও রেডিওর উপর চাপান সংরক্ষণ। কিন্তু আজ তার কটা কারখানা টিকে আছে? ভারতবর্ষের বাইরে ভারতীয় রেডিওর চাহিদা নেই মোটেই। বিদেশের বাজারে পশ্চিমী দেশগুলির তৈরী সুন্দর রেডিওর পাশে ভারতীয় রেডিও তুচ্ছ খেলনা মনে করে কেউ ছুঁতেই চায় না। আর আভ্যন্তরীণ চাহিদার কথা ধরুন। দেশের মধ্যেও রেডিওর চাহিদা কমে গেছে। কত রকমের কিস্তীতে মূল্য পরিশোধের সুবিধা ও কমিশন দিয়েও খদ্দের পাওয়া যায় না।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা উঠতে পারে। প্রত্যেকটি দেশতো আর কাঁচামাল ও ভিত্তিস্থানীয় যন্ত্রপাতির দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় তাদের এগুলি আমদানী করতেই হবে। তখনই আবার একটি দেশকে আর একটি দেশের কাছে হাত পাততে হবে। যেমন ধরুন ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে বাণিজ্যের অবস্থা। ভারতীয় শিল্পে সংরক্ষণের ফলে বৃটেন থেকে যেমন সেলাইকল, সাইকেল ও মোটরগাড়ী আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে, তেমন দেশের উন্নয়ন কাজের জন্য বৃটেন থেকে ভিত্তিস্থানীয় যন্ত্রপাতির আমদানী বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক ভাবে। বৃটেন থেকে ভারতে

মোট আমদানির মূল্য গড়পড়তার দিক থেকে মোটেই হ্রাস পায়নি। কিন্তু ঠিক এই অবস্থাটি চিরস্থায়ী হতে পারে না। কোন দেশই ভিত্তিস্থানীয় যন্ত্রপাতির দিক থেকে পরনির্ভরশীল থাকতে চায় না। রাশিয়ার কথা ধরা যাক্। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া বিদেশের কাছে হাত পেতেছিল ভিত্তিস্থানীয় যন্ত্রপাতির জন্য; আজ আর রাশিয়ার সে প্রয়োজন নেই; রাশিয়াই এখন তার চেয়ে অনেক উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে সক্ষম। অবশ্য কাঁচামালের দিক থেকে পরনির্ভরশীল থাকতে হতে পারে। কারণ সবদেশে সব জিনিষ প্রকৃতির দান হিসাবে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই পরনির্ভরশীলতার একটা সীমা আছে। কোন দেশ কাঁচামালের প্রাচুর্যের জন্য যদি একচেটিয়া মনোভাব অবলম্বন করে বাজারে নিজের কোটেশান খাটাতে থাকে, তাহলে ক্রেতা দেশগুলিকে বাধ্য হয়ে অন্য পথ ধরতে হবে। যেমন ঘটেছে কাঁচাপাটের ও পাটদ্রব্যের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়ার। পাট ও পাটদ্রব্যের জন্য সকল দেশই ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই নির্ভরশীলতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মার্কিন যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়া কৃত্রিমতন্তু, কাগজ ও কাপড়ের থলের দিকে নজর দিয়েছে! এর ফলে ঐ সমস্ত দেশে সময় সময় চটের থলের চাহিদা পড়ে যায়। তাছাড়া এক কাঁচামালের পরিবর্তে যেমন অন্য কাঁচামাল ব্যবহৃত হতে পারে (use of substitutes) তেমনই রয়েছে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অন্যান্য দেশ থেকে একই প্রকার কাঁচামাল সরবরাহের স্তর।

সেজন্য এ জিনিষটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, অধিক অন্নোৎপাদনের ফলে বা সামরিক দিক থেকে বেশী সজ্জিত হলে যেমন শেষ ফল হয়ে দাঁড়ায় যুদ্ধ, তেমনি প্রত্যেকটী দেশ যদি অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে ধাবিত হয়, তাহলে ফল হবে অর্থনৈতিক ও অধিক উৎপাদনের সংঘর্ষ। বর্তমান সময়ই এই সংঘর্ষের শক্তিশালী পূর্বাভাষ। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা থেকেই সুরু হয়েছিল সমুদ্রপারে সাম্রাজ্য বিস্তার ও শোষণের ইতিহাস। দু দু'বার সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধ ও ইতিহাসের এত শিক্ষার পর আমরা কি আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাই—অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে পৃথিবীময় অশান্তির সৃষ্টি?

এই মৌলিক সমস্যার সমাধান অর্থনীতি বা একনিষ্ঠের মধ্যে নেই। এর সমাধানে চাই চিরন্তন মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী। যে দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে আদর্শ ও শান্তিকামী মানব সমাজের কথা চিন্তা করে নূতন একনিষ্ঠের সৃষ্টি করতে হবে।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে অবস্থিত একই ভাষা ও ধর্মপ্রধান দেশ দেশ করে আমরা যে আজ ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছি, তার অবসান না হলে পৃথিবীব্যাপী আদর্শ মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। পাহাড়, সমুদ্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতির ব্যবধান এড়িয়ে সমগ্র পৃথিবীকে একটি বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে বিচার করতে হবে। এ চিন্তা হয়তো আকাশকুসুম কল্পনার মত। কিন্তু বার্ণার্ড শ' থেকে মানবেন্দ্র রায় পর্যন্ত অনেক মনীষীই এই কথা বলেছেন। আরও অনেকে আছেন যাঁরা এই কথাই বলেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা জনসংখ্যা। প্রত্যেক বছর জনসংখ্যা ৪ কোটিরও বেশী বেড়ে যাচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আহার্য, পরিধেয় ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। রাশিয়ান অর্থনীতিবিদেরা অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে থাকেন। তাঁরা বলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করুক না, ভবিষ্যতের দায়িত্ব ভবিষ্যৎ গ্রহণ করবে। নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে মানুষ নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করবে বাঁচবার জন্যে। যেমন অধিক খাদ্য-

শস্য উৎপাদনের জন্যে আজ যে ট্রাকটার আবিষ্কৃত হয়েছে, মাত্র একশো বছর আগেও তা, অজানা ছিল। রাশিয়ার চিন্তানায়কদের এই কথাটা অনেকটা সত্য হলেও, পুরোপুরি সত্য নয়। মানুষ বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাই পেয়েছে যে ভবিষ্যতের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিলে পস্তাতে হবে। বর্তমান থেকেই থেকেই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি চাই।

যদিও সমগ্র পৃথিবীব্যাপী একক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দিবা স্বপ্নের মত তবুও সেই অসম্ভবকে দূরবর্তী ভবিষ্যতে সম্ভব করবার জন্য আজ থেকেই প্রস্তুতি চাই। একটি দুর্বল লীগ অব নেশনস্ ও পরবর্তী অধিকতর শক্তিশালী ইউ, এন ও এদিক থেকে আমাদের চিন্তাধারাকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে।

বর্তমান সময়ে দুটি ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট। প্রথমটি অধিকাংশ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা—সম্বন্ধে পূর্বেই যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টী বিজ্ঞানের বিরাট জয়যাত্রা। আজ মানুষ মহাজাগতিক রশ্মিকে কাজে প্রয়োগ করছে।

এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিজ্ঞানের উন্নতি—দুটী আন্দোলনই পরস্পর জড়িত। দুটী আন্দোলনই মানুষের পক্ষে যেমন কল্যাণকর, তেমন দুটির মধ্যেই মানুষের ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে। সমস্ত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নতির আন্দোলন যেমন একদিন রক্তাক্ত অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করতে পারে, তেমন বিজ্ঞানের চরম অবদানে মারাত্মক অস্ত্রের প্রয়োগে একদিন সমস্ত সৃষ্টিই ধ্বংস পেতে পারে। সেজন্য বলছিলাম, বর্তমান সময় থেকেই ভবিষ্যতের চরম বিপদ এড়াবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

বার্ণার্ড শ'র সবচেয়ে বড় কথা বলে আমার প্রবন্ধ শেষ করবো। ভগবান বলে যদি কেহ থাকেন তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র বিরাজমান ন'ন। তা' যদি তিনি হতেন, তাহলে স্নেহশীল পিতামাতার মত তাঁরই সৃষ্ট মানুষের সমস্ত দুঃখ কষ্ট মুহূর্তে বিলোপ করে দিতেন। বস্তুতঃ সৃষ্টির মাধ্যমেই ঈশ্বরের পরিপূর্ণতা লাভের প্রচেষ্টা চলছে।....আদিম পৃথিবীতে ঈশ্বর পাঠিয়েছিলেন ডাইনোসোর জাতীয় অতিকায় প্রাণী। কিন্তু দেখা গেল তারা পৃথিবীর পক্ষে অচল। ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করে দিলেন। তারপর এল আরও কত শ্রেষ্ঠীর প্রাণী। দেখা গেল তারাও পৃথিবীর পক্ষে অচল। সেজন্য তারাও বিদায় নিল। এল বানর। তারপর মানুষ। মানুষ একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। তার চিন্তা ও কর্মশক্তি আছে। কিন্তু এই মানুষ যদি পৃথিবীর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে গড়ে না ওঠে, ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে যদি তারা সার্থক করে না তোলে, তা'হলে অতিকায় ডাইনোসোর বিলুপ্ত প্রাণীদের মত একদিন তাদেরও ধ্বংস ঘটবে।

বার্টাণ্ড রাসেল, আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষিগণ এই কথা বলেছেন, মানুষ আজ এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, যে, সুপথে যদি তাদের প্রচেষ্টা প্রবাহিত হয়, তাহলে তারা মহান ও আদর্শ মানব সমাজে উপনীত হবে; আর বিপথে চালিত হলে সমূহ ধ্বংস অনিবার্য।... আমরা এখন উন্নয়নের অর্থনীতির আওতায় গড়ে উঠছি। উন্নয়ন বলতে যেন গোটাকতক কলকারখানা, ড্যাম, রাস্তাঘাটই শুধু না বুঝি। উন্নয়ন বলতে যেন আদর্শ মানব সমাজের কথা ভাবতে শিখি। জাতীয়তাবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ উন্নয়ন একদিন মেদস্ফীতিজনিত হৃদরোগের ফলে হার্টফেল করে মারা পড়বে।

———

বল্প সঞ্চয় উৎসব

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কমিশনার

আমাদের এই দেশকে যাঁরা গৌরবমণ্ডিত ক'রে গেছেন ভগবান বুদ্ধ তাঁদের অন্যতম। তাঁর অসীম করুণা, তাঁর শান্তি বাণী, তাঁর প্রতি ভারতবাসীকে এমন আকৃষ্ট করেছিল যে ভারতবাসী তাঁকে অনন্ত পুণ্যের আধার ব'লে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। ঠিক বলতে কি দীর্ঘ কাল ধরে ভারতবর্ষ এই মহাপুরুষকে নিয়ে মেতে গিয়েছিল। ভারতবাসীর সেই উন্মাদনা শুধু তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাঁর বাণী পালন ও প্রচার ক'রে তৃপ্তি পায় নি। সে উন্মাদনা যেন ভারতবাসীর জীবনের সব দিক জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। স্থপতি নির্মাণ করেছিল তাঁর জন্য সুন্দর মন্দির। ভাস্কর ঢেলে দিয়েছিল তার মন তাঁর মূর্তিকে প্রস্তরে খোদিত করতে। সাহিত্যিক রচনা করেছিল তাঁকে নিয়ে নূতন কাব্য। গল্পকার রচনা করেছিল তাঁকে নিয়ে কত গল্প। এইরূপ ভগবান বুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হয়েছিল নানা গল্পের সমষ্টি। তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অবদান'।

তারই একটি গল্প আপনাদের উপহার দিয়ে আজকের আলোচনা সুরু করতে চাই। মহামানবকে স্মরণ ক'রে শুভকার্য্য আরম্ভ করার রীতি আছে। কিন্তু সেইটিই প্রধান উদ্দেশ্য নয়। তাঁকে ঘিরে যত গল্প প্রচলিত আছে তাদের প্রতিটির একটি নীতি আছে। সেই অন্তর্নিহিত নীতিটি আমার বক্তব্যকে সহজ করে। তাই তাকে ব্যবহার করতে আমি উৎসুক। এ বিষয় আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন আমাদের দেশের আর এক মহামানব। 'কল্পতরু অবদানের' এই গল্পটির রবীন্দ্রনাথ কবিতায় রূপ দিয়েছেন। বাঙ্গালী সাহিত্য রসিক সে গল্পের সহিত সুপরিচিত। গল্পটি এই।

ভগবান বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তি নগরীতে অবস্থান করছিলেন তখন এক দুর্ভিক্ষের উদয় হয়। মানুষের মুখে অন্ন জোটে না। চারিদিকে হাহাকার উঠেছে। তখন তিনি তাঁর বিশিষ্ট ভক্তদের ডেকে বললেন,

ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা।

ভক্তদের মধ্যে শেঠ ছিলেন, সামন্ত ছিলেন, বিস্তৃত ভূমির মালিক ছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরুভার গ্রহণ করতে স্বীকার করেন না। তখন সবার অলক্ষিতে কোণে পড়ে রয়েছিলেন সামান্যা একটি নারী, তাঁর না ছিল অর্থের বল, না ছিল পদের বল। নাম তাঁর সুপ্রিয়া, ভগবান বুদ্ধের শিষ্য অনাথপিণ্ডদের তিনি তনয়া। তিনি সমবেত ভক্তদের বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে দিয়ে অগণিত মানুষের ক্ষুধায় অন্ন জোটাবার ভার নিলেন। তিনি বললেন,

নগরীর অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।

এখন প্রশ্ন ওঠে কোন সাহসে তিনি এই দুরূহ কর্তব্য সম্পাদনের ভার নিয়েছিলেন। তাঁর সহজ সরল বুদ্ধি, চরিত্রের নির্মলতার গুণে তিনি সে সাহস প্রকাশের সঙ্গত কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন বৈকি। কণায় কণায় সঞ্চিত হয়ে প্রবালের দেহ দ্বীপ সৃষ্টি করে। বর্ষার অগণিত বারিবিন্দু একত্রিত হয়ে বন্যার প্লাবন আনে। মাটির তৃষ্ণা দূর করবার তা ক্ষমতা রাখে। মুষ্টিমাত্র ভিক্ষা সকলের কাছে মিললে তা সে মহাভাণ্ডার সৃষ্টি করে তা এই বিরাট দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবার ক্ষমতা

বৈকি ! তাই যখন তাঁকে অন্যেরা জিজ্ঞাসা করেছিল, কোন দুঃসাহসে তিনি গুরুর এই কঠিন আজ্ঞা বহন করতে সম্মত হয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন,

আমার ভাণ্ডার আছে তবে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া যে কারণে দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট নগরীর ক্ষুধা নিবৃত্তির ভার নেবার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন বর্তমানে ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনও অনুরূপ কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে এমন বিরাট ক'রে গড়ে তোলবার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। প্রথম পরিকল্পনাকে রূপদান করতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ২০৬৯ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য কিন্তু তাঁরা বরাদ্দ করলেন ৪৮০০ কোটি। অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার দ্বিগুণেরও বেশী।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে কেন এমন বিরাট অঙ্কের খরচের ব্যবস্থা হয়েছিল। তার কি সত্যই প্রয়োজন ছিল ? যাঁরা এ পরিকল্পনা রচনা করেছেন তাঁদের মতে তা ছিল। তার একটা যুক্তি আছে। তা হল সংক্ষেপে এই। প্রথম পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছিল খাদ্য উৎপাদনের উপর। কারণ তখন খাদ্য সমস্যা সবার বড় সমস্যা ছিল। তখন ছিল রেশনের যুগ। খাদ্য শস্যের ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হতে কোটি কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য আমদানী করতে হত। তাই সিন্ধুতে সার উৎপাদনের কারখানা গড়ে তোলা হয়। তাই দেশের নানাস্থানে কতকগুলি নদী উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রসংগে আমাদের দেশের ময়ূরাক্ষী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা ও দামোদর নদী উপত্যকা পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। এগুলি বহু উদ্দেশ্য সাধক পরিকল্পনা। প্রথমতঃ নদী বেঁধে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ বাঁধে জল ধরে রেখে সেচের ব্যবস্থা করা যায়। তৃতীয়তঃ জল প্রবাহিত ক'রে আনুষঙ্গিকভাবে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যায়। প্রথম দুটি উদ্দেশ্য শস্য উৎপাদনের বিশেষ সহায়ক। সেই জন্যই নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

পরিকল্পনার কাজ হাতে নিয়ে কিন্তু দেখা গেল যে দেশের দ্রুত উন্নতি সাধন করতে হলে শিল্পের ভিত্তি শক্ত করা প্রয়োজন। এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে উৎপাদক পণ্য উৎপাদন বিষয়ে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হই। যে মাল আমরা ব্যবহার করি তা হল ব্যবহার্য পণ্য। আর যে মাল ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার হয় তাই হল উৎপাদক পণ্য। কাপড় আমরা পরি। তাই তা ব্যবহার্য পণ্য। তাকে উৎপাদন করতে প্রয়োজন সুতার। তাই সুতা হল উৎপাদক পণ্য। এই ধরণের মৌলিক উৎপাদক পণ্য হল কয়লা, ইস্পাত প্রভৃতি। সেই কারণেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে উৎপাদক পণ্যের উৎপাদন ব্যবস্থায়। উৎপাদক পণ্যের প্রধান হল ইস্পাত। ইস্পাত বহু শিল্পের কাঁচা মাল। সেই কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তিনটি নূতন ইস্পাতের কারখানার ব্যবস্থা করা হয়। একটি রুরকেল্লায়, একটি ভিলাইতে ও একটি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত দুর্গাপুরে। শুধু তাই নয় যে ইস্পাতের কারখানাগুলি পূর্বেই বর্তমান ছিল তাদের পরিবর্ধনের ব্যবস্থাও হয়েছে।

এখন এই ধরণের ভারি শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধনের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। প্রধানতঃ এই কারণেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ সাধ্যাতিরিক্তভাবে বাড়ান হয়েছিল।

সত্যই এখানে পরিকল্পনার রচয়িতা যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। এখানে বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ হল ৪৮০০ কোটি টাকা। এত টাকা আসবে কোথা হতে? মানুষ সাধারণতঃ এই ধরণের খরচের জন্য আয় হতে সাধারণ জীবনধারণের ব্যয় নির্বাহ ক'রে যা অতিরিক্ত থাকে তা হতে খরচ করতে পারে। ভারত সরকার দেখেছেন দেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় খরচ বাদে মোট সংগৃহীত রাজস্বের যা উদ্বৃত্ত থাকে তার পরিমাণ মাত্র ৩০০ কোটি টাকা। অতিরিক্ত কর ধার্য ক'রে আশা করা গিয়েছে যে এই উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ ৫০০ কোটি বৃদ্ধি হয়ে ৮০০ কোটিতে দাঁড়াবে। সুতরাং ৪৮০০ কোটির মধ্যে মাত্র ৮০০ কোটি উদ্বৃত্ত আয় হতে ব্যয়িত হবে। বাকি সমস্ত টাকাই সংগ্রহ করতে হবে অন্য উপায়ে। এটি কীভিমত দুঃসাহসের কাজ বৈকি?

কিন্তু দুঃসাহস না হলে ত বড় কাজ হয় না। সঙ্গত কারণ থাকলে ঝুঁকি নিয়ে এমন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় বৈকি। যেমন অনাথপিণ্ডদের কন্যা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই ভরসায় যে অল্প অল্প করে সংগ্রহ করেও এমন শস্য ভাণ্ডার স্থাপন করা যায় যা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মিটাবার ক্ষমতা রাখে। যাঁরা এই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তাঁরাও একান্ত অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ কাজ করেননি। দেশ আমাদের সকলের। দেশকে মনের মত ক'রে গড়ে তুলতে অর্থ চাই। হোক তা বিপুল পরিমাণ অর্থ হোক তা আমাদের সাধ্যাতিরিক্ত। তবুও তা অসম্ভব নয়। কেমন করে তা সম্ভব তা অবদানের গল্পটি দেখিয়ে দেয়।

আমাদের দেশ ছোট নয়। আমাদের দেশে ৫½ লক্ষ গ্রাম আছে। আমাদের দেশের অর্থ বল নেই, কিন্তু জনবলের ত অভাব নেই। প্রতি গ্রামে প্রায় একশত পরিবারের বাস। এই ৫½ লক্ষ গ্রামে ৩½ কোটি পরিবার আছে। সকলেই যদি কিছু কিছু সঞ্চয় করেন তার পরিমাণ ত কম দাঁড়ায় না। বছরে কুড়ি টাকা করে প্রতি পরিবার সঞ্চয় করলেও পাঁচ বছরে ৫০০ কোটি টাকা সঞ্চয় হয়। সেই সঞ্চয় সরকারের হাতে ঋণ হিসাবে দিলে পরিকল্পনার অর্থ সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়। এ বস্তুটি সম্ভাবনার গণ্ডির বাহিরে নয়। বরং দেশের উন্নয়নের কাজে দীনতম যে নাগরিক তারও সক্রিয় সাহায্যের পথ এতে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারও এই তৃপ্তি সম্ভব যে তার নগণ্য যা সঞ্চয় তাও দেশের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে কাজে লেগেছে।

আমাদের সরকার দ্বারা প্রবর্তিত স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা ঠিক এই যুক্তির উপর স্থাপিত। আমরা প্রতি নাগরিক সাধ্যমত সামান্য যা কিছু সঞ্চয় করি তা যদি এই স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনায় জমা দিই, তা এই বিরাট অর্থাভাব সমস্যার সমাধান করবে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সফলতা আমাদের নাগালের মধ্যে এনে দেবে। এখানে ধনী দরিদ্রের প্রশ্ন নেই, সাধ্যাতিরিক্ত চেষ্টার প্রশ্ন নেই, সকলের সম্মিলিত চেষ্টাই যথেষ্ট।

'বর্তমান'

সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যামূলক শিক্ষণীয় পাক্ষিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যা—দুই আনা

স্বাধীন ভারতে আন্তর্রাজ্য সহযোগিতা

বছরে তিনবার কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ এক বৈঠকে মিলিত হন। যে সমস্যাগুলির সমাধান তাঁরা পৃথকভাবে করতে পারেননি সেগুলি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাধান করার উদ্দেশ্যে নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। ধরুন কোন রাজ্যের বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োজন অথচ উৎপাদনের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। আর একটি রাজ্যের কারিগর প্রয়োজন কিন্তু শিক্ষণ ব্যবস্থা নেই। আবার কোন একটি রাজ্যে পর্যটক আগমন অনায়াসেই বৃদ্ধি করা যায় যদি কাছের রাজ্য থেকে সাহায্য পাওয়া যায়।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে যখন বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তখনই অনুরূপ সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। একটি বিশেষ রাজ্যের ক্ষমতা, সম্পদ ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকার যথাসাধ্য সহযোগিতা করে থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণও এই অধিবেশনে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর আন্তর্রাজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা প্রথম বাস্তব রূপ লাভ করে। এরই মধ্যে যথেষ্ট কাজ হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব রাজস্থান, দিল্লী এবং হিমাচল প্রদেশ নিয়ে গঠিত উত্তর অঞ্চলের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পরিকল্পনা রচনা করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি—অন্ধ্র প্রদেশ, কেরালা ও মহীশূরসহ মাদ্রাজ—তাহাদের পুলিশের ইনস্পেক্টার-জেনারেলকে একটি সাধারণ রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী গঠন বিষয়ে চিন্তা করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে।

অনুরূপভাবে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি—আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মণিপুর ও ত্রিপুরা—পূর্ব পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা দ্রুততর করার পন্থা নিরূপণের জন্য একসাথে আলোচনা করেছে। মধ্যাঞ্চলের রাজ্য দুটি উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ নিজেদের সীমান্তে ডাকাতের উপদ্রব বন্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করেছে। বোম্বাই ও মহীশূর নিয়ে গঠিত পশ্চিমাঞ্চলের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জলরাশি পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত করার পরিকল্পনা রচনা করেছে।

খাদ্যোৎপাদন—পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত রাজ্যগুলির প্রধান কর্তব্য হল নিজস্ব অঞ্চল তথা ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করা। এই প্রসঙ্গে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পুনর্গঠিত রাজ্যগুলির সঙ্গে যাতে এ লক্ষ্যগুলি খাপ খায় সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সহায়তায় সেগুলির অদলবদল করা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগে উত্তরাঞ্চলের জন্য ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছিল এখন সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন। অনুরূপভাবে মধ্যাঞ্চলের লক্ষ্য ২৮ লক্ষ ২০ হাজার টন থেকে বাড়িয়ে ৪১ লক্ষ ২ হাজার টন এবং দক্ষিণাঞ্চলের লক্ষ্য ১৮ লক্ষ ২৯ হাজার টন থেকে বাড়িয়ে ৩২ লক্ষ ৫৭ হাজার টন করা হয়েছে।

জনবল সংস্থা—খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁচটি অঞ্চলে ভবিষ্যতে কত কারিগরি কর্মী লাগবে তা নিরূপণ এবং তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য জনবল কমিটি গঠিত হয়েছে।

যে রাজ্য কোন কারিগরি শিক্ষালয় নেই সেখান থেকে নিকটস্থ রাজ্যগুলিতে শিক্ষার্থীদের পাঠান যাবে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশ নিজ রাজ্যের কৃষি শিক্ষার্থীদের পাঞ্জাবের কৃষি বিদ্যালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। আবার পাঞ্জাব তার পার্বত্য অঞ্চলের গ্রাম সেবকদের কৃষি বিষয়ে মৌলিক শিক্ষালাভের জন্য হিমাচল প্রদেশে পাঠাচ্ছে। এসব ছাড়াও হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বাইরে থেকে নেওয়ার জন্য রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন যে সুপারিশ করেছেন তা অধিকাংশগুলি নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একজন বিচারপতি মহীশূরের প্রধান বিচারপতির পদ পেয়েছেন আর এলাহাবাদের হাইকোর্টের একজন বিচারপতি রাজস্থানের হাইকোর্টে বদলী হয়েছেন।

আন্তরাজ্য সহযোগিতার উৎস—বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় ও নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু। ১৯৫৪ সালে তিনি লোকসভায় বলেন, আমাদের দেশকে চার বা পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত এবং প্রতিটি অঞ্চলে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর রাজ্য পুনর্গঠন আইন কার্যকরী করা হয়। সংস্কৃতি, ভাষাগত ঐক্য, নদী, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপকরণ নিরাপত্তা, আইন ও শৃঙ্খলা প্রভৃতির দিকে নজর রেখে এই আইনবলে দেশকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হল।

বিভিন্ন বৈঠকে যে সিদ্ধান্তে গৃহীত হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করার জন্য প্রতিটি পরিষদের সঙ্গে কার্যালয় যুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই কার্যালয়গুলির খাতোর বহন করে থাকেন। কিন্তু রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়ন ও শাসন করার ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না। সমস্যা সমাধানের একই পদ্ধতি অবলম্বনের প্রচেষ্টার ফলে আশা করা যায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে পুরাপুরি কাজে লাগান সম্ভব হবে। আঞ্চলিক পরিষদগুলির আরও বেশী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজ্যগুলি পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসবে আর তারই ফলে সারা অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে—জাতির ঐক্য ও কল্যাণ সাধিত হবে।

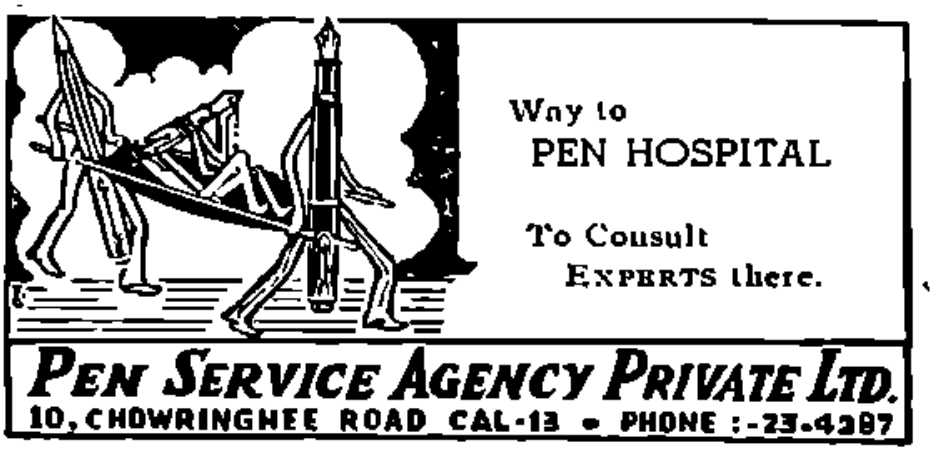

চেকোস্লোভাকিয়ার কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা

অগ্রবর্তী পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় চেকোস্লোভাকিয়া আয়তনের দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও তাহার ভৌগোলিক বিশেষত্বের উন্নত। লোকায়ত্ত প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর চেকোস্লোভাকিয়ার কৃষি ব্যবস্থাতেও সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটাইবার জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ফলে, একথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখাতে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী পশ্চিমী দেশগুলিকে ধরিয়া ফেলার ও ছাড়াইয়া যাওয়ার খুব ভালো রকম সম্ভাবনা চেকোস্লোভাকিয়ার রহিয়াছে।

সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুলনায় চেকোস্লোভাকিয়ার কৃষি উৎপাদনের অবস্থা কিরূপ? চেকোস্লোভাকিয়া আয়তনে অনেক ছোট হইবার ফলে, এক্ষেত্রে জমির মাপে তুলনামূলক বিচার করিতে হইবে। আমেরিকার প্রতি হেক্টার (= ২½ বিঘা) জমিতে মাংস উৎপন্ন হয় ৩৩ কিলোগ্রাম, দুধ উৎপন্ন হয় ১১১ কিলোগ্রাম; চেকোস্লোভাকিয়ায়: মাংস—৮৬·২ কিলোগ্রাম, দুধ—৫০২ কিলোগ্রাম। ১৯৫৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চেকোস্লোভাকিয়া যেখানে প্রতি হেক্টার জমিতে ২১·৪ কুইন্টাল্ গম ও ২০·৫ কুইন্টাল্ যাই উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই উৎপাদনের পরিমাণ হইল গম—২৩·৪ কুইন্টাল্ ও যাই—৮·৯ কুইন্টাল্।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, চেকোস্লোভাক চাষীদের সম পরিমাণ গম, আলু, মাংস, ঘাঁস মুরগি-পশুপাখি পশু ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে মার্কিন চাষীদের অপেক্ষা বেশি সময় ব্যয় করিতে হয়। একজন মার্কিন চাষী যে-সময়ে ২২ জন লোকের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যাদি দ্রব্য উৎপাদন করে সেই সময়ের মধ্যে চেকোস্লোভাক চাষী উৎপাদন করে ৮·৬ জন লোকের উপযোগী দ্রব্যাদি। পক্ষান্তরে আমেরিকায় প্রতি চাষীর মাথা-পিছু কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ ১·১ হেক্টার; চেকোস্লোভাকিয়ায় মাত্র ০·০৮ হেক্টার।

কিন্তু এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও, চেকোস্লোভাকিয়ার উল্লেখযোগ্য কৃষি-প্রধানিত হইবে ১৯৫৬ সালের নিম্নলিখিত মাথা-পিছু উৎপাদনের তুলনামূলক পরিসংখ্যান হইতে:—

কৃষিদ্রব্য	চেকোস্লোভাকিয়া	আমেরিকা
মাংস	৪৮·১ কিলোগ্রাম	১০২·২ কিলোগ্রাম
দুধ	২৮০ ,,	৩৪৩ ,,
মাখন	৩·৭ ,,	৩·৬ ,,
চিনি	৪৭ ,,	১২·৪ ,,

অর্থাৎ ভৌগোলিক আয়তনের দিক দিয়া চেকোস্লোভাকিয়ার যতটা পিছনে থাকা উচিত ছিল, তাহার চেয়ে সে অনেক আগাইয়া আছে। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার কৃষি-পরিকল্পনায় মাথা-পিছু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অগ্রবর্তী পুঁজিবাদী দেশগুলিকে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে ধরিয়া ফেলার জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন হইল স্বল্প-পরিমাণ ব্যক্তিগত উৎপাদনকে ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে পরিণত করা। এ কাজে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে। যেমন, ১৯৬৭ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার সমস্ত কৃষিক্ষেত্রের দুই-তৃতীয়াংশ (৬৩%) জমি, রাষ্ট্রীয় ও সমবায় খামারগুলির হাতে আসিয়াছে। মোট ১১,২২০টি মাংস, শস্য ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ১১,১০৩ প্রতিষ্ঠানই যুক্ত-সমবায়গুলির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

১৯৪৭ ও ১৯৫৬ সালের পরিসংখ্যান তুলনা করিয়া দেখা যাইতেছে, যুদ্ধপূর্ব চেকোশ্লোভাকিয়ার চেয়ে আজিকার চেকোশ্লোভাকিয়ার মোট কৃষি উৎপাদন ঢের বাড়িয়াছে—যদিও কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় অর্ধেক।

কৃষি-উন্নয়নের পরিকল্পনায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাটি হইল—আরও বেশি করিয়া যন্ত্রীকরণের মারফতে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানো। সেই সঙ্গে মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইবার জন্য কৃষিবিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারগুলিকে কাজে লাগানো হইতেছে। কৃষি ব্যবস্থাকে ক্রমেই সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যে অবলম্বিত এই সব ব্যবস্থাগুলি ইতিমধ্যেই বিশেষ সুফলপ্রসূ হইয়াছে। তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই নূতন কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়।

———

ভারত ও সমবায় আন্দোলনের বনিয়াদ

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

একথা অনস্বীকার্য যে ভারতের জাতীয় সরকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বিগত সাত আট বছর ধরে অনেক টাকা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু আন্দোলনের মধ্যে যে-সব গুরুতর গলদ আছে সে সব গলদ দূর করার জন্য সরকার কোন বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিতে পারেন নি। কাজেই যথেষ্ট সদিচ্ছা নিয়ে সরকার যে টাকা মঞ্জুর করেছেন সে টাকার বিরাট অংশের মোটেই সদ্ব্যবহার হয়নি। প্রত্যেক অর্থনীতিবিদ্ স্বীকার করবেন, যে-সব গলদের জন্য আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন এখনও পর্যন্ত দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি সে-সব গলদ দূর করা একান্ত দরকারী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে যে সব দেশকে আমরা উন্নত বলে আখ্যা দিয়ে থাকি সে সব দেশের সমবায় আন্দোলনের সাথে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, যে মূলভিত্তির উপর নির্ভর করে সমবায় আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে সে মূলভিত্তি হল প্রাথমিক সমবায় সমিতি। হয়ত কোন কোন স্থানে এই সমিতি পল্লীতে গঠন করা হয়েছে, আবার কোন কোন স্থানে এটা গঠন করা হয়েছে সহরে। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাথমিক সমিতি পল্লী কিম্বা সহর যেখানে গঠন করা হোক না কেন তা'তে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হচ্ছে, এই সমিতিকে গোটা সমবায় আন্দোলনের মূলভিত্তি করতে হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, বাইরের দেশগুলোয় যে সব প্রাথমিক সমিতির কথা বলা হচ্ছে কিভাবে সে-সব সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কখনই বা সমিতিগুলোর প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশে সংযোগসাধনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপিত হয়েছে। প্রধানতঃ জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর মূলধন সংগৃহীত হয়েছে। তবে প্রাথমিক সমিতি স্থাপনের সাথে সাথেই সংযোগসাধনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্ভব হয়নি। সমিতি স্থাপিত হবার পরে ক্রমে ক্রমে এগুলোর উদ্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে বলেছেন, এক একটা গ্রামের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায় সমিতি গঠন করা দরকার। যা'তে এই সব সংগঠনে সরকারের তরফ থেকে

হস্তক্ষেপ করা না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে, কারণ তাঁর ধারণা, সরকারের তরফ থেকে যদি হস্তক্ষেপ করা হয় তাহলে দেশের জনসাধারণ সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ বোধ করবেন না। তাছাড়া জনসাধারণ সমস্ত ব্যাপারে সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন; ফলে একদিকে যেরকম জাতীয় কল্যাণের পথে বাধা এসে পড়বে সেরকম অন্যদিকে জনসাধারণ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবেন।

আমাদের দেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, ভারত স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত এই আন্দোলনের পিছনে একটামাত্র উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে ঋণ সরবরাহ করা। অবশ্যি তখন কেবলমাত্র গ্রামের চাষীদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই ঋণ দেওয়া হত না। যাঁরা সহরে বসবাস করতেন তাঁদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যও ঋণ সরবরাহ করা হত। কিন্তু প্রশ্ন হল, ঋণ দেবার মত টাকা সমবায় সমিতিগুলো কোথেকে পেতেন। এই টাকার বেশীর ভাগই পাওয়া যেত হয় আমানতকারীদের কাছ থেকে না হয় দেশের সরকারের কাছ থেকে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সরকার দাদনের মারফৎ টাকা সরবরাহ করতেন। অথচ যাঁরা সমবায় সমিতিগুলোর সভ্য তাঁদের কাছ থেকে খুব কম টাকা আসত।

বৃটিশ আমলে ঋণ দেবার ব্যাপারে কি ধরণের দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হত সে সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা আমাদের অনেকেরই হয়ত আছে। সে আমলে বেনামীতে নিজে ঋণ নেবার বহু অপচেষ্টা হয়েছে। এছাড়া সমবায় সমিতিগুলোকে স্বজন পোষণের অস্ত্র হিসাবেও বহুক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। যাঁরা সমিতিগুলোর অংশীদার তাঁরা এই দুর্নীতির ফলে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। একথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, বহুক্ষেত্রে সাধ্যের অতিরিক্ত ঋণ দেবার ফলে সমিতির মূলধনের একটা বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্যি এই ঋণ সবাই পেতেন না। একমাত্র যাঁরা সমিতির পরিচালকবৃন্দের অনুগৃহীত ব্যক্তি তাঁদের এইভাবে ঋণ দেওয়া হত।

গ্রামাঞ্চলে দাদন দেওয়া সম্পর্কে জরিপ কমিটি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। কমিটি বিরাট আকারের সমবায় সংগঠনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়। ভাল ভাবে পরিচালিত হতে পারে সেজন্য সরকারী প্রভাবের আওতার মধ্যে এঁকে নিয়ে আসা দরকার। অবশ্যি আজকের দিনে অনেকেই হয়ত কমিটির এই সুপারিশের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে চাইবেন না। তবে যে পরিপ্রেক্ষিতে জরিপ কমিটির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছে—তার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। অর্থাৎ আমরা যে কথাটি বলতে চাইছি সে কথাটি হল এই যে, যখন জরিপ কমিটি তদন্ত চালাচ্ছিলেন তখন দেশে, বিশেষ করে গ্রামগুলোতে সমবায় সমিতির মারফৎ বিতরিত দাদনের পরিমাণ ছিল খুব সামান্য। মনে হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে মোট যে দাদন দেওয়া হত কোন কোন স্থানে সে দাদনের শতকরা পাঁচ ভাগও সমবায় সমিতির মারফৎ দেওয়া হয়নি। যাতে সমবায় সমিতিগুলোর মারফৎ অধিকতর পরিমাণে দাদন দেওয়া যেতে পারে সেজন্য জরিপ কমিটি রাষ্ট্র এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই ভাবে যে তহবিল গড়ে উঠবে সে তহবিলের নিরপত্তা একেবারে অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার। জরিপ কমিটি মনে করেন, যদি বিরাট আকারের সমবায় সংগঠন স্থাপিত হয় এবং দরকার মত সরকার সরাসরি ভাবে হস্তক্ষেপ করতে রাজী থাকেন তাহলে তহবিলের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্যি এক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় বিবেচনা করার আছে। যে ভাবে আমাদের দেশে সমবায়

সমিতির কাগাবলা পরিচালিত হয়ে এসেছে তাতে কোন কোন অর্থনীতিবিদের মনে এই মর্মে ধারণা জন্মেছে যে ছোট বড় প্রত্যেকটি পল্লীর ভিত্তিতে গঠিত সমবায় সমিতির হাতে যদি গোটা দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তহবিলের নিরাপত্তা বিপন্ন হবার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া এঁরা মনে করেন, এই ভাবে গঠিত সমিতিগুলো ভারতীয় সংস্থার কথা দূরে থাকুক রাজ্যের কেন্দ্রীয় সংস্থার সাথে পর্যন্ত নিয়মিতভাবে সংযোগ রক্ষা করে চলতে পারবেন না।

বৃটিশ আমলে আমরা দেখেছি সমবায় আন্দোলনের আদর্শের ব্যাপকতা সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা ছিলনা। ফলে সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ তীব্র হয়ে উঠতে পারেনি। স্বাধীন ভারতে যে রকম বিভিন্ন ধরণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমবায় প্রথার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে বৃটিশ আমলে সে রকম প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবার সুযোগ ছিলনা। আজকের দিনে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিককে কেন্দ্র করে সমবায় সংস্থা গড়ে উঠছে। অথচ পুরাতন গলদ এখনও দূর হয়নি। জনসাধারণ সমবায়ের প্রয়োজন অনুভব করেন সত্যি কথা কিন্তু বহু বছর ধরে সমবায় আন্দোলনের কাঠামোতে যে সব গলদ রয়েছে সে সব গলদ দূর করার জন্য জনসাধারণকে এখনও পর্যন্ত তৎপর হয়ে উঠতে দেখা যায়নি। কাজেই যতদিন পর্যন্ত সে সব গলদ দূর হবেনা ততদিন পর্যন্ত সমবায় সংগঠনের তহবিলের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সরকারকে দরকার মত হস্তক্ষেপ করতে হবে। অবশ্য সমিতির কাজে ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী হস্তক্ষেপ করলেই যে কখনও সন্দেহজনক লগ্না হবে না, এই রকম ধারণা ঠিক নয়, কারণ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও অসাধু এবং অপদার্থ লোক থাকতে পারেন। কাজেই সমবায় সমিতির কাজ যদি সুষ্ঠু ভাবে চালাতে হয় তাহলে সমিতির পরিচালকবৃন্দ এবং ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সতর্ক হয়ে চলতে হবে। তাছাড়া আন্দোলনের সত্যিকারের সাফল্য নির্ভর করছে এঁদের যোগ্যতার উপর।

পরিভাষা সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু

'আর্থিক প্রসঙ্গের' পঞ্চম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় ২৬৭ পৃষ্ঠায় ইংরাজী trade এবং সংশ্লিষ্ট শব্দ-গোষ্ঠীর বাংলা-পরিভাষা-রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। তৎসংক্রান্ত আলোচনার জের টানিতে হইবে এই প্রবন্ধে। Trade শব্দটির বাংলা পরিভাষা দেওয়া সহজ নয়, কেননা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে trade শব্দটী ব্যবহৃত হয়। Trade বলিতে কখনও বোঝায়, বাণিজ্য, কখনও বোঝায় তেজারতি, কখনও বা শিল্প-কার্য, কারিগরি ইত্যাদি। Industry এবং Trade-এর যেখানে যুগল-মিলন সেখানে trade-এর অর্থ হয় বাণিজ্য। সেক্ষেত্রে Industry অর্থাৎ শিল্প উৎপাদনাত্মক এবং trade বিনিময়-সূচক। মার্শালের একখানা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম Industry and Trade. সেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের পুস্তকের নামকরণে ও Industry and trade যুগ্ম-শব্দের প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লিখিত গ্রন্থদুইখানার বিষয়-বস্তু বিশ্লেষণ করিলেই তাহাদের নাম-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। Trade-এর অর্থ বাণিজ্য; free trade-এর মানে অবশ্যই হইবে অবাধ বাণিজ্য। Trade-এর মধ্যে উৎপাদনের ভাব নাই তত্তটা যতটা আছে উৎপন্নদ্রব্যের বিনিময়ের স্তোতনা। এই মূলভাব হইতেই দাঁড়াইয়াছে trader মানে বণিক এবং তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে অপর অর্থ বাণিজ্য-জাহাজ। অতএব trader বলিতে বোঝায় বণিক অর্থাৎ যে বিনিময় করে এবং বিনিময় হইতে আসে ক্রয়-বিক্রয়। আবার tradesman বলিতেও বোঝায় বণিককে—বণিকের বিনিময়ের কার্যের অনুরোধে দোকান সাজাইতে হয় বলিয়া দোকানদারকেও বোঝায়।

Trade mark—কোন ব্যক্তির, কারখানার বা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট চিহ্ন যাহা উৎপন্ন জিনিষের উদ্ভব, উৎকর্ষ বা খাঁটীত্ব প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয়।

Trade wind-এর যে বায়ু তাহারও ভাবানুষঙ্গ বাণিজ্যিক। মধ্যযুগীয় Trade ও guild-এর যে জোড় তাহাতে trade-এর মধ্যে আছে 'কারিকর' বা 'কর্মীর' স্তোতনা। Trade Union-এর মধ্যেও আছে শ্রমিকের ব্যঞ্জনা। বলাই বাহুল্য যে শ্রমিকের, কারিগরের বা কর্মীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে তত্তৎ কাজের ভাবানুষঙ্গ।

Jack of all trades, master of none—সব কাজে যা'র হাত লাগে কোন কাজেই তা'র হাত পাকে না। এখানে tradeএর ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

Two of a trade cannot agree—এই প্রবচনে সমব্যবসায়ীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব সূচিত হয়। এখানে trade-এর অর্থ অনেকখানি ব্যাপক—বৃত্তি।

Trade কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ রূপে ব্যাপার কথাটি চলে না কি? Trade যদি হয় ব্যাপার, তবে trader হইবে ব্যাপারী, ধরুন, যেমন আদার ব্যাপারী।

Stock-in-tradeকে বাংলায় তর্জমা করা হইয়াছে বিক্রয় মাল, পুঁজি-পাটা, ব্যবসায়ের দ্রব্য ও যন্ত্রাদি। আরও সহজ সরলভাষায় ইহাকে 'ব্যাপারের বেসাতি' বলা যায় না কি?

অধুনা-প্রচলিত 'State trading'-এর বঙ্গানুবাদ কেহ কেহ করিয়াছেন "রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য"; পরিভাষায় প্রমাণগুণ থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়, যদিও সবসময়ে কার্যতঃ সম্ভবপর নয়।

Trading interest, trading concern, trading company ইত্যাদি বাক্যাংশে

ব্যবহৃত trade শব্দটি প্রসঙ্গ-বিশেষে ব্যবসায় বাণিজ্য বা ব্যাপার বলিয়া বাংলায় অনূদিত হইতে পারে।

আর্থিক প্রসঙ্গের পঞ্চম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় ১৪৪ পৃষ্ঠায় Market-এর বাংলা পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে পণ্যক্ষেত্র বা বাজার। এই সম্পর্কে আরও কিছু বলা হইতেছে।

Market of agricultural produce—কৃষিজাত দ্রব্যের পণ্য
Local Market - স্থানীয় বাজার
National market (or home markdt)—জাতীয় পণ্যক্ষেত্র বা দেশের বাজার
International market—আন্তর্জাতিক পণ্যক্ষেত্র বা বাজার
Foreign market—বিদেশের বাজার (বিদেশী)
World market—বিশ্বের বা দুনিয়ার বাজার
Wide market—প্রসারী বাজার, বিস্তৃত বাজার
Organised market—সু (ব্যবস্থিত) বাজার, সংগঠিত বাজার
Regulate market—সু (নিয়ন্ত্রিত) বাজার
Market-day—হাটবার
Market price—প্রচলিত বাজার দর
Market garden—শাকসব্জির বাগান
Money market—টাকার বাজার
Open market operation—খোলা বাজারে সিকিউরিটি (নিদর্শন-পত্র) ক্রয়-বিক্রয়
Plan—নক্সা, কল্পনা
Planning—পরিকল্পনা
Planned—পরিকল্পিত
Economic Planning—অর্থ নৈতিক বা আর্থিক পরিকল্পনা
Planned economy—পরিকল্পিত (আর্থিক) ব্যবস্থা
Planning Commission—পরিকল্পনা কমিশন বা কল্পয়িতা-কমিশন
Draft Plan—খসড়া পরিকল্পনা বা পরিকল্পনার খসড়া

Discount, Rebate এবং Commission শব্দত্রয়ের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় দস্তুরি, বাট্টা ও দালালি প্রভৃতি কথা যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রেও কিন্তু শব্দ প্রয়োগে বিচার ও সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। Entrepreneur (ইংরাজী শব্দ নয়, ফরাসি ও ইংরাজী ভাষায় চলিয়া গিয়াছে)—নায়ক, সংগঠক, চালক, উদ্যোক্তা, সূত্রধার, নিষ্পাদক।

Desire—অভিলাষ, বাঞ্ছা, আকাঙ্ক্ষা
Demand—চাহিদা
Total utility—মোট উপযোগ
Factors of Production—উৎপাদনের সাধন
Effort—প্রচেষ্টা
Material—ভৌতিক
Non-material—অতি-ভৌতিক (অভৌতিক নয়)
Active agent—সক্রিয় কর্তা বা প্রযোজক
Goods—মাল
Commodity—পণ্য
} দ্রব্য, বস্তু, সামগ্রী, [নিম্ন, চিজ্
Fishery—মীনাকর, (মাছের) জলা
Combination—সংহতি, জোট
Approximation—আসক্তি, সন্নিকর্ষণ, নৈকট্য

Composite demand—মিশ্র চাহিদা
Continuous demand—অবিরাম চাহিদা
Joint demand—সংযুক্ত চাহিদা
Effective demand—কার্যকরী (ফলোৎপাদক), সার্থক, চাহিদা
Elastic demand—দমনীয় বা পরিবর্তনশীল চাহিদা।
Surety—জামিন, জামানত
Security—জামিন, প্রতিভূ, নিদর্শন-পত্র
Hypothecation—বন্ধক
Value under competition—প্রতিযোগিক, বা প্রতিযোগিতা সাপেক্ষ মূল্য।
High price—চড়া দর বা দাম।
Low price—নীচু বা নরম দর বা দাম।
Equal price—সমান দাম বা দর।
Same price—একই দাম বা দর।
Uniform price—নির্বিশেষ দাম বা দর।
By-product—উপজাত দ্রব্য, উপস্থ।
Joint-product—সহজাত দ্রব্য।
Divsion of labour—শ্রম-বিভাগ অপেক্ষা কর্ম-বিভাগ প্রয়োগ করাই অধিকতর সঙ্গত
Unproductive labour—বন্ধ্যশ্রম, অনুৎপাদক বা নিষ্ফল শ্রম।
Productive labow—অবন্ধ্যশ্রম, ফলপ্রসূ বা ফলোৎপাদক শ্রম।
Circulating capital—আবর্তিক মূলধন।
Quasi-rent—খাজনার অনুরূপ বা খাজনা-প্রায়।
Tariff wall—শুল্ক-প্রাচীর।
Metallic money or Currency—ধাতব মুদ্রা।
Paper Currency or money—কাগজী মুদ্রা, পত্রমুদ্রা।
Convertible paper—পরিবৃত্তি-ক্ষম পত্রমুদ্রা।
Legal tender—বিহিত মুদ্রা।

Legal tender যদি Limited হয় তবে তাহার বঙ্গানুবাদ হইবে সীমিত, এবং যদি Unlimited হয় তবে তাহার অনুবাদ করিতে বিশেষ শব্দ 'আমহকুম' আমদানী করিতে হইবে।

Direct tax—সাক্ষাৎ কর।
Indirect tax—পরম্পরিত বা পরোক্ষ কর।
Race—জাতি, Nation—(রাষ্ট্রিক) জাতি।
Party—দল।
Coterie, clique—ঘেঁটি, চক্র।
Kin—জ্ঞাতি (কুটি)
Tribe—উপজাতি।
Group—উপদল।
Community, sect—সম্প্রদায়, গোষ্ঠী
Clan—গোত্র, (গোষ্ঠী)।
Gen সমযোনি বা জন ?

Exchangeable কে বিনিময় যোগ্য, changeableকে পরিবর্তনীয় করিতে হয় বলিয়া convertible কে করিতে হইয়াছে পরিবৃত্তিক্ষম। আবার substitution এবং transfe শব্দ দুইটির তর্জমা করিতে গিয়া অনুরূপ অসুবিধা অনুভূত হয়—বদল ও বদলি শব্দের শরণ লইতে হয়। Saving, accumulation and hoarding এর বঙ্গানুবাদেও সমস্যা দেখা দেয় এক 'সঞ্চয়ে' কুলায় না। Wear and tear—ক্ষয়-ক্ষতি। Limited যদি হয় সীমিত, Unlimited হইবে নিঃসীম। Polyandry—বহুভর্তৃত্ব বা বহু ভর্তৃক প্রথা। Polygamy—বহুপত্নীত্ব বা বহুপত্নীক প্রথা।

বাংলা পরিভাষা

অধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্রকুমার মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

Guarantee—প্রত্যাবৃত্তি
Guinea—গিনি
Income—আয়
" Annual—বার্ষিক আয়
„ National—জাতীয় আয়
" Net—নীট আয়, আসল আয়
" Per Capita—জনপ্রতি আয়, মাথা পিছু আয়
" Unearned—অনর্জিত আয়
Inconvertible Paper Money—অপরিবর্তনীয় পত্রমুদ্রা
Increment, unearned—অনর্জিত বৃদ্ধি
Indemnity—ক্ষতিপূরণ
" Bond—ক্ষতিপূরণ পত্র
Index number—সূচক সংখ্যা
Inelastic—অনমনীয়
Inequality of wealth—ধন-বৈষম্য
Inflation of Currency—মুদ্রাস্ফীতি
Ingot—ধাতুপিণ্ড
Interest—সুদীন, সুদ
" Compound—চক্রবৃদ্ধি সুদ
„ Simple—সরল সুদ
Intrinsic Value—নিহিত মূল্য
Investment—(পুঁজি) বিনিয়োগ
Inverse ratio—বিপরীত হার
Legal tender—বৈধ মুদ্রা
Limping Standard—লঙ্গ মান
Linking—সংযোগ সাধন
Liquid asset—নগদ পুঁজি
Loan, National—জাতীয় ঋণ
Loan, unsecured—অনিশ্চিত ঋণ, অপ্রত্যাভূত ঋণ
Loss—ক্ষতি, লোকসান
Managed Currency—নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থা
Measure of Value—মূল্যের পরিমাপ
Medium of Exchange—বিনিময়ের মাধ্যম
Metallic Currency—ধাতুমুদ্রা,
Milling—মুদ্রার ধারে খাঁজ কাটা বা রেখাঙ্কণ
Mint—টাঁকশাল
Mintage—টাঁকশালী শুল্ক
Mint par · টাঁকশালী দর
Mixed Currency—মিশ্রিত মুদ্রা ব্যবস্থা
Money—ধন, অর্থ, মুদ্রা
„ Bill—ধন বিনেয়ক
„ In Circulation—পরিচলিত অর্থ
„ Market—টাকার বাজার
„ Appreciation of—অর্থের মূল্য বৃদ্ধি
„ Depreciation of—অর্থের মূল্য হ্রাস
„ Fiat—হুকুমতী পত্র মুদ্রা
„ Convertible—পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা
„ Paper—পত্রমুদ্রা
„ Quantity theory of—অর্থের পরিমাণবাদ
„ Standard—মান মুদ্রা
„ Token—প্রতীক মুদ্রা
Monometallism—একধাতু মান
Net—নীট, আসল
Negotiable instrument—সম্প্রদেয় পত্র
Nominal Value—অভিহিত মূল্য, লিখিত মূল্য
Not negotiable—অসম্প্রদেয়
Notes, Currency—পত্রমুদ্রা, নোট
„ Promissory—প্রত্যর্থ পত্র
„ Govt. „ —সরকারী প্রত্যর্পপত্র
Paper currency—পত্র মুদ্রা
„ money—পত্র মুদ্রা
Per—বরাবর, সমান, সর, হার
„ Above—অধিকার
„ At—সমহার
„ Below—ঊনহার
„ Mint—টাঁকশালী দর বা হার
Parity—সমতা
„ Of exchange—বিনিময়ের সমমূল্য দর
Passive Bond—সুদহীন ঋণপত্র
Pawn—বন্ধক দেওয়া, বন্ধকী দ্রব্য
Pawnee—বন্ধক গ্রহীতা
Payee—গ্রাপক
Payment in kind—বস্তু দ্বারা পরিশোধ
„ On account—চলতি হিসাবে

Pecuniary—আর্থিক
Pegging—হারবদ্ধ, অধিকীলন
Pegging of exchange—বিনিময় অধিকীলন
Per capita—জনপ্রতি, মাথাপিছু
„ cent—শতকরা
„ unit—প্রতি একক
Permanent debt—স্থায়ী ঋণ
„ fund—স্থায়ী তহবিল
„ Advance—স্থায়ী অগ্রিমক
Perpetual Debenture—চিরস্থায়ী ঋণপত্র
Pledge—বন্ধক, রেহন
Promissory note—প্রত্যর্থ পত্র
Public debt—রাষ্ট্র ঋণ
„ finance—রাজস্ব বিজ্ঞান
„ loan—রাষ্ট্র ঋণ
„ revenue—রাজস্ব
Purchasing power—ক্রয়শক্তি
„ „ —ক্রয়শক্তি ক্ষমতা
Quantity theory of money—
অর্থের পরিমাণবাদ
Quantum—পরিমাণ
Quittances—ঋণ মুক্তি
Rapidity of circulation—
প্রচলনের দ্রুততা
Rate—হার
„ of exchange—বিনিময় হার
Ratio—অনুপাত
„ of exchange—বিনিময়ের অনুপাত
Redeemable—পরিশোধযোগ্য
Redemption of debt—ঋণ পরিশোধ
Refund—প্রত্যর্পণ, ফেরৎ
Relative value—আপেক্ষিক মূল্য
Remission—নিষ্কৃতি, পরিহার
Reserve—সংচিতি
„ Bank—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
„ Fund—সংরক্ষিত তহবিল
„ Liability—সংরক্ষিত দায়
„ Price—ন্যূনতম দর
„ Restricted coinage—সীমাবদ্ধ টঙ্কণ
Retention money—জমানতের টাকা,
প্রতিধারণ মূল্য
Savings—সঞ্চয়
„ Bank—সেভিংস ব্যাঙ্ক
Scarcity—দুষ্প্রাপ্যতা, অনটন, অভাব
Security—প্রতিভূতি, নিরাপত্তা
„ Deposit—জামিন টাকা
„ Marketable—বিক্রয়যোগ্য প্রতিভূতি
„ Gilt-edged—স্বর্ণতুল্য প্রতিভূতি
Seigniorage—মুদ্রা নির্মাণ ব্যয়, বাট্টা
Silver coin—রৌপ্য মুদ্রা
„ Standard—রৌপ্যমান
Soft currency—সুলভ মুদ্রা
Solvency—সঙ্গতি
Specie—ধাতু
„ point—স্বর্ণনিষ্কাশ বিন্দু
Stability of value—মূল্যের স্থিরতা
Stale cheque—গতমেয়াদ চেক
Standard coin—মান মুদ্রা
„ of value—মূল্যমান
State Bank—রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক
Sterilization of gold—স্বর্ণের
Subsidiary coin—সহায়ক বা অপ্রকৃষ্ট মুদ্রা
Tariff—শুল্ক, শুল্ক-সূচী
Tender, legal—বৈধ মুদ্রা
Treasurer—কোষাধ্যক্ষ
Treasury—কোষাগার
„ Bill—সরকারী হুণ্ডি
„ Warrant—কোষাগার আদেশপত্র
Value—মূল্য
„ Declared—ঘোষিত মূল্য
„ Gross—মোট মূল্য
„ Intrinsic—নিহিত মূল্য
„ Nominal—অভিহিত মূল্য
„ Standard—মানমূল্য
„ Relative—আপেক্ষিক মূল্য
Velocity of circulation—প্রচলন বেগ
Wealth—ধন

Alteration requires full signature—
পরিবর্তনের সমর্থনে পূর্ণ সহি আবশ্যক
Amount in words and figures differ
—কথায় ও অঙ্কে টাকার মিল নাই
Bank's guarantee—ব্যাঙ্কের জামিন আবশ্য
Cheque mutilated—চেক ছিন্ন
Cheque out of date—চেকের মেয়াদ

Cheque post dated—চেক পরবর্তী তারিখের
Drawer Deceased (D/D)—চেককর্তা মৃত
Drawer's signature differs—চেককর্তার সহির মিল নাই
Effects not cleared—টাকা আদায় হয় নাই
Not sufficient fund (N/S)—পর্যাপ্ত টাকা নাই
Payee's endorsement irregular—প্রাপকের সহির ঠিকমত হয় নাই
Payee's endorsement required—প্রাপকের সহি আবশ্যক
Refer to Drawer (D/D)—চেককর্তার নিকট সংবাদ নিন

আমেরিকায় ভারতের ম্যাঙ্গানীজ

ইস্পাতের দেশ আমেরিকা। এখন আমেরিকাবাসীর জীবনযাত্রার সর্বপ্রধান অবলম্বন হচ্ছে ইস্পাত। আমেরিকার প্রত্যেক অধিবাসীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এখন প্রধান ভূমিকা নিয়েছে ইস্পাত। এক কথায় বলা যায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মার্কিন জনগণের জীবনযাত্রা বিশেষ করে নির্ভর করে ইস্পাতের ওপর। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র যেমন প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমেই পরস্পরের প্রতি অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, আমেরিকাও তেমনি ইস্পাত নির্মাণকল্পে প্রয়োজনীয় প্রধান পদার্থটির জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এই পদার্থটি হল ম্যাঙ্গানীজ। ইস্পাত তৈরী করতে প্রধান যে চারটি উপাদানের প্রয়োজন হয় ম্যাঙ্গানীজ তাদের অন্যতম। লৌহপিণ্ড, কয়লা ও ফেলে দেওয়া টুকরা ধাতুখণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া গেলেও ম্যাঙ্গানীজ এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নি। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে স্বীয় প্রয়োজনীয় ম্যাঙ্গানীজ আমদানী করতেই হয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে ২৩,০৯,১৯২ টন ম্যাঙ্গানীজ পিণ্ড আমদানী করা হয়েছিল। এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই এসেছিল ভারত ও আফ্রিকা থেকে, আর অবশিষ্টটুকু আমদানী করা হয়েছিল মেক্সিকো, কিউবা ও ব্রেজিল থেকে।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায়, ভারত ৬,০০,০০০ টনের কিছু বেশী পরিমাণ ম্যাঙ্গানীজ পিণ্ড যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করেছে। ব্রেজিলকে বাদ দিলে যুক্তরাষ্ট্র কোন একটিমাত্র দেশের কাছ থেকে এত অধিক পরিমাণ ম্যাঙ্গানীজ পিণ্ড আর ক্রয় করেনি। ইস্পাত থেকে তৈরী নয় অথবা ইস্পাত দ্বারা তৈরী নয় এরকম বস্তু আমেরিকায় এখন প্রায় নেই বললেই চলে। আমেরিকার শ্রমশক্তির আট ভাগের একভাগ এখন লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন, চালান ও বণ্টনের কাজে সরাসরি নিযুক্ত রয়েছে। বিদেশ থেকে আমদানী করা মালের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভাড়া দেয় তার শতকরা প্রায় ২৫ ভাগই ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচা মাল এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচা মাল ক্রয়ে ব্যয়িত হয়।

যদিও আমেরিকায় এখন ইস্পাতের যুগ চলেছে, একশ' বছর আগে কিন্তু তা ছিল না। তখন আমেরিকা চলছিল লৌহ যুগের মধ্য দিয়ে—৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মিশরে যে লৌহযুগ বর্তমান ছিল ঠিক সেই রকম। এর আগে ছিল তাম্র ও ব্রোঞ্জের যুগ। সে যুগে আমেরিকা ছিল প্রধানতঃ

কৃষিজীবী দেশ। ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের অধিকাংশই কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। উন্নত শস্ত্র রপ্তানী করে ইউরোপে থেকে আমদানীকৃত পণ্যের দাম অনেকখানি মেটান হত। মানুষ অধিকাংশ কাজেই তখন ঘোড়া ও বলদের সাহায্য গ্রহণ করত।

তখন কয়লার প্রচলন সুরু হলেও লোহা তৈরীর কাজে তখনও কাঠকয়লাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। এক টন লোহা তৈরীর জন্ত দু'একর জমিতে উৎপন্ন গাছ থেকে কাঠ সংগ্রহ করতে হত। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রথম রেলপথের উদ্বোধন হল। কাঠের রিপারের সাহায্যে তিন মাইল দীর্ঘ এই রেলপথ নির্মিত হল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রায় ২৩, ৪০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মিত হল এবং এজন্ত প্রয়োজনীয় রেলের অধিকাংশই আমদানী করতে হয়েছিল ইংলণ্ড থেকে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে ইংলণ্ডে স্যার হেনরী বেসেমারকে ও আমেরিকায় উইলিয়াম কেলীকে ইস্পাত তৈরীর জন্ত ব্লাষ্ট ফার্নেস নির্মাণের পেটেন্ট দেওয়া হয়। অতঃপর আমেরিকায় এই নতুন ধাতুটির চাহিদা বেড়ে চলল অত্যন্ত দ্রুত। ১৮৬৫ থেকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২৫,০০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মিত হল ইস্পাতের সাহায্যে। বৈদ্যুতিক আলোর কারখানাটি সর্বপ্রথম চালু হল ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে টমাস এডিসন নিউইয়র্ক সিটিতে তাঁর কারখানা করেন। আগাগোড়া ইস্পাতের ফ্রেম দিয়ে তৈরী প্রথম আকাশচুম্বী অট্টালিকাটি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শিকাগো সহরে নির্মিত হল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় আধুনিক ইস্পাত শিল্পের পত্তন হল। এ সময়ে আমেরিকার ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ইংলণ্ডের এক-তৃতীয়াংশেরও কম ও জার্মানীর অর্ধেক। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার উৎপাদন সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্বের মোট ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ৩৭ ভাগ উৎপন্ন হল আমেরিকায়। সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সাড়ে ৫ কোটি ইনগট টন ইস্পাত উৎপন্ন করে, অর্থাৎ আমেরিকার মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও কম। আমেরিকায় লৌহপিণ্ড ও কয়লা রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ। পেনসিলভ্যানিয়ার অন্তর্গত পিটসবার্গ কয়লা উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল। আমেরিকার উত্তরদিগ্ভাগে মাসাবি রেঞ্জে লৌহখনি রয়েছে। একমাত্র ম্যাঙ্গানীজই যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় না! অথচ ইস্পাত উৎপাদনের জন্ত এই ম্যাঙ্গানীজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ম্যাঙ্গানীজ ইস্পাতকে পরিষ্কৃত করে শক্ত করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল বন্দরে ম্যাঙ্গানীজ এসে পৌছয় মেরীল্যাণ্ডের অন্তর্গত বাল্‌টিমোর তার মধ্যে সর্বপ্রধান। এখানে প্রধানতঃ ভারত ও আফ্রিকা থেকে গত বৎসর সাড়ে ২২ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ পিণ্ড এসে পৌছেছিল। বাল্‌টিমোরকে ঘিরে ৩৫০ মাইলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কারখানাগুলিতে এই ম্যাঙ্গানীজ পিণ্ডকে ফেরো-ম্যাঙ্গানীজে পরিণত করা হয়। তারপর পাঠান হয় পিটসবার্গে। এখানে ভারতের ম্যাঙ্গানীজ আমেরিকার লোহা, কাঠ কয়লা ও ফেলে দেওয়া টুকরা ধাতুখণ্ডের সঙ্গে মিশে ইস্পাতে পরিণত হয়। তারপর পিটসবার্গ থেকে এই ইস্পাতের বাট চলে যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২৫০টি কোম্পানীতে। এখানে ইস্পাত থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্মিত হয়।

প্রত্যেকটি আমেরিকানই ইস্পাত শিল্পের নিয়মিত ক্রেতা। মোট উৎপন্ন ইস্পাতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ দেয় আমেরিকার মোটরগাড়ী নির্মাণকারকরা, আর এক-চতুর্থাংশ সাধারণতঃ বাড়ী গৃহ ও অট্টালিকাদি নির্মাণশিল্পে ও যন্ত্রনির্মাতাদের কাছে।

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানীকৃত ম্যাঙ্গানীজের বৃহত্তম অংশই ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়, তথাপি এর বেশ কিছুটা অংশ কিছুটা অংশ রাসায়নিক পদার্থ নির্মাণের কাজেও ব্যবহৃত হয়; পারম্যাঙ্গানেট উৎপাদনেও এর প্রয়োজন খুব বেশী। ড্রাই সেল ব্যাটারী নির্মাণেও অল্প পরিমাণ ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন হয়।

১৯৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৫০ হাজার টনের অতিরিক্ত যে পরিমাণ ম্যাঙ্গানীজ পিণ্ড আমদানী করেছিল তার একটা হিসাব নীচে দেওয়া হল :

ব্রেজিল থেকে	৬,৪১,৯৩৬ শর্ট টন
ভারত থেকে	৬,২০,০৭৫ শর্ট টন
ঘানা থেকে	২,১৪,৫৯৪ শর্ট টন
মেক্সিকো থেকে	২,০০,৩২৫ শর্ট টন
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন থেকে	১,৯০,৬১৪ শর্ট টন
কিউবা থেকে	১,০৪,৭৫৫ শর্ট টন
বেলজিয়াম কঙ্গো	১৩৮৬৭৪ শর্ট টন
মোট আমদানীর পরিমাণ	২১,৭১,৪৬৩ শর্ট টন

ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুতের পরিমাণ

সম্প্রতি প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বুলেটিনের (এপ্রিল, ১৯৫৮) ভারতে মজুত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অবিভক্ত ভারতের সময় হইতে (১৯৪৭-৪৮) ১৯৫৭-৫৮ পর্যন্ত গত দশ বৎসরের হিসাব আলোচনা করা হইয়াছে। ভারত-বিভাগের পূর্বেকার এমন কি ব্রহ্মদেশ পৃথক হইবার সময়কাল পর্যন্ত কোন বিশদ তথ্য না পাওয়ায় ১৯৪৭-৪৮ সালের হিসাবেও ব্রহ্মদেশের হিসাব ধরা হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য প্রবন্ধটিতে এই উপ-মহাদেশে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ের মজুত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ কত ছিল তাহার একটা বিশ্লেষণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

আলোচ্য অনুশীলন হইতে জানা যায় অবিভক্ত ভারতে মজুত স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটী আউন্স। ব্রহ্ম ও পাকিস্থানের লোক সংখ্যা বিচার করিলে তাহাতে ৩ কোটী আউন্স ঐ দুইটী দেশের মজুত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অবশিষ্ট হইতে ৭০ লক্ষ আউন্স রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত তহবিল বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতের মজুত স্বর্ণের পরিমাণ ৯ কোটী ৩০ লক্ষ আউন্স হইবে। সরকারী কোষাগারসমূহে মজুত স্বর্ণের পরিমাণ যৎসামান্য বলিয়া ইহা ধরা যাইতে পারে যে উপরোক্ত স্বর্ণের সমস্তটাই বেসরকারী ক্ষেত্রে ন্যস্ত ছিল। ইহা ছাড়াও আভ্যন্তরীণ উৎপাদন যাহা কয়েক লক্ষ আউন্স মাত্র এবং চোরাই কারবারের দ্বারা সংগৃহীত স্বর্ণের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ১৯৫৭-৫৮ সালে মজুত স্বর্ণের পরিমাণ সাড়ে দশ কোটী আউন্সের মত। ১৯৫৭-৫৮ সালে স্বর্ণের সর্বাধিক গড় মূল্য ছিল প্রতি তোলা ২৮৯ টাকা। ঐ হিসাবে ভারতে মজুত স্বর্ণের মোট মূল্য ৩ হাজার ৩৫ কোটী টাকা। আন্তর্জাতিক বাজার দর হিসাবে এক হাজার ৭ শত ৫০ কোটী টাকা।

১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে মজুত রৌপ্যের পরিমাণ ছিল ৫শত ৪০ কোটি আউন্স। ইহা হইতে ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্থানের মজুত লোকসংখ্যার অনুপাতে ১২০ কোটী বাদ দিলে ভারতে মজুত রৌপ্যের পরিমাণ ১৯৪৭-৪৮ সালে ৪২০ কোটী আউন্সের মত হইবে। ইহার সহিত আভ্যন্তরীন উৎপাদন ও আমদানী যোগ করিলে বর্ত্তমান মজুতের পরিমাণ ৪২৩ কোটী ৫০ লক্ষ আউন্সের মত হইবে। ভারতে সরকারী ক্ষেত্রে রৌপ্যের মজুতের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য। সুতরাং মজুত রৌপ্যের সমস্তটাই বেসরকারী হস্তে আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। চলতি মূল্য (প্রতি আউন্স ৪. ৯০ নয়া পয়সার হিসাবে) ১৯৪৭।৪৮ সালে ইহার মূল্য ২ হাজার ৭৪ কোটী টাকা।

অর্থনৈতিক সমাজে ব্যক্তি ও ব্যক্তিস্ব

ব্রহ্মদেশের সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি দল

গত ২০ই মে ক্যালকাটা সিটিজেন্স এ্যাসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে বর্মী সংবাদপত্র প্রতিনিধিদলকে একটি চা-পান অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হয়। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে এই প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় অতিথিদের আপ্যায়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন যে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক অতি নিবিড় এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ। কিছুদিন পূর্বেও ব্রহ্মদেশ ভারতের সহিত এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল এবং তাহারা একই শাসনের, একই অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে শতাব্দিক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতালাভ উভয়ই ঐতিহাসিক ঘটনার কার্যকারণের পরিণতি। ভারতবাসী স্বাধীন ব্রহ্মদেশের যেমন অগ্রগতি দেখিয়া আনন্দলাভ করে, তেমনি আশা করে যে ভারত ও ব্রহ্মদেশ পরস্পর বাস করিয়া শান্তি, মৈত্রী এবং অগ্রগতির পটভূমিকায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামগ্রিক উন্নতিতে এক বিরাট অবদান রাখিয়া যাইবে।

ব্রহ্মদেশের প্রেস প্রতিনিধিদলের নেতা বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণের উত্তরে বলেন যে, তাহারা মর্মে মর্মে বিশ্বাস করেন যে ভারত ও ব্রহ্মদেশ দুইটি একান্ত প্রতিবেশি পরস্পরের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের নির্ভরস্থল। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পটভূমিকায় তাহারা ভারতের যে অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা শুধু বিস্ময়কর নহে, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির এক বিরাট ক্ষেত্রভূমি। তাঁহারা আরও বলেন যে অগ্রগতির তুলনায় ভারতের প্রচার কার্য নিতান্ত অল্প এবং অগ্রগতির তুলনায় সমধিক প্রচার কার্য হইলে সমগ্র বিশ্বে ভারতের অগ্রগতি সম্পর্কে একটা আলোড়ন উঠিত। ইহাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভারত কোনরূপ প্রচার চাহে না, কোনরূপ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। নীরবে কাজ করিয়া জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন করাই একমাত্র লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন যে তাঁহারা দামোদর উপত্যকা, চিত্তরঞ্জন, সিন্ধ্রি প্রভৃতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিরাট সাফল্যের নিদর্শনগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশের এমনি অগ্রগতির কথা আজ

তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে তাঁহারা কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছেন যে বাহিরে যতই প্রচার চলুক না কেন, কাশ্মীরীরা জানে যে তাহারা ভারতের অধিবাসী, কাশ্মীর ভারতের অন্তর্গত। সুতরাং আজ এই প্রশ্ন উঠিতেই পারে না যে কাশ্মীরের উপর পাকিস্থানের কোন অধিকার আছে এবং তাহা লইয়া কোন সালিসী বিচারের কোন প্রয়োজন আছে।

সভার শেষে শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় অতিথিদের এবং অভ্যাগতদের ধন্যবাদ দান করেন।

———

ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস কর্পোরেশন কর্তৃক খাদ্য মন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

গত ১লা মে তারিখে ইউনাইটেড্ প্রভিন্স কমার্শিয়াল কর্পোরেশান শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনকে তাহাদের কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মোটর, ট্রাক প্রভৃতি যন্ত্রপাতির প্রদর্শনীর একটি ব্যবস্থা করেন। খাদ্যমন্ত্রীকে ঐ সকল সামগ্রী দেখাইবার জন্য একটি আমন্ত্রণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐদিন কলিকাতার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়। সভায় শ্রীজৈন বলেন যে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও খাদ্য সমস্যার উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার যে একান্ত প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। তিনি আরও বলেন যে সেক্ষেত্রে এই সংস্থার উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয় এবং আশা করেন যে ভূমি সংস্কার ও সমবায় পদ্ধতির অগ্রগতির সংগে সংগে এই ধরণের যন্ত্রপাতির বহুল প্রয়োগ হইবে।

সভার প্রারম্ভে তিনি ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ প্রদর্শনী পর্যবেক্ষণ করেন এবং সবার শেষে সকলকে জলযোগে পরিতৃপ্ত করা হয়।

———

বৈদেশিক মুদ্রা সংকট

সম্প্রতি 'ফোরাম অফ ফ্রী এণ্টার প্রাইজে'র কলিকাতা শাখার উদ্যোগে শ্রীসুধীরকুমার সেনের সভাপতিত্বে বেঙ্গল ল্যাশন্যাল চেম্বার হলে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট সম্পর্কে একটি আলোচনার উদ্বোধন করা হয়। শ্রী কে. সি কুপার এই আলোচনার উদ্বোধন করিয়া বলেন, যে যুদ্ধের পরে ভারতের ১৭০৯ কোটি টাকার মত সঞ্চিত ষ্টার্লিং ছিল। ইহার পরিমাণ তখনকার চালু নোটের প্রায় ১৪৫ শতাংশ।

কিন্তু ভারত গত ২।৩ বৎসরে অতি উচ্চমূল্যে ইহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রায় গত ২০ মাস কালে দ্বিতীয় পরিকল্পনারকালে ৪০০ কোটী টাকা খরচ করা হইয়াছে। বর্তমানে আমাদের প্রচলিত মুদ্রার মাত্র ১৫ শতাংশ রিজার্ভ আছে। ঘাটতি ব্যয়ের একটা সীমা আছে এবং বৈদেশিক তহবিল নিঃশেষ করারও একটা মাত্রা আছে। যে হারে আমরা খরচ করিয়া চলিয়াছি তাহাতে আমাদিগকে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে। মিঃ কুপারের মতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংস্কার, সঞ্চয় এবং কর হইতে সংগৃহীত আয়ের সতর্ক ব্যয়ের ব্যবস্থা, ভোগের উপর নিয়ন্ত্রণ, মূল্য-বৃদ্ধির গতিরোধ, আর্থিক কাঠামোর মধ্যে সমতার সৃষ্টি, মাত্রাতিরিক্ত লগ্নীর ক্ষেত্রে

নিয়ন্ত্রণ, ব্যাঙ্কের দাদন, শিল্পের লভ্যাংশকে শিল্প উন্নয়নের পথে পরিচালিত করা এবং বৈদেশিক মূলধন ও কারিগরী সহযোগিতার সাহায্যে আমাদের ত্রুটি দূর করিতে হইবে। বর্তমানে যৌথ কোম্পানী সমূহের দেয় আবশ্যিক মুনাফা প্রত্যাহারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে মিঃ কুপার তাহার প্রশংসা করেন।

ডাঃ বিধুভূষণ ঘোষ প্রধান বক্তা হিসাবে বলেন, যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি আর আর কোন সমস্যা নহে, ইহা আমাদের আর্থিক অবস্থার বিভ্রান্তিকর শোচনীয় পরিণতি মাত্র। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক লেনদেনের মধ্যে আমরা যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিতে হইলে, আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় বিপর্যয় দেখা দিবে। আমাদের মাত্র ২৮০-২৯০—কোটী টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা আছে। যখন এইটুকু অর্থের উপর হাত পড়িবে তখনই বিস্ফোরণের সৃষ্টি হইবে। ইতিমধ্যে ভারতীয় টাকা ইহার মূল্যের মর্যাদা বিদেশের বাজারে অনেকখানি হারাইয়াছে। এখন শুধু শেষ সম্বলটুকু আঁকড়াইয়া বসিয়া আছি। তিনি সমস্যার সমাধানে বলেন, যে আজ আমাদের পুঁথিগত বিদ্যার আশ্রয় লইলে চলিবে না। বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যকে স্বীকার করিয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের নেতারা হয়তো "Beg, borrow or steal" নীতির প্রতি ঝুঁকিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কর্জ করা টাকার সুদ দিতে হইবে এবং মূলধনও পরিশোধ করিতে হইবে। আমরা ঋণের পর ঋণ করিয়া ঋণের পিরামিড গঠন করিতেছি এবং ভবিষ্যৎকে দেউলিয়া করিয়া যাইতেছি। বিলম্বে পরিশোধের সর্তে আজ যে সকল যন্ত্রপাতি কেনা হইতেছে, তাহার জন্য অধিক মূল্য দিতে হইতেছে এবং তাহার ফলে শিল্পগুলির প্রতিযোগিতার ক্ষমতা স্বভাবতই হ্রাস পাইতেছে। ডাঃ ঘোষ বলেন যে আজ আমাদিগকে রপ্তানী বৃদ্ধি করিতেই হইবে। সমস্ত প্রকার রপ্তানী দ্রব্যের উপর হইতে রপ্তানী শুল্ক প্রত্যাহার করিতে হইবে—অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে এক বৎসরের জন্য ইহা করা উচিত। ইহার ফলে হয়তো কিছু লোকসান হইবে, কিন্তু তাহা আভ্যন্তরীন ঋণের টাকা হইতে পরিশোধ করা যাইবে। গভর্ণমেণ্টকে বৈদেশিক মূলধন আকর্ষণ করিতে হইবে। তজ্জন্য অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে। সমগ্র দেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের যে হাওয়া বহিতেছে তাহা বৈদেশিক লগ্নীর ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। এক্ষেত্রে সরকারের পশ্চাদাপসরণ প্রয়োজন কিনা তাহাও একান্তভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার।

চা শিল্পের নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যৎ

ইণ্ডিয়ান টী প্ল্যাণ্টারস্ এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় শ্রী এস্ এস্ কর্মকারের ভাষণ

ইণ্ডিয়ান টী প্ল্যাণ্টারস্ এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির সভাপতি শ্রী এন, এন কর্মকার তাঁহার ভাষণে চা-শিল্পের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বলেন যে, যে শিল্পটি জাতির কল্যাণে নিয়োজিত, জাতির অর্থ সংকটে যাহার অবদান অতীব মূল্যবান, সেই শিল্পটির স্থায়িত্ব বিধানে সরকারের ও শ্রমিকদের নিকট হইতে যতটুকু সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া দরকার, ততটুকু না পাওয়াই এই শিল্পটি বর্তমান দুর্দশার কারণ। তিনি বলেন যে একথা আজ শুধু আমিই বলিতেছিনা, এমনি সতর্কবাণী আমার সহকর্মীগণ অন্যান্য সমিতির মাধ্যমেও উচ্চারণ করিয়াছেন, তথাপি ফল যে খুব বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই শিল্পটির অনুকূলে অবশ্য

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে ভারত চা-উৎপাদনের ক্ষেত্রে কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। ১৯০৪ সালে অবিভক্ত ভারতে ৮৪০৬৪৪ একর জমিতে ৪১০ পাউণ্ড একর প্রতি চা উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ বৎসর ৩৯ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। দেশবিভাগের পর ১৯৪৭ সালে ৪৬ কোটী ৫ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ একর প্রতি ৭২৬ পাউণ্ড। আবার ১৯৫৬ সালে ৬৬ কোটী ২২ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ একর প্রতি ৮৪২ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। গত ২২ বৎসরের ইতিহাসে দেখা যায় যে গড় উৎপাদন প্রায় ৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৯ সালে ঐচ্ছিক সঙ্কোচন নীতি ও তদুপরি অনাবৃষ্টিজনিত উৎপাদন হ্রাস সত্ত্বেও ১৯৫৭ সালে ৫৬ কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা না হইলে ৬২ কোটী পাউণ্ডের মত চা উৎপন্ন হইত।

অনেক সময় বলা হইয়া থাকে যে চা বাগান মালিকদের অবহেলার জন্যই এবং চা বাগানগুলির সংস্কার ও নূতন চারা না বসানোর জন্য শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। চা-আবাদ তদন্ত কমিশনও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কোন কোন আবাদের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ সত্য হইলেও বিস্তৃত ক্ষেত্রে ও বৃহত্তর পটভূমিকায় ইহা যে সত্য নহে তাহা গত ২২ বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। হয়তো কোথাও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রম কখনও সত্যের ভিত্তি হইতে পারে না। তাহা ছাড়া ভারতের বাহিরে চাএর বাজার সঙ্কুচিত হইয়াছে বলিয়া উৎপাদন হ্রাসের সঙ্কোচন নীতি আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না। বর্তমান পরিবেশে চা আবাদগুলি ১৯৬০ সালের মধ্যে ৭৫ কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার যতখানি আভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তার ও রপ্তানীর জন্য চেষ্টা করিতেছেন, চা-শিল্পের ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রচেষ্টার আজ একান্ত প্রয়োজন। আমাদের চা প্রায় ৬০ ভাগ সাধারণ শ্রেণীর। বিশ্বের বাজারে ইহার বিনিময়ে লাভজনক মূল্যও পাওয়া যায় না।

বিশ্বের বাজারে চায়ের সরবরাহ ও চাহিদা (দশ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে)

বৎসর	সরবরাহ	চাহিদা	চাহিদার উপরে সরবরাহ
১৯৫১	১২২৫	১১৯২	+৩৩
১৯৫২	১১৬৪	১২০৬	−৪২
১৯৫৩	১২১১	১২২৯	−১৮
১৯৫৪	১৩৬৮	১২৭৮	+৯০
১৯৫৫	১৩৫৮	১৩২০	+৩৮
১৯৫৬	১৩৪৫	১৩৩৯	+ ৬

প্রসঙ্গক্রমে তিনি উত্তর পূর্ব ভারতের চায়ের উৎপাদন মূল্যের আধিক্যের কথা আলোচনা করেন। অন্য সমস্ত চা উৎপাদনকারী দেশ অপেক্ষা উত্তর পূর্ব ভারতের চায়ের মূল্য বেশী। সেইজন্য মূল্যাকার পরিমাণ আশাতীত কম। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের শ্রমিকদের জন্য গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, খাদ্য সরবরাহ, পরিবহনে অসুবিধা জনিত যন্ত্রপাতি ও জিনিষপত্র আদান-প্রদান করিতে অতিরিক্ত ব্যয় ষ্টীমার এবং রেলের ভাড়া বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। তাহা ছাড়া চা-শুল্ক সাধারণ শ্রেণীর চায়ের উপর এতখানি গুরুভার হইয়াছে যে উত্তর-পূর্ব ভারতের চা-বাগানগুলি প্রকৃতপক্ষে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে অর্থানুকূল্যের অভাবে চা-শিল্প আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, অথচ ৪ কোটি টাকা চা-শিল্প উন্নয়ন তহবিল অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা ছাড়া এক বৎসর পূর্বে চা-শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটী উন্নয়ন তহবিল গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছিল, তাহার ফলাফল আজ পর্যন্তও জানা যায় নাই। পরিশেষে তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম চা উৎপাদনকারী অঞ্চল। অন্যান্য দেশের মত এখানেও একটী চা গবেষণা সংস্থা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। এই অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন চা-শিল্পের আরেকটী অন্তরায়। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলন এই শিল্পের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীবনবীকান্ত রাহুত, এবং শ্রীফণীভূষণ গুহ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

পাট শিল্পে দশমিক পদ্ধতির প্রবর্তন

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রী কে, ডি, ভেঙ্কট্যচলম এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্মতিক্রমে বর্তমান বৎসরের ১লা অক্টোবর হইতে কাপড়, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য প্রভৃতি কতকগুলি বৃহৎ শিল্পে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় ও কাঁচা উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতি চালু করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তবে পাট শিল্প ও পাট বাজারের প্রতিনিধিগণ আগামী ১লা জুলাই ১৯৫৮ হইতে কাঁচা পাট ক্রয় ও পাটজাত দ্রব্য বিক্রয়ে দশমিক পদ্ধতি প্রবর্তনে সম্মত হইয়াছেন। প্রথম দুই দুই বৎসর দশমিক পদ্ধতির ব্যবহার ইচ্ছাধীন থাকিবে এবং বর্তমানের মত মণের হিসাবে কাঁচাপাট ক্রয় ও গজের হিসাবে চট বিক্রয় করা চলিবে। প্রতিনিধিগণের এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে :

(ক) উৎপাদকগণের নিকট এই ব্যবসায়িগণ বা গাঁইট বাঁধাইকারিগণ মণের হিসাবে কাঁচা পাট ক্রয় করিবেন কিন্তু পাটকলে মণের হিসাবে বা দশমিক পদ্ধতিতে (১০৭ কিলোগ্রাম) উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন। যাঁহারা সরাসরি দশমিক পদ্ধতি গ্রহণ করিবেন তাঁহারা ৷০ কিলোগ্রাম, ৬০ কিলোগ্রাম, ১৩০ কিলোগ্রাম, ১৫০ কিলোগ্রাম, অথবা ১৮০ কিলোগ্রামের ওজনে পাটের গাঁইট বাঁধিবেন। এই মাপগুলি প্রচলিত ওজনের যথাক্রমে ১ মণ, ১½ মণ, ৩½ মণ ৪ মণ ও ৫ মণের সমান হইবে। তাঁহারা প্রত্যেক কিলোগ্রামের কাঁচা পাটের মূল্য টাকা ও নয়া পয়সায় হিসাবে লিখিবেন। যাঁহারা আপাততঃ চলতি হিসাব রাখিতে চান তাঁহারা তাঁহাদের ইনভয়েস ও অন্যান্য প্রকার কাগজপত্র দশমিক পদ্ধতির সমান হার (অর্থাৎ প্রতি কিলোগ্রামে টাকা নয়া পয়সা) উল্লেখ করিবেন এবং ক্রমশঃ যথাকালে পুরাপুরি দশমিক পদ্ধতি চালু করিবেন।

(খ) পাটকলগুলি ১লা জুলাই ১৯৫৮ হইতে সকলপ্রকার পাটজাত দ্রব্যের মাপ, ওজন ও মূল্য দশমিক পদ্ধতিতে নির্দেশ করিবে; অর্থাৎ চটের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ মিটারের মূল্য টাকা ও নয়া পয়সায় উল্লেখ করিতে হইবে এবং যেখানে মোট ওজন নির্দেশ করিতে হইবে সেখানে মেট্রিক টনে উহা উল্লেখ করিতে হইবে। বর্তমান উৎপাদন পরিমাণের কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না। কিন্তু ঐ মাপগুলির অনুরূপ দশমিক হিসাব পাটকলগুলি তাহাদের সকলপ্রকার কাগজপত্রে উল্লেখ করিবে অর্থাৎ চট ৪০ ইঞ্চি ×২০ আউন্স বলিলে বুঝাইবে ১২১·৬ সেন্টিমিটার ×·২৮ কিলোগ্রাম।

(গ) পাট সংক্রান্ত সাময়িক পত্রাদির প্রকাশকগণ আগামী জুলাই মাস হইতে বর্তমান হিসাবের পরিবর্তে দশমিক পদ্ধতিতে হিসাব চালু করিবে। বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সম্পর্কিত ডিরেক্টার জেনারেল, কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কাগজপত্রে ও পরিসংখ্যানে সম্ভবমত দশমিক পদ্ধতিতে হিসাব চালু করিবেন।

(ঘ) পাটকলগুলি অনুরোধ করিলে ভারতীয় পাটকল সমিতি তাহাদিগকে বিনিময় তালিকা ও সংক্ষিপ্ত "রেডি রেকনার" সরবরাহ করিবেন। ইহাতে পাটজাত দ্রব্যের নির্দিষ্ট মাপ-জোপ রূপান্তরের সুবিধা হইবে। বঙ্গীয় পাট ব্যবসায়ী সমিতি ও পাটের গাঁইট বাঁধাইকারী সমিতি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাঁচা পাট ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য একটি "রেডি রেকনার" তৈরি করিয়া উহার কপি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পাঠাইবেন।

(ঙ) পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিকারকগণ রপ্তানির লাইসেন্স ও শিপিং বিলের জন্য আবেদনকালে প্রচলিত হিসাবের সংগে সংগে দশমিক পদ্ধতির অনুরূপ হার উল্লেখ করিবেন। বিদেশী ক্রেতাদের সংগে সম্পাদিত চুক্তিতে চলতি হিসাব ব্যবহার করা চলিবে। অর্থাৎ দশমিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিলে এদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে চলতি রীতির কোন ব্যাঘাত হইবে না।

প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এদেশে প্রচলিত ওজন ও মাপের মধ্যে যে তারতম্য রহিয়াছে তাহার অবসানের উদ্দেশ্যে দশমিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। ক্রমশঃ এই নূতন পদ্ধতি চালু করা হইবে। ওজন ও মাপের মান আইন অনুসারে দেশের প্রচলিত সকলপ্রকার ওজন ও মাপ দশ বৎসরের মধ্যে দশমিক পদ্ধতি অনুযায়ী হইবে। দৈর্ঘ্যের নূতন ইউনিট হইবে মীটার, আয়তনের হইবে বর্গ মীটার, ঘনত্বের হইবে কিউবিক মীটার, কঠিন পদার্থ পরিমাপের হইবে কিলোগ্রাম এবং তরল পদার্থ পরিমাপের হইবে লীটার। এই ইউনিটগুলি চলতি ইউনিটে পরিবর্তিত করিলে নিম্নরূপ দাঁড়াইবে :

মীটার	১·০২৩৩১৪ গজ
বর্গমীটার	১·১৯৬২৯ বর্গ গজ
কিউবিক মীটার	১·৩০৭৯ কিউবিক গজ
কিলোগ্রাম	২·২০৪৬২ পাউণ্ড
লীটার	·২২০০ গ্যালন

আইন অনুসারে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি চালু করা যাইবে। তবে দশ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই দশমিক পদ্ধতিতে রূপান্তরের কাজ শেষ করিতে হইবে।

আর্থিক সংবাদ

ভারতে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যমান—ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টার অফিস হইতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, তাঁহারা ১৯৩৯ সালের মার্চ পর্যন্ত এক বৎসর = ১০০ এই ভিত্তিতে পণ্যদ্রব্যের যে পাইকারী মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, উহা গত ২৭শে এপ্রিল (১৯৫৮) পর্যন্ত এক সপ্তাহে শতকরা ·৩ কমিয়া ১০৭·৭ হয়। উহা এক মাস ও

এক বৎসর পূর্বের তুলনায় শতকরা ১·৫ ও ·৪ অধিক। এপ্রিল মাসের (১৯৫৮) গড় মূল্যমান ছিল ১০৭·৪, মার্চ মাসের গড় মূল্যমান ছিল ১০৫·৪ ও ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসের গড় মূল্যমান ছিল ১০৬·৫।

দ্রব্যসামগ্রীর পাইকারী মূল্যমান সূচী

ভিত্তি বৎসর—১৯৫২-৫৩ = ১০০

সপ্তাহ শেষে শনিবার	সর্বপ্রকার পণ্যের গড়	খাদ্যসামগ্রী	ইন্ধন, আলানি ইত্যাদি	শিল্পের কাঁচামাল	কারখানাজাত দ্রব্য
পরিমাপ	১০০০	৫০৪	১৫৫	২৯০	২৪৯
১৯৫৩-৫৪	১০১·৫	১০০·১	৯৮·২	১০৭·৪	১০০·৭
১৯৫৪-৫৫	৮৯·৬	৮২·১	৯৫·৬	৯৪·৬	১০০·১
১৯৫৫-৫৬	৯৯·২	৯৪·৬	৯৭·১	১১০·৬	১০১·৬
১৯৫৬-৫৭	১০৫·৮	১০১·৭	১০৬·১	১১৬·৮	১০৫·৮
১৯৫৭-৫৮	১০৬·১	১০৩·৪	১১৪·৫	১১২·৭	১০৭·৫
ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭	১০৬·১	১০৩·১	১০৬·৬	১১৭ ০	১০৬·২
মার্চ	১০৫·১	০১·৭	১০৬·৫	১১৬·৮	১০৫·৩
এপ্রিল	১০৭·৩	১০৫·৪	১০৭·৮	১১৭·২	১০৬·১
মে	১১০·৩	১০৮·৬	১১২·৩	১২১·৬	১০৮·১
জুন	১১০·৮	১০৯·৬	১১১·৮	১২১·২	১০৮·৫
জুলাই	১১২·৪	১১২·১	১১৪·৯	১২২·২	·৯·০
আগষ্ট	১১০·৯	১১০·৫	১১৪·৯	১১৮·২	১০৮·৬
সেপ্টেম্বর	১০৮·৭	১০৭·১	১১৫·০	১১৫·৯	১০৮·৯
অক্টোবর	১০৮·৯	১০৭·০	১১৪·৬	১১৫·৫	১০৯২
নভেম্বর	১০৮·৬	১০৬·৭	১১৫·১	১১৬·৪	১০৮·৩
ডিসেম্বর	১০৬·৩	১০২·৯	১১৪·৮	১১৪·৮	১০৭·৭
জানুয়ারী, ১৯৫৮	১০৫·৬	১০২·২	১১৪·৪	১১২·৮	১০৭·৬
ফেব্রুয়ারী ,,	১০৫·০	১০১·৫	১১১·৮	১১০·৯	১০৭·৭
মার্চ ,,	১ ৪·৮	১০১·৫	১১৪ ৪	১০৯·৭	১০৭·৭
৮, ,,	১০৫·০	১০১·৭	১১৪·৮	১১০·৩	১০৭·৯
১৫, ,,	১০৫·।	১০২·৪	১১৪·৮	১১১·৩	১০৭·৮
২২, ,,	১০৫·৬	১০২·৫	১১৪·৫	১১১·৮	১০৭·৮
২৯ ,,	১০৬·১	১০৩·৪	১১৫·৫	১১২·৭	১০৭·৪

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য ও লক্ষ্য পর্যালোচনা—উন্নয়ন পরিষদ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য ও লক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়াছেন। কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন ব্যাপারে সাফল্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে যে সাফল্যলাভ করা গিয়াছে, তাহা ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য অপেক্ষা কম হইয়াছে। এরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন মোট ২০ লক্ষ টন হ্রাস পাইবে। সুতরাং যে সমস্ত অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা আছে ও বৃষ্টিপাত হয়, তথায় সেচ ব্যবস্থা ও বৃষ্টিপাতের সুযোগ গ্রহণের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য নির্ধারিত উৎপাদনের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি করা যায়, তাহার জন্য রাজ্যসমূহকে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

বীজ সরবরাহকারী সংস্থাসমূহ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পনায় ৪,১৮৫টি বীজ সরবরাহকারী সংস্থা স্থাপনের যে লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়াছে তন্মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালে মাত্র ৩৮৫টি এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ৬০৮টি সংস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং যে সমস্ত বীজ সরবরাহকারী সংস্থার জন্য ভূমি সংগ্রহ করা হইয়াছে তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্য অবিলম্বে শেষ করিতে হইবে।

সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বৃহৎ ও মাঝারী সেচ পরিকল্পনার সাহায্যে যে ১ কোটি ২০ একর জমির সেচ ব্যবস্থা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় করিতে চাওয়া হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে বর্তমান অনুমান এই যে, প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গেলে চিরাচরিত সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ একরের মত জমির সেচ ব্যবস্থা হইবে। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত ৬ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমির সেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে আরও ১০ লক্ষ ১১ হাজার জমির সেচ ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন—ভারত সরকার ১৯৫৭-৫৮ সালে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য পাঁচশত পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন। ঐ বৎসরে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ৪১২টি পরিকল্পনা পেশ করেন। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৪ কোটি ৯২ লক্ষ ২ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। তাহা ছাড়া, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসন কর্তৃপক্ষকে ২৮টি পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য ৩৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ব্যয়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে ৩১৭টি ও ৩৫টি পরিকল্পনার জন্য যথাক্রমে ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও ৫০ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল। রাজ্য সরকারদের পরিকল্পনায় ফলজাত দ্রব্য সংরক্ষণ, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, খেলনা, কাঠ লোহা, প্লাষ্টিকের দ্রব্য, দিয়াশলাই, জুতা, বৈদ্যুতিক পাখা, সাইকেল, সেলাই কল, পেন্সিল ইত্যাদি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মঞ্জুরীকৃত সাহায্যের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন রাজ্যকে দেওয়া হইয়াছে—অন্ধ্রপ্রদেশ—৩৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, আসাম—১৩ লক্ষ ১৭ হাজার, বিহার—৫১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, উড়িষ্যা—২৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা, পশ্চিমবঙ্গ—৭২ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, মাদ্রাজ—৬৪ লক্ষ টাকা, বোম্বাই—৪৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, কেরালা—২৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা, মহীশূর—২৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, উত্তরপ্রদেশ - ৫৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, পঞ্জাব—৩৫ লক্ষ ৩ হাজার টাকা, মধ্যপ্রদেশ—৩৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, রাজস্থান—১৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা এবং জম্মু ও কাশ্মীর —১৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা।

প্রথম ভারত-ইথিওপিয়া বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত—কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি ভারত আগমনের সময় হইতে ভারত ও ইথিওপিয়ার মধ্যে বাণিজ্য চলাচল সম্পর্কে যে আলোচনা চলিয়াছিল তাহা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

এই চুক্তি অনুসারে বাণিজ্য শুল্ক ও অন্যান্য প্রকার নিয়মাদি সম্পর্কে উভয় দেশের সরকার পরস্পরের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত জাতির ন্যায় আচরণ করিবেন. প্রচলিত নিয়মকানুন মানিয়া উভয় সরকার পরস্পরকে পণ্য আমদানি রপ্তানি সম্পর্কে যতটা সম্ভব অধিক সুবিধা দিবেন। এই উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের তালিকা মধ্যে মধ্যে বিনিময় করা হইবে। উভয় দেশের ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাহাতে যোগাযোগ স্থাপিত হয় সেজন্য উভয় সরকার উৎসাহ

দিবেন। উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আর্থিক সহযোগিতা বিশেষতঃ কারিগরি জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সুবিধা বিনিময় করার সম্ভাব্যতা উদ্ভাবনে উভয় দেশ সচেষ্ট থাকিবেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিটি কার্যকরী হইবে এবং ১৯৫৯ সালের মে মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

উড়িষ্যায় চুণা পাথর ও ডোলোমাইটের সন্ধান—ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা উড়িষ্যা রাজ্যের সুন্দরগড় জেলায় গাংপুর এলাকায় যথেষ্ট চুণাপাথর ও ডোলোমাইটের সন্ধান পাইয়াছেন। সেখানে অল্প ব্যয়ে ঐ সকল খনিজ সম্পদ উদ্ধার করা চলিবে। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সম্প্রতি গায়পোস রেল ষ্টেশনের ১০ মাইল উত্তরে ঘুবকুটোনিতে ৩,৬০,০০০ বর্গ ফুটেরও অধিক স্থানে সিমেন্ট তৈরির উপযুক্ত চুণাপাথরের সন্ধান পাইয়াছেন। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার এম, নারায়ণ স্বামী, মুক্তি নাথ, এম, সি, চক্রবর্তী ও এ, আর, গোকুলের অনুসন্ধানের ফলেই উহার সন্ধান মিলে। জানা গিয়াছে গাংপুর পাহাড়মালার উত্তর ও দক্ষিণ অংশে যথেষ্ট চুণাপাথর ও ডোলোমাইট রহিয়াছে।

বীরমিত্রপুরে ৮,০০০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩০০-৪০০ ফুট প্রসস্থ এলাকায় ফ্লাক্স শ্রেণীর চুণাপাথর আছে। কাটাং, খাটকুরবাহাল এবং কুণ্ডরডুকারও যথেষ্ট চুণাপাথর ও ডোলোমাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কার্নেসে ব্যবহার্য ডোলোমাইট ধারুয়াদিহি রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী কিনজিরমা, বাসুরাহান ও তিলাইমানটী এবং সুন্দরগড়ের ১৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত লিফ্রিপাডাতে পাওয়া গিয়াছে। এক মাত্র শেষোক্ত স্থানেই প্রায় ১,৫০,০০০ বর্গ ফুট স্থানে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

জনতা পলিসির সংখ্যা—লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন—১৯৫৭ সালের ২৬শে মে হইতে ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত ভারতের জীবনবীমা কর্পোরেশন ১,০৯,২১,৫৫১ টাকা মূল্যের ২৪,৪১১টি পলিসি মঞ্জুর করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা সম্প্রসারিত করা হইবে কি না তাহা এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিচার করিয়া বিবেচনা করা হইবে।

ভারতে লৌহ খনিজ পিণ্ডের উৎপাদন বৃদ্ধি—ভারতীয় খনি সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৭ সনে ভারতে ৪০,২০,০০০ টন লৌহ খনিজ পিণ্ড উৎপাদন হইয়াছে; পূর্ববর্তী বৎসর উৎপন্ন হইয়াছিল ৪৮,৫৮,০০০ টন। আলোচ্য বৎসর বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যে যথাক্রমে ১৯,৩৫,০০০ টন ও ২০,৪২,০০০ টন লৌহ খনিজ উত্তোলন করা হয়; পূর্ববর্তী বৎসর উত্তোলন করা হইয়াছিল যথাক্রমে ১৮,৪৮,০০০ টন ও ১৭,১০,০০০ টন। ১৯৫৭ সনে মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ে যথাক্রমে ৫,৩২,০০০ টন, ২,৬৭,০০০ টন ও ১,১৯,০০০ টন লৌহখনিজ উৎপন্ন হইয়াছে; পূর্ববর্তী বৎসর উৎপন্ন হইয়াছিল যথাক্রমে ৫,৪১,০০০ টন, ·,৩২,০০০ টন ও ১,২৭,০০০ টন।

১৯৫৭ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে ভারতে মোট ১৩,৩০,০০০ টন লৌহ খনিজ পিণ্ড উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে বিহারে ৫,০৩,০ - টন, উড়িষ্যায় ৫,৬৩,০০০ টন, অন্ধ্র প্রদেশে ৫৭,০০০ টন, মহীশূরে ১,২০,০০০ টন ও বোম্বাইয়ে ৪৩,০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ববর্তী তিন মাসের তুলনায় উক্ত তিন মাসে ভারতে ২,৩৩,০০০ টন বেশী লৌহ খনিজ পিণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে।

১৯৫৭-৫৮ সনে চিনির উৎপাদন—১৯৫৮ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত এক বৎসরে ভারতে ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর ২০ লক্ষ ২ হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসর ভারতে উৎপন্ন চিনির মধ্যে ১ লক্ষ ১৬ হাজার টন বিদেশে চালান দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টন দেশের বাজারে ছাড়া হইয়াছে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য (পণ্যসামগ্রী সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্র) (কোটি টাকায়)

বৎসর	আমদানী	রপ্তানী	উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি
১৯৫১-৫২	৮৫২·৯৩	৭০১·৫৯	— ১৫১·৩৭
১৯৫২-৫৩*	৬৭০·১৭	৫৭১·০৭	— ৯৯·০৭
১৯৫৩-৫৪	৫৭১·১৩	৫৩০·৬৯	— ৪১·৪৭
১৯৫৪-৫৫	৬৩৪·০৪	৫৮৩·৫১	— ৫০·৫৩
১৯৫৫-৫৬	৬৭৯·০৮	৫২৭·৪৫	— ৮১·৬৩
১৯৫৬-৫৭	৮৩১·৭৫	৬০০·১২	— ১৩ ·৫৩
১৯৫৭-৫৮ (এপ্রিল-জুন)	১২১·৮৬	১৩১·৫৭	— ৬০·১৯
(জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২১০·১০	১৪২·৩৪	— ৬৭·৮৬
(অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২১০·২৬	১৬৫·৮৬	— ৪৪·৪০

* পুনঃ রপ্তানীসহ। * ১৯৫২-৫৮ সালের পর স্থল বাণিজ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

নির্ম্মাণজাত দ্রব্যের উৎপাদন

বৎসর	পাটজাত দ্রব্য	সুতীবস্ত্র	চিনি	লৌহপিণ্ড	অন্যান্য ইস্পাত ও ঢালাই এর লৌহ	ইস্পাত	সিমেন্ট
	(০০০ টন)	(মিঃ গজ)	(০০০টন)	(০০০ টন)	(০০০ টন)	(০০০টন)	০০০ টন)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৯৫১-৫২	৯৩১·৪	৪২৪৯·৭	১২২২·৪	১৭৪০·০	১৩৩৩·৫	১০৫৮·৭	৩২৪২·৪
১৯৫২-৫৩	৯০৯·৪	৪৭৯৮·০	১৪০৫·১	১৬৯১·১	১৫৮৯·৪	১০৫৮·৩	৩৫৭৬·৮
১৯৫৩-৫৪	৮৬৭·০	৪৯৭৪·৬	১১৩৮·৯	১৯৭৪·৬	১৫৩১·৯	১০৭৭·৫	৪০২৭·৪
১৯৫৪-৫৫	৯৭১·১	৫০৭৫·৭	১২৯৪·৪	১৭৭৩.৩	১৬৯৪·৭	১২০১·৪	৪৪১১·৫
১৯৫৫-৫৬	১০৫৩·৯	৫১৫১·৪	১১০০·৭	১৭৮৬·৮	১৭১৩·২	১২২১·৯	৪৫০৬·২
১৯৫৬-৫৭	১০৬৫·৫	৫৪২০·২	২০০২·০	১৭৯৬·৭	১৭২১·৯	১২৬৬·৫	৫০৭০·৯
১৯৫৭-৫৮							
(এপ্রিল-জুন)	২৫৯·২	১৩৩৭·০	৪৬৯·৪	৪২৪·৫	৪১১·০	৩০৭·৭	১২৯৭·৯
জুলাই-সেপ্ট:	২৫৩·৮	১৩২৪·০	২৫·৭	৪৩৩·৬	৪১৪·৯	২৯৯·৯	১৩,৭·১

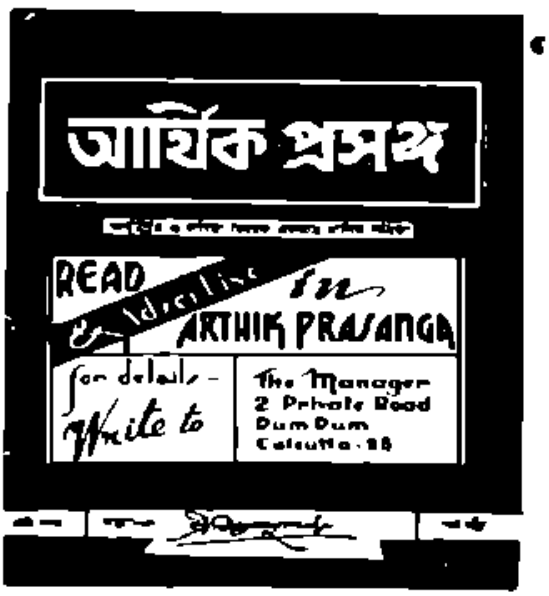

বার্ষিক চাঁদা:— ৯৲ টাকা
ষাণ্মাসিক চাঁদা:—৪৷৷০ "
ছাত্রদের জন্য :—
বার্ষিক—৭৷৷০ ষাণ্মাসিক—৪৲ টাকা
এই সংখ্যার মূল্য—বারো আনা

(১৩৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শেষ হইয়া আসিয়াছে। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৫৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। মহানদী সেচ পরিকল্পনা ও হীরাকুদ শরিপূরক বাঁধের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইতেছে। এজন্য যথাক্রমে ১৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ও ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

দামোদর উপত্যকা করপোরেশন—প্রধানমন্ত্রী গত ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের উদ্বোধন করেন। এখানকার তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রথমটি গত ৩০শে অক্টোবর (১৯৫৭) চালু হয়। অন্য দুইটি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলিতেছে। পাঞ্চেতে শতকরা ৮৪ ভাগ মাটির কাজ ও শতকরা ৮৯ ভাগ কংক্রিটের কাজ গত নভেম্বর মাসে (১৯৫৭) শেষ হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তি খননের কাজও শেষ হয়। নভেম্বর মাসের (১৯৫৭) মধ্যে সমগ্র ক্যানেল ব্যবস্থার শতকরা ৯০ ভাগ ও ড্রেন ব্যবস্থার শতকরা ৭৫ ভাগ কাজ শেষ হয়। ঐ মাসে দুর্গাপুর তাপজ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের শতকরা ১০ ভাগ কাজ এবং যোথাযোগ্রিড চতুর্থ ইউনিটের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা—অন্ধ্র প্রদেশে তুঙ্গভদ্রার প্রধান বাঁধ, নিম্নভূমির খাল জলযেচন ব্যবস্থা ইত্যাদির কাজ শেষ হইয়াছে। নদীর দুই পার্শ্বে প্রায় ৮০ হাজার একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। ১৯৫৭ সালের মে মাসে দ্বিতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে চালু হয়।

ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা—ভাক্রা বাঁধের কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে, ডিসেম্বর (১৯৫৭) পর্যন্ত ২৩,৭৮,০০০ ঘন গজ কংক্রীট ঢালা হইয়াছে। পাঞ্জাব ও রাজস্থানে ভাক্রা খালের দ্বারা ৬,৭৮,২১১ একর জমিতে সেচ দেওয়া হয়। পরিকল্পনার জন্য ব্যয় হইবে ১৭০ কোটি ২ লক্ষ টাকা। গত অক্টোবর (১৯৫৭) পর্যন্ত ব্যয় হইয়াছে ১৩৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।

নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা—নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনায় ৩ হাজার ফুট লম্বা ৪০ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ ঘন ফুটের মধ্যে ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার ঘনফুট সেতু এবং ম্যাচের হইতে বাঁধ পর্যন্ত ৮ মাইল লম্বা একটি রেলপথ নির্মিত করা হইয়াছে। গত ডিসেম্বর (১৯৫৭) পর্যন্ত এই পরিকল্পনার জন্য ব্যয় হইয়াছে ১০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে বিহান্দ বাঁধের ভিত্তি খনন আরম্ভ হয়। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই পরিকল্পনার ৯ কোটি ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। চম্বল পরিকল্পনায় গান্ধীসাগর বাঁধ ১০০ ফুট উপর পর্যন্ত উঠিয়াছে। খাল খননের কাজ চলিতেছে। ডিসেম্বর (১৯৫৭) পর্যন্ত এই পরিকল্পনার জন্য ১০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কথা বাঁধের প্রাথমিক কাজ শেষ হওয়ার পর অন্যান্য কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

কুশী পরিকল্পনা—কুশী পরিকল্পনায় ১৩০ মাইল বাঁধ নির্মাণ শেষ হইয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য আনুমানিক ৪৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। গত ডিসেম্বর (১৯৫৭) পর্যন্ত ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ—বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যা পর্যালোচনার জন্য ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে একটি উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটি ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং ব্যয় সংকোচ সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এজন্য প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বিদেশী সাহায্য—কারিগরি সহযোগিতা মিশনের কর্মসূচী অনুসারে এ পর্যন্ত বিদেশ হইতে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছে। কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে কানাডা সরকার কুন্তা বারি-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্য ২ কোটি ডলারের মত সাহায্য এবং পল্লী অঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য ৩০ লক্ষ ডলার সাহায্য দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

A. I. C. C. Publications : Published from 7, Jantar mantar Road, New Delhi :

Know Your Country—Sadique Ali. Price 30 nP.

কংগ্রেস কী বিচারধারা উর কার্যক্রম—সাদিক আলি, মূল্য—৩০ নয়া পয়সা।

আলোচ্য দুইখানি মূলতঃ একই দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখিত। চল্লিশকোটি অধিবাসীর বাসভূমি এই ভারতবর্ষে স্বাধীনোত্তর কালে কি পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে বিশেষতঃ কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত গভর্ণমেণ্টসমূহের দ্বারা তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা বই দুইখানিতে স্থান পাইয়াছে। প্রথম বইখানি "দেশকে জানুন" ও পরবর্তী বই দুইখানি হিন্দীতে 'কংগ্রেসের কার্যকলাপ দেখুন' উভয়ই একই সূত্রে লিখিত তথাপি বইখানি পাঠ করিতে ভাল লাগিবে—যিনি হিন্দী জানেন আর যিনি ইংরাজী বোঝেন। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রথমটিকে অধিকতর পাঠযোগ্য করিয়াছে এবং দ্বিতীয়টিতে করাচী প্রস্তাব হইতে গৌহাটি অধিবেশন পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যধারা ইহার ইতিহাসকে সহজবোধ্য করিয়াছে।

Sierra Leone—An Economic Survey. Issued by Barclays Bank D. C. O, 54, Lombart Street London, E. C. E.

ব্যারক্লে ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকমালার অন্যতম এই বইখানি। 'সিয়েরা লিওনের' ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বিবরণীতে পুস্তিকাখানি সমৃদ্ধ। আলোচ্য দেশের অর্থনৈতিক বিবরণী সম্পর্কে যে কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহাতে উপকৃত হইবে।

Link—ক্যালক্যাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কর্মীদের কর্তৃক প্রকাশিত নিজস্ব পত্রিকা। ৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯ হইতে প্রকাশিত। শ্রীশ্রীহরি গাঙ্গুলী কর্তৃক সম্পাদিত।

'লিঙ্ক' ক্যালকাটা কেমিক্যালের কর্মীদের নিজস্ব পত্রিকা হইলেও প্রতিষ্ঠানের বাহিরে খ্যাতনামা লেখকের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। আলোচ্য সংখ্যাটিতে শ্রীএ. এম ব্যানার্জি, ডি, সি ড্রাইভার প্রভৃতির রচনা স্থান পাইয়াছে। তাহা ছাড়া আলোকচিত্র ও উড়িষ্যার মন্দিরের চিত্রকলার চিত্রগুলি ইহাকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। নিজস্ব কারখানার পরিবেশের মধ্যেই কর্মীবৃন্দ বাহিরের যোগাযোগকে ঘনিষ্ট করিতে যে উদ্যোগী, নিজেদের ভিতরে সৌহার্দ্য ও প্রীতি দৃঢ়তর করিতে যে উৎসাহী আলোচ্য সংখ্যাখানি ইহারই নিদর্শন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উদ্যোগকে অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাইতেছি। পত্রিকাখানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট ও সম্পাদনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বাংলা বার্ষিকী নববর্ষ ১৩৬৫—সম্পাদক শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়। ৬ষ্ঠ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৬৫। ১৯ নূর মহম্মদ লেন কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

নববর্ষ একখানি শ্রেষ্ঠ বাংলা বার্ষিকী। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ রচনার সংকলনে ইহা ইহার ৬ষ্ঠ পদক্ষেপ। পূর্ব বৎসরের মতই এই বৎসরও প্রেমেন্দ্র মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, নরেন্দ্র দেব, গোপাল ভৌমিক কুমারেশ ঘোষ, দেবেশ দাশ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের রচনায় বর্তমান সংস্করণটি অতীব আকর্ষনীয় সংকলনে রূপায়িত হইয়াছে। প্রচুর আলোকচিত্র, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিত্রাঙ্কন ও ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে মহিলা শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনীর চিত্রগুলির আলোকচিত্র বার্ষিকীটির গৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। ছাপা, কাগজ ও রচনা সম্ভারের সমাবেশের তুলনায় মূল্য অতীত সুলভ। ইহার বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

———

ব্রাইটেক্স

ড্যাজল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড • ১৩৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

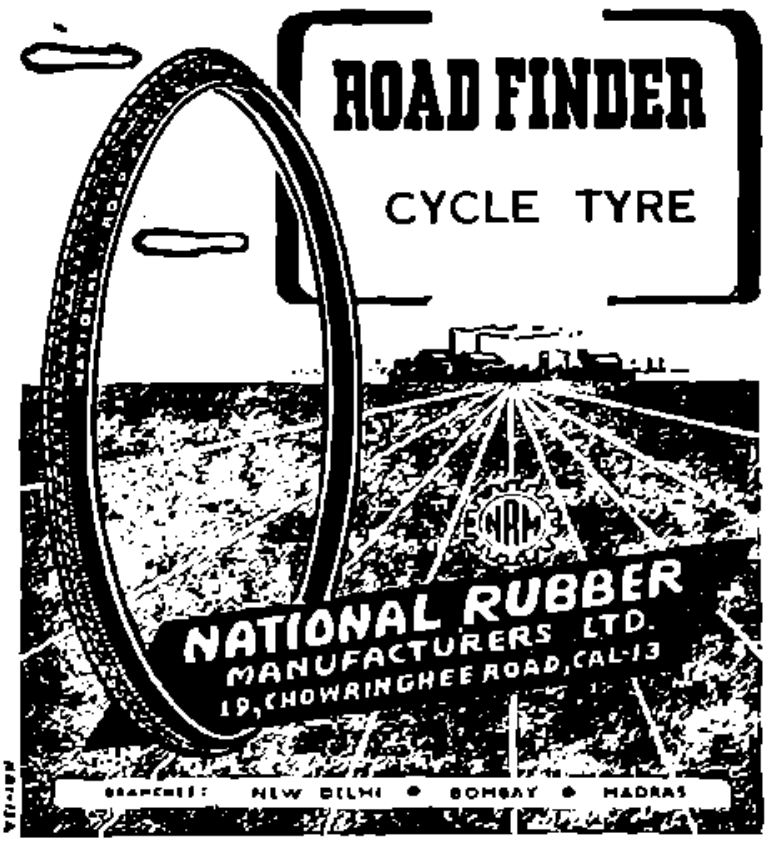

শ্রীবিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নবগোপাল প্রেস, ১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ, ৯ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিপুল পরিকল্পনা

বহুমুখী কল্যাণ

গ্রাম্য শিল্প উৎপাদনের উন্নতির জন্য

ক্ষেতগুলির জন্য জল .....

গৃহের জন্য বিদ্যুৎ .....

ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলির জন্য শক্তি ...

অনগ্রসর এলাকা দূরীকরণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বহুমুখী-উপযোগী পরিকল্পনাগুলি নিয়ে নজর দিচ্ছেন।

তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র, লৌহ-ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক উপাদান, সার, খনিজ ও অন্যান্য কর্মসূচীগুলি রূপায়িত করাই হোল বিভিন্ন পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তু।

পরিকল্পনা সফল করে তুলুন

প্রগতির জন্য সমৃদ্ধির জন্য

আদর্শ পথ্য,
পানীয় ও খাদ্য

লিলি বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত.

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা] জ্যৈষ্ঠ • ১৩৬৫ [মে-জুন • ১৯৫৮

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

ভারতে সর্বাধিক
বিক্রয়ের গৌরব অর্জন
করেছে

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥

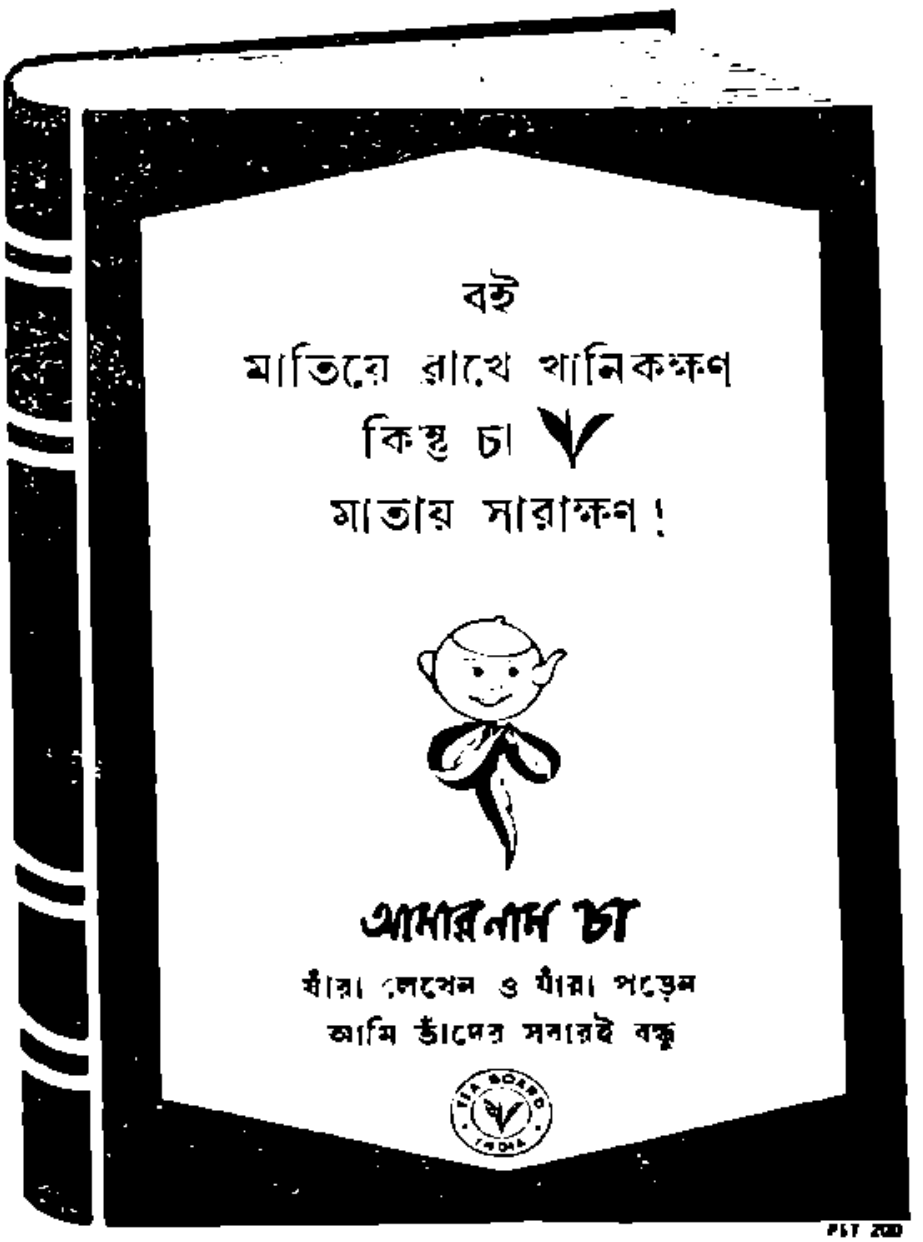
বই
মাতিয়ে রাখে খানিকক্ষণ
কিন্তু চা
মাতায় সারাক্ষণ!
আমারনাম চা
যাঁরা লেখেন ও যাঁরা পড়েন
আমি তাঁদের সবারই বন্ধু
TEA BOARD INDIA
PST 200

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসংখ্য ছোটো ছোটো রক্তবাহী শিরা ও ধমনি দেহের সর্বত্র বিস্তৃত, তার প্রত্যেকটির মধ্যে দিয়ে রক্ত প্রবাহের সঙ্গেই তার পুষ্টিসাধন হয়ে থাকে। এই রক্তকে প্রথমেই পরিষ্কার করা চাই। তবেই রক্তের পুষ্টি হবে, তবেই স্বাস্থ্যলাভ হবে। নতুবা রক্তের সঙ্গে মিশে যে সকল বিষাক্ত পদার্থ দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তার ফলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

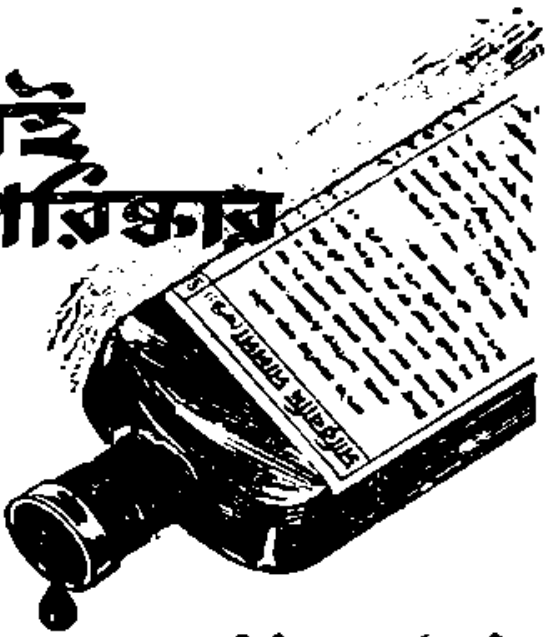

সায়িবাদ্দি সালসা প্রায় সর্ব প্রকারের সকল অসুখের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সায়িবাদ্দি সালসা সেবনে নিশ্চিত ফোঁড় পরিষ্কার হয়, ঘোস, পাঁচড়া, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্বপ্রকার চর্মরোগ, দাদ ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, শিরায়ের বিশুদ্ধ স্বাভাবিক হয়, মুখে দৃষ্টি পায় এবং শরীরে প্রকৃত বিশুদ্ধ সুস্থ রক্ত সঞ্চালিত হয়।

সায়িবাদ্দি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত-পরিষ্কারক মহৌষধি

ডাক্তার [illegible] ঘোষ, এম.এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম.বি.এস (লন্ডন), এফ.সি.এস (আমেরিকা), চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ।

• কলিকাতা মেডিকেল কলেজ—ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এল-সি (ডাবলিন), আয়ুর্বেদ-আচার্য। ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতা-৯

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা

ঢাকা ও কলিকাতা-মুর্শিদাবাদ এজেন্ট

আমাদের কথা গল্প করার মতোই বটে। দেশীয় শিল্পের অগ্রগতির ইতিহাসে এ গল্পকে বলা চলে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৪৬ সালে আমাদের এসেম্বলী লাইন থেকেই ভারতের সর্বপ্রথম 'রিং স্পিনিং ফ্রেম' বের হয়। এর পরে 'লাফাশায়ার টাইপ বয়লার', 'ওয়াটারটিউব বয়লার ইত্যাদি অনেক কিছুই সর্বপ্রথম তৈরী করার গৌরব আমরা অর্জন করেছি। ভারতের বৃহত্তম স্লুইস্-গেট সমূহের কয়েকটি গেট কপারে আমরাই নির্মাণ করেছি। হীরাকুদে আমাদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে যন্ত্রদানব 'পেন-স্টক লাইনার'-এর প্রবর্তন। ভারতীয় রেলপথের জন্য গাড়ি ও ইঞ্জিনের বয়লার আমরাই প্রস্তুত করে থাকি; আমাদেরই যন্ত্রপাতি লাক্সরফাম আজ সিঙ্কিতে সক্রিয়। চিনি এবং পাটকলের যন্ত্রপাতিও নির্মাণ শুরু করেছি আমরা; ডি ডি সি-র বিভিন্ন বন্দর নির্মাণের কাজও হাতে নিয়েছি। আন্তর্জাতিক মানবিশিষ্ট আমাদের এই সব যন্ত্রপাতি বিশ্বের সেরা বিশেষজ্ঞদের কারিগরি সহযোগিতায় তৈরী। ভারতের মূলশিল্পের সেবায় টেক্সমাকো এইভাবেই আত্মনিয়োগ করেছে।

টেক্সটাইল মেশিনারী কর্পোরেশন লিমিটেড

কে, সি, দাশের রসগোল্লা।

প্রিয়জনের প্রীতিভোজে উপাদেয় উপাদান

বায়ুশূন্য টিনেও পাওয়া যায় এবং বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া
দূরান্তরেও উপহার হিসাবে পাঠানো যায়।

* * *

আরও

রসোমালাই ঃ সন্দেশ ঃ দধি ইত্যাদি

ঃ:ঃ:ঃ

রসোমালাই আবিষ্কারক ঃ

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা—৩

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

সম্পাদক

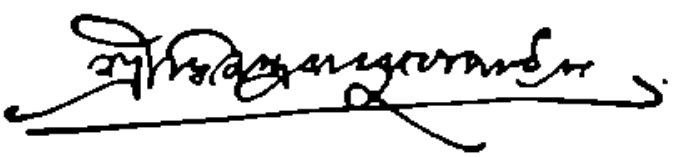

জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৫
মে—জুন : ১৯৫৮

কার্যালয় :
৫/প্রাইভেট রোড, নবপল্লী, কলিকাতা-৩৮
দিল্লি অফিস
১০৪, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯

এই সংখ্যার মূল্য বারো আনা

BUY

BEST SELECTED "B" GRADE COAL

FROM

SAMLA COLLIERIES LTD.

&

JAIPURIA KAJORA COLLIERIES LTD.

ENQUIRIES TO :

33, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA.

Phones : 22 { 2465 2466 2468 3347

Gram : { JAIPURIA CALCUTTA

NATIONAL SHEET
Serves EVERY INDUSTRY

TIN PRINTERS AND
CONTAINERS MANUFACTURERS
INCLUDING
DRUMS KEGS BUCKETS Etc

PHONE: 55-4696 GRAM-NASMET WORK

NATIONAL SHEET & METAL WORKS
PRIVATE LIMITED.

36-A, SAHITYA PARISAD ST. ★ CALCUTTA-6

রেশম শিল্পী সংঘ

বাংলার খাঁটী রেশমের প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয় :—১২/১ নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

* টাকা প্রতি তিন আনা (ট্রানিশ নয়া পয়সা) রিবেট।
* নূতনতম ডিজাইনের মুর্শিদাবাদী ছাপা শাড়ী, গরদের সাটিং, কোটিং, তসর, মট্‌কা, বাপ্‌তা প্রভৃতির সাড়ম্বর আয়োজন।
* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় উৎপাদিত।
* কেন্দ্রীয় খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত।

—ঃ খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র : —

(১) ১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(২) ৩৯ নং মহাত্মা গান্ধী রোড
(৩) ১৫৯/১, রাসবিহারী এভেনিউ

ডায়াপেপ্‌সিন

হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য্যই করা উচিত ডায়াপেপ্‌সিন সেই কার্য্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপ্‌সিন বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বল লাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপ্‌সিন ঠিক ঔষধ নহে, দুর্ব্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায়ক মাত্র।

ইউনিক্সন ড্রাগ

কলিকাতা

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা] **সূচীপত্র** [জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পশ্চিমবঙ্গের বাজেট	১০১
ধর্মঘটের গোড়ার কথা—ইউ. এম-এর অর্থনীতি	২০৯
আর্থিক দিকদর্শন-তথ্যসেবী—বিদেশী মুদ্রা সঙ্কট	২১২
পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ ও গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা—শ্রীপবিত্রতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৬
অনুন্নত অর্থনীতি ও জনসংখ্যা তত্ত্ব—অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়ব্রতোষ মৈত্রেয়	১৯৯
কপিরাইট রেজিষ্ট্রেশনে গ্রন্থকারের সুবিধা—শ্রী টি. এস. কৃষ্ণমূর্তি	২০৫
ভারতে বৈদেশিক মূলধন সমস্যা—শ্রীঅচিন কুমার মুখোপাধ্যায়	২০৮
কৃষিপর্যায়ে সোভিয়েৎ দেশ ও ভারত—শ্রীসুবলকুমার চক্রবর্তী	২১২
ভারতে মূলধনের ব্যাটস্তিতে মজুত সোনা-রূপার ভূমিকা—শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	২১৫
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক শিক্ষা—শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়	২১৭
কর ধার্যের নূতন পদ্ধতি ও ভারতীয় অর্থনীতিতে ইহার প্রতিক্রিয়া—শ্রীএ. ডি. শ্রফ	২১৯
সম্পত্তি শাস্ত্র—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এল্, এন্, ডি, সি-আই-ই	২২১
কৃষি-শিল্প বাণিজ্য প্রসঙ্গ	২৪৬
অর্থনৈতিক সমাজে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব	২৫১
আর্থিক সংবাদ	২৫৩

সৌন্দর্য্যে ও সংরক্ষণে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট য়্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা : আসানসোল : শিলিগুড়ি : মাদ্রাজ

মেট্রিক পদ্ধতির ওজন
প্রবর্তিত হচ্ছে

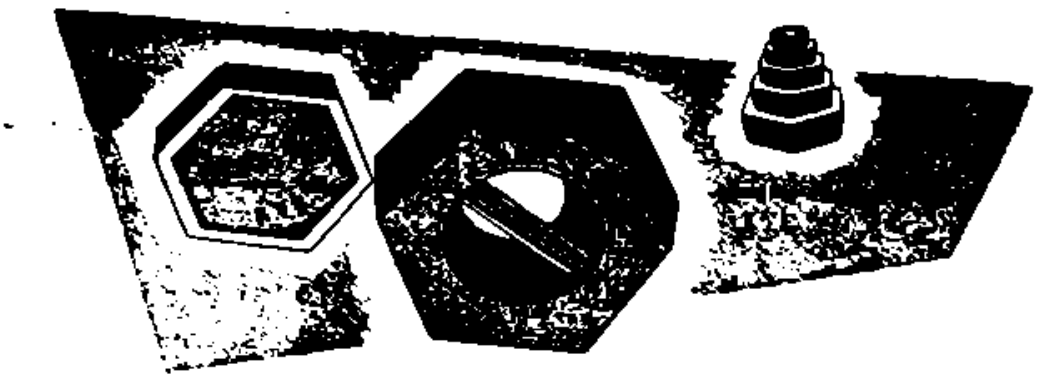

বর্তমানে ভারতে কোনো জিনিস ওজন বা মাপ পদ্ধতি নেই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্ততপক্ষে ১৪৩ রকমের ওজন চলছে। এই রকম বিভিন্ন ওজন ব্যবস্থা অসামঞ্জস্যের প্রশ্রয় দেয়। মেট্রিক ওজন ও মাপের ভিত্তিতে সমগ্র দেশে একই রকম ওজন পদ্ধতি চালু করা হলে তাতে প্রত্যেকেরই সুবিধে হবে। বিশেষ করে দেশে এখন দশমিক মুদ্রা চালু হওয়ায় এই পদ্ধতির ওজনে হিসেব করাও খুব সহজ হবে। ১৯৫৬ সালের ওজন ও মাপ আইনের দান অনুযায়ী মেট্রিক পদ্ধতির ওজনগুলির মূল একক স্থির করে দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের যাতে বিশেষ কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য ধাপে ধাপে এই পরিবর্তন আনা হবে।

কোন অঞ্চল বা ব্যবসাতে এই ওজন চালু করা হলেও তিনবছর পর্যন্ত পুরানো ওজনও ব্যবহার করতে দেওয়া হবে।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ চালু করা হবে।

মেট্রিক ওজনগুলি জেনে নিন

এই ওজনের একক হোল কিলোগ্রাম।
এক কিলোগ্রাম হোল ১ সের ৩ ছটাক আনুমানিক
১০ ডেসা গ্রাম
১ পাউণ্ড ৩ আউন্সের সমান।

একক এর অংশ
১০ মিলিগ্রামে—১ সেন্টিগ্রাম
১০ সেন্টিগ্রামে—১ ডেসিগ্রাম
১০ ডেসিগ্রামে—১ গ্রাম
১০ গ্রাম —১ ডেকাগ্রাম
১০ ডেকাগ্রামে—১ হেক্টোগ্রাম
১০ হেক্টোগ্রামে—১ কিলোগ্রাম

গুণিতক
১০০ কিলোগ্রামে—১ কুইন্টাল
১০ কুইন্টাল সমান
১০০০ কিলোগ্রামে—১ মেট্রিক টন

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

দ্বিতীয়
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়

প্রথম পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে ব্যয় হয়েছিল ৭১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই ব্যয় হবে দ্বিগুণ, বস্তুত এ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রত্যেকটি নয়া পয়সাই জনসাধারণের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য, শিক্ষা ও শিল্পপ্রসারের কাজে, চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণে, সেচ ও

পশ্চিমবঙ্গ

কৃষির উন্নতিতে এবং সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের অসুবিধাগুলি দূর করার কাজে ব্যয় করা হবে।

কিন্তু শুধু অর্থ ব্যয়-ই সাফল্যে পৌঁছানোর পথ সুগম করে না। এ কাজে জনসাধারণকেও সাগ্রহ সহযোগিতায় অগ্রসর হতে হবে। তাই আসুন সকর্মে সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়ে আমাদের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

IN 5 WAYS

UPCC

are contributing to the

SECOND 5 YEAR PLAN

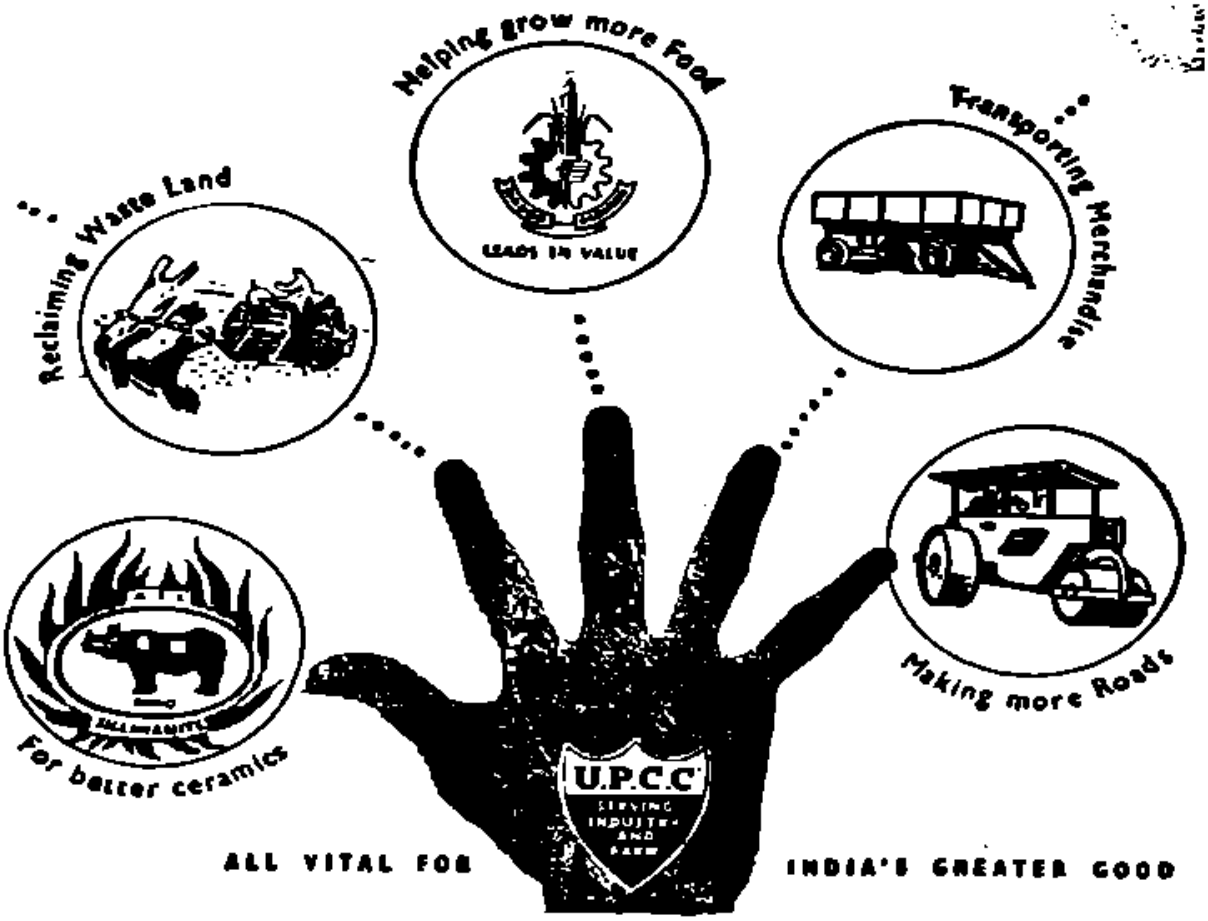

THE UNITED PROVINCES COMMERCIAL CORPORATION

6, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13

PPB/UPCC/1/58

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা] [জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

গত ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় যদিও বর্তমান বাজেটটি উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, তবুও তাহার সম্যক আলোচনা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আলোচ্য বাজেটটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে অর্থ কমিশনের নিকট হইতে সুপারিশকৃত সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ না জানা পর্যন্ত বর্তমান বাজেটের সম্যক আলোচনা সম্ভব নহে। সুতরাং মাত্র তিন মাসের জন্য পাশ করাইয়া লইয়াছিলেন। অতএব বর্তমান মাসে ইহার পুনর্বিবেচনার জন্য বিধান সভার অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বাজেট সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, চিরাচরিত গতানুগতিকতার ছাপ বর্তমান বাজেটেও রহিয়াছে। একমাত্র সুখের কথা, কোন নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের করনীতি কোন রাজ্যের অধিবাসীদের অব্যাহতি দেয় নাই এবং পশ্চিমবঙ্গ তাহাতেও সবিশেষ জড়িত। সুতরাং ডাঃ রায় কোনরূপ করধার্য না করিলেও বাঙ্গালীর স্বস্তি ফেলিবার যে কোন অবকাশ রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। বরং পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম বৃহৎ শিল্পাঞ্চল হিসাবে, পূর্ব-ভারতের সীমান্তরাজ্য হিসাবে, কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি হিসাবে, ইহার যে সব সমস্যা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে জর্জরিত ও নিষ্পেষিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নহে, সর্বভারতীয় সমস্যা।

• • • •

কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, বাংলার সংস্কার-সংস্কৃতির লীলাভূমি। ঐতিহাসিককালের ছোট কয়েকটি গ্রাম, ভাগীরথীতীরে অজানা—অখ্যাত অবহেলায় থাকিয়া একদিন কালের বিবর্তনে কাহার পদধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া মহাকালের পরিক্রমায় মহান করিয়া তুলিল, তাহারই নিদর্শন বর্তমান কলিকাতা! সেদিন পড়িতেছিলাম, জহরলাল বলিয়াছেন, কলিকাতা মৃত, কলিকাতা বৃহৎ উজাড় গ্রাম। কলিকাতা মৃত কি জীবিত, কলিকাতা আগামীকালের পুরাতত্ত্ববিদের মহেঞ্জদারো না নালন্দা, না হরপ্পা, কলিকাতা অতীতকালের সিরাজউদ্দৌল্লার, না ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর, কলিকাতা বর্তমানকালের বাঙ্গালীর, মুসলমানের না মাড়োয়ারীর, কলিকাতা ইংরাজ চক্রান্তের নিদর্শন স্বরূপ মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর মঞ্চ-পীঠ-ভূমি, না বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবহেলা-উপক্ষোর পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপ, না অনাগত দিনের নূতন মানব-অভ্যুদয়ের গৌরবোজ্জ্বল ভারতের মর্মকেন্দ্র, আজ তাহার শেষ বিচার করিবার এখনও সময় আসে নাই। যদি কোনদিন উন্নত ভারতবর্ষ, ঐতিহ্যময় ভারতবর্ষ, আদর্শপ্রবণ ভারতবর্ষ, মানবতার প্রতীক ভারতবর্ষ, শিল্প-সাহিত্য, কৃষ্টি-কলায় ভারতবর্ষ জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হয়, তবে একদিন Discovery of India'র গ্রন্থকার পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে কলিকাতা অবলম্বন করিয়াই করিতে হইবে। সেদিন

পড়িতেছিলাম 'কমলাকান্তের' প্রলাপ। কমলাকান্ত বলিয়াছেন, কলিকাতার পূর্ববর্ণিত মূর্তি অস্বীকার করিতেছিনা। বলিতেছি যে ইহাই তাহার স্বরূপ নয়। সংবাদপত্রের শিরোনামা যে-সব তথ্যকে সদা সর্বদা প্রশ্রয় দেয় না, সেই সব তথ্যের মধ্যে কলিকাতার যথার্থ রূপ। এখানে বিদ্যা বিতরণ কেন্দ্রসমূহ আছে, গবেষণার প্রতিষ্ঠানসমূহ আছে, গ্রন্থাগারে নিষ্ঠাবান পঠিক্ষু ছাত্র, অধ্যাপক আছে, একটা মহৎ সাহিত্য নিত্য-নতুন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, এখানে শত লক্ষ গৃহী সংসারের শুভ্রহ কর্তব্যভার সম্পাদন করিতেছে এবং 'ক্ষুদ্র খণ্ড বিরহমিলন-পূর্ণ সংসার' নীর-মন্থরগতিতে এখানে চলমান। এখানেই যথার্থ কলিকাতা এবং তাহা আদৌ মৃত নহে। রাজনীতির ঘষা কাচের চশমা জীবনের ও সত্যের শত্রু। তাহার ভস্মলোচনী দৃষ্টি যেখানেই পড়ে সেখানকার রস শোভা সৌন্দর্য লোপ পাইয়া নৈরাশ্যের সাহারায় পরিণত হয়। এ তো প্রলাপ উক্তি নয়; এ যে সত্য ভাষণের ব্যাকুল প্রয়াস।

নয়া দিল্লীর কথা মনে পড়ে। শুনিয়াছি জাঁক জমক, আড়ম্বর বিলাস সৌষ্ঠবে গঠিত দিল্লী নগরী জনগণের, জনসমাজের দূরে থাকিয়া দিবালোকে যেমন কলরবে মুখরিত হয়, তেমনি রাত্রিতে নিশিথ অন্ধকারে প্রেতপুরীর মত মনে হয়। কলিকতা সকলকে লইয়া। সমগ্র দিবারাত্রি মানুষের সুখ-দুঃখের, দ্বন্দ্ব-মিলনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে সর্বশ্রেণীর জনমানবের পদধ্বনি, মুখর কলধ্বনি ইহাকে মুখরিত, সঙ্গীতিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ছেদহীন যাত্রাপথের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কলিকাতা ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের। বিশ্বমানবের অন্তহীন যাত্রাপথে এ যে তীর্থ ভূমি—যদিও একান্ত বাংলার ও বাঙালীর। আমরা ভারতবাসী,; একে অন্যকে নিজেদের মধ্যে ছোট করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আঞ্চিকতার মনোবৃত্তি আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তাই ভারতবাসীর নিকটে কলিকাতার সমৃদ্ধি তথা বাঙ্গালীর ক্ষেত্রভূমির গৌরব সময় সময় অসহ্য হইয়া উঠে। আজ সমগ্র ভারতে বিশেষ করিয়া ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে যে ঔদ্যোগ-আয়োজন, বিলাস-সৌষ্ঠবের অহমিকার আভিজাত্য তাহা দেখিয়া বাংলার কলিকাতা আপন মনে যে গুঞ্জন করে ··

"আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দে রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত কল্লোলে॥"

অনেকখানি পথ-চ্যুতি ঘটিয়াছে। আলোচনা করিতেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের বাজেট—পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা। আমাদের বক্তব্য এই যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা শুধু বাঙ্গালীর সমস্যা নহে, সর্বভারতীয় সমস্যা; বিশেষ করিয়া নয়াদিল্লী সরকারের সমস্যা। কলিকাতার যে বন্দর আছে তাহার সমস্যা কেন্দ্রীয় সমস্যা। কলিকাতার যে রেলপথের সংযোগ ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, সে সমস্যাও কেন্দ্রীয় সমস্যা, বাংলার প্রধান জলপথ হুগলী নদীর সমস্যা—কেন্দ্রীয় সমস্যা। কলিকাতার বিরাট শিল্পাঞ্চলের শিক্ষা, বাসস্থান, খাদ্য-সরবরাহ সব কিছুই সর্ব ভারতীয় সমস্যা— নয়াদিল্লী সরকারের সমস্যা। কলিকাতার বিরাট শিল্পাঞ্চলের শিক্ষা, বাসস্থান, খাদ্য-সরবরাহ সব কিছুই সর্ব ভারতীয় প্রয়োজনকে রূপ দিতে গিয়া যে কলিকাতা গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা তাহারই বিশালতার বিরাট সমস্যা। সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে বাংলা বিভক্ত হইয়াছিল তাহারই

পরিণতি স্বরূপ যে সব উদ্বাস্তু কলিকাতা ও কলিকাতার সহরতলীতে ভীড় জমাইয়াছে তাহাও কেন্দ্রীয় সমস্যা। কলিকাতা কলিকাতার জন্যই গড়িয়া উঠে নাই, বাঙ্গালীর জন্যও নহে। হয়তো বাঙ্গালীর প্রেরণা কলিকাতার বিবর্তনকে অগ্রগতি দান করিয়াছিল—কিন্তু তাহা সর্বভারতীয় প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া নহে।

• • • •

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে সব সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সর্বভারতীয় সমস্যার অঙ্গীভূত। পশ্চিমবঙ্গের মত ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি এমন নহে যে এই সব সমস্যার সমাধান রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎস হইতে আর্থিক সংস্থানের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে অথচ কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং অর্থ কমিশনের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে যে কার্পণ্য তাহাতে উদারতার পরিবর্তে উপেক্ষাই প্রমাণিত হইতেছে। সমস্যা সঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বাহুল্যও কম হইবে না। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের যে অর্থনৈতিক অবস্থা তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আর্থনীতিক অবস্থা—১৯৫১ সালের শিল্প-উৎপাদনের ভিত্তিতে নির্ধারিত "সূচক মান" ১৯৫৫ সালে ১২২·১ এবং ১৯৫৬ সালে ১৩৩·০ ছিল। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে তাহা ১৬২·৩ হইয়াছিল। পরের মাসে উক্ত উক্ত "সূচক মান" ১৪১·৪-এ নামিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে উহা আবার বাড়িয়া ১৪৪·৩ হয়।

১৯৫০ সালের জুনমাসে যে সমাবর্ষ শেষ হয়, তন্মধ্যে লক্ষ ভারতের কৃষি-উৎপাদনকে ভিত্তি ধরিয়া যে সাধারণ সূচক মান ১৯৫৩-৫৪ সালে ১১৪·৩ ছিল তাহা ১৯৫৪-৫৫ সালে ১১৬·৪-এ, ১৯৫৫-৫৬ সালে ১১৫·৯ এ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ১২৩·০-এ উঠিয়াছিল। খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের যে সূচক মান ১৯৫৩-৫৪ সালে ১১৯·১ ছিল তাহা ১৯৫৪-৫৫ সালে ১১৯·৪ এ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ১১৩·৫-এ নামিয়া আসিয়াছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে ইহা বাড়িয়া ১১৯·৬-এ উঠিয়া গিয়াছিল। চাউল উৎপাদনের যে সূচক মান ১৯৫৩-৫৪ সালে ১১৮·৬ ছিল, তাহা ১৯৫৪-৫৫ সালে ১০৫·৫-এ নামিয়া গিয়াছিল। এই মান ১৯৫৫-৫৬ সালে ১১২·৭-এ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ১১৮·১-এ উঠিয়া গিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে চাউল উৎপাদন ১৯৫৩-৫৪ সালে দশ লক্ষ টনের হিসাবে ছিল ৫·২; ১৯৫৪-৫৫ সালে ইহা ৩·৭৬-এ নামিয়া গিয়াছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা বাড়িয়া ৪·১৫ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪·৩৪ হইয়াছিল।

১৯৩৯ সালকে ভিত্তি ধরিয়া সকলপ্রকার পণ্যের পাইকারী মূল্যের সর্বভারতীয় সূচক সংখ্যা ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ৪৪৩·৫-এ উঠিয়াছিল। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে তাহা ৪৩২·৭ এ নামিয়া আসিয়াছিল। একই ভিত্তি ধরিয়া খাদ্যশস্যের পাইকারী মূল্যের সর্বভারতীয় সূচক সংখ্যা ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে ৪৪০·৯-এ উঠিয়াছিল, কিন্তু ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ৪১১·১-এ নামিয়া আসিয়াছিল। ১৯৫০ সালের নবেম্বর মাসকে ভিত্তি ধরিয়া : হইতে ১০০ পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে কলিকাতার জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক মান : ১৯৫৭ সালের নবেম্বর মাসে বাড়িয়া ১০৮·০ হইয়াছিল। ১৯৫৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী উহা নামিয়া ১০৪·৫ হইয়াছিল। সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারীদের মূল্যের সূচক মান ১৯৫৬ সালের অক্টোবর

মাসে উহা নামিয়া ৮৯·০-এ দাঁড়ায়। পরিবর্তনীয় লভ্যাংশযুক্ত কাগজের মূল্যের সূচক মান ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে ছিল ১২৪·৯। গত মে মাসে উহা ১০৭·৫-এ এবং জুন মাসে ১০২·৬-এ নামিয়া যায়; জুলাই মাসে আবার বাড়িয়া ১০৫·৫ হয় বটে, কিন্তু আগস্ট মাসে আবার নামিয়া ১০৩·১, সেপ্টেম্বর ৯৯·৩ এবং অক্টোবরে ৯৭·৪ হয়।

পূর্বোক্ত এই সংখ্যাগুলি হইতে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা হইতেছে দ্রুত গতিশীল একটি অর্থনীতির চিত্র এবং ইহা গতিশীলতাজনিত ঘাত-প্রতিঘাতের নিদর্শনবাহী। দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য সর্বক্ষেত্রে যে অর্থবিনিয়োগ করা হইয়াছে, তাহা এমন চাহিদা সৃষ্টি করিতেছে যাহা সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন-বৃদ্ধিকেও ছাড়াইয়া যাইতে চাহিতেছে। দ্রুত উন্নতির কালে ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং এইজন্যই অবস্থা আয়ত্তে রাখিবার জন্য এবং আমাদের সম্পদসমূহকে যথা সম্ভব লাভজনকরূপে কাজে লাগাইবার প্রয়োজনে আমাদের সমস্ত উদ্যম ও নৈপুণ্যকে নিয়োজিত করা আবশ্যক। উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে। অপচয় নিবারণ করিতে হইবে। অগ্রাধিকার সম্বন্ধেও আমাদের প্রকৃত ধারণা থাকা দরকার। চাহিদার সৃষ্টি করে অথচ সমপরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করে না এরূপ কোন-কিছুর প্রশ্রয় দিতে পারি না।

১৯৫৭-৫৮ সাল—৫·৭১ কোটি টাকা প্রারম্ভিক তহবিলে লইয়া ১৯৫৬-৫৮ সাল শুরু হয়। বাজেট বরাদ্দের পর্যায়ে রাজস্ব খাতে আয় ৬৭·৮৯ কোটি টাকার স্থলে চলতি বৎসরে সংশোধিত বাজেটে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৯·৯৮ কোটি টাকা। বাজেট পর্যায়ে ইহার পরিমাণ ছিল ৭২·১৮ কোটি টাকা। ইহার নীট ফল হইতেছে বাজেটকৃত ১১·২৯ কোটি টাকা। রাজস্ব ঘাটতির স্থলে ২·৬৬ কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি। এই উন্নতি প্রধানত অধিকতর পরিমাণে বিক্রয় কর ও প্রবেশ কর আদায় এবং দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে অধিকতর প্রাপ্তির দরুণ সম্ভব হয়।

সংশোধিত বাজেটে মূলধন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৩০·৩৫ কোটি টাকা হইলেও বাজেট বরাদ্দে ইহার পরিমাণ ছিল ২৬·৭১ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধির মধ্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার খাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে ৪·৬৪ কোটি টাকা যাহা ভারত সরকারের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে পাওয়া যায়।

১৯৫৮-৫৯ সাল—১৯৫৯-৫৯ সালে বাজেট বরাদ্দে রাজস্ব খাতে আয় ধরা হইয়াছে ৬৮·৮৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় ধরা হইয়াছে ৭২·৬৯ কোটি টাকা। অতএব আগামী বৎসর রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমাণ ৩·৮ কোটি টাকা। রাজস্ব খাতের বাহিরে নীট ফল হইতেছে ২·০৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত। অতএব বাজেটের সর্বমোট ফল হইতেছে ১·৭৩ কোটি টাকা ঘাটতি।

পরিকল্পনা—পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয় দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য ১৫·৬ কোটি টাকা সহ ১৫৩·৭ কোটি টাকা অথবা দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বাদে ১৩৮.১ কোটি টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশন বিহার হইতে হস্তান্তরিত এলাকাসমূহের জন্য যেসব পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব এই রাজ্যকে দিয়াছেন তাহার ব্যয় ৪ কোটি টাকা। সুতরাং পরিকল্পনার ব্যয় এখন দাঁড়াইয়াছে ১৪১·৬ কোটি টাকা। ১৯৫৫ সালে পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য অর্থসংস্থানের যে ধারা স্থির করিয়া দেন তাহাতে রাজ্য-সরকারের দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা ছাড়া সমগ্র পরিকল্পনার ব্যয় ১৩৮·১ কোটি টাকার মধ্যে ৬৪·৪ কোটি টাকা অর্থাৎ সমগ্র পরিমাণের ৪৭ শতাংশ সংগ্রহ করার কথা এবং বাকি ৭৩·৭ কোটি টাকা বা সমগ্র

পরিমাণের ৫০ শতাংশ ব্যয় কেন্দ্রীয় সাহায্যের আকারে নির্ধারিত হওয়ার কথা। যদিও বিহার হইতে ৪ কোটি টাকার পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরিত হইয়াছে, তবুও সেগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণের কোন ইঙ্গিত পরিকল্পনা কমিশন এখনও দেন নাই।

১৯৫৬-৫৭ সালে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বাদে আমরা ১৭·১ কোটি টাকার পরিকল্পনা রূপায়িত করিয়াছিলাম। এই ব্যয়ের মধ্যে মাত্র ৬·৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্যরূপে পাওয়া গিয়াছিল, বাকি ১০·৬ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে সরবরাহ করিতে হইয়াছিল!

১৯৫৭-৫৮ সালে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বাদে পরিকল্পনার জন্য বাজেটে ২১·৪৯ কোটি টাকা ধরা হইলেও, ইহার সংশোধিত হিসাব হইতেছে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বাদ দিয়া ২৬·৪১ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে প্রতিশ্রুত কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ১১·২ কোটি টাকা এবং রাজ্য-সরকারের তরফে ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ১৫·২৯ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ ২৬·৪১ কোটি টাকার মধ্যে মোট সংস্থান হইতেছে ২০·৪৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ পরিকল্পনার বাজেটে ঘাটতি থাকিতেছে প্রায় ৫·৯ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে সর্বমোট ৫·৯ কোটি টাকা ঘাটতির ইহাই কারণ।

১৯৫৮-৫৯ সালে পরিকল্পনা খাতে আমরা দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বাদে ২৪·৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতেছি। এই বাজেট প্রস্তুত করিবার সময় পর্যন্ত দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বাদে কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুত পরিমাণ ৭·০৭ কোটি টাকা সহ ১৪·৭ কোটি টাকা এবং রাজ্যের প্রাপ্তব্য সংস্থান বাজার ঋণের ৫ কোটি টাকা সহ ১৪·৭ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পরিকল্পনার জন্য ২৪·৪১ কোটি টাকার মধ্যে মোট সংস্থান হইতেছে ২২·৭৭ কোটি টাকা। পরিকল্পনা খাতে এই ১·৭ কোটি টাকা ঘাটতি, ১৯৮ ৫৯ সালের বাজেট বরাদ্দে সর্বমোট ১·৭ কোটি টাকা ঘাটতির কারণ।

উপসংহার—দেশ বিভাগের পর হইতে আমাদের অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে রাজস্ব খাতে আমাদের আয় ছিল মাত্র ৩২ কোটি টাকা। তাহা এক্ষণে ৬৯ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। এই বৃদ্ধি শতকরা ১০০ ভাগেরও বেশি। ১৯৪৮-৪৯ সালে রাজস্ব খাতে আমাদের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৯ কোটি টাকা। তাহার পরিমাণ এখন ৭৩ কোটি টাকা। এ-ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১০০ ভাগেরও বেশি। অনুন্নত অর্থনীতি দ্রুত সমৃদ্ধ হইতে চেষ্টা করিলে যেমন, বৃদ্ধিজনিত অসুবিধা অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ অসুবিধা দশগুণমাত্র বিগত বৎসরে আমাদের অর্থনীতিও অনুভব করিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ বাজেট, ১৯৫৮-৫৯

(হাজার টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯
আদায়				
প্রারম্ভিক তহবিল	১৭,০৯,১১০	৮,৭৪,৮৬	৪,১০,৭১	—২৭,৫৭
রাজস্ব আদায়	৫৭,৬১,১৭	৬১,৮৮,৮৭	৫৯,৯৮,২৮	৬৮,৮৬,৫৯
ঋণ খাতে আদায়—ঋণ	৩৫,৯৫,৩৭	৩৪,৩৮,৪০	৪০,৩১,৮৬	৩৬,৯৬,২৯
সম্ভাব্য তহবিল ও সরকারী হিসাব হইতে আদায়	১,০৭,২৫,২৪	৮০,৮৬,৩৭	৯১,১৫,৮১	৭০,৭৫,৪৭
মোট	২,১৭,৮৭,৯৫	১,০৫,৮৮,৫০	২,০৭,১৬,৭০	১,৭৯,৩০,৭৮

ব্যয়				
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১১,২০,০৮	১২,১৭,৫২	১২,৬৪,৩৪	১২,৬৯,১৬
মূলধন খাতে ব্যয়	২০,৩৫,৬২	২৬,৭১,৪২	৩৩,৩৫,১৯	২১,৮০,০৯
ঋণ খাতে ব্যয়—ঋণ	৯,৬০,৫৬	১১,০৫,১৭	১৫ ৬৩,৪০	১৩,৭২,৬৭
অন্যান্য তহবিল ও সরকারী হইতে ব্যয়	১,১১,০০,২৮	৭৯,৩৫,৭০	৮৪,৮১,২৯	৭৩,০৫,৩৪
সমাপ্তি তহবিল	৫,৭০,৭১	—৩,৪১,২১	—২৭, ৭	—২,০৩,৪৭
মোট	২,১৭,০৭,৯৫	১,৮৫,৮৮,৫০	২,০৭,১৬,৭০	১,৭৯,৩০,৭৮
মোট ফল—				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (–)				
(ক) রাজস্ব খাতে	—১৩,৫৮,২১	—১০,২৮,৬৫	—২,৬৬,০৮	—৩,৮২,৫৭
(খ) রাজস্ব খাতের বাহিরে	+২,২৩,৪০	—১,৮৮,১২	—৩,৩২,২০	+২,০৬,৬৭
(গ) মোট (প্রারম্ভিক তহবিল বাদে)	—১১,৫৫,৪৬	—১২,১৬,৭৭	—৫,২৮,২৮	—১,৭৫,৯০

*হস্তান্তরিত অঞ্চল হইতে ফাজিল বাকি ২·১০ লক্ষ টাকা সহ।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে আগামী বর্ষে শিক্ষা খাতে গত বৎসর অপেক্ষা যে পাঁচ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে সে টাকা বেশী আয়ও হইবে। পুলিশে ১ লক্ষ টাকা বেশী, ভূমির রাজস্ব খাতে ৬৮ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে ও ৩০ লক্ষ টাকা বেশী খরচ হইবে। আবগারি দরুণ আয় বাড়িবে না, খরচ কিছু কমিবে। সেলস্ ট্যাক্সের হিসাবে এবার ১৯৪১, '৫ ও '৫৬ সালের আইন মত এবং ১৯৪১ মত স্পিরিট বাবদ হিসাব ধরা হইয়াছে। এ বাবদে এবার ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা কম আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় অনুশাসনে চিনি তামাক ও মিলজাত বস্ত্র প্রদেশের সেলস্ ট্যাক্সের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ১৯৫৭ সালের এক আইনে রেলওয়ে মাশুলের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেশে বণ্টিতব্য শতকরা ৬·৩১ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাইবেন। তদনুসারে ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩২ লক্ষ ৮১ হাজার আলোচ্য বর্ষে ৬২ লক্ষ ১৫ হাজার পাইবেন। বর্তমান শিল্প বিজ্ঞানে ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হইবে। কিন্তু কুটীর শিল্পে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে টাকা বরাদ্দ হয়।

আলোচ্য পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট আলোচনায় বিরোধী পক্ষের যুক্তি প্রবল হইলেও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার ও বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানে আজ সর্বশ্রেণীর সর্ব দলের সমবেত প্রচেষ্টা একান্ত আবশ্যক। আমরা মনে করি সমস্যার সমাধানের চেয়ে ভুল ত্রুটির অবাঞ্ছিত আলোচনা অতি গুরুত্বপূর্ণ নহে। একদিকে যেমন সরকারের জাতীয় কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়, অন্যদিকে তেমনি সহযোগিতা ও সমবেত প্রচেষ্টা আজ একান্ত কাম্য।

— — —

চিনি শিল্পের বিপত্তি

১৯৫১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত চিনি শিল্প একাধিক্রমে এগিয়ে চলেছে। উৎপাদনী ব্যবস্থা সুদৃঢ় না হলেও এর উৎপাদন কয়েক বৎসরে দ্বিগুণ হয়েছে আর ১৯৬০ সালে অগ্রগতি ব্যাহত না হলে উৎপাদন সীমা ২৫ লক্ষ টনে এসে দাঁড়াবে। ভারত ১৯৪৭ সালে মাত্র ১০·৭৫ লক্ষ টন চিনি তৈরী করত। ১৯৫৭ সালে উৎপাদন ২০·২৬ লক্ষ টনে এসেছে। ১৯৫৭ সালের পরও উৎপাদন বেড়ে চলেছে।

আজ উৎপাদনের চেয়ে বিক্রয় বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; অবশ্য যদি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে জনগণের জীবনধারণের মান বৃদ্ধি পায় তবে এ উৎপাদনকে প্রাচুর্য বলা যায় না। কিন্তু বর্তমানে চিনি গুদামে জমে যাচ্ছে। এরকম অবস্থায় মজুত কমাতে হলে রপ্তানি করা প্রয়োজন। ১৯৫৭ সালে এদেশ থেকে কিছু চিনি রপ্তানি হয়েছিল। তার প্রধান কারণ ছিল সুয়েজ খাল বন্ধ আর ব্যাপকভাবে বীট চাষের অবনতি। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বহু চেষ্টা করেও চিনি রপ্তানী করা যাচ্ছে না। গত বৎসরের ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত এক কেঁটা চিনিও রপ্তানি হয়নি।

কিন্তু রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে ভারতীয় চিনির অত্যধিক উৎপাদন-ব্যয়। তাই শিল্পপতিরা সরকারের কাছে নানা প্রকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। এই আবেদন সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এখন যে দরে চিনি বিদেশী বাজারে বিক্রী হয়, যদি ভারতীয় চিনি সেই দরে বিক্রী করতে হয় তবে প্রতি টনে ২৬৭ টাকা লোকসান দিতে হবে। দু লক্ষ টন রপ্তানি করতে ৬·৩৪ কোটি টাকা লোকসান হবে আর ৫·৮২ কোটি টাকা উৎপাদন কর এবং ১·০২ কোটি টাকার ইক্ষু সেস্ ছেড়ে দিতে হবে। সর্বকুল্যে ১৩·১৮ কোটি টাকা লোকসান হবে আর আমরাই মোট ৮·৮০ কোটি টাকা বিদেশের বাজার থেকে পাব। কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য ডেপুটী মন্ত্রী মহাশয় রাজ্য সভায় বলেছেন যে এই লোকাসান ঘরের বাজারে দাম চড়িয়ে তুলে নেওয়া হবে। আজ ১৮ বৎসর ধরে শিল্প সংরক্ষণের নামে যে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সে বোঝা ক্রেতা আজও বইছে ; আরও বোঝা বাড়ানর কথা চলছে।

একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যায় যে ভারতীয় চিনির উচ্চ মূল্যের কারণ কৃষি ও শিল্পের নিম্নগামী উৎপাদন প্রণালী, ইক্ষুর উৎপাদন খুব কম ও শিল্প সংস্থাগুলো বেশীর ভাগ আঞ্চলিক ও কার্যকুশলী নয়, ইহার উপজাত দ্রব্য লাভজনকভাবে ব্যবহার হয় না। আর তাছাড়া কর ভারও খুব বেশী। ভারতীয় ইক্ষুর উৎপাদন প্রতি একর জমিতে মাত্র ১৪ টন। কিউবাতে ১৭·২ টন, হাওয়াইতে ২৭·২, পোর্টোরিকো ২৪·২, দক্ষিণ আফ্রিকাতে ২২·৪। প্রতি একরের ইক্ষু থেকে চিনি পাওয়া যায় ভারতে তা ১·৩১২, কিউবাতে ২·১ টন, হাওয়াইতে ৫·১, পেরুতে ৬·১, জাভায় ৬·৪ আর অষ্ট্রেলিয়ায় ৩·৬ টন।

উত্তর প্রদেশ ও বিহারে সমগ্র উৎপাদনের প্রায় ৭২ ভাগ উৎপাদিত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিকিং চাষের উন্নতির বিশেষ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ; কারণ সরকার সাধারণ ভাগের কৃষির বিশেষ উন্নতি করতে পারছে না। বহু লক্ষ চাষী ইক্ষু চাষ করে। ইক্ষু চাষ সাধারণ চাষের অংশ। সুতরাং চাষের সাধারণভাবে উন্নতি না হলে কেবল ইক্ষু চাষের উন্নতি হতে পারে না। এই প্রদেশে দেখা গিয়েছে যে বীজের, চাষের পোকামাকড় মারবার ব্যাপারে, সেচ ব্যবহার প্রভৃতির বিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। অনেক জায়গায় টিউবওয়েলগুলো খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। অনেক জায়গায় কৃষির জমিতে সেচ জল নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়নি। সুতরাং এই সব উন্নতি ব্যতিরেকে উৎপাদন ব্যয় কমান যায় না। প্রতি মণে ভারতে যখন ৯০ নয়া পয়সা খরচ হয়, জাভা, হাওয়াই ও কিউবাতে ১৯ নয়া পয়সার মত খরচ হয়।

শিল্পের উপজাত দ্রব্যগুলো লাভজনকভাবে ব্যবহার করা হয় না। ছিবড়েগুলো জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মাত্ত গুড় (molasses) যদিও কিছুটা পরিমাণে পাওয়ার এ্যালকোহল প্রস্তুত করবার জন্য ব্যবহারে করা হচ্ছে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে নয়! এই সকল উপজাত দ্রব্য নানা প্রকার প্রয়োজনীয় নিত্য দ্রব্য প্রস্তুতের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা তা বিশেষভাবে

অনুসন্ধান করা দরকার। ছিবড়ে কার্ডবোর্ড গৃহে, বৈদ্যুতিক ব্যবহারের বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট অন্যান্য রাসায়নিক জিনিষ প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা যায়। ছিবড়ে থেকে Formal dehyde, ও নানা প্রকারের মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। এই সকল রসায়নদ্রব্য সিনথেটিক রবার, নাইলন ও বনস্পতি তৈল প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে।

পরিত্যক্ত রসে শতকরা ২৮ থেকে ৩০ ভাগ চিনি জাতীয় দ্রব্য থাকে। ভারতে পাঁচ কিংবা ছয় লক্ষ টন গুড় তৈরী হয়। এর থেকে ভাটিখানার পরিস্রাবণের জন্য ৫০ ভাগ মাত্র টন প্রতি ৬৲ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। যদিও প্রতি টন গুড়ে ২০০৲ টাকার মত চিনি আছে। ইহা থেকে অনেক রকম রাসায়নিক সামগ্রী প্রস্তুত করা যায়—যেমন ল্যাকটিক, সাইট্রিক এ্যাকোনাইটিক এ্যাসিড, এ্যাসিটোন প্রভৃতি। এ ছাড়া অনেক রকম মৌলিক ব্যবহারেও ইহা প্রয়োজন।

এখন দেখা যাচ্ছে যে চিনি শিল্প যতই প্রসার লাভ করুক না কেন, ইহার নিজস্ব শক্তি অর্জনের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে পারিনি। এর আগেই বলা হয়েছে যে কাঁচামালের উৎপাদনশক্তি কৃষি শ্রীবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। নানা কারণে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, নেতৃত্বের দায়িত্বহীনতা পরিকল্পনার সামঞ্জস্যহীনতা, শাসনযন্ত্রের অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতার ফলে কৃষির সমস্যা বেড়ে যাওয়া ছাড়া কমেনি। এখানে ওখানে যে ৫ একটা কৃষি-সাহায্য দেখা যায় তাহা ভারতীয় কৃষি শিল্পের স্বাভাবিক অবনতিকে রুদ্ধ করতে পারেনি। শতকরা ৩ভাগ ফলন বৃদ্ধি কৃষি সমৃদ্ধির পরিচায়ক নয়। অর্থনৈতিক শক্তির অগ্রগতি সাধারণ কৃষকের সমস্যার সমাধান ও উন্নতির উপর নির্ভর করে। আজ কৃষকের সমস্যা বেড়েই গিয়েছে, কমেনি। আজ স্বাধীনতার ১১বৎসর পরেও ভূমি সংস্কারের কোন নীতি গ্রহণ করা হয় নি।

চিনির কলের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে বটে। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মিতব্যয়ী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়নি। আজ তার যান্ত্রিকবিন্যাসের কথা উঠেছে। উপজাত দ্রব্য ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে অনুসন্ধান করাও হয়নি। এখন এই শিল্প উৎপাদিত মূল্যের একশত ভাগের মধ্যে ৩৩ ভাগ কর দেয়। সরকারী কর সকল শিল্পকেই দিতে হবে। কিন্তু যে হাঁস সোনার ডিমপাড়ে তাকে হত্যা করলে আর কে ডিম পাড়বে? যা দেখা যাচ্ছে চিনির উৎপাদন আজকের পর্যায়ে রাখলে কিম্বা বাড়ালে বিদেশী বাজারে বিক্রয় করতেই হবে। দেখা যাচ্ছে যে সেইসঙ্গে নানা উপায়ে উৎপাদন ব্যয় না কমান যায় কিম্বা জমির উৎপাদিকা শক্তি না বাড়ান যায় কিম্বা লাভজনকভাবে উপজাত দ্রব্য অন্য শিল্পে ব্যবহার করা না যায় তবে যে অপচয় হবে তাতে বিদেশী উৎপাদকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যায় না আমরা সকলেই জানি রাতারাতি উৎপাদন প্রণালী বদলান যায় না কিম্বা কৃষি উৎপাদন বাড়ান কিম্বা কমান যাবে না। সুতরাং একমাত্র পথ হচ্ছে সরকারের কর ব্যবস্থার পরিবর্তন ও ইক্ষুর মূল্য সাধারণভাবে বেঁধে না দিয়ে চিনি উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বেঁধে দেওয়া। অবশ্য, গরীব কৃষক যদি ন্যায্য মূল্য না পায় তবে তাহার কৃষি উন্নতি করবার ক্ষমতা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং সাধারণ মূল্য তালিকার সঙ্গে দামের সামঞ্জস্য রাখতে হবে। আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে সেচের দ্বারা যে টাকা আদায় হয়েছে তা কি ইক্ষু চাষের ও শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে? আর তাছাড়া বিহার ও উত্তর প্রদেশ হতে মাদ্রাজ ও দক্ষিণভারতে বিকেন্দ্রীকরণের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে? এক কথায় এই শিল্পের আমূল পরিবর্তন না করলে এই শিল্প প্রতিযোগীমূলক হতে পারবে না।

ধর্মঘটের গোড়ার কথা

ইউ. এম-এর অর্থনীতি

শুধু যে ভারতীয় অর্থনীতি অন্তর্নিহিত শক্তির অভাবে প্রগতির পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে তা নয়, ভারতীয় শিল্পে উৎপাদনীয় শক্তির মধ্যে অসামঞ্জস্য সম্পর্ক স্থিতিবান থাকায়, সংগঠন প্রণালী শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কিম্বা উৎপাদন প্রণালীর দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে আরও বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাতে মালিক, শ্রমিক কিংবা সরকার কোন পক্ষই এমন কোন উদার ও সর্বস্বার্থ সামগ্রিক নীতি গ্রহণ করতে পারছে না যাহাতে উৎপাদনীয় শক্তির অপব্যয় বিলীন হতে পারে। লেখক পশ্চিম দেশের মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের মধ্যে সাধারণতঃ যে বন্ধুত্ব ও সত্যনিষ্ঠার স্পষ্ট চিহ্ন দেখেছেন শ্রমিক আন্দোলন কিংবা মালিকের ব্যবহারের মধ্যেও জাতীয় স্বার্থের প্রতি যে দরদ দেখেছেন তা ভারতীয় উৎপাদন প্রণালীর মধ্যে বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায় না।

অধুনা ভারতে জাতীয় সঙ্কটের মধ্যে শ্রমিক বিক্ষোভের ঘন কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের কামনা সাধারণ মানুষের সাধারণ রাজনৈতিক কিম্বা অর্থনৈতিক কামনার প্রতিধ্বনির মাঝে তার আজকের দিনে যখন বেকারত্বে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যখন বাজারের অভাবে কলকারখানা বন্ধ করতে হচ্ছে যখন বহু দ্রব্যের আমদানি বন্ধ হওয়াতে বহু অফিস ও দোকান উঠে যাচ্ছে তখন সব চেয়ে বিপদ কার? সাধারণ মানুষের—শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের। যারা বড় ব্যবসাদার, যারা কলকারখানার মালিক, তাদেরও লোকসান হচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের জীবন-মরণের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে না, শুধু আবার ভাল সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আজ যখন অনেক কারিগরী কারখানায় কিম্বা অন্যান্য ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় শ্রমিক বিতাড়ণ করা হচ্ছে তখন শ্রমিকদের আন্দোলনকে রাজনৈতিক পর্যায়ে না নিয়ে গেলে কি তারা বাঁচতে পারে? অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি পরস্পর বিরোধী নয়—পরস্পর সাহায্যকারী। রাজনৈতিক শক্তি সর্বোচ্চ সামাজিক শক্তির আধার হওয়ায় অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য ও পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক শক্তির ব্যবহারের সর্বক্ষেত্রেই দরকার হয়েছে। সুতরাং, যাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব দেখলে আতঙ্কে আঁতকে উঠেন তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের তাৎপর্য জানতে পারেন না। তাঁদের মতে শ্রমিক আন্দোলন ক্ষেত্র বিশেষে মালিকের সঙ্গে দলগতভাবে চুক্তি করা। শ্রমিক আন্দোলনের ইহাও একটি অভিন্ন অংশ কিন্তু সব নয় এবং মূলগত কারণ নয়।

ভারতে শ্রমিক ও মালিকের আয়ের ও জীবন ধারণের নীতি ও প্রণালীর এত বৈষম্য যে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি খুব কঠিন। শ্রমিকরা শুধু যে আধুনিক জীবনের কোন আস্বাদ পাইনি তা নয়, শিক্ষার অভাব তাদের মর্যাদার মান অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য পাশ্চাত্য দেশেও আছে কিন্তু শিক্ষা ও সংগঠন দ্বারা পাশ্চাত্য শ্রমিকরা তাদের মর্যাদা অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। শ্রমিকের সংহতি শক্তির উৎপাদন ব্যবস্থা নির্দেশে বিশেষ স্থান আছে। জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শ্রমিক প্রতিনিধিদের মান, মর্যাদা ও শক্তি মালিকদের থেকে কোন অংশে কম নয়।

ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কাঠামোতে যে শ্রম আইন গৃহীত হয়েছে তা বহু বৎসরের জাতীয় আন্দোলনে ধর্বিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবী শক্তির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু

রাজনৈতিক দুর্বলতা, রাষ্ট্রশাসন যন্ত্রের অপারগতা ও সম্মিলিত মালিক শক্তির কৌশলে এই সকল আইন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। এই সকল আইনের কর্মপন্থা বারে বারে ব্যাহত হয়েছে। সাধু উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে—খালি পড়ে রয়েছে কথার বাঁধুনি আর আমলাতান্ত্রিক বাঁধন। একথা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না যে সরকারী আমলারাজে অধিকর্তাদের জীবন যাত্রার প্রণালী মালিকদের মতই; সুতরাং তাঁদের সহানুভূতি সাধারণতঃ সমগোত্রীয়দের প্রতিই যায়।

কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক উদাসীনতাতে ব্যাহত হয় নি, ক্ষুদ্র শ্রমিক শক্তির বহুমুখী বিভক্তির দ্বারাও তা ব্যাহত হয়েছে। যেদিন শ্রমিক আন্দোলন অবাঞ্ছিত নেতার দ্বারা বিভক্ত হয়েছে, সংহতি হারিয়েছে সেদিনই তার দুর্বলতা নগ্নরূপে দেখা গিয়েছে। যে সুযোগ নিতে কি কেহই ছেড়েছে? অগণিত বেকারশক্তি বিভক্ত শ্রমিক আন্দোলনের বিরাট শত্রু। বেকার শক্তি, রাজনৈতিক চক্রান্ত, বুদ্ধির প্রখরতা, একশ বৎসরের পিছিয়ে-পড়া বিচার-পদ্ধতি প্রভৃতি সর্বশক্তি প্রয়োগে অর্ধভুক্ত ও বিভক্ত সাধারণ মানুষকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারা যায় দেখতে পাচ্ছি। মালিকদের হাজারও অসুবিধা থাকলেও শ্রমিকদের মত জীবনধারণের সমস্যা নেই। আর তাছাড়া রাজদ্বারে, খবরের কাগজে, পার্লামেন্টে সর্বত্র মালিকরা এরকম ভালভাবে যোগাযোগ রেখেছেন যে তাঁদের কর কিম্বা লভ্যাংশ সমস্যা শ্রমিকের বেঁচে থাকার সমস্যার অনেক উপরেই স্থান পেয়েছে।

বেশী দিন নয়, ডাকবিভাগের ধর্মঘট, ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, সেদিনকার বেঙ্গল কেমিক্যালের ধর্মঘট আমাদের জীবনযাত্রায় সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে। সামনে রেল ধর্মঘটের লাল সিগন্যাল জ্বলে উঠেছে! টাটার শ্রমিকরা ধর্মঘট করে পরাজিত হয়েছে আর ডক শ্রমিকরা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। সরকারও পেছপা নন—সামরিক শক্তির ব্যবহার আইনবিধিবহির্গত ধর্মঘট প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে শ্রমিকদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন। মাদ্রাজে গুলি চলেছে। টাটায়ই পুনরাবৃত্তি। অস্ত্র ব্যবহারের নেশা সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর গণতান্ত্রিক নেতাদের শক্তি পাগল ও মাতাল করে তুলেছে। জানি না এর পরিণতি কি! জালিয়ানাবাগের সূচনা, না ১৯৩২ এর নিয়তির নির্মম বিদায় অভিশাপ! সরকার শ্রমিকদের দোষ দিচ্ছেন আর শ্রমিকরা মালিকদের দোষ দিচ্ছেন। কোন কোন শ্রমিকনেতা এই সুযোগে কিছু জমিদারী করে নেবার সুবিধেতে আছেন। পরম বিক্রমশীল সৈন্যবাহিনী দিয়ে কিম্বা "দেশভক্ত" স্বেচ্ছা-সেবক দিয়ে শ্রমিকদের মনোবল নষ্ট করা হয়ত সহজ হবে কিংবা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে হয়ত তারা ধর্মঘট চালাতে পারবে না কিন্তু দেশের কি ইহাতে কোন উপকার হবে? সর্বদেশেই একদল লোক থাকেন যাঁরা হয় কালোবাজারে কিংবা দালালীর দ্বারা নানা উপায়ে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন তাঁরা সর্ব সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে শুভ-চক্ষে দেখতে পারেন না। প্রায়ই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা তোলেন।

ওঁদের ঘরের মিনু ছুটোর সময় মাত্র গোটা দুয়েক সন্দেশ, একগেলাস দুধ, কিছু স্যাণ্ডউইচ, কিছু চা খেয়েছিল, আর তারপর কিছু লজেন্স ও টফী চলেছে, কিন্তু স্কুল থেকে মিনুর বাড়ী ফিরতে ৪৫ মিনিট দেরী হয়ে গিয়েছে; কারণ বর্বর শ্রমিকরা মিছিল করে যাচ্ছিল। আর মিনুর বাবা তাঁর অফিসের ঠাণ্ডা ঘর থেকে এই রৌদ্রে বহু কষ্ট করে ক্যালকাটা ক্লাবের ঠাণ্ডাঘরে মিঃ ও মিসেস উইলসনের সঙ্গে আড়াই ঘণ্টার চায় কোর্সের লাঞ্চ ও বোতল কয়েক বিয়ার পিটিয়ে আফিসে ফিরেছিলেন, তাঁরও বোধ হয় ঘণ্টা খানিক বর্বরদের মিছিলের জন্য দেরী হয়েছিল। কেন তিনি

রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য নেবেন না এই সকল সামাজিক বিদ্রোহীদের শাসন করতে? না খেতে পাক লছমনের মেয়েটা, ছেলেটা আর তার বউ। কারণ আজ সাতদিন লছমনের কাজ নেই। ছাঁটাই পড়েছে। লছমনের মেয়ের খাবার ত মিস্থর বাবার কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। হাঁ! সরকার ও সমাজ, লছমনের মত নিকৃষ্টতম জীবদের রক্ষা করবার জন্ত নয়!

বিহারের মন্ত্রীসভার মুখ্য আর টাটার উপমুখ্য টাটার ধর্মঘট নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু তার উক্তির মধ্যে শ্রমিকদের কল্যাণের কথা বিশেষ কিছু বলেন নি; কেবল ভয়ের বশীভূত হয়ে শাসনের কথা বলেছেন। পরাজিত যদি শারীরিক শক্তিতে বিজিতের চেয়ে শক্তিশালী হয় তবে অন্তস্থানে পরাজিত হলেও পশু শক্তিতে বিজিতকে পরাজিত করে নিজেকে জয়ী বলে প্রমাণ করতে চায়। ধর্মঘটে ১৬লক্ষ টাকার ইস্পাত উৎপাদন নষ্ট হ'ল। শ্রমিকের আত্মপ্রত্যয় নিম্নমুখী হ'ল আর দলীয় স্বার্থের যূপকাষ্ঠে গণতান্ত্রিক নীতির বলিদান দেওয়া হল। কিন্তু কে এই ধর্মঘটের জন্ত দায়ী? এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন কারণ বিহার কংগ্রেসের দলাদলি থেকে আরম্ভ করে মাইকেল জনের স্বেচ্ছাচারিতা ও লোকপ্রিয়তার অভাব ইহার জন্ত দায়ী। জন বিহারী না হওয়ায় বিহারের অনেক কংগ্রেস নেতা তাঁকে অতীতে সহ্য করতে পারেন নি ও কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ইহাতে কমিউনিষ্টদের সুবিধাই হ'ল। ১৯৪৬ সালে জন টাটা কোম্পানীর সঙ্গে একটা চুক্তি করেন—যে চুক্তিতে ঠিক হয় যে কোম্পানীর উৎপাদন প্রসারের কাজ শেষ হলেই বেতন প্রভৃতি বাড়ানর ব্যবস্থা করা হবে। এই চুক্তিতে অনেক প্রকার স্বার্থবোধক ভাষা ও ভাবের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। টাটারা কি ছাঁটায়ের কথা ভাবছিলেন না?

এই মার্কিন চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল জন সাহেবের অতিমাত্রায় আমেরী চাল ও আত্মম্ভরিতা। কর্মক্ষেত্রের প্রসারতা ও আমেরী জীবন জন সাহেবকে শ্রমিকদের থেকে দূরে নিয়ে গেল। তাদের ঘরের মত জন সাহেবের শক্তির পিরামিড ভেঙ্গে পড়তে সময় নিল না। তিনি যে শ্রমিকের দলপতি তা আর বোঝা যায় না। গত বৎসরের নির্বাচন বুঝিয়ে দিয়েছে জন সাহেবের লোক প্রিয়তার দৌড় কতদূর। তাঁর দলে ভাঙ্গন ধরল। তাঁর সঙ্গে তাঁর দলের অন্যান্য শ্রমিকনেতার সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু তাতে কি আসে যায়! তিনি যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতায় আসীন থাকলেন। এখন তাঁর দলের লোকেরা চাঁদা দেয় না, সভায় আসে না, অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগ দেয় যোঝাপড়ার জন্ত। নেতৃত্বের সঙ্গে সংস্থার আর আন্দোলনের সঙ্গে নেতার আর কোন সম্পর্ক রইল না। নেতৃত্ব আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী; আর জনশক্তি নেতৃত্বের অবলম্বন হারিয়ে ফেলেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রয়োজন সার্বজনীন স্বার্থ-পদদলিত হল—সর্বজনের আশা আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি আর নেতৃত্বের ক্ষীণকণ্ঠে শোনা যায় না। সংঘাতের আলো-আধারের সন্ধিক্ষণে দলীয় স্বার্থ নির্মম পৈশাচিক উল্লাসে শ্রমিক কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ করল।

ধ্বনি উঠল ইস্পাত চাই, আরও ইস্পাত পরিকল্পনার জন্ত। ইস্পাত চাই সমাজ বিপ্লবের ইস্পাত কাঠামোর জন্ত। কিন্তু এ সমাজ কার তা আগে ঠিক করা হ'ল না কেন? নথীতে যা লেখা হয় তা কাজে করা হয় না কেন? মধ্যযুগের দেশ গঠন অর্থে আজও কি সাধারণ মানুষকে অন্ধ ক্রীতদাসের কাজ করে যেতে হবে? তাকে চোরাকারবারী, বিবেকহীন নেতা ও হৃদয়হীন সরকারী কর্মচারীর পীড়ন সহ্য করতে হবে? আর তার সঙ্গে আকণ্ঠ দেনা, ক্রমবর্ধমান

মূল্য বৃদ্ধি, বৃহৎ করভার বইতে হবে? সমাজের কোন কল্যাণ তারও কল্যাণ, তা কি থাকে খোয়ান যাবে? এই কি গান্ধীজীর স্বপ্নের স্বরাজ ভারত!

যাই হ'ক জনসাহেব ত কেদার দাসের কাছে সুবিধা করতে পারলে না। কিন্তু তা বলে ত জন সাম্যবাদীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন না; আর টাটা কোম্পানীই বা কিভাবে জনকে ছাড়েন। ও রকম নীরমস্তিষ্ক 'অবিডিয়েন্ট বয়' আর কোথায় পাওয়া যাবে? আর সরকারই বা এ রকম ব্যাপার হতে দেবেন কি রকম করে। এত আর পি,এস,পি, নয়। একেবারে খোদ ক্রুশ্চেভের চেলাদের হাতে যাওয়া। মার্কিন গুণ দাতারা কিছুতেই ইহা সহ্য করবে না।

শ্রমিকরা যদি নেতা বদলাতে বদ্ধ করেই থাকেন তা'বলে দেশের কল্যাণ ত ডুবিয়ে দেওয়া যায় না। হ'লই বা গণতন্ত্র তা'বলে সর্বক্ষেত্রেই কি গণতন্ত্রের মহিমা রাখা যায়। সমরে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে গণতন্ত্রকে হত্যা করা দরকার। সুতরাং সাম্যবাদীদের অগ্রগতিকে বাধা দিতেই হবে। আইনসাফিক হলে ভালই হ'ত কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তবে অন্তপন্থায় তা করা হ'ল। সত্যকথা বলতে গেলে পন্থাটি সমাজ কল্যাণ বিরোধী। ইহাতে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা হ'ল না, স্বেচ্ছাচারিতার পথ খোলা হ'ল, এর বিচার ইতিহাস করবে।

তিন হাজারী দল বার হাজারীকে হারিয়ে দিল। অন্ত রাজনৈতিকদল আমলাতন্ত্রকে ভগবানের প্রেরিত দূত বলে গ্রহণ করেন, যেমন করে ফ্রান্সের সোস্যালিষ্টরা গু-গলকে নিয়েছে। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে তোষণ করতে শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করতে বাদল না। সমাজের উন্নতির নামে সমাজের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি স্বার্থ কেন্দ্রীয় শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখা হল। আশাতেজে উদ্দীপ্ত শ্রমজীবীদের সমাজগঠনের স্বাভাবিক গতি থেকে বিচ্যুত করা হ'ল। কে ইহার জন্ত দায়ী? নিশ্চয়ই শ্রমিক নয়। বিবেচনাহীন আমলাতন্ত্রস্বার্থপরায়ণ মন্ত্রীরা, ক্ষুদ্রমনা শ্রমিকনেতারা। ইহারাই কি আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধার? ভগবান ইহাদের রক্ষা করুন!

আর্থিক দিগ্‌দর্শন

তথ্যসেবী

বিদেশী মুদ্রা সঙ্কট

আমাদের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ৩১। জুনের সাংবাদিক সম্মেলনে বর্তমান বিদেশী মুদ্রা সঙ্কটকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। সামান্ত দু এক কথায় ইহার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই সম্মেলনে আত্মবিশ্লেষণে অনেক কথার অবতারণা করেছেন! তাঁর অভিমত প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিত তিনি অবশ্যই নিজে ঠিক করে নেবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না! প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখবার চেষ্টা করলেও তা রাখা যায় না; কারণ ইতিমধ্যে দিল্লীর অর্থমন্ত্রীর দপ্তর এবিষয়ে অনেকবার বিপদের সঙ্কেত দিয়েছেন।

প্রকৃত অবস্থার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ইহা শুধু শোচনীয় নয়, অতি বিপজ্জনক। মুদ্রা সঙ্কট যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা ৪৫০০ কোটি না ৩৮০০ কোটি টাকায় হবে সেটাই সব নয়—এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আমরা যে শিল্পোন্নতি সাধন করেছি তাকে বাঁচিয়ে রাখব কি করে? আর নূতন শিল্প ও কৃষি প্রসারের যে গোড়াপত্তন করেছি তাকি সব নষ্ট হয়ে যাবে? আন্তর্জাতিক লেনদেনে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি যে অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা সকল শিল্প সংস্থা ও কৃষি-কার্যকে অতলজলে ডুবিয়ে দিচ্ছে; উদ্ধারের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা কিম্বা উপায় নির্ধারণের ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে না।

মুদ্রার ঘাটতি এত বেশী যে এমন কি বিশেষ প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপাদানও আমরা আমদানি করতে পারছি না। বহুমুখী শিল্পের যে গোড়াপত্তন স্বাধীন ভারতে হয়েছে তা আবার শীর্ণ ও বিধ্বস্ত হতে চলেছে। আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এর কোন উপায়ই করতে পারছে না। চাষের সার বা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে একান্ত প্রয়োজন, তাও অল্প বৎসরের তুলনায় আমদানি অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। আমলাতান্ত্রিক অবিবেচনার জন্য সারের কল বসাবার ব্যবস্থা করতে পারা যায় নি। কারিগরী শিল্প সংস্থাগুলি কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন করতে পারছে না। কাঁচামাল না পাওয়ায় পুরা উৎপাদনের অনেক নীচে বর্তমান উৎপাদনের হার রাখা হয়েছে। অর্ডারের অভাব নেই। কিন্তু ইস্পাত নেই, সাহায্যকারী অংশ নেই। সাইকেল শিল্পের সাজ-সরঞ্জাম বা ভারতে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজন মত তৈরী হয় না তা আনবার লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না। Pack value ৭৷০ টাকা থেকে ৫৲ টাকায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে সকল অংশ বিদেশী ইস্পাত ছাড়া তৈরী করা যায় না সেগুলো ইস্পাতের অভাবে তৈরী হচ্ছে না। ফলে শ্রমিক বিতাড়ণ আরম্ভ হয়েছে। বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেল আর অপচয়মূলক মূলধন গঠনের জন্য উৎপাদন মূল্য ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলল। এতে ঘরের আর বাইরের দুই বাজারই নষ্ট হতে চলেছে।

অবস্থা এমন শোচনীয় যে শিল্পখাদ্যের নামে গুদাম-পচা মাল দ্বিগুণ দরে বিক্রী হচ্ছে। ঘড়ির আমদানি ও ব্যবসা চোরাকারবারীদের হাতে চলে গিয়েছে আর সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ব্যবসা সূত্রে ব্যবসা না চলায় বহুলোক চাকুরী হারিয়েছে।

জমান ষ্টার্লিং আর কদিন?

১৯৪৮ সালের ১৬ই মে-তে আমাদের গচ্ছিত ষ্টার্লিং এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৫২'৫১ কোটি টাকাতে। এর থেকে ব্যবসার লেনদেন করবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছে ৪২'৮৪ কোটি; বাকী ২০৯'১৮ কোটি টাকা নোটের সমর্থনে রাখা হয়েছিল। এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে নোট সমর্থনে গচ্ছিত ষ্টার্লিং সর্ব নিম্ন সীমানার নিচে নেমে গিয়েছে। সরকার আইনের শক্তির উপর দাঁড়িয়ে সীমানার প্রয়োজন লঙ্ঘন করছেন। গত বৎসর এই সময়ে ষ্টার্লিং ব্যালান্সে ৪৭৭'৫৯ কোটি টাকা ছিল। গত বৎসরে যেখানে সপ্তাহে গড়ে ৪'৩ কোটি টাকা করে গচ্ছিত ষ্টার্লিং খোয়া গিয়েছে সেখানে এই বৎসরের জুন পর্যন্ত গড়ে সপ্তাহে ৬ কোটি টাকা করে খোয়া গেল। আর জুন থেকে আরও বেড়ে আশা করা যাচ্ছে ৯ কোটি টাকায় গিয়ে উঠবে। অনেকে মনে করেন জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫০ কোটি ষ্টার্লিং খোয়া যাবে।

বিদেশী মুদ্রা সঙ্কট থেকে তিনপ্রকার উপায়ে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সোজা উপায় আমদানি কমিয়ে

কিম্বা বন্ধ রেখে। মুস্কিল হচ্ছে যে জাতীয় অর্থনীতি এমন এক আন্তর্জাতিক লেনদেনের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে যে বহুপ্রকারের ও বহুমূল্যের সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি না করলে শিল্প ও সমাজ অচল পথে এগিয়ে যায়। শিক্ষা, শিল্প, কৃষিকর্ম সম্ভাব্য সমস্তই অর্থ-নৈতিক শক্তির সহজ ও দ্রুত গতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং শক্তির অভাব যখন হয় সমাজ ও অর্থনীতির বহু ধারা অসুস্থ ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আজ আমদানি এত কমান হয়েছে যে তাহাতে ঊর্ধগামী অর্থনৈতিক শক্তির প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

রপ্তানি বাড়ান যে কি ভয়ানক শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। কাঁচামালের দাম পড়ে গিয়েছে সুতরাং বেশী রপ্তানি করে কম টাকা পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তার লেনদেনের উপর নির্ভর করে। আমরা বৃটেন থেকে মাল কম আমদানি করছি আর বৃটেনও আমাদের থেকে ২৩ মিলিয়ন পাউণ্ড কম জিনিষ নিয়েছে। বিদেশী ঋণ যা পাওয়া যাচ্ছে তা বিশেষ কোন পরিকল্পনার জন্য। এতে সাধারণ বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণ করে না। ৭৫ মিলিয়ন ডলারের "off shore ঋণ আমরা আজও আমেরিকার কাছ থেকে নেইনি কিন্তু তাতে মাত্র ৩৪ কোটি টাকা আমরা পাব। ইহাতে কি আমরা হালে পানি পাবো?

সাবান, রং ও প্ল্যাষ্টিক শিল্পের উন্নয়ন পর্ষৎ

শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনানুসারে ইহা এই ধরণের তের নম্বরের কাউন্সিল। টাটার শ্রীনারওল আশা এই কাউন্সিলের সভাপতি হয়েছেন। ইহাতে ২১ জন সদস্য আছে। ইহা উপরোক্ত শিল্পগুলির প্রগতির প্রতি নজর রাখবে, উৎপাদন হার ও মানির উন্নতি করবে ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করবে। কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রী শ্রীমানুভাই সাহা অনুরোধ করেছেন যে এই শিল্পে যে তৈল ব্যবহার হবে তা যেন ভোক্ষ্যনীয় তৈল না হয়। এখনও এই শিল্পের জন্য বিদেশ থেকে এক কোটি টাকার মত কাঁচা মাল আমদানি করতে হয়। তাঁর মতে অনেক দেশীয় সামগ্রী এই শিল্পে ব্যবহার করা যায়। তিনি আরও রজক ও সিনথেটিক রেসিনের ভিত্তিতে নাইট্রো সেলুলোস বার্ণিস তৈরী করতে উপদেশ দিয়েছেন।

কাগজ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি

সকল দেশেই কাগজ শিল্প সমাজের বিশেষ স্থান অধিকার করে। বিক্রয় দ্রব্যের মোড়ক প্রভৃতি ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়াও মানসিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য ইহার চাহিদা কম নয়। রাশিয়াকে বস্তুতন্ত্রের কঠোর আরাধনার ৩০ বৎসর পরেও স্বীকার করতে হচ্ছে যে 'Man can not live by bread alone' কয়েক বৎসরে ভারতীয় কাগজ শিল্প দ্রুত এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছবার জন্য শিল্পসংস্থাগুলি সর্বপ্রকার চেষ্টা করছে। গত সাত বৎসরে এই শিল্পের উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়েছে। ২ লক্ষ টনের উপর উৎপাদন হয়েছে। এই কয়েক বৎসরে কাঁচামালের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এই শিল্পসংস্থাগুলো যতদূর সম্ভব বিক্রয় মূল্য নিম্নগামী করে রেখেছে। কিন্তু শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন বিক্রয় মূল্য বাড়াতে হবে। শিল্পপতিরা এ বিষয়ে সরকারকে অবগত করেছেন।

শিল্প উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি

গেষ্টকিন উইলিয়ামের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ উইলিয়ামস অংশীদারদের বাৎসরিক সভায়

বলেছেন যে উৎপাদনীয় উপাদানের শুধু মূল্য বাড়ছে তা নয় যোগাড় করাও মুস্কিল হয়ে পড়েছে। এতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অনেক শিল্পের বিক্রয় সুবিধার অভাব না থাকা সত্ত্বেও মাল তৈরী করবার সুবিধা নেই—উপাদান পাওয়া যাচ্ছে না। উপাদান অভাবে ওভারহেড খরচা অনেক অংশে বেড়ে গিয়েছে।

কাপড় রপ্তানী

যতদূর বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় এই বৎসরে ও আমরা বিদেশী বাজারে কাপড় বিক্রয়ে সুবিধা করতে পারব না। এ বৎসরের প্রথম চার মাসে আমরা মাত্র ২০২ মিলিয়ন গজ কাপড় বিক্রয় করেছি। গত বৎসর এক মাসে ৩২১ মিলিয়ন গজ বিক্রয় হয়েছিল। যদি এই গতিতে কাপড় রপ্তানী চলে তবে গোটা বৎসরে আমরা ৬২০ মিলিয়ন গজ কাপড় বিক্রয় করব। গত বৎসরে ৮৫০ মিলিয়ন গজ বিক্রয় হয়েছিল।

চীন তার নূতন শক্তি নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এসিয়াতে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, রাশিয়া ও ইউরোপীয় দেশগুলো দক্ষিণ পশ্চিম দেশগুলোতে প্রতিযোগিতা করছে। আমেরিকা ও কানাডার বাজার দুর্বল হয়ে পড়ায় জাপান প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর নজর দিয়েছে। সুদানের বাজার ঠিক রাখতে পারা যাবে কিনা বলা কঠিন। অন্যান্য মধ্য প্রাচ্য দেশের বাজারে কাপড়ের ব্যবসার অবস্থা বিশেষ অনুকূল নয়। তবুও রপ্তানি আমাদের বাড়াতে হবে। সরকার ও শিল্পপতিরা এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা করছেন তা জানবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি

পেট্রোলের মূল্য হ্রাস

পেট্রোলের মূল্য হ্রাসের ব্যাপার নিয়ে তিনটি পেট্রোল কোম্পানীর সঙ্গে সরকারের বহুদিন থেকে আলাপ আলোচনা চলছিল। এতদিন পর তিনটি কোম্পানী সাময়িকভাবে মূল্য হ্রাস করতে রাজি হয়েছে। ইহাতে মাসে ৮০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় সংকোচ হ'ল। আলাপ আলোচনায় সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছিল তৈল কোম্পানীর উদারতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার উপর। আমরা জেনে বিশেষ সুখী হলাম যে বার্মাশল কোম্পানী একাই ৬০ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা ব্যয় সংকোচ করল।

১৯৫৮ সালে থেকে পেট্রোল বিক্রয় মূল্যের হার ঐ সালের সরকারের সঙ্গে কোম্পানীর চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার পেট্রোল কোম্পানীদের জানায় যে সমস্ত দিক বর্তমান মাপ কাঠিতে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ঐ বিক্রয় মূল্য অনেক চড়া-দরে নির্ধারিত হয়েছে। আর আমেরিকার ও অন্যান্য দেশে পেট্রোলের দাম বর্তমানে অনেক কমে গিয়েছে। সাময়িকভাবে মূল্য হ্রাস করে ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করবার জন্য উৎপাদন প্রভৃতি বিবেচনা করা হচ্ছে। মূল্য হ্রাসে তৈল ব্যবহারে কারা কতটা সুবিধা পাবেন তা এখনও জানা যায় নি। আমরা বৎসরে ৯০ কোটি টাকার মত পেট্রোল আমদানি করি। মূল্য-হ্রাসে ১০ কোটি টাকা বাঁচাতে পারছি।

———

পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ ও গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা

শ্রীপরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা যে "পশ্চিমবঙ্গ" আমরা পেয়েছি তা তিনটি বিচ্ছিন্ন অংশের সমাবেশ। উত্তরে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আর কুচবিহার নিয়ে এক অংশ, মাঝে পশ্চিম দিনাজপুর আর মালদা নিয়ে এক অংশ, আর দক্ষিণে পশ্চিম বাংলার দশটি জেলা নিয়ে তৃতীয় অংশ। এই তিন অংশের ভিতরে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন অভাব রয়েছে যে মনে হয় যেন এরা তিন ভিন্ন রাজ্যের অংশ। এর পরিণতি হয়েছে এই যে কলিকাতা থেকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার কিংবা আসামে যেতে হলে কলিকাতা থেকে ট্রেনে শকরিগলিঘাট, সেখান থেকে ফেরীতে মনিহারীঘাটে এবং আসাম লিঙ্কে বিহারের ভিতর দিয়ে তবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো যাবে। এতে ভাড়া তো বেশী লাগেই, তাছাড়া সময় লাগে প্রায় তিন দিন, আর মাল পাঠাতে হলে তো কথাই নেই! লালগোলা ঘাটের পথ বন্ধ হবার পর থেকেও অঞ্চলে যাতায়াত এক মহা ঝকমারির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অথচ কি শাসন শৃঙ্খলার দিক থেকে - কি অর্থনীতির দিক থেকে—পশ্চিম বাংলার এই শোচনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কতখানি প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। প্রতিদিন চওড়া লাইনের মালগাড়ীর (wagon) প্রায় ২০৯ গাড়ী মাল কলিকাতা এবং উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা-বাগান এবং তৈল খনি অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করে। কলিকাতা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে যায় সিমেণ্ট, লৌহ ও ইস্পাত এবং কয়লা আর আসাম ও উত্তরবঙ্গ থেকে আসে চা, পাট এবং নিজ তেল। শকরিগলিঘাট ও মনিহারীঘাটে গঙ্গা পেরোবার জন্যে মাল চলাচলের যে কি দারুণ অসুবিধে হয় সেটা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। অনেক ক্ষেত্রে মালের জন্যে বেশী ভাড়া দিতে হয়; তাতে পড়তা বেশী পড়ে।

স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষার দিক থেকেও উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব অসীম। এই দিক থেকে পশ্চিম বাংলার যোগাযোগ সমস্যা কেবল পশ্চিম বাংলারই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারত তথা সমগ্র ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা। অখণ্ড ভারত থেকে প্রথমে ব্রহ্মদেশ এবং তারপর পূর্ববঙ্গের বিচ্ছুতির ফলে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের সামরিক গুরুত্ব অভাবনীয় রকম বেড়ে গেছে; এবং তার ফলে এ অঞ্চলের সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে অপরিহার্য; আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ গড়ে তোলবার যে প্রচেষ্টা কিছুদিন থেকে চলছে তার ভিতরেও রয়েছে এই বিশেষ অবস্থারই স্বীকৃতির স্বাক্ষর।

সরকারী প্রচেষ্টা—উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের এই যোগাযোগ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে সচেতন করবার চেষ্টা করেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ পরিষদ (Central Transport Board) এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানে লিপ্ত হন। এই অনুসন্ধান কার্যের অর্থেক ব্যয়ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করেছিলেন, উক্ত পরিষদ নির্দেশ দিয়েছিলেন গঙ্গার উপর এক সেতু নির্মাণের। পরবর্তীকালে ভারতের পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পর্কে পুণাতে যে অধিবেশন হয় তাতেও উক্ত পরিষদের সুপারিশকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, কিন্তু গঙ্গার উপরকার এই সেতু ঠিক কোথায়

(শেষাংশ ২৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অনুন্নত অর্থনীতি ও জনসংখ্যা তত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্রেয়, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউট

মোটামুটি ৮টি লক্ষণের সাহায্যে আমরা অনুন্নত অর্থনীতিকে জানতে পারি। তা হ'ল,

(১) মাথা-পিছু স্বল্প জাতীয় আয় ও অন্যান্য নিম্ন জীবন-মান
(২) মাথা পিছু ও এলাকা পিছু মূলধনের স্বল্প উৎপাদন হার
(৩) জনসংখ্যার অনুপাতে অধিক অব্যবহৃত অর্থনৈতিক সম্পদ
(৪) প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা
(৫) স্বল্প সংখ্যক সংগঠক (Entreprenner)
(৬) অমুদ্রাগত বিনিময় ব্যবস্থার ব্যাপকতা (monetised sector)

অনুন্নত অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করলে সাধারণভাবে উপরে উল্লিখিত ৬টি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। অধ্যাপক ডাইনার Potential of unused resources এর উপর জোর দিয়ে অনুন্নত অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "a country which has good, potential prospects for using more capital or more labour or more available natural resources, or of all these, to support its present population on a higher level of living or if its per capita income level is already fairly high to support a larger population on a not lower level of living. This definition puts primary emphasis where I would think it properly belongs, on per capita levels of living, on the issue of poverty although it leaves room for secondary emphasis on quality of population ·····**The basic criterion then becomes whether one country has good potential prospects of raising per capita income for an increased population.**"

এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে। তা হ'ল, দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম ও উন্নয়ন সম্পর্কে জনসাধারণের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সহযোগিতা। এটা অবিমিশ্র মনস্তাত্ত্বিক, তবে এর সাথে অর্থনৈতিক পরিবেশ ও তার বিভিন্ন পর্যায়ের যোগাযোগ খুব সুস্পষ্ট। আমাদের দেশের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার এটা অন্যতম দিক—তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক।

একথা আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য জনসাধারণ। উৎপাদনের দিক দিয়ে, ভোগের দিক দিয়ে এবং বণ্টনের দিক দিয়ে—যে দিক দিয়েই বিচার করুন, লক্ষ্য এক—তা হ'ল, জনসাধারণ ও জন-মঙ্গল। কাজেই জন-সংখ্যার তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার।

জন-সংখ্যা তত্ত্বের (Demography) দিক দিয়ে উন্নত ও অনুন্নত অর্থনীতির মধ্যে লাইন টানা চলে। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য ধীর গতিতে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি আর দ্বিতীয়টির দ্রুত গতিতে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি। প্রথম পক্ষকে আমরা সাধারণতঃ ব'লে থাকি, পশ্চিমী দেশ যেমন, পশ্চিম ও মধ্য য়ুরোপীয় দেশগুলি, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া, গ্রেটব্রটেন প্রভৃতি। আর দ্রুত জন-সংখ্যা বৃদ্ধির অঞ্চল বলতে সাধারণতঃ রুষি, ভারত, পাকিস্তান, মধ্যপূর্ব ও দঃ পূঃ এশিয়া এবং লাটিন আমেরিকা। এই পৃথকীকরণ খুব ব্যাপকভিত্তিক হ'ল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী যদি অঞ্চলগুলি বিভাগ করতে হয় তবে তিন শ্রেণীতে ভাগ

করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ জন্মহার যে সমস্ত দেশে বছরে শতকরা ২৫% এর কম; দ্বিতীয়তঃ যেখানে জন্মহার ২৫% থেকে ৩৫% এর মধ্যে অর্থাৎ জন্মহার ক্রমবৃদ্ধির দিকে আর তৃতীয়তঃ সেই সব দেশ যেখানে জন্মহার খুব বেশী অর্থাৎ শতকরা ৩৫% এর উপর। অধিকাংশ অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। আর প্রথম শ্রেণীতে পড়ে উন্নত দেশগুলি—এখানে যেমন জন্মহার হ্রাসগতি (উন্নত অর্থনীতির দরুণ প্রচুর recreation ব্যবস্থা ও ব্যাপক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এর মূলে, তেমনি উন্নত ধরণের সমাজ কল্যাণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য মৃত্যু হারও হ্রাসগতি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী যে ৩টি গোষ্ঠির উল্লেখ করা গেল, তার সাথে জাতীয় আয়ের পরিমাণের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে—তার হিসাব নেওয়ার চেষ্টার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মহলেই হয়েছে। The National Advisory Council on I. M. F. and Financial Problems ১৯৪৭ সালে ৫৩টি দেশের (পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ৮৫% ভাগ) ১৯৩৯ সালের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে একটা হিসাব করেছিলেন –তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দিলাম।

মাথাপিছু আয় অনুযায়ী জন-সংখ্যা ভিত্তিক দেশ-গোষ্ঠি, ১৯৩৯

	আয় স্তর		
জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির ভিত্তিতে দেশ-গোষ্ঠি	উচ্চ (২০০ ডলারের উপর ১৪টি দেশ)	মধ্য (১০১-২০০ ডলার ১০টি দেশ)	নিম্ন (১০০ ডলার ও সব নীচে ২৮টি দেশ)
১। স্বল্প-বৃদ্ধি	১৪	৫	—
২। মাঝারি বৃদ্ধি	১	৫	২
৩। দ্রুত বৃদ্ধি	—	—	২৬

নিম্ন আয়ের ২টি দেশের দুটি দেশ ছাড়া আর সব কয়টি দ্রুত জনবৃদ্ধির দেশভুক্ত। ঐ দুইটি দেশ ও আবার য়ুরোপের একটি পোল্যাণ্ড, অপরটি যুগোশ্লাভিয়া। আর মধ্যবর্তী আয়ের ১০টি দেশের ৫টি স্বল্প-হার বৃদ্ধি এবং আর ৫টি ক্রমবৃদ্ধিসম্পন্ন গোষ্ঠীভুক্ত। আর উচ্চ-আয়ের ১৪টি দেশের ১৩টিই স্বল্প-হারে জন-বৃদ্ধির দেশ গোষ্ঠীভুক্ত এবং বাকী একটি দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত। আবার অন্যভাবেও ব্যাপারটা দেখা চলে অর্থাৎ আয়ুষ্কাল, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মাপকাঠিতেও জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির বিষয়টির বিচার করা চলে।

জন-সংখ্যা-বৃদ্ধি-ভিত্তিক-দেশগোষ্ঠির মাথাপিছু আয় অনুযায়ী (১৯৩৯ এর হিসাব)

	আয় অনুযায়ী		
	(২০০ ডলার)	(১০০-২০০ ডলার)	(১০০ ডলার নীচে)
১। আয়ুষ্কাল	৬৩	৪২	৪০
২। যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুহার, ১৯৩৯	৬৪	১৪৩	৩৩১
৩। নিরক্ষরের শতকরা হার (১০ বৎসর বয়স ও তার উর্ধে)	৫	২০	৭৮

উপরের হিসাব থেকে দেখা গেল অধিক আয়ের সাথে জীবনের দৈর্ঘ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আবার আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরক্ষরতার হারও হ্রাস পায়। একথা সহজেই বুঝি গতিহীন স্থূল অর্থনীতিতে জন-সংখ্যার অবাধ বৃদ্ধির ফলে সেই দেশের মাথাপিছু আয় অবশ্যই হ্রাস পাবে। আবার একথাও সত্যি, শিল্পায়নের ফলে আয় বৃদ্ধি ও শিক্ষার বিস্তার জন্মহারের পক্ষে নেতি-বাচক প্রভাব।

মাথা পিছু আয় (১৯২৫-৩৪ এর ডলারের হিসাবে) এবং জন্মহার (১৩৪-৩৯) হাজার প্রতি

	আয়		জন্মহার	প্রবণতা
	১৯২৫-৩৪	১৯৪৮		
আমেরিকা	৫২৫	৯৯২	১৭·১	১৩·৭
যুক্তরাজ্য	৪২৫	৬৪২	১৫·০	১৬·৭
কানাডা	৪২১	৭৮৭	২০·২	১৩·৮
ফ্রান্স	২৮৭	৪৩৪	১৪·৯	২০·৮
জার্মানী	২৯০	৪৩৮	১৯·	২০·৭
চেকোস্লোভিকিয়া	২১৪	৩২৩	১৭·৯	২৩·০
গ্রীস	১৮০	২৭২	২৮·৩	২৪·০
জাপান	১৫৯	২৪০	২৩·৭	২৪·৭
পোল্যাণ্ড	১৬৫	২৪৯	২৫·৪	২৪·৫
রাশিয়া	১৫২	২২৯	৪৪·২	২৪·৮
বুলগারিয়া	১১৯	১৮০	২৪·২	২৫·৯
ভারত	৯০	১৩৬	৩৪·৭	২৬·৮

সূত্র : S. Rauseubush-People, Food and Machine.

আবার মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সাথে জন্মহারের সম্পর্ক নিচের তালিকা থেকে ধারণা করা চলে—

আয় বৃদ্ধি	জন্মহার
মাথা পিছু আয় (১৯২৫-৩৪ সালের ডলার অনুযায়ী	জন্মহারের গতি হাজার প্রতি
৫২৫	১৫·৩৭
৪০০	১৫·৫৬
৩৭৫	১৬·২০
৩৫০	১৬·৮৪
৩২৫	১৭·৪৭
৩০০	১৮·১১
৩০০	২০·৬৬
২৫০	২১·২৪
২০০	২৩·২১
১৫০	২৪·৪৯
১০০	২৫·৭৬

সূত্র : S. Rauseubush-People, Food and Machine.

Demographic Book (1952) এ ২১টি দেশের একটা হিসাব নেওয়া হয়েছিল। দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কৃষিতে নিযুক্ত পুরুষের সংখ্যানুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

(ক) ৬০% অথবা তার উর্দ্ধে (খ) ৩৫% থেকে ৫৯% (গ) ৩৫% এর কম শহর নগর এলাকার চেয়ে পল্লী এলাকায় সন্তান ধারণের বয়সের মেয়েদের সন্তানের সংখ্যা বেশী। ঐ বিশ্লেষণ থেকেই পাওয়া যায়। পল্লী ও নগর এলাকার "fertility ratios" ব্যাখ্যা ক'রে দেখা গিয়েছে, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এই অনুপাত নিম্নতম এবং কৃষি প্রধান দেশগুলিতে সেই অনুপাত সর্বোচ্চ।

এবার জন-সংখ্যাতত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখা যাক্। তা হ'ল বয়স হিসাবে জনসংখ্যার বিশ্লেষণ। যে সমস্ত হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ভারত, মিশর, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি অনুন্নত দেশগুলির শতকরা ৪০ভাগ লোকই প্রথম বয়স গোষ্ঠির (age group) ভুক্ত (অর্থাৎ ০—১৪ বৎসরের মধ্যে) এবং মোট সংখ্যার প্রায় ২।৩অংশ ৩০ বৎসরের নিচে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলির ছবি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে মোট জন সংখ্যার ২।৩ অংশই কর্মক্ষম বয়স গোষ্ঠিভুক্ত (active age group) অর্থাৎ ১৫-২৯, ৩০-৪৪, ৪৫-৫৯ বৎসরের মধ্যে। অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক দিয়ে এই বিশ্লেষণ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ ক'রে। তা হ'ল, উন্নত দেশগুলির অধিক সংখ্যক লোকই সক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মে সক্ষম; মোট ও মাথাপিছু উৎপাদনের দিক দিয়ে এর প্রভাব খুবই গভীর। একটু তলিয়ে দেখা যাক্, উন্নত দেশগুলিতে একজন উপার্জনকারী তার বালক-কালের লালন-পালন ও শিক্ষার সব খরচই (যা সমাজ তার জন্য বহন করেছিল) সে পরবর্তী কালে সেজন্য সমাজকে ফেরৎ দিতে পারে; কেননা, যত বয়স অবধি মানুষ কর্মক্ষম থাকে এবং তার শ্রম দিয়ে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সাহায্য করতে পারে সেই বয়স অবধি এই সব দেশের মানুষ সহজেই জীবিত থাকে।

আমাদের দেশের মত অনুন্নত দেশগুলি কিন্তু সেই দিক থেকেই জিজ্ঞাস্য। কেননা সমাজ এই সব দেশের মানুষের কর্ম ক্ষম হবার বয়সের পূর্ব পর্যন্ত তাদের লালন-পালন শিক্ষার জন্য যে ব্যয় বহন করল তা আর পূরণ হ'ল না, কারণ এই জন-সংখ্যার অধিক সংখ্যকই কর্মক্ষম বয়সেই পৌছতে পারে না। যুদ্ধ পূর্ব ভারতবর্ষে দেখা গেছে ১০০জন শিশুর মধ্যে ৪৩জন শিশুর মাত্র পনের বছর পর্যন্ত আয়ু, আর ১০০জনের মধ্যে মাত্র ১৫জন কোন রকমে ৬০ বৎসর অবধি ঠিক থাকতে পারে। এ থেকে capital wastageএর পরিমাণ এবং অর্থনীতির উপর তার প্রতিক্রিয়া আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। আমেরিকায় জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা-তত্ত্ব থেকে জানা যায় সেখানে ১০০জনের মধ্যে ৯২জনের ১৫বছর আয়ু এবং এদের মধ্যে আবার ৭০জন ৬০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। অর্থাৎ সমাজ এদের ৪০।৪৫ বৎসরের কর্ম-ক্ষমতার ফলভোগ ক'রে।

সহর ও পল্লী এলাকায় জন-সংখ্যার বণ্টন—অর্থনৈতিক সংগঠন ও উন্নয়নে সহর ও পল্লী এলাকার মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। পল্লীবাসীর ভোগ প্রকৃতি সহর এলাকার ভোগ প্রকৃতি (Consumption Pattern) থেকে অনেকখানি আলাদা। উন্নত দেশের অর্থনীতিতে অবশ্য এ পার্থক্য নগণ্য; কেননা, সহজ যানবাহন, শিক্ষার বিস্তার ও সর্বোপরি উন্নত অর্থনীতি এই প্রভেদ দূর করে দিয়েছে। কিন্তু অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে পল্লী ও সহর এলাকায় ভোগ প্রকৃতির বেলায় একথা খাটে না। এখানে সহরবাসী যে ভোগকে জীবন মানের পক্ষেও অপরিহার্য মনে করে, সেই ভোগের জন্য পল্লীবাসী তার আয়ের একটা সামান্য অংশ ব্যয় করে। এর দৃষ্টান্ত খুঁজে বেড়াতে হয় না।

সহরবাসী ও পল্লীবাসীর বিভাগের অনুপাতের পরিবর্তনের ফলাফল যোগ সাহেব অঙ্কের হিসাবে দেখিয়েছেন। একথা সকলেই জানি, সহরে ভোগের পরিমাণ পল্লীবাসীর চেয়ে বেশী সহরবাসীর তুলনায় পল্লীবাসীর অনুপাতকে ৩ ভাগে ভাগ করা যাক—প্রথম ক্ষেত্রে, পল্লীবাসী শতকরা ৮০ জন; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ জন এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ জন। পল্লীবাসীর ভোগের একক ১গ এবং সেক্ষেত্রে সহরবাসীর ভোগের একক ৩গ ধরে প্রথমক্ষেত্রে মোট ভোগ দাঁড়ায় ১৪০গ (৮০ + ৬০ [৩ × ২০]); দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১২০গ (৭০ + ৩০ × ৩গ) এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে ১৮০গ (৬০ + ৪০ × ৩) অর্থাৎ পল্লী ও নগর এলাকার ভোগ প্রকৃতি স্থায়ী ধরে নিলেও, সহরবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মোট ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কেননা, অনুন্নত অর্থনীতিতে সহরের প্রত্যেকটি বৃত্তির মাথাপিছু প্রকৃত আয় কৃষিকাজের চেয়ে ঢের বেশী।

এখন ধরা যাক্, সহরের এলাকায় মাথাপিছু ভোগ খুব বৃদ্ধি পেল—অবশ্য পল্লী এলাকাতে এই মাথাপিছু ভোগের বৃদ্ধি নগণ্য না। আগের অঙ্কের হিসাবেই দেখা যাক—পল্লী অঞ্চলে এই বৃদ্ধির পরিমাণ। ধরা যাক—১·৫গ এবং সহর অঞ্চলে তাহ'ল, ৪গ। আবার তৃতীয় ধাপে এই বৃদ্ধি পল্লী অঞ্চলে ২গ এবং সহর অঞ্চলে ৫গ। যোগ সাহেবের তালিকানুযায়ী :—

পর্যায়	পল্লীবাসী % হিসাবে	একক প্রতি ভোগ	সহরবাসী % হিসাবে	একক প্রতি ভোগ	মোট ভোগের পরিমাণ
১	৮০	১গ	২০	৩গ	(৮০ + ৬০) ৪০গ
২	৭০	১·৫গ	৩০	৪গ	(১০৫ + ১২০) ২২৫গ
৩	৬০	২গ	৪০	৫গ	(১২০ + ২০০) ৩২০গ

উপরের এই হিসাব থেকে দেখা যায়, সহরের জনসংখ্যা বেড়েছে ২০% থেকে ৪০% ভাগ এবং সাথে সাথে পল্লী ও সহর অঞ্চলে যে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল তাতে মোট ভোগের পরিমাণ লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেল, যদিও তালিকানুযায়ী, ৩য় পর্যায় অবধি পল্লী এলাকাতেই অধিক জনসংখ্যারবাস। অবশ্য ইতিমধ্যে মোট জনসংখ্যার কোন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনি এটা ধরে নেওয়া হয়েছে। সহর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মোট ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আমাদের মত অনুন্নত দেশগুলিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু থাকা কালে ভোগের পরিমাণ ও সহর এলাকার জনবৃদ্ধির মধ্যেকার আনুপাতিক সম্পর্কের হিসাব আমাদের নিতে হ'বে।

একথা আমরা সকলেই স্বীকার করব, শিল্পের প্রসারের সাথে সহর গড়ে উঠার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সহর গ'ড়ে উঠার ইতিহাসকে শিল্প প্রসারের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পৃথক করে দেখা চলে না। নীচে উন্নত ও অনুন্নত অর্থনীতির দেশের দুটি তালিকা দেওয়া হ'ল। প্রথম তালিকা থেকে পাওয়া যায়, বড় বড় সহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবনতা; কেননা এই সব সহরের অধিকতর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সুযোগ পল্লী এলাকার মানুষকে আকৃষ্ট ক'রে।

'বর্তমান'
সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যামূলক শিক্ষণীয় পাক্ষিক পত্রিকা
প্রতি সংখ্যা—দুই আনা

(ক)

সহর এলাকায় শতকরা হিসাবে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি

(উন্নত অর্থনীতির দেশ)

ইংলণ্ড ও ওয়েলস	১৯০১	৭৭
	১৯২১	৭৯·৩
	১৯৪১	৮০·৭
কানাডা	১৯০১	৩৭·৫
	১৯২১	৪৯·৫
	১৯৪১	৫৭·৪
ফ্রান্স	১৯২১	৪৬·৪
	১৯৩৬	৫২·৪
	১৯৪৬	৫২·৯

সূত্র—Demographic Year Book, 1932, U.N.

(খ)

ভারত ও মিশর :

(অনুন্নত অর্থনীতির দেশ)

সহর	শতকরা	সহর	শতকরা
ভারত—১৯৩১		মিশর—১৯৩৭	
বোম্বাই	১৪·৪	কায়রো	৩৮·১
কানপুর	৪১·৪	আলেকজান্দ্রিয়া	৩১·৬
বরোদা সিটি	৩৮·২	সুয়েজ	৪৪·৫
হায়দরাবাদ ,,	৩০·৪		
আগ্রা ,,	২২·৪		
লক্ষ্ণৌ ,,	২৯·৬		
গড়ে	৩৭·৩		

সূত্র—Devisএর Population of Indian and Pakistan এবং Census of Egypt. 1937 (Bonneএর পুথি থেকে উদ্ধৃত)

উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হ'ল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুপাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই অনুপাতকে প্রভাবিত করতে হ'লে চলতি আয় সঞ্চয় করে অথবা অন্য সূত্র থেকে মূলধন (Productive Capital) সরবরাহ বৃদ্ধি করার নীতি পরিকল্পনায় অন্যতম পথ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

জীবিকার সংগঠনও আবার এই (সহর ও পল্লী) অঞ্চলিক বিভাগ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। একথাও সহজেই বোঝা যায়, সহর অঞ্চলের মানুষ সহরের বৃত্তি থেকে জীবিকা অর্জন ক'রে থাকে, যা অনুন্নত দেশে বস্তুগত ও মানসগত অভাব মেটাবার অনেক বেশী সুযোগ সৃষ্টি ক'রে দেয়। এদিক থেকে জীবিকার সংগঠন সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্বগত সঠিক বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থকতার দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক অনুন্নত দেশ আছে যেখানে যুগযুগান্তর ধরে একই ধরণের বৃত্তির পুনরাবৃত্তি চলে আসছে—না তার উন্নতি, না তার পরিবর্তন ঘটছে। অবশ্য তা সম্ভব হ'লে ঐ অর্থনীতিকে আজ আর অনুন্নত বলা চলত না। এসব দেশের অধিকাংশ মানুষই কৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বৃত্তিতে নিযুক্ত। ঘর-কুনো স্বভাবের (Lack of mobility) দরুণ, যা এই সব কৃষি অর্থনীতির দেশগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উন্নত ধরনের Specialisation ও শিল্পায়ন সম্ভব হচ্ছে না। আমার মতে এই দু'টো দিক পরস্পর নির্ভরশীল। শিল্পায়ন ও Specialiation ব্যাপক হ'লে, যোগাযোগ ব্যবস্থার ও বিভিন্ন বৃত্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে; ফলে, পল্লীর মানুষের ঘরকুনো স্বভাব দূর হ'তে বাধ্য; আর হচ্ছেও।

——

কপিরাইট রেজিষ্ট্রেশনে গ্রন্থকারের সুবিধা

শ্রী টি. এস. কৃষ্ণমূর্তি

১৯৫৭ সালের নূতন কপিরাইট আইনে স্বেচ্ছায় কপিরাইট রেজিষ্ট্রেশনের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা এই আইনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই নূতন আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের হিন্দী ভাষায় লিখিত 'আত্মকথা' শীর্ষক গ্রন্থখানি প্রথম রেজিষ্ট্রি করা হইয়াছে।

কপিরাইট অফিসে রক্ষিত রেজিষ্টারে এইসব রেজিষ্ট্রী লিপিবদ্ধ করা হয়। কপিরাইটের রেজিষ্টারে গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক ও কপিরাইট মালিকের নাম, ঠিকানা ও জাতি লিখিত থাকে। কোন পুস্তকের রচয়িতা বা উহার প্রকাশক বা কপিরাইটের মালিক বা কপিরাইটের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন লোক ঐ পুস্তকের যাবতীয় তথ্য রেজিষ্টারে লিখিয়া লইবার জন্য কপিরাইট রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিতে পারেন।

কপিরাইট আইনে গ্রন্থাবলীকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে :—

সাহিত্য, নাটক, শিল্প, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও রেকর্ড। এইসব বিষয়ের গ্রন্থাদি, এমন কি ১৯৫৮ সালের ২১শে জানুয়ারী নূতন আইন চালু হওয়ার পূর্বে যেসব গ্রন্থাদি সৃষ্টি হইয়াছিল সেগুলিও কপিরাইটের মধ্যে থাকিলে রেজিষ্ট্রীর জন্য পাঠান যাইতে পারে।

বার্ণ সম্মেলনে ভারত ও অন্যান্য অনেকগুলি দেশ যোগদান করিয়াছিল। গ্রন্থকার বার্ণ সম্মেলনে যোগদানকারী কোন দেশের অধিবাসী হইলে, তিনি ঐ সম্মেলনে গৃহীত নিয়মানুসারে তাঁহার অপ্রকাশিত বা প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ রচনার দেশ ছাড়াও অন্যান্য যোগদানকারী দেশ তাঁহার নিজ দেশের আখ্যানুসারে ভোগ্য অধিকারের ন্যায় সমান অধিকার এবং ঐ সম্মেলন কর্তৃক বিশেষভাবে মঞ্জুরীকৃত অধিকার ভোগ করিতে পাইবেন। এই সকল অধিকার ভোগ ও প্রয়োগের সময় কোন প্রকার আদবকায়দা মানিয়া চলিতে হইবে না।

কাজেই এই প্রশ্ন উঠে—ভারতীয় গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের পুস্তকাবলী রেজেষ্ট্রী করিলে কি কি সুবিধা হইবে। আইন অনুসারে ঐ রেজিষ্টার উহাতে লিখিত বিশদ তথ্যের মূল সাক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। রেজিষ্টারে লিখিত কোন গ্রন্থের কপি বা উহার অংশ বিশেষ রেজিষ্ট্রার অনুমোদন করিয়া তাহাতে কপিরাইট অফিসের মোহর বসাইলে তাহা অন্য কোন প্রমাণ বা মূল গ্রন্থ ব্যতিরেকে সকল আদালতে সাক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

কোন প্রকাশিত পুস্তকে যে বিশদ বিবরণ রহিয়াছে তাহা ছাড়া তাহার সত্যতা প্রমাণের অন্য বাহিরের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অপ্রকাশিত পুস্তকের কপিরাইটের মালিকানা প্রমাণ করা অসুবিধাজনক ব্যাপার। নূতন কপিরাইট আইন ও ঐ আইনানুসারে রচিত নিয়মাবলীর মধ্যে অপ্রকাশিত পুস্তকের কপিরাইটের রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অপ্রকাশিত পুস্তক—কোন অপ্রকাশিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি কোন প্রকাশক বা পত্রিকার নিকট দিলে, পুস্তকের বিষয়বস্তু চুরি হইয়া যাইতে পারে—লেখকের মনে এই আশঙ্কা থাকে। এই অবস্থায় লেখকগণ কোন প্রকাশক বা অন্য কাহারও নিকট তাঁহার অপ্রকাশিত পুস্তকের

কপি পাঠাইবার পূর্বে পাণ্ডুলিপির এক কপি নিজের নিকট রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠান। তাঁহার নিকট বইখানি ডাকযোগে আসিলে তাহা তিনি না খুলিয়া ডাকঘরের মোহরের ছাপসহ অবিকৃত অবস্থায় রাখিয়া দেন। কারণ, ঐ পুস্তকের কোন অংশ কেহ চুরি করিলে উহার সাহায্যে মামলা করা যাইতে পারে।

কপিরাইট রেজিষ্ট্রেশনের নূতন আইনে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে লেখকদের অসুবিধা কিছুটা বিদূরিত হইবে। যদি অপ্রকাশিত পুস্তকের লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তক রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করার সময় তাঁহারা উহার সহিত পাণ্ডুলিপির কপি বা পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠান এবং সেইসঙ্গে এই অনুরোধ করেন যে, পাণ্ডুলিপির বা উদ্ধৃতাংশ পাঠান হইল তাহা যেন রেজিষ্ট্রেশনের সার্টিফিকেটসহ ফেরৎ পাঠান হয়, তাহা হইলে কপিরাইট অফিস পাণ্ডুলিপির উপর তাঁহাদের মোহরের ছাপ বসাইয়া রেজিষ্ট্রেশনের সার্টিফিকেটসহ উহা আবেদনকারীর নিকট ফেরৎ পাঠাইবেন।

যদি আবেদনের সহিত পাণ্ডুলিপির বা উহার উদ্ধৃতাংশের একটা অতিরিক্ত কপি পাঠান হয়, তবে অতিরিক্ত কপিটি যতটা সম্ভব কপিরাইট অফিসে গুছাইয়া রাখা হইবে এবং তাহা গোপনীয় দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

দেখা গিয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে লেখকের নাম, ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে অসুবিধা হয়, বিশেষতঃ যখন মূল প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় গুটাইয়া থাকে, তখনও অসুবিধা হয়ই। এই সকল ক্ষেত্রে কোন লোক কোন উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি কাজে লাগাইতে সচেষ্ট হইলে, তাঁহার পক্ষে কপিরাইট মালিকের সন্ধান করিয়া তাঁহার অনুমতি লওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

কপিরাইট রেজিষ্টারের দ্বারা এই অসুবিধা দূর হইবে। কারণ যাঁহার হাতে লাইসেন্স মঞ্জুর করার ক্ষমতা থাকে, তাঁহার নাম ঠিকানা ঐ রেজিষ্টারে লিখিত থাকিবে।

কপিরাইটের বিশদ বিবরণ একবার রেজিষ্টারে লেখা হইলে, তাহা পরিবর্তনের জন্যও আইনটির কপিরাইট নিয়মাবলীর মধ্যে ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কপিরাইট অফিস মালিকের এবং সংশ্লিষ্ট বই সম্পর্কে লাইসেন্স মঞ্জুরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির পরিবর্তিত নাম ঠিকানা লিখিয়া রাখিবেন।

লেখকের অধিকার—কপি রাইট আইনে লেখকদিগকে কতকগুলি অধিকার দেওয়া হইয়াছে। লেখকগণ এইসব অধিকারের প্রত্যেকটির জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন। প্রায়ই এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রথম চুক্তি লঙ্ঘিত হওয়ায় লেখক, প্রকাশক বা সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষকে লাইসেন্স দিয়াছেন বা হস্তান্তর করিয়াছেন। এইরূপ বিবাদের বিষয় আদালতে উপস্থিত হইলে দ্বিতীয় লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বা এসাইনিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হয় এবং বিনা দোষে কপিরাইট লঙ্ঘনকারী বলিয়া অভিহিত হয়।

যে বই পূর্বেই রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে সেই বই-এর লাইসেন্স বা এসাইনমেন্ট-এর যদি কথা উঠে, তবে কপিরাইট রেজিষ্টারের উদ্ধৃতি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিবে—যে ব্যক্তি লাইসেন্স বা এসাইনমেন্ট মঞ্জুর করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া দাবী করিতেছে সে ব্যক্তি যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কি না। যদি

রেজিষ্টারে লিখিত বিবরণ বর্তমানে অচল হইয়া থাকে, তবে সম্ভাব্য লাইসেন্স-মালিক বা এসাইনিকে নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে।

কপিরাইটের নিয়মানুসারে, রেজিষ্টারে লিখিত কপিরাইটের বিশদ বিবরণ পরিবর্তনের আবেদন দাখিলের সময় উহার সহিত লাইসেন্স বা এসাইনমেন্টের ষ্ট্যাটেটেড (সম্রাস্ত লোকের স্বাক্ষরিত) কপি যোগ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ কপি যোগ করিয়া না দিলে কপিরাইট অফিস প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে অস্বীকার করিবেন। যেখানে আবেদনকারী এইরূপ অভিপ্রায় করিবেন সেখানে কপিরাইট অফিস মূল এসাইনমেন্ট বা লাইসেন্সে ষ্ট্যাম্প দিয়া উহা মালিককে ফেরৎ দিতে এবং সেই সঙ্গে রেজিষ্টারে লিখিত বিবরণের পরিবর্তনের অনুমোদিত কপি পাঠাইয়া দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

রেজিষ্টারে পুস্তকের বিবরণ লেখা—আবেদনপত্র তন্নতন্নভাবে পরীক্ষা করিয়া পুস্তকের বিবরণ-রেজিষ্টারে লিখিতে হইবে। নিয়মাবলীর মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, প্রত্যেক আবেদনকারী কপিরাইটের সহিত সংশ্লিষ্ট অপরাপর পক্ষকে আবেদনের কপি পাঠাইবেন। যদি কোন বিবরণ অসঙ্গতভাবে লেখা হইয়া থাকে, তবে এই ব্যবস্থায় অপরাপর পক্ষ ঐরূপ রেজিষ্ট্রেশনে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন। আইনে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, যে ব্যক্তি রেজিষ্টারে মিথ্যা বিবরণ লিখে বা লিখায় অথবা কোন লেখাকে রেজিষ্টারের কোন লেখা কপি বলিয়া মিথ্যা অজুহাতে লিখে বা লেখায় অথবা কোন বিবরণ বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত কোন লেখাকে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করে বা করায়, তবে এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা বা উভয় দণ্ড ভোগ করিবে।

কপিরাইট রেজিষ্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা এমন তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছে যে, অনেকক্ষেত্রে লোকে ১৯০৮ সালের ভারতীয় রেজিষ্ট্রেশন আইন অনুসারে বই রেজিষ্ট্রী করা অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার জানিয়াও এবং এই রেজিষ্ট্রেশনের ফলে কপিরাইট সম্পর্কে কোন অধিকার আসিবে না অবগত থাকিলেও তাঁহাদের বই রেজিষ্ট্রী করিয়া থাকেন। রেজিষ্টার দেখিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাজের সুবিধার্থে কপিরাইট নিয়মাবলিতে রেজিষ্ট্রীকৃত পুস্তকের বিশদ সূচী রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভাষার জন্য স্বতন্ত্র সূচী রাখা হইবে।

কপিরাইট রেজিষ্ট্রেশন এবং রেজিষ্টারে পূর্বে লিখিত বিবরণের কোন পরিবর্তন সাধনের জন্য নামমাত্র ফি লাগে। জনসাধারণের অনাবশ্যক ব্যয় বাঁচাইবার জন্য আইনে সংশ্লিষ্ট পুস্তকের কপি বা অপ্রকাশিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আবেদনের সহিত যোগ করিয়া দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয় নাই। কপিরাইট রেজিষ্ট্রীকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত কপিরাইট রেজিষ্টারের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন সমস্যা

শ্রীঅচিনকুমার মুখোপাধ্যায়

দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করার জন্য যেমন শ্রমশক্তির প্রয়োজন তেমনি অপর দিকে এই বিরাট শ্রমশক্তিকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে মূলধনেরও প্রয়োজন আছে। দেশের সকল রকম সম্পত্তির উন্নতি সম্ভব হয় যদি শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে প্রচুর পরিমাণ মূলধন থাকে। মূলধনের উপরই জাতির সুসম্পদ নির্ভর করে। সুতরাং এমন দেখা যাচ্ছে মূলধনের প্রাচুর্য থাকলে দেশের জনসাধারণের মনে সুখ ও শান্তি বিরাজ করে আবার যদি মূলধনের স্বল্পতা থাকে তাহলে দেশবাসীর দুঃখকষ্টের আর অন্ত থাকে না। মূলধন যত বেশী হবে সেই অনুপাতে দেশের উন্নতি ও বহু গুণ বেড়ে যাবে। ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য, জনশক্তি ও খনিজ সম্পদগুলোর যথাযোগ্য উন্নতি সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য আমাদের প্রয়োজন মূলধনের। প্রয়োজনীয় মূলধন ভারতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। গত বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে "সমবায় ও সহযোগিতা" ব্যবস্থার চাহিদা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত অনুন্নত দেশগুলোতে বৈদেশিক মূলধনের গুরুত্ব আশাতীতরূপে বেড়ে গিয়েছে। সংযুক্ত রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ সংস্থা ছাড়া পাশ্চাত্য দেশের (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ইত্যাদি) শাসন কর্তৃপক্ষ প্রাচ্যের অনুন্নত দেশগুলোকে বহু পরিমাণে সাহায্য করেছে। ভারতবর্ষও এই সমস্তদেশের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য রকমে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করতে পেরেছে।

ভারতে নিযুক্ত বিদেশী মূলধনের ঠিক ঠিক হিসাব আমাদের জানা ছিল না। সম্প্রতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে এক অনুসন্ধান কার্য চালান। এই অনুসন্ধান কার্য যথাক্রমে ১৯৫০ সালে ও ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ভারতে বিদেশী শিল্প মালিকদের পুঁজি ও মোট ধার দায়িত্ব সম্বন্ধে এক নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশ করেন। প্রথম রিপোর্টে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে ভারতে লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের এক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ভারতের বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে প্রায় ৩২০·৪ কোটি টাকা পরিমাণ মূলধন (বিদেশী) বিনিয়োগ করা হয়েছিল। (এর মধ্যে যুক্তরাজ্যের অংশ ছিল প্রায় ২৩০ কোটি টাকার সমান, এই হিসাবের প্রায় শতকরা ৮২% ভাগ মূলধন প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এ ছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ছিল প্রায় ১৮ কোটি টাকার সমান ও পাকিস্তানের প্রায় ১৪·৪ কোটি টাকার মূলধন ভারতে বিভিন্ন শিল্পে গচ্ছিত ছিল)। পাকিস্তানের মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে একটি কথা বলা যায়, তাদের গচ্ছিত মোট মূলধনের মধ্যে প্রায় ১১ কোটি টাকার মূলধনের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। লগ্নীকৃত মূলধন থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত অংশটি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করেন।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয়বার যে পরিসংখ্যানের তথ্য প্রকাশ করেন তা থেকে জানা যায় যে এই সময়ের মধ্যে (১৯৫২–৫৩) ভারতে বৈদেশিক মূলধনের যোগান বহুগুণ বেড়ে গেছে। ১৯৪৮ সালের ভারত সরকারের শিল্প সংক্রান্ত নীতিতে বিদেশী মূলধনের অনুকূলে একমত প্রকাশ করা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি করা সম্ভব হয় যদি বিদেশী শিল্প মালিকদের কাছ থেকে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন লাভ করা যায়। ১৯৪৯ সালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ভারতীয় সংসদে ভারতীয় শিল্প নীতি সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন। এই অনুসারে

মূলধন বিনিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মকানুনের কঠোরতা শিথিল করা হয়। সেই সময় থেকে ভারত সরকারের শিল্প নীতি এইভাবে বর্ণনা করা হয়।

(১) ভারত সরকারের শিল্প নীতির আওতায় ভারতীয় ও বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগকারীদের আনা হবে ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একই আইন চালু থাকবে। (২) বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থার অধীন যে কোন বিদেশী উদ্যোক্তা বা শিল্প মালিক তাঁদের লগ্নীকৃত মূলধনের লাভাংশ সংগ্রহ করতে পারবেন, বা তাদের ইচ্ছা অনুসারে নিয়োজিত মূলধন প্রত্যাহার করতে পারবেন। (৩) যখন ভারতস্থিত কোন বিদেশী বাণিজ্য সংস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে আনা হবে তখন তাদের উপযুক্ত রকমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। (৪) কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সমস্ত বৈদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রদোশন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভারত সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। কর্মদক্ষ, সুঅভিজ্ঞ অভারতীয় বিশেষজ্ঞদের স্থায়ীভাবে ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হবে।

এই সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর পরীক্ষা করে দেখা দরকার— (ক) অর্থবিনিয়োগকারী সংস্থাগুলো একমাত্র মূলধন লগ্নীকারী বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিনিধি হলেই চলবে না। (খ) উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য একটি সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত কার্যসূচীর প্রণয়ন করা বিধেয়। (গ) যে সব ক্ষেত্রে ভারতীয় মূলধনের যোগান অপেক্ষাকৃত অল্প বা যেখানে যোগানের সম্ভাবনা বিশেষ আশাপ্রদ নয় সেই সমস্ত স্থানে বিদেশী শিল্পমালিকদের মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে। (ঘ) এই ভাবে মূলধন বিনিয়োগ করার ফলে বিদেশী বিনিময় ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা হবে। আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করে বা রপ্তানি বহুলাংশে বৃদ্ধি করে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থায় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলোকে যদি ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগান যায় তা'হলে ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বহু গুণ বেড়ে যাবে। ভারত সরকার ও মূলধন বিনিয়োগকারী বিদেশী সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার পূর্বে সরকারকে ভারতীয় অর্থ নৈতিক জীবনের দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত অবস্থাটি উত্তমরূপে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। অনেকে হয়ত প্রশ্ন করবেন যে সেই দাবী-দাওয়াগুলো কি কি যেগুলো সম্বন্ধে ভারত সরকার উত্তমরূপে চিন্তা করবেন। সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে নিম্নরূপ হয় :—

(১) যে সব ক্ষেত্রে কারিগরী বিষয়ে সুঅভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন সেই সব ক্ষেত্রে বিদেশীদের মূলধন লগ্নীর সুযোগ দেওয়া উচিত (২) যেখানে ভারতীয় শিল্পমালিকরা উৎপাদনের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য রকমে উন্নতি করতে পেরেছে সেই সব ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়। (৩) ভারতে কোন বিদেশী প্রতিনিধি বেসরকারীভাবে মূলধন বিনিয়োগ করার ফলে যাতে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্রেক না হয় সেইদিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। (৪) ভারতীয় শিল্প মালিকরা যে সব সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করেন তা' মোটামুটিভাবে ভারতীয় জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে সমর্থ হবে। এই ক্ষেত্রে বিদেশী শিল্প মালিকদের মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ দিলে ভারতীয় শিল্পের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হবে। যদি মূলধন লগ্নীর ব্যাপারে বিদেশী পুঁজিপতিদের হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তাহলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হবে। এই অবস্থায় বিদেশী কর্তৃত্ব এলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অসুবিধায় আর শেষ থাকবে না।

১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা সরকারের (মূলধন) বিনিয়োগ অঙ্গীকার কার্যসূচীর (American Government's Juvestment Guarantee Programme) অধীনে আমেরিকা সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে মূলধন লগ্নী সম্পর্কীয় কয়েকটি বাধাবিপত্তির সহজ নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হয়। চুক্তির ফলে দুটি বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হয় :—(ক) যদি কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের আওতায় আনা হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত রকমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে (খ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুদ্রা লেনদেনের কাঠোরতার দরুণ ভারতে বিনিযুক্ত মূলধন থেকে প্রাপ্ত লাভাংশ ভারতের বাইরে পাঠানোর যে অসুবিধা ছিল তার সহজ মিটমাট হওয়া সম্ভব হয়।

ভারত সরকারের বাণিজ্য প্রতিনিধি মারফৎ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ, রাশিয়া সমেত আরও কয়েকটি অকমুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট দেশের সঙ্গে কথাবার্তা চালান হচ্ছে যাতে ভারতের সঙ্গে চুক্তিভুক্ত দেশগুলি Deferred Payment পর্যায়ে জিনিষ পত্র আদান প্রদান করা সম্ভব হয়। এই পর্যায়ে জিনিষপত্র ক্রয় করলে বিদেশ থেকে ক্রীত জিনিষের জন্য নগদ মূল্য সঙ্গে সঙ্গে দিতে হয় না। এই ব্যাপারে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে। ডিফার পেমেণ্ট পর্যায়ে জিনিষপত্র লেনদেনের জন্য পূর্ব জার্মানী ও চেকোশ্লোভেকিয়া দেশের সঙ্গে এক চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তির ফলে বিদেশ থেকে ভারী যন্ত্রপাতি ছাড়া যুদ্রনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর যন্ত্রপাতি আমদানী করা সম্ভব হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে এতরকমের সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতে বিদেশী মূলধনের অভাব দেখা দেয় কেন? কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গত দশ বছরে এশিয়ার স্বল্প উন্নত দেশগুলোতে বিদেশী মূলধন লগ্নীকার মূলধন লগ্নীর ব্যাপারে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। এর কারণ স্বরূপ বলা যায় :—

(১) বিগত দিনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তৎকালে শক্তিশালী রাজারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্যের রাজাকে নানারকম ভাবে অর্থ কড়ি দিয়ে সাহায্য করতেন। এর পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত লুকিয়ে থাকতো। সুবিধামত সেই শক্তিশালী রাজা সেই দুর্বল প্রায় সমস্ত অংশ নিজে গ্রাস করতে চেষ্টা করতেন। বর্তমানে সে রাজাও যা তার রাজত্বও নেই। ঘটনার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এই ব্যাপারে রাজনীতিকে একেবারে ভিন্ন করা যায় না। এই কারনেই বোধ হয় বিদেশী মূলধনের উপর এশিয়াবাসীদের তেমন আগ্রহ নেই। চীন, সুদূরপ্রাচ্য, পারস্য ও মিশরে সম্প্রতি যে সব রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে সেই কারণে পাশ্চাত্য-মূলধনের উপর প্রাচ্যের প্রায় সমস্ত দেশের বীতশ্রদ্ধা জন্মেছে।

(২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিনিময় সংকোচ, মূলধন বিনিয়োগের অপরিমিত সুযোগ, রাষ্ট্রিয়করণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খেসারত দেবার ব্যবস্থার অভাবে মূলধন লগ্নীর ব্যাপারে এক বাধার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতে বিদেশী মূলধনের স্বল্পতা বা সংকোচের কারণ সম্বন্ধে অনেক জীবন বীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রিয়করণকে দায়ী করেন। শুধু তাই নয়, শিল্পব্যবস্থার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সরকার হস্তক্ষেপ করেছেন বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। কোন কোন স্থানে প্রশাসনিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে কর ভার চাপান হয়েছে। এইজন্য আমেরিকার শিল্প মালিকরা এদেশে মূলধন বিনিয়োগ করতে বিশেষ রাজী নন।

(৩) সকলদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এক ধরণের হয় না বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও এক হয় না। যুক্তরাজ্যে সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক যে তাঁরা মূলধন লেনদেনের উপর যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টি রাখবেন। মুদ্রা-স্ফীতি দমন করার জন্য তাঁরা (যুক্তরাজ্য সরকার) ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate) শতকরা ৭ ভাগ করেছেন। এ কথাও ঠিক যে পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর উপর যথেষ্ট চাপ পড়ায় যুক্তরাজ্য সরকার সহজে মূলধন দেশের বাইরে পাঠাতে রাজী হবেন না। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক চক্রান্তও বাদ যায় না। দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য বিদেশী শিল্প মালিকদের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। অনুন্নত দেশগুলি এই ধরণের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করে তোলেন। এই কারণে অনুন্নত দেশগুলো সাধারণতঃ বিদেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যই বেশী পরিমাণে পছন্দ করেন। Fiscal Commission (১৯৪৯-৫০) বলেন যে, বৈদেশিক মূলধন লাভ করার জন্য কয়েকটি বিশেষ পথ আছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিচার্য বিষয় এইরূপ :—

(ক) কি ধরণের পরিকল্পনার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন? (খ) সম্ভাব্য পরিকল্পনাগুলোর জন্য কি ধরণের কারিগরী বিশেষজ্ঞ, প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন? (গ) দ্রব্য সামগ্রী ও কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার উৎপাদন ক্ষমতা কতখানি? (ঘ) সাহায্য গ্রহণ-কারী দেশগুলোর প্রশাসনিক কাজের জন্য দক্ষতা কতখানি আছে? (ঙ) মূলধন লাভ করা, বিদেশী শিল্পমালিকদের উপরই নির্ভর করে।

অনুন্নত দেশগুলো সাধারণতঃ ভারী যন্ত্রপাতি, কলকারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিই সাহায্য হিসাবে গ্রহণ করেন। যেখানে নতুনভাবে কোন উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়, সেই সব স্থানেই প্রত্যক্ষভাবে বিদেশী মূলধন বা কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

কৃষি পর্য্যায়ে সোভিয়েৎ দেশ ও ভারত

শ্রীসুবলকুমার চক্রবর্ত্তী

(১)

একটা দেশের স্বয়ং সম্পূর্ণতার জন্য কৃষি এবং শিল্পের সমান উন্নতি দরকার অর্থাৎ এক কথায় ভারসাম্য অর্থনীতির (Balanced Economy) দরকার। শুধু মাত্র কৃষি কিংবা শুধু মাত্র শিল্পের উন্নতি হইলেই দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার চরম উন্নতি হইল এমন কথা বলা যায় না। যেমন ইংল্যাণ্ডের কথাই ধরা যাক না—ইংল্যাণ্ডের শতকরা ৯০ভাগ লোক শিল্পের উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের সময় যখন আমদানী রপ্তানী কার্য অসম্ভব হইয়া পড়ে তখন ইংল্যাণ্ডের অবস্থার কথা উপলব্ধি করা যায়। আবার ভারতের শতকরা ৮০ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল; কিন্তু যুদ্ধের সময় শুধুমাত্র কৃষিজ ফসল লইয়া যুদ্ধ করা যায় না। সুতরাং শিল্পের উন্নতিরও প্রয়োজন। ভারতের শিল্পাবস্থা এখন শৈশব অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই; তাহার উপর ভারতের কৃষি ব্যবস্থা অতীব ত্রুটিপূর্ণ। সেইজন্যই ভারতের মাটীতে যথেষ্ট পরিমাণ কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাহাকে বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হয়। সোভিয়েৎ দেশের সহিত আমাদের কৃষিব্যবস্থার আলোচনা করিলেই আমাদের কৃষিব্যবস্থার বর্ত্তমান অবস্থার কথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা হয়ত বা সহজ হইবে।

সকলেই বলে সোভিয়েৎ দেশ কৃষি ব্যবস্থায় চরম স্থানের অধিকারী। ইহার কারণ প্রধানতঃ সরকারের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও চেষ্টা। সোভিয়েৎ দেশের কৃষি পরিচালনা দু'উপায়ে হইয়া থাকে। একটি বৃহদায়তন যৌথ খামার ব্যবস্থা (Kolkhoz) এবং অপরটি হইল বৃহদায়তন খাস খামার ব্যবস্থা (Sovkhoz)। এই উভয় ব্যবস্থাতেই সরকারী প্রচেষ্টা সমরূপ দৃষ্ট হয়। তবে বর্ত্তমান কৃষির শতকরা ৯০ ভাগই বৃহদায়তন যৌথ খামার বা Kolkhoz দ্বারা পরিচালিত হয় এবং মাত্র ১০ভাগ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। বৃহদায়তন যৌথ খামার বলিতে বোঝায় চাষীদের ব্যক্তিগত জমি সকল একত্রিত করিয়া যৌথভাবে চাষ এবং সমবায় (Co-operative) প্রথায় লব্ধ উপস্বত্ব ভাগ করিয়া লওয়া। আর খাস খামার বলিতে সরকারের পূর্ণ তত্ত্বাবধানে চাষ করা বোঝায়।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং ১৯১৮-২০ সালের গৃহযুদ্ধের ফলে সোভিয়েৎ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এমত অবস্থাকালীন সময়ে পুঁজিপাতী এবং সরকারের মিলিত চেষ্টায় মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের উদ্দেশ্যে 'নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (New Economic Policy) নামক একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবরূপ পরিগ্রহের ফলে রাশিয়ার শিল্প এবং কৃষির ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ইহার পর রাশিয়া আরও পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে; তাহার ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লক্ষিত হয়।

রাশিয়ার কৃষি উন্নতির মূলে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, রাশিয়ার কৃষি অঞ্চলগুলি সমতল অঞ্চলে অবস্থিত; দ্বিতীয়তঃ, কৃষি অঞ্চলগুলি সমতল অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার

অন্ত কৃষি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, ট্রাক্টর ইত্যাদির ব্যবহার ; তৃতীয়তঃ, সরকারী প্রচেষ্টায় ফলে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ; চতুর্থতঃ, বীজ ও সার বিষয়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন ; পঞ্চমতঃ, জমি সকল যৌথভাবে চাষ হওয়ার ফলে খণ্ডিকরণ ও অসমবন্টনের ফলে যে জমি নষ্ট হইত তাহা রক্ষা ; ষষ্ঠতঃ, চাষের উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য গ্রহণ এবং তাহার জন্ত প্রভূত অর্থ সাহায্য।

বৃহদায়তন খাল খামার প্রথার ফলে কৃষকদের [সহযোগিতার অভাব দৃষ্ট হয়। সেইজন্ত রাশিয়া বৃহদায়তন যৌথ খামার প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। সোভিয়েৎ দেশের এত উন্নতির মূলীভূত কারণ হইল সরকারের আন্তরিক চেষ্টা এবং সহযোগিতা। রাশিয়ার কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করিলাম। এখন ভারতের কৃষি ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতেছি। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং ভারতের যথেষ্ট পরিমাণ কৃষিদ্রব্য উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভারত কৃষিকার্যে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ সরকারের ত্রুটিপূর্ণ চেষ্টা ও সহযোগিতা। ১৯৫০ সালে যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয় তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতি। এবং তাহার জন্ত প্রথম পরিকল্পনায় যে মোট ব্যয় বরাদ্দ হয় তাহার অনেকটা অংশই এই খাতে ব্যয় করা হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কৃষির আশানুরূপ এবং সুদূর প্রসারী উন্নতি হয় নাই তাহার প্রমাণ স্বরূপ ভারতের ১৯৫৭ সালের কৃষির অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণ হইয়া উঠে। এই সালে সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে ১২ লক্ষ টন চাউল ঘাটতি পড়ে এবং ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ভারত খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। সরকার এমন সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করিলেন যে যাহার ফলে কৃষকগণের খালের জল ব্যবহার করিবার শক্তি রহিল না। কৃষকগণকে প্রতি একর জমি পিছু ৭ টাকা করিয়া জলকর দিতে হয়—এত টাকা করিয়া কর দিবার সামর্থ্য তাহাদের কোথায় ? ভারতের কৃষি ব্যবস্থার প্রধান অন্তরায় সেচ ব্যবস্থার ত্রুটি।

ভারতের কৃষি পশ্চাদ্‌পদ আরও নানা কারণে। প্রথমতঃ, বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত হওয়ায় উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে উপযুক্ত জমিগুলিতে আশানুরূপ ফসল হয় না। দ্বিতীয়তঃ, সেচ ব্যবস্থার ত্রুটি—এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে সেচের ব্যবস্থা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, জমির খণ্ডিকরণ ও অসংবদ্ধতার ফলে কৃষিকার্যে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। চতুর্থতঃ, কৃষকের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও ঋণ ; মহাজনের নিকট এমনভাবে তাহারা ঋণজালে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে তাহার ফলে সুবৎসরেও তাহারা কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না এমন কি পূর্বাবস্থার কিছুই পরিবর্তন হয় না। পঞ্চমতঃ, ভূমিস্বত্ব বিষয়ক আইনের বলে আসল চাষী অর্থনৈতিক প্রভাবে এমন একদল লোকের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল যাহারা শুধুমাত্র খাজনা আজনা আদায় ছাড়া অন্তান্ত কর্তব্যের কথা চিন্তাই করিত না। ষষ্ঠতঃ, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত মূলধন অত্যন্ত আর সেইজন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি অজ্ঞাত প্রায়। তাহাদের সম্বল শুধুমাত্র একটি হাল আর দুইটি বলদ যাহারা আবার বহুদিন উপযুক্ত খাদ্যাভাবে দুর্বল। সপ্তমতঃ, মহাজন ও ফড়িয়াদের নিকট হাট হইতেই ফসল বিক্রয় করিয়া দিতে হয় ইহাতে তাহারা ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। অষ্টমতঃ, তাহারা জমিতে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহার করিতে পারে না। একমাত্র গোবর সার তাহারা ব্যবহার করে তাহাও আবার জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের ফলে সারের অভাব সহজেই দেখা যায়।

এরূপ অবস্থার দূরীকরণ বাবদে অনেকেই পরামর্শ দিয়া থাকেন যে আমরা যদি সোভিয়েৎ কৃষিপদ্ধতি অনুসরণ করি তাহা হইলে আমরা ইহার প্রতিকার করিতে অবশ্যই সক্ষম হইব।

কিন্তু তাহারা একথা ভাবিয়া দেখেন না যে ঐ বিশেষ পদ্ধতি আমাদের পক্ষে ব্যবহার করা সহজ হইবে না। আমাদের দেশের জমিতে ট্রাক্টর ব্যবহার করা সম্ভব নয়; কারণ আমাদের জমিগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তনের। যদি ঐ সকল জমি একত্রিত করা হয় তাহা হইলে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু একটি কথা এই বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে; তাহা হইল—সোভিয়েৎ অর্থ-নীতির ভারসাম্য (balance) আছে অর্থাৎ ঐ দেশ কৃষি ও শিল্প উভয় বিষয়েই উন্নত কিন্তু আমাদের দেশে শিল্প এখন শৈশব অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই; সুতরাং তাহাকে কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং আমাদের দেশের জমিতে যদি ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে জমিতে বর্তমানে যত কৃষক নিযুক্ত রহিয়াছে তাহার চেয়ে কম কৃষক লাগিবে; ইহার ফলে যে সকল কৃষক উদ্বৃত্ত রহিল তাহারা বেকার হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশ যদি শিল্পে অগ্রসর হইত তাহা হইলে ঐ উদ্বৃত্ত কৃষকগণকে শিল্পে নিযুক্ত করা যাইত যদিও বা গ্রামে নিযুক্ত কুটির শিল্পগুলি বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলেও এরূপ অবস্থার সমাধান করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইত। কিন্তু কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস প্রায়; সুতরাং এরূপ অবস্থায় কৃষি জমিগুলিতে ট্রাক্টর ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তবে সেচ ব্যবস্থার পর্যাপ্ত পরিমাণ উন্নয়ন এবং সম্ভাব্যরূপে জলকর হ্রাস (অর্থাৎ কৃষকরা যাহাতে জলকর দিতে কষ্টবোধ না করে) করিয়া কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা যাইতে পারে। বীজ, সার ইত্যাদির উন্নয়ন প্রয়োজন। কৃষকদের মহাজন ঋণজাল হইতে মুক্ত করা এবং তাহাদের অল্পসুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য। সরকার যেরূপ ধীর গতিতে এইপথে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে ইহার বিশেষ উন্নতি আশা করা সমীচীন হইবে না। সরকার কৃষিঋণের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অতি নগণ্য। মোট কৃষিঋণের মাত্র শতকরা ১ অথবা ২ ভাগ মাত্র সমবায় সরবরাহ করিয়া থাকেন। সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ফলে বর্তমান অসুবিধার অনেকটা লাঘব হইতে পারে।

সরকার পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খাদ্য বিষয়ে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মোটামুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল :—(ক) কৃষির উন্নতি—এই উদ্দেশ্য সকলের নিমিত্ত বহু উদ্দেশ্য বিশিষ্ট নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, গ্রাম ও সমাজ উন্নয়ন, সার উৎপাদন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। (খ) অনাবাদী জমির পুনরুদ্ধার। (গ) বিদেশ হইতে খাদ্যের আমদানী হ্রাস। (ঘ) খাদ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ। তবে বর্তমানে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আর নাই। তবে খাদ্যাভাব নিরসন করা সরকারের পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নাই।

সরকারের ঐ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়; তবে সে চেষ্টা এতই ত্রুটিপূর্ণ যে ইহা ভাবিতেও আমাদের সন্দেহ হয়, আমরা কখনও খাদ্যাভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারিব। তবে আমরা আশাবাদী; সুতরাং ভবিষ্যৎ সোনার ভারতের' কথা চিন্তা করিতে দোষ কি? আমরা যদিও বা 'সোনার ভারত' দেখিয়া যাইতে না পারি, তবে আশায় রহিয়াছি অন্ততঃ ভবিষ্যৎ ভারত সন্তানেরা 'সোনার ভারত' দেখিয়া যাইতে পারিবে।

———

ভারতে মূলধনের ঘাটতিতে মজুত সোনা-রূপার ভূমিকা

শ্রীঅবিভাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিনের এপ্রিল সংখ্যায় মজুত সোনা এবং রূপা সম্পর্কিত একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছাপান হয়েছে। সে প্রবন্ধে এই মর্মে অনুমান করা হয়েছে যে আমাদের দেশে বে-সরকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের কাছে ছাব্বিশ কোটি ভরি সোনা মজুত রয়েছে। এছাড়া মজুত রূপার পরিমাণ হবে এক হাজার একশত উনত্রিশ কোটি ভরি। বর্তমানে বাজার দর কতটা চড়া সে সম্পর্কে নূতন করে কিছু বলার নেই। অনুমান করা হয়েছে, এই চড়া বাজার দর অনুযায়ী ভারতে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে মজুত সোনার দাম তিন হাজার পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা। অন্যদিকে বে সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট মজুত রূপার দাম ও আনুমানিক দুহাজার পঁচাত্তর কোটি টাকা হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে যে দর বিদ্যমান সে দর অনুযায়ী যদি ভারতে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট মজুত সোনার দাম যাচাই করা হয় তাহলেও দেখা যাবে, দাম প্রায় একহাজার সাতশত পঞ্চাশ কোটি টাকার কাছাকাছি হবে। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি কাটছাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কারণ গোটা পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার মত অর্থ নেই। অথচ বে-সরকারী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কাছে যথেষ্ট সোনারূপা মজুত রয়েছে, যদিও এই মজুত সোনা-রূপার সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব।

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, ইউরোপ এবং সুদূর প্রাচ্যে শত শত বছর ধরে ভারত থেকে পণ্য রপ্তানী করা হয়েছে। ইউরোপে এই পণ্য রপ্তানী করা হত আরব এবং আফ্রিকা উপকূলের ভিতর দিয়ে। কিন্তু সুদূর প্রাচ্যে প্রধানতঃ সমুদ্রপথেই ভারত থেকে পণ্য রপ্তানী করার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি প্রশ্ন হতে পারে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, যখন ভারত থেকে ইউরোপে পণ্য রপ্তানী করা সুরু হল তখন ইউরোপীয় শিল্পের কিরকম অবস্থা ছিল। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, ভারত থেকে সাধারণতঃ কি ধরণের পণ্য রপ্তানী করা হত। তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, রপ্তানীর বিনিময়ে ভারত কি পেতো।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। যে যুগে ভারত থেকে পণ্য রপ্তানী করা সুরু হয়েছিল সে যুগে শিল্পোন্নত ইউরোপের স্বল্প অবস্থার বলে মনে হত। অর্থাৎ যে সময়ে ইউরোপে শিল্পোন্নতির গোড়া পত্তন হয়েছে সে সময়ের বহু আগে ভারত থেকে পণ্য রপ্তানী করা সুরু হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে বলা যেতে পারে, ভারত থেকে যে সব পণ্য রপ্তানী করা হত সে সব পণ্যের বেশীর ভাগই হচ্ছে কুটির শিল্পজাত। বাকী রইল তৃতীয় প্রশ্ন। এর উত্তর দেওয়া কষ্টকর নয়। অর্থাৎ বাইরে পণ্য রপ্তানী করার ফলে ভারতে প্রচুর পরিমাণে সোনা রূপা, এবং এই ধরণের অনেক মূল্যবান আসতে লাগল। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে রপ্তানীর পরিমাণ যতই বেড়েছেতে লাগল ততই ভারতে প্রচুর পরিমাণে এই সব মূল্যবান জিনিষ মজুত হয়েছে। বর্তমানে ভারতে মজুত সোনারূপাকে প্রধানতঃ দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হল সে সব সোনারূপা—যেগুলো দিয়ে মেয়েদের গহনা তৈরী করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যি একটা কথা বিশেষভাবে বলবার আছে। যারা দিনের পর দিন, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত তাঁদের ঘরের মেয়েদের পক্ষে সোনার গহনা তৈরী করা অসম্ভব, কারণ সোনা ক্রয় করার মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁদের নেই। কাজেই গহনা যদি একান্ত ব্যবহার করতেই হয় তাহলে তাঁদের পক্ষে রূপার গহনা তৈরী করা ছাড়া উপায় থাকেনা। এই গহন

নিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়। যারা মধ্য এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বলে পরিচিত তাঁদের ঘরের মেয়েদের সোনার গহনা ব্যবহার করতে দেখা যায়, কারণ দারিদ্র্য অর্জ্জরিত চাষী এবং শ্রমিকের অবস্থার চাইতে তাঁদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। অবিশ্যি যাঁরা ধনী তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করা অবান্তর, কারণ তাঁদের ঘরে সোনা রূপা, হীরা-জহরত এবং মণি-মুক্তার অভাব নেই।

অন্যদিকে দ্বিতীয়ভাগের অন্তর্ভুক্ত হ'ল সেসব সোনারূপা—যেগুলো নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী বিক্রী করে নগদ তহবিলে রূপান্তরিত করার জন্য বিত্তশালী জমিদার, শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছেন। মোট কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে বর্তমানে যে সোনা এবং রূপা মজুত রয়েছে সে সোনা এবং রূপাকে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ব্যবহার করতে হয়, তাহলে দেশের সরকারের পক্ষে এমন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার যার ফলে একদিকে যেরকম গহনার দিকে মেয়েদের ঝোঁক কমে যাবে সেরকম অন্যদিকে যাঁরা কর ফাঁকি দিয়ে প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন এবং যাঁরা মুনাফাবাজ বলে কুখ্যাত তাঁদের পক্ষে সোনারূপায় অনুপাতে অর্জ্জিত টাকা লগ্নী করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। যারা মুনাফাবাজির আশ্রয় নিয়ে এবং কর ফাঁকির সাহায্যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন তাঁরা তাঁদের অর্থ এমন সম্পত্তিতে লগ্নী করে থাকেন যেটা সরকারের নাগালের বাইরে। অর্থাৎ যেসব সম্পত্তি বিক্রী করতে কোন অসুবিধা নেই সেসব সম্পত্তিতে এঁরা এঁদের অর্থ মজুত রাখেন। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে সোনা, রূপা, হীরা ইত্যাদির মত অন্য কোন সম্পত্তি অত সহজে বিক্রী করা যায় না। তাই প্রকাশ্যভাবে অর্থ লগ্নী না করে এঁরা সোনা-রূপায় অনুপাতে অর্জ্জিত টাকা মজুত রেখেছেন। অবশ্যি এইভাবে কতটা অর্থ মজুত রাখা হয়েছে সেটা ঠিকভাবে বলা কষ্টকর। তবে আয়কর তদন্ত কমিশন মোটামুটি একটা হিসাব দিবার চেষ্টা করেছেন। বিগত ১৯৫৯ সালে কমিশনের প্রথম রিপোর্টে বলা হয়েছে, মুনাফা-বাজি এবং করফাঁকির সাহায্যে অর্জ্জিত টাকার মোট পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার বেশী ছাড়া কম নয়। রিপোর্ট যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের ধারণা এই অর্থের বেশীর ভাগই বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং সেফ-ডিপজিট ভল্ট-এ মজুত রাখা হয়েছে। একথা বিনাদ্বিধায় বলা যেতে পারে, ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে একদিকে যেরকম মুনাফাবাজি বেড়ে গেছে সেরকম অন্যদিকে ব্যাপক ভাবে করফাঁকি দেবার অপচেষ্টা চলেছে। ফলে স্বভাবতঃই অনুপাতে অর্জ্জিত টাকার পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়েছে এ কথা অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া যদি অনুমান করা হয়, আগে যেরকম সোনারূপার অর্থ মজুত রাখা হচ্ছিল এখনও যেরকম মজুত রাখা হচ্ছে তাহলে ভুল হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান অসম্ভব। তাছাড়া ভারতের যে সরকারী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কাছে কোটি কোটি টাকা মূল্যের যে সোনা-রূপা মজুত রয়েছে দেশ এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকে সে সোনারূপার কোন মূল্য নেই, কারণ এগুলো সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় সম্পদ। যদি এই সম্পদকে জাতিগঠনের কাজে লগ্নী করা হয় তাহলে আজ মূলধনের ঘাটতি জনিত যে গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সে সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হবে। এ ছাড়া আরো তিন ধরণের সুফল পাওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি হতে থাকবে। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় আয় বেড়ে যাবে। তৃতীয়তঃ বেকার সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক শিক্ষা

শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিশেষিকরণের যুগে বাণিজ্যিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাণিজ্যিক শিক্ষা বলতে আমরা শুধু অর্থশাস্ত্রের পুঁথিগত পাঠাভ্যাস তথা চর্বিত চর্বণ বলে আমরা মনে করি না। কেন না, বাণিজ্যিক শিক্ষার পরিবেশ বাস্তব ক্ষেত্র—সেখানে দৈনন্দিন ব্যবসা জীবনের বহুশত সমস্যা এসে ভিড় করে আর তার সমাধানে যত্নপর হয়ে প্রস্তুতির অবকাশ রাখে। ব্যবসাদার নিশ্চয়ই তার সমস্যার মাঝে দিনাতিপাত করে আর তার অভিজ্ঞতা ও তার বাস্তব সমস্যা সমাধান করে যন্ত্র ভাবে কাজে লাগে কারণ তাই যদি সম্ভব না হত তাহলে ব্যবসা জগৎ প্রদার লাভ ত করতই না বরং এতদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। আবহগতিতে অভিজ্ঞতা হস্তান্তর করার রীতি থেকেই বাণিজ্যিক শিক্ষার উদ্ভব। শুধু বন্ধ ঘরে মোটা মোটা বই পড়েই যথার্থ বাণিজ্যিক শিক্ষা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক শিক্ষার সার্থক মূল্যায়ন আজও সম্ভবপর হয়নি এবং স্নাতকোত্তর বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রাপ্ত ছেলেরা ও যথার্থ স্বীকৃতি পায় না যত্র ক্ষেত্রে এবং পাশ করে ও তারা যেন কোন মর্যাদার অধিকারী হয় না। এমন কি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিয়োগাধিকারগুলিও এই মর্যাদা বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের দিতে নারাজ। অথচ বিচার করলে দেখা যাবে বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা ব্যবহারিক জগতে অনেক বেশী মানানসই হয়ে থাকে কারণ তারা একাধারে হিসাব, আইন, হিসাব পরীক্ষা, ব্যবহারিক অর্থনীতি, ব্যাংকিং, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান যেটা অন্য কোন স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর উপাধিধারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এই আপেক্ষিক প্রতিকূলতার জন্য বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিজেরা মোটেই দায়ী নয়। কি জন্য এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা দরকার। বিচার করলে দেখা যাবে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,কম্ বা এম,কম শিক্ষার পাঠক্রম বাণিজ্যকেন্দ্রিক না হয়ে অর্থনীতি কেন্দ্রিক হয়েছে। ফলে পাঠক্রমগুলিকে অযথা বিষয়-ভারাক্রান্ত করা সত্ত্বেও সার্থক শিক্ষাদান সম্ভব হয় না এবং অনেক স্থানে বাণিজ্যি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা পল্লবগ্রাহিতা দোষে দুষ্ট হয়ে থাকে। বি, কম পরীক্ষার পাঠক্রমে Business Organisation, Commercial Geography ও Indian Economics এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এত বেশী যে এর যে কোন একটিকে রেখে বাকী বিষয়গুলি বাদ দিলে কোন ক্ষতিই হয় না। অবশ্য এই বিষয়টির মধ্যে অন্য বিষয় দুটির কিছু কিছু যোগ দেওয়া যায় আর ঐ দুটি বিষয়ের জায়গায় পরিসংখ্যান (Statistics) ও বীমা (Insurance) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। Advanced Accountancy ও Compulsory Accouuntancy বিষয়দুটিকে আলাদা রাখা উচিত নয় কারণ এই দুটি একই বিষয়ের অন্তর্গত। M. Com পাঠক্রমে কোন বিশেষ বিষয়ের উপর জোর না দিয়ে এটিকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে কোন M. Com ছেলের পক্ষে এখানে শিক্ষকতা করা সম্ভব নয়। আমরা যদি অনুসন্ধান করি তবে দেখতে পাব যে বাণিজ্যিক শিক্ষা বিভাগটি এমন কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত যাঁদের বাণিজ্যিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোন বিশেষ পারদর্শিতা নেই এবং তাঁরা শুধু অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত। ফলে ব্যবহারিক অর্থনীতির নামে যে অর্থনীতি শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে

ব্যবহারিক জগতে কোন কাজই হয় না। গোড়ায় Bye & Hewett এর Realistic Economics M. Com এ পড়ানো হত। কিন্তু আজকাল আর পড়ানো হয় না। বাণিজ্যিক শিক্ষার পাঠক্রমে অর্থনীতির theory র কচ্‌কচি না ঢোকানোই ভাল; ফল হচ্ছে এই যে কমার্সের ছাত্র লাইব্রেরীতে বসে নূতন পুরানো বই থেকে নোট নিতে ভালবাসে কিন্তু ব্যবহারিক জগতের অর্থ সংক্রান্ত গতি প্রকৃতির খোঁজ নেওয়ার মত উৎসাহ তার থাকে না। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বাণিজ্য বিভাগের আয় অনেক বেশী কিন্তু এই বিভাগে Wholetime Professor এর সংখ্যা অত্যন্ত কম। ১২০৲ টাকা মাসিক ভাতায় উপযুক্ত লোক পাওয়া দুরাশা। যাঁরা আসেন তাঁরাও ১০০৲ টাকায় বিনিময়ে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন না এবং পরিণামে ছেলেরা ফল ভোগ করে। কিছুদিন হল এই বিভাগে গবেষণার বন্দোবস্ত করা হয়েছে কিন্তু কি কি বিষয়ে গবেষণা করা যায় এই বিভাগের অধীনে? বাণিজ্য সংক্রান্ত সবকটি বিষয়ে নিশ্চয়ই নয়! কারণ বাণিজ্য বিষয়ক গবেষণা চালাবার উপযুক্ত শিক্ষক এই বিভাগে নেই! শুধু ব্যাংকিং কিংবা অর্থনীতিতে গবেষণা করবার জন্য বাণিজ্য বিভাগের দ্বারস্থ হতে হবে কেন? হিসাব রক্ষা, ব্যবসা পরিচালনা, উৎপাদন ও উৎপাদন জাত সমস্যা, বিক্রয় সমস্যা, শ্রমিক সমস্যা, এসব বিষয়ে যে গবেষণা করার সুযোগ এবং অবকাশ আছে সে সম্বন্ধে আমাদের প্রায় ধারণাই নেই। অথচ একথা কোন মতেই বলা যায় না যে এদেশে এবিষয়ে চিন্তার অভাব। উদাহরণের জন্য আমাদের বেশীদূরে যেতে হয় না। সিটি কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক বাণিজ্যিক জগতের বিষয়গুলি সম্পর্কে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

কাজেই দেখা যায় যে বাস্তবিক পক্ষে গলদ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে, লোকের অসামর্থ্যে নয়। M. Com এর পাঠক্রম সম্বন্ধে একথাও বলা যায় Industrial Structure and Development, Business Organisation ও Economic History এই তিন বিষয় কমবেশী সমপন্থী; এর একটিকে পাঠক্রমে রাখলেই যথেষ্ট। Accountancy, Costing এবং Income Tax এই তিনটি স্ব স্ব জটিলতায় এক একটি পূর্ণ বিষয়ের মর্যাদা রাখে। এইরূপ তিনটি বিষয়কে একটি বিষয়ের অন্তর্গত রাখা অত্যন্ত অযৌক্তিক। আমরা দেখতে পাই Chartered Accountancy পরীক্ষায় Accountancy দুটি ভাগে বিভক্ত, I. C. W. A পরীক্ষায় Costing চারটি ভাগে। এ অবস্থায় এই তিনটি বিষয়কে একটি বিষয়ে সন্নিবিষ্ট করার ফলে ছাত্রদের যথার্থ অনুসন্ধিৎসা হ্রাস পেয়েছে এবং সেই স্থানে একটা ভয় এসে জায়গা নিয়েছে।

ছাত্রদের মুখচেয়ে, ভারতের এবং বাংলার ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট তাই আবেদন জানাচ্ছি এ সম্বন্ধে বিচার বিবেচনার জন্য। অতীতে আমরা দেখেছি বাণিজ্য বিভাগের "প্রধান" ডাঃ বাসু বাণিজ্য বিভাগের যথার্থ উন্নতির জন্য পরিশ্রম করেছেন, গবেষণার সুযোগ স্থাপনের জন্য অনেক চেষ্টা করে সফলকাম হয়েছেন। আশা করি এই ব্যাপারেও তিনি পরাঙ্মুখ হবেন না।

———

কর ধার্যের নূতন পদ্ধতি ও ভারতীয় অর্থনীতিতে ইহার প্রতিক্রিয়া

শ্রী এ. ভি. প্রেক্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্বেই আমরা ভারতের কর পদ্ধতির ধারা আলোচনা করিয়াছি। ভারতের অর্থনীতি আজ পরিপূর্ণভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবান্বিত। আমরা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যভাগে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমাদের সরকার ঠিক করিয়াছেন দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য ৪৫০০ কোটি টাকা করিবেন। প্রথম দুই বৎসরে প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে, অবশিষ্ট ৩০০০ টাকা পরবর্তী তিন বৎসরে ব্যয়িত হইবে। আমি যতদূর জানি গভর্ণমেণ্ট পরিকল্পনা কমিশনকে ভারতের অভ্যন্তরে অর্থ সংগ্রহের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে একটি স্মারক-লিপি প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন যাহাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য ৪৫০০ কোটি টাকা পাইতে পারেন। পরিকল্পনা কমিশনকে ইহাতে বলা হইয়াছিল যে কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে অর্থ-সংগ্রহ করা হইবে তাহাও যেন নির্দেশ দিয়াছেন।

আমাদের দেশে পরিকল্পনা একটা অব্যাহিত গোয়ার্তুমির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। যদিও নিত্যই নানাবিধ অসুবিধা দেখা দিতেছে এবং পরিকল্পনা কালে ৪০০৪ কোটি টাকা এইভাবে সংগ্রহ করা ও ব্যয় করা বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে। তথাপি পাঁচ বৎসরে ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের দুরাশা এখনও দূরীভূত হয় নাই। সম্প্রতি কিছু শুভ বুদ্ধি দেখা দিয়াছে কিন্তু তাহা পর্যাপ্ত নহে বলিয়া মনে হয়। যেহেতু উপর হইতে হুকুম আসিয়াছে সেই হেতু বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করিতেই হইবে এবং তাহার জন্য লোককে অতিরিক্ত কর ভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য জনগণের জীবনমান উন্নত করা। এই কথা এতবার এত ভাবে বলা হইয়াছে যে আজ ইহা একান্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। জনগণের জীবনমান কিরূপে উন্নত করা যায়? নিশ্চয়ই তাহা ধনী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শেষ নয়া পয়সাটি পর্যন্ত আদায় করিয়া নহে। এ সম্পর্কে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। বিখ্যাত ব্যাঙ্কার রথস্ চাইল্ড এই গল্পের নায়ক। একদিন কম্যুনিষ্ট পার্টির পাঁচজন সদস্য তাঁহার অফিসে গিয়া বলিলেন যে ফ্রান্সের ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ লোকের মধ্যে কেহই তাঁহার মত বিত্তশালী নহে। সুতরাং তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মনে করেন না যে আপনার সম্পূর্ণ বিলুপ্তির বিনিময়ে ফ্রান্সের প্রত্যেকটি লোকের সাধারণভাবে ধনী হওয়া উচিত?" ইহার উত্তরে রথস্ চাইল্ড বলিলেন, "আমি পরিপূর্ণভাবে আপনাদের মত সমর্থন করি। আমি ইহাও সমর্থন করি যে ফ্রান্সে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ লোক বাস করে। আপনারা কি দয়া করিয়া আমাকে বলিবেন যে আমার কত অর্থ আছে।" তাহার পর ঐ লোকেরা আর্থিক সম্পদের একটা হিসাব দিল। তখন রথস্ চাইল্ড বলিলেন, "আসুন আমার সমস্ত অর্থ এখন ফ্রান্সের লোকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিই।" তিনি ভাগ করিবার পর বলিলেন যে প্রত্যেকের ভাগে ২৫ হইতে ৩০ ফ্রাঙ্কের মত পড়িতেছে। সুতরাং আপনারা যাহারা এখানে আছেন তাহারা হিসাব মত আপনাদের প্রাপ্য গ্রহণ করুন।

উপরোক্ত কাহিনীটি হইতে ইহাই বোঝা যায় যে ২৫ বা ৫০ ফ্রাঙ্কের দ্বারা কোন ব্যক্তিকেই ধনী করা যায় না। সুতরাং ভারতবর্ষে ৩৭ কোটি লোকের মধ্যে যদি দেশের সমস্ত ধনী লোককে নির্ধন করিয়া সমস্ত লোককে নির্ধন করা যায় তাহা হইলেও ভারতের লোকেরা ধনী হইবে না। ধনীকে নির্ধন করিয়া নির্ধনকে ধনী করিবার ইহা পন্থা নহে, বা জীবনমান উন্নত করিবার ইহা পদ্ধতি নহে! এই পদ্ধতিতে ধনীকে নির্ধন করিয়া দেশের সমগ্র অধিবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্য বণ্টন করা সহজ হয়। জীবনমান উন্নত করা যায় না। ইহা ধন বণ্টনের পন্থা নহে, ইহা দারিদ্র্য বণ্টনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। সুতরাং ভারতবর্ষে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হইতেছে, তাহাতে প্রথমটি সার্থক না হইয়া দ্বিতীয়টি সফলতা লাভ করিবে! দেশের জীবনমান উন্নত করিতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। উৎপাদন বৃদ্ধির সাহায্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং অধিকতর জাতীয় আয়ের সুষ্ঠু বিতরণের ফলে দেশবাসীর জীবনমান উন্নত হয়।

সঞ্চয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূলধনের সৃষ্টি হইবে। অধিক মূলধন অধিকতর উৎপাদনের বৃদ্ধি করিবে। তাহার ফলে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ সম্ভব হইবে। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রী শ্রীঅশোক কুমার সেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুখপত্র 'ইকনমিক রিভিউতে' একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৯৫৭ সালের নভেম্বরের সংখ্যাটিতে তাঁহার এই প্রবন্ধটিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবন্ধ রচনার সময় যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যে ভাবে ভারতের সহিত পশ্চিমের দেশগুলির অবস্থা তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সাহায্য লইয়াছেন। মন্ত্রী হিসাবে তাঁহার সে সুযোগও ছিল। তাঁহার সিদ্ধান্ত সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীসেন নূতন কর কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি ও যৌথ সংস্থা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ভারতে যৌথ সংস্থা লাভের তুলনায় কর বৃদ্ধির যে প্রবণতা আছে ঠিক সেই অনুপাতে মুনাফা বৃদ্ধির তুলনায় সঞ্চয় হ্রাস পাইতেছে। যুক্তরাজ্যে তাঁহার মতে মুনাফার তুলনায় কর ও সঞ্চয়ের অনুপাত উভয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীসেন আরও বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫১ হইতে ১৯৫৫ সালের মধ্যে যৌথ কোম্পানীর তহবিলের অনুপাতে নূতন মূলধনের পরিমাণ ১৭ হইতে ১৮ শতাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষে ইহা ৫ শতাংশে স্থির হইয়াছে। শ্রীসেন বলেন যে মোট মূলধন গঠনের অনুপাতে মোট জাতীয় আয় ভারতবর্ষে ৭ শতাংশে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ক্ষেত্রে বাড়িতেছে। এই হার জার্মানীতে ২৩ শতাংশে, জাপান ২৪ শতাংশে, যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ শতাংশে। তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে বলেন যে ভারতবর্ষে বড় সমস্যা তাঁহার মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা। যতদিন পর্যন্ত তাহা না হয় ততদিন ভারতবর্ষের লোক বৃদ্ধির অনুপাতে কর্ম সংস্থান সম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষে যে বিরাট বেকার সমস্যা রহিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা চিন্তা করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে শ্রীসেন বলেন যে যৌথ কোম্পানী হউক, আর সরকারের ক্ষেত্রেই হউক মূলধন প্রবাহ ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। আজ পর্যন্ত বাজারে যে মূলধন সংগ্রহ করা হয় তাহা মুখ্যতঃ বিভিন্ন সঞ্চয় হইতে সংগৃহীত হয়। ভারতবর্ষে এই সঞ্চয় ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী—যৌথ সংস্থার ক্ষেত্রে ইহা মাত্র জাতীয় উৎপাদনের তুলনায় ৩ শতাংশে এবং অবশিষ্ট ৯৭ শতাংশ ব্যক্তিগত আয়ের অবদান।

শ্রীসেন বলেন যে বর্তমান করের হার অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এইভাবে ইহা চলিতে থাকিলে অর্থ-নীতির আইন অনুযায়ী সঞ্চয় নিম্নাভিমুখী হইবে। ইহা পার্লামেন্টের আইন দ্বারা রোধ করা যাইবে না। যুগের পর যুগ ধরিয়া মনুষ্য চরিত্রের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার দ্বারাই ইহা নির্ধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ যদি কর বৃদ্ধি করিয়াই যাওয়া হয়, তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে, যখন করবৃদ্ধি আয়বৃদ্ধি না করিয়া আয়ের হ্রাস ঘটাইবে। ভারতবর্ষে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। এখানে "The Law of Diminishing Returns" কার্যকরী হইতেছে। ভারতবর্ষে বর্তমান কর কাঠামো অধিকতর কর্মপ্রেরণা ও উপার্জনের উদ্দীপনা হ্রাস করিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে বাড়ীর উপর যে ট্যাক্স ধার্য করা হইতেছে, তাহা কোন কোন রাজ্যে এত বেশী যে লোকে আর নূতন বাড়ী নির্মাণ করিতে উৎসাহী হইতেছে না, এমন কি পুরাতন বাড়ী সংস্কার করিতেও নহে।

এক্ষেত্রে আমি ভারতের সহিত পশ্চিমের অর্থনৈতিক অবস্থার আনুপাতিক পর্যালোচনায় যে তুলনা মূলক পরিসংখ্যান ব্যবহারের কৌশল গ্রহণ করা হয় তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছি। সর্বপ্রথমে আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখ এই কৌশল অবলম্বন করেন। এমন সব বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া এই সব আলোচনা করা হইয়াছে যাহাতে লোককে সঠিক পরিস্থিতি নির্ধারণ করিতে সাহায্য করে না। যেমন, যদি ব্যক্তিগত আয়ের সহিত কর হারের যথাযথ সম্পর্ক না দেখানো করা হয় তবে তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু আয় ভারতবর্ষের ৩০ গুণ এবং যুক্তরাজ্যে ১৩ হইতে ১৪ গুণ বেশি। সুতরাং ভারতবর্ষের কর ভার ও ঐ দুইটি দেশের কর ভার ইহার মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্য কোথায়? তাহাছাড়া কর প্রদানকারী লোকের সংখ্যা। ভারতবর্ষে ৩৭ কোটি লোকের মধ্যে করপ্রদানকারী লোকের সংখ্যা ১ অংশের ১ শতাংশেরও কম। অথচ শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ৩০ হইতে ৫০ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষভাবে কর দেয়। ভারতবর্ষে জীবনযান কেবলমাত্র অধিকতর উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের দ্বারাই উন্নত করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হইল কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করা। আমার প্রতিদিনের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি আজ বলিতে পারি যে আমার ৩০ বৎসর শিল্প ব্যবসায়ের কর্মব্যস্ত দিনগুলিতে আমি কখনও এমন বেকার লোকের ভীড় দেখি নাই। ইহাই সম্পূর্ণ সত্যের স্বরূপ নহে, হয়তো প্রকৃত সত্য আরও ব্যাপক ও গভীর।　　(ক্রমশঃ)

---

১০৬ বৎসর পূর্বেকার অর্থনৈতিক প্রবন্ধ

সম্প্রতি আস্ত্র

রাজা রাজেন্দ্রলালা মিত্র, এল্, এল্, ডি, সি-আই-ই

বিনিময়—প্রত্যেক মানুষ কেবল এক এক প্রকার বস্তু পরিশ্রম পূর্বক উৎপন্ন করিয়া আপনার প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা পরিবর্তন করে। কেহ কার্পাস চাষ করে, কেহ সূত্র কাটে, কেহ বস্ত্র বয়ন করে, কেহ ইষ্টক নির্মাণ, কেহ বা গৃহ নির্মাণ করে। এইরূপে অনেকেই কোন না কোন বস্তুর উৎপন্ন করিতে নিযুক্ত আছে। কিন্তু আপন আপন পরিশ্রমোৎপন্ন দুই এক বস্তু ব্যতীত পৃথিবীর অন্য অনেক বস্তুতে তাহাদের

প্রয়োজন হইয়া থাকে। দেখ, যে ব্যক্তি পাদুকা প্রস্তুত করে, তাহার সেই পরিশ্রমোৎপন্ন পাদুকা দ্বারা, ভোজন, পান, বাসিবনাদি কার্য্য সকল কদাপি নির্বাহ হইতে পারে না। সুতরাং তাহার যে যে বস্তুতে আবশ্যক হয় তাহার জন্য সে অবশ্যই স্বকীয় প্রস্তুতীকৃত পাদুকা দিয়া থাকে। অন্যান্য অনেক ব্যক্তি এইরূপে নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে; এবং দেখিতে পাই যে তাহারা প্রতিদিন সভ্য সমাজ হইতে ভূরি ভূরি বস্তু তৎপরিবর্তে লইয়া আইসে। এইরূপ এক বস্তুর পরিবর্তে অন্য বস্তুর গ্রহণকে 'বিনিময়' শব্দে জানা যায়, এবং এই বিনিময় ক্রিয়া হইতে বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছে।

অংশকরণ—এক বিশেষ বাণিজ্য উপলক্ষেই যে এক এক মনুষ্য কেবল পরিশ্রমাদি করে এমন নহে; বিশেষ বিশেষ বস্তু উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত অনেকেই একত্রে পরিশ্রম করিয়া থাকে, এবং তাহা না হইলেও যে কষ্ট নিষ্পন্ন হয় না। পরস্পর সাহায্য না করিলে একখানি কাষ্ঠ পাঠক নির্মিত করিতে হইলে প্রথমতঃ খনিস্থ লোহা উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারা অস্ত্রাদি নির্মাণ করত তাহা দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদ, এবং তজ্জাতকাষ্ঠে পীঠক প্রস্তুত হয়। ফলতঃ এক পীঠকের নিমিত্তে এক ব্যক্তির সমুদায় পরমায়ুক্ষেপ করিতে হয়। পরস্পর সাহায্যে ঐ পীঠক নির্মাণে একদণ্ড কালও লাগে না। এতদ্রূপে এক একখানা ছুরিকা কিংবা এক একটা আলপিন নানা কর্মণ্য ব্যক্তির হস্তে গিয়া তাহাদের প্রত্যেক হইতে ইহা নিজ অবয়বের কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়। অবশেষে উৎপন্ন বস্তু বিক্রয় দ্বারা উপস্বত্ব উৎপন্ন হইলে পর স্ব স্ব প্রধানুসারে শ্রমিকরা সকলেই তাহা অংশ করিয়া লইবার যোগ্য হয়। আর যেভাবে এই লব্ধ বস্তু অংশ করিয়া লওয়া যায় সুবিজ্ঞ পরিমিত করিয়া তাহার "অংশ করণ" শব্দ কহিয়া থাকেন।

ব্যয়করণ—বস্তু সকল উৎপন্ন হইলে মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে, কখন বা ঐ উৎপন্ন বস্তুতে অন্য কিছু উৎপন্ন করিতে আবশ্যক হয়। গম প্রস্তুত হইলে পর তাহাতে ময়দা প্রস্তুত করা যায়। অথবা তদবলম্বনে মানবজাতির প্রয়োজন সম্পাদন করা যায়। কারণ ইহাতে রুটি প্রস্তুত হয়; এবং তাহাতে ক্ষুধার শান্তি হয়। এইরূপে বস্তুর ব্যবহারকে সম্পত্তি শাস্ত্রজ্ঞেরা "ব্যয়" শব্দে ব্যক্ত করেন। এবং বিধায়ে সম্পত্তি বা বিতব্যয় শাস্ত্র উপস্বত্ব, বিনিময়, অংশকরণ, এবং ব্যয়করণ এই চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

মূল্য পরিবর্তন—সচরাচর মনুষ্যেরা এক মূল্যের বস্তু অন্য মূল্যের বস্তুর সহিত পরিবর্তন করিতে যত পরিশ্রম করিতে থাকে মূলবস্তু ততই উত্তরোত্তর অপরিমিতরূপে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু বহুদেশে বস্তু বস্তুন্তরের সহিত পরিবর্তকরণে পরিশ্রম করা যায় তাহার মূল্য পোষাইলে উহার মূলের যত ইচ্ছা তত কেন পরিবর্তন হউক না তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

মূল্য বৃদ্ধি—প্রকৃত বস্তু যদি আকারান্তরে পরিবর্ত করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার মূল্য পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ বস্তুর পূর্বমূল্য ও বর্তমান মূল্যে যাদৃশ বিভিন্নতা তাহার তুল্যই প্রকৃতের বৃদ্ধি পরিগণিত হয়। বিভিন্নতার তুল্য বৃদ্ধি বলিবার হেতু এই যে বস্তুত একটা নূতন মূল্য নির্ধারিত হইলেই তাহার পূর্বমূল্যের ধ্বংস অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এবং প্রকৃত বস্তু দিয়া বস্তুন্তর প্রস্তুত করিয়া আমরা যে অধিক মূল্য পাই তাহাতেই আমাদের লাভ বোধ হয়। এইরূপে কৃষকের শস্যোৎপাদন বিষয়ে শস্যের বীজ বপন, সার মাটি প্রদান, দৈহিক পরিশ্রম, জল সেচনাদি করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের এক বস্তু দিয়া অন্য বস্তু লাভ করা হইল। আর

* গতমাসে হিসাবের ভুলবশতঃ '১৮৪ বৎসর পূর্বেকার প্রবন্ধ' বলিয়া ছাপা হইয়াছিল। তাহা ঠিক নহে। আঃ প্রঃ সঃ

শস্য উৎপন্ন করিতে তাহার যত আবশ্যক হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ লাভ করিয়া ধনসম্পন্ন হইয়া উঠে।

মূলধন দুই প্রকার; "উৎপাদক" এবং "অ-মুৎপাদক।" যে মূলের পরিবর্তনে বৃদ্ধি হয়, কিংবা যাহাতে বার্ষিক আয় বৃদ্ধি করে তাহার নাম "উৎপাদক মূল।" যে মূল হইতে কিছুই উৎপন্ন বা বৃদ্ধি হয় না, কেবল অকর্মণ্যরূপে থাকে তাহার নাম "অমুৎপাদক মূল।" বাণিজ্যে বা ঋণে ন্যস্ত টাকা, যাহা ব্যাঙ্ক বা মুনাফা দ্বারা প্রত্যহ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা উৎপাদক ধনের মধ্যে গণ্য হয়। স্বর্ণাভরণাদি বহুমূল্য বস্তু যাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় না তাহা সুতরাং অমুৎপাদক শব্দ বাচ্য হয়।

ধনপরিমানাপেক্ষায় মুদ্রার ভাগ অতি অল্প, কিন্তু সভ্য জাতিদিগের মূলধনের মধ্যে ইহা অতি প্রয়োজনীয় অংশরূপে পরিগণিত। অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে আমরা পরস্পর অনায়াসে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রিয় বিক্রয় বিনিময়াদি দ্বারা সাধন করিতে পারি। ফলতঃ ইহা সপ্রমাণযোগ হইতেছে যে টাকা এদেশে মূলধনের কিয়দংশ মাত্র। এইরূপ নগরীর কোন ব্যক্তির নিকটে যে কিছু টাকা থাকে সে তাহার অন্যান্য মূলধনের অপেক্ষায় অত্যল্প অংশ হয়। এতাদৃশ সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটস্থ টাকা অল্পাংশ হওয়াতে সুতরাং অন্য ধনাপেক্ষায় টাকার সমষ্টি অল্পাংশ অবশ্যই হইবেক।

স্থায়ী এবং ব্যাপক মূলধন—অবস্থান্তরে মূলধন অপর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রথমতঃ, যে ধনের অবলম্বনে মূলধন স্বামী তাহার আকার পরিবর্তন করিয়া বিশিষ্ট প্রকার লাভ করিয়া থাকে, তাহার নাম "ব্যাপক মূলধন।" আর (দ্বিতীয়) এতাদৃশ পরিবর্তন করিবার জন্য ধনস্বামী যাবৎ পর্যন্ত যে সকল যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহারই দ্বারা লাভ জন্মায় তাবৎ পর্যন্ত তাহার নাম "স্থায়ীমূল" কহা যায়। এই নিয়মানুসারে শ্রম এবং সার প্রভৃতি, কৃষকদিগের শস্য সামগ্রী, ও পশম এবং শিল্পকরদিগের অসম্যক প্রস্তুত তুলকাদিগের ব্যাপক মূলধন কহিতে পারি। লাঙ্গল, চাষের মই, গোলাঘর এবং একের ভূমি, অপরের গৃহ ও যন্ত্রাদিই তাহাদের স্থায়ী মূলরূপে গণ্য হয়।

ব্যক্তিদিগের সৌভাগ্যাবস্থা হইলেই তাহারাই সততই উক্তরূপে স্থায়ি মূলধন ব্যাপক মূলধনের সহিত পরিবর্তন করিয়া থাকে। কৃষকগণ ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা অতিরিক্ত ভূমি ও অস্ত্রাদি ক্রয় করে, কিংবা তদ্বারে উত্তম বেড়া দেয় ও শস্য রাখিবার গোলাঘর বাঁধে। শিল্পীরা এক বৎসরের লভ্যে পর বৎসর তাহার শিল্প স্থানের উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। এইরূপে বর্ষে বর্ষে শিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগের যে উপস্বত্ব হয়, তাহা অধিকাংশ রথ্যা, খাল, কর্মশালা এবং অন্যান্য উন্নতির উপায় সকল করিতে ব্যয় হইয়া থাকে।

এতাদৃশ ব্যাপারের সততানুশীলনের লাভজনক ফল অনায়াসেই আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। কিন্তু স্থায়ীমূলের ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া থাকে। একারণ এক পুরুষের ধন পুরুষান্তরে সংক্রান্ত হয়; এবং বর্ষে বর্ষে জীবনোপযোগী দ্রব্যজাত নগর যত সুশোভিত হইতে থাকে ততই তাহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। বহুকাল অতীত হইল এদেশীয়েরা স্বদেশে যে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়াছিল তদপেক্ষায় আমরা এক্ষণে যে অধিক সুখ সম্ভোগ করিতেছি সে কেবল সম্পূর্ণরূপে ভূমির উর্বরতা নিবন্ধন। যেমন মনুষ্যের পরিশ্রমের ফল তাহাদের বংশ পরম্পরায় সংক্রান্ত হইয়া থাকে, তেমনি একজনের

মনুষ্যের কৌশল ও পরিশ্রম এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও রীতির অবলম্বনে তৎপর সময়ের মনুষ্যেরা উপস্থর সকল আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়।

পরিশ্রম—মনুষ্য জাতির পরিশ্রমের স্বরূপ ও ভেদ নিরূপণ মানবগণ দ্রব্যের মূল্য বিধান জন্য যে কোন প্রকার আয়াস করিয়া থাকেন তাহার নাম "পরিশ্রম"। মনুষ্যের ক্ষমতা সহকারে যে মূল্য সৃষ্ট হয় তাহার প্রভেদ বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে আমাদিগের নয়নগোচর অবশ্যই হইবেক যে মানবীয় শ্রম বিবিধ প্রকারে বিনিযুক্ত হয়। প্রথমতঃ দ্রব্যসকল প্রকৃতিসিদ্ধ ভৌতিক আকারে পরিণত হইয়া রূপান্তর হয়। ইহার নিদর্শন কৃষক আদৌ ক্ষেত্রে শস্যের বীজ বপন করে, তাহা প্রস্তুত হইলে কর্তন করে, পরে তাহার বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার অনেক অবয়বে নানাবস্তু নির্মিত হয়। যথা, এক ব্যক্তি সূত্রধর এক বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড হইতে কোন প্রকার দ্রব্য বা পাত্রের অবয়ব নির্মাণ করে। তৃতীয়তঃ, কতক দ্রব্য কেবল স্থানমাত্রে পরিবর্তিত হয়। যেমন নাবিকেরা আপন আপন নৌকা বোঝাই করিয়া দ্রব্যসকল এক দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যায়। উৎপত্তি বিষয়ে মানবীয় পরিশ্রমের মুখ্য তাৎপর্য এই যে তাহা হইতে কোন না কোন প্রকার ফল অবশ্যই উৎপন্ন হইবেক। আর এই শ্রমের ভিন্নতা সম্পাদনার্থেই শ্রমিরা কৃষি, বস্তুৎপাদন ও বাণিজ্য প্রভৃতি কর্মের ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লেখ করিয়া থাকে।

এতৎ সমুদায়ে এই প্রতিপন্ন করা গেল, যে মনুষ্যের সুখ ও স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবার জন্যে সর্বপ্রকার মানবীয় শ্রম বিনিয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক; এবং এই রীতি অনুসারেই এক ব্যক্তি অন্যের আশ্রয় ব্যতীত কোন কার্য সাধন করিতে পারে না। যদি কৃষি বিষয়ে লোক শ্রম না করিত তাহা হইলে সকলে অনাহারে মরিত। যদি কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম করিবার প্রথা না থাকিত তবে মনুষ্যেরা শীতাদিতে বাঁচিত না। যদি নানাবিধ বস্তুজাত একদেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাইবার পদ্ধতি না হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব শ্রমের ফল ব্যতীত অন্য কিছুমাত্রের সুখভোগ করিতে পারিত না। ইহার তাৎপর্য এই যে এই ভূমণ্ডলে কতক লোক কেবল আপন আপন শ্রম ও দুঃখ সহকারে দিনপাত করিয়া আসিতেছি। তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে, আর তাহারা কোনকালেই সুখী হইতে পারে না। অতএব এতাদৃশ কৃষক, শিল্পী ও বণিকগণ যদি আপনা আপনি ঈর্ষাদি করে তাহা হইলে তাহাদের অনভিজ্ঞতা আমরা অনায়াসেই দেখিতে পারি। ইহারা তুল্যরূপেই পরস্পর উপকারী, এবং এক এক শ্রেণী অপর শ্রেণীদ্বয়ের সহায় হইয়া থাকে।

কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি এমন আছেন যে তাহারা না শিল্পী, না কৃষক, না বণিক, কেবল ছাত্র বা দার্শনিক, কিম্বা ব্যবস্থাপক অথবা চিকিৎসক, বা ধর্মোপাসকরূপে কালহরণ করিয়া আসিতেছেন। এতাদৃশ ব্যক্তিরাই সভ্য সমাজে অন্যান্য ব্যবসায়ি শ্রেণী হইতে বিশিষ্ট প্রকার উপযোগী ও ভূরি পারিতোষিকের যোগ্য হন।

দ্রব্যগুণ বিশেষ বলে মানব শ্রমের
ফলোপধায়কতা বৃদ্ধি করে, তদ্বিষয়॥

মনুষ্যেরা স্বীয় শ্রম সহকারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে যে ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় সেই সমুদয় ফলই মানবীয় শ্রমের ফলোপধায়কতা দ্বারা উৎপন্ন ইহা অনুমান করিতে সমর্থ হই। এইরূপে কৃষক

ঐকাহিক পরিশ্রমের দ্বারা যদি একজন পরিমিত শস্য উঠাইতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার শ্রমের ফলোপযোগিতাই সেই মণ পরিমাণের তুল্য হয়। যদি সেই শ্রমে দুই মণ উঠায় তাহা হইলে সেই শ্রম দুই মাপের সদৃশ হইয়া উঠে। একজন সূত্রকার একদিনে এক সের তুলা কাটিয়া সূত্র প্রস্তুত করিতে পারিলে সেই প্রস্তুত সূত্রই তাহার শ্রমের ফলোপযোগিতারূপে গণ্য করিতে হইবেক। যদি সেই শ্রমে দশসের তুলা কাটিতে পারে তাহা হইলে তাবন্মাত্রই তাহার শ্রমের ফল হইবেক। ইহাতে এই প্রতিপন্ন করা হইল যে শ্রমের ফলোপযোগিকতাদিকাই সেই শ্রমের ও তৎপ্রতিবাসিবর্গের উৎকৃষ্ট ফল ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছেন যে কৃষকের পক্ষে হাজা শুষ্ক ভূমি অধিকার করা অতি শ্রেয়স্কর, কারণ একবৎসর পরিশ্রম করিয়া পূর্বোক্ত ভূমিতে যত শস্য উৎপন্ন করিতে পারে তাহা হইতে ঐ পরিশ্রম অধিক শস্য উর্বরা ভূমিতে জন্মাইতে পারে সন্দেহ নাই।

———

পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ ও গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা

(২১৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তৈরী হবে তার স্থান নির্বাচন ও এই সেতু সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য যখন "বিশ্বেশ্বরাইয়া সভা" নিযুক্ত হন তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শত চেষ্টা সত্ত্বেও উক্ত সভা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত স্থান—ফরাক্কায় এই বাঁধ নির্মাণ সমর্থন না করে বিহারের মোকামাতে সেতু নির্মাণের সুপারিশ করেন। এ প্রসঙ্গে আরও যে দুটি জায়গার নাম উঠেছিল সে দুটি হচ্ছে পাটনা এবং ভাগলপুর। জানি না, মোকামাতে সেতু নির্মাণের সুপারিশের পেছনে কোন রকম "কিন্তু" ছিল কিনা, তবে গঙ্গাবাঁধের স্থান হিসাবে ফরাক্কা তথা পশ্চিমবঙ্গের দাবী উপেক্ষিত হয়েছিল প্রধানতঃ ব্যয় বাহুল্যের জন্য—বিশ্বেশ্বরাইয়া সভা এরকম নজীরই দেখিয়েছিলেন। যাই হোক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় বিশেষতঃ মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ রায়ের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার "সেন্ট্রাল ওয়াটার এণ্ড পাওয়ার কমিশনে"র পরিকল্পিত ৪০ কোটি টাকার গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনাকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই পরিকল্পনা মতে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব সীমান্তে ফরাক্কা অঞ্চলে গঙ্গার উপর একটি বাঁধ ও সেই সঙ্গে একটি সেতু তৈরী হবে এবং এরই নাম দেওয়া হয়েছে "গঙ্গা বাঁধ" বা 'ফরাক্কা বাঁধ।"

যদিও উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ সাধনের জন্যও গঙ্গা বাঁধের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্ব এবং দক্ষিণবঙ্গের পুনরুজ্জীবন বিশেষ করে কলিকাতা বন্দরকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য। এককালে ভাগীরথীই ছিল গঙ্গার মূল প্রবাহ পথ। তারপর কালের প্রবাহে নানা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে গঙ্গা তা'র গতিপথকে ঘুরিয়ে নিয়ে ফরিদপুর জেলায় গোয়ালন্দের কাছাকাছি মিলিত হলেন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে; সেই সময় থেকেই ভাগীরথী তথা দক্ষিণবঙ্গের দুর্দশার দিন শুরু হয়েছে। এই দুর্দশা চরমে পৌঁছোলো যখন গঙ্গা তা'র গতিপথ সরিয়ে নিলেন আরও কয়েক মাইল উত্তরে এবং তার ফলে ভাগীরথীর সঙ্গে গঙ্গার যোগাযোগ একরকম বন্ধ হয়ে গেল। আজকের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে বর্ষার দু'মাস (শ্রাবণ, ভাদ্র) ছাড়া গঙ্গার সঙ্গে ভাগীরথীর যোগাযোগ একরকম থাকে না বললেই চলে। তার ফলে ভাগীরথী নদী তথা সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ আজ মহা সঙ্কটের মুখে উপস্থিত হয়েছে।

প্রথমতঃ ঊর্ধস্রোতে ভাগীরথী যথেষ্ট জলপ্রবাহ না পেয়ে দক্ষিণ—পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নদী—শাখানদী ও খালগুলো হেজেমজে গেছে এবং তা'র ফলে এক এক জায়গায়, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, চব্বিশপরগণা ও নদীয়া জেলায় বহু বিঘাট বিঘাট বদ্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই জলাশয় গুলো একদিকে যেমন কোটি কোটি মশামাছির জন্ম দিয়ে জনস্বাস্থ্যকে ব্যাহত করছে তেমনি আবার বহুচাষের জমিকে জলের তলায় ডুবিয়ে রেখে কৃষি ও কৃষকের সর্বনাশ করেছে। চব্বিশ পরগণা জেলার সোনারপুর আরাপাচ অঞ্চলে এই ধরণের এক জলাশয়কেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ পাম্পের সাহায্যে জল নিকাশ করে চাষবাসের যোগ্য করে তুলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ভাগীরথীর জলধারা শুকিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বন্দরেরও নিশ্চিত মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে কেবল অবিরাম নদীগর্ভ খুড়ে খুড়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে এই বন্দরকে। জোয়ারের সময় বঙ্গোপসাগর থেকে যে সমস্ত পাথরবালি ও পলিমাটি জোয়ারের টানে ঢুকে পড়ে ভাগীরথীর মোহনায় এবং কতকাংশে অভ্যন্তরেও। ভাঁটার সময় তা'র সব বেরিয়ে আসতে পারে না; উপরন্তু ঊর্ধ প্রবাহে ক্ষীণস্রোতও এদের বের ক'রে দিতে পারেনা।

তৃতীয়তঃ ঊর্ধপ্রবাহে বছরের দশমাস কাল জল না পেয়ে ভাগীরথী নদী কেবল বেঁচে আছে জোয়ারের জলের উপর। জোয়ারের সময় বঙ্গোপসাগরের খানিকটা জল ঢুকে পড়ে নদীর ভিতরে এবং তারই ফলে কোনমতে বেঁচে আছে এই মুমূর্ষু নদীটা। কিন্তু বিপদ হচ্ছে এই যে জোয়ারে যে সমুদ্রের জল প্রবেশ করে ভাগীরথীতে তা'র সবটাই লোনা। ঊর্ধপ্রবাহে স্বাদু জল না পেয়ে ভাগীরথীর জল বিশেষ করে গ্রীষ্মের কয়েক মাস এত লবণাক্ত হয়ে ওঠে যে কলিকাতা শহর এবং ভাগীরথী তীরের বিস্তৃত শিল্পাঞ্চলে এই সময় প্রচণ্ড জল-কষ্ট দেখা দেয়। এছাড়া মূল নদী ভাগীরথীর জল লবণাক্ত হবার ফলে আশে পাশের সমস্ত শাখানদী ও উপনদীগুলোর জল ও অল্পবিস্তর লবণাক্ত হয়ে পড়ে। খাল, বিল, নদী, নালা দিয়ে এই লোনা জল চাষের জমিতে প্রবেশ করে জমিকে চাষের অযোগ্য ক'রে তুলেছে। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ এবং সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে এই সমস্যা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। বালি জমে সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলোর জল ধারণ ক্ষমতা একেবারেই কমে গেছে। ফলে জলের চাপ একটু বেশী হ'লেই বহু জায়গায় অসংস্কৃত বাঁধ ভেঙ্গে জোয়ারের জল প্রবেশ করছে চাষের জমিতে এবং মাইলের পর মাইল জমির ফসল নিঃশেষে গ্রাস করছে প্রতি বছর।

এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস নিয়েই রচিত হয়েছে গঙ্গা বাঁধ তথা গঙ্গা সেতু পরিকল্পনা (Ganga Bridge-Cum-Barrage Project)। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাগীরথী ও গঙ্গার উপর দুটী বাঁধ ও এদের সংযোগকারী একটি খালের সাহায্যে ভাগীরথীর জল প্রবাহে নূতন করে আবার প্রাণ-সঞ্চার করা হবে। প্রথম বাঁধটী হবে গঙ্গার উপর উপর—ফরাক্কার কাছাকাছি এবং এই বাঁধের সাহায্যে জলের গতিকে কতকাংশে রুদ্ধ করা হবে। ফরাক্কার কাছে এই যে বাঁধ দেওয়া হবে এই বাঁধের উপর দিয়ে তৈরী হবে রেলপথ—যার মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণ-বাংলার ভেতর সৃষ্টি হবে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। এই রেলপথের সঙ্গেই আবার থাকবে মোটর চলাচলের জন্য এক পাকা রাস্তা। পরিকল্পনার দু নম্বর বাঁধটী হবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুরের কাছে—ভাগীরথী নদীর উপর উপর। ফরাক্কার কাজে বাঁধ বেধে যে জল ধরা হবে খাল কেটে সেই জল এনে ফেলা হবে জঙ্গীপুরের বাঁধের মুখে—ভাগীরথী নদীতে। জঙ্গীপুরের বাঁধের সাহায্যে এই খালের জল প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং ঊর্ধপ্রবাহে যে সব বালি ও

পাথর আনবে সেগুলোর অপসারণের ব্যবস্থা হবে। বলা বাহুল্য যে ফরাক্কার বাঁধের তুলনায় জঙ্গীপুরের বাঁধ অনেক ছোট হবে।

এই হ'ল পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাগীরথী থেকে খাল কেটে জলঙ্গী জলঙ্গী থেকে খাল কেটে মাথাভাঙ্গা এবং মাথাভাঙ্গা থেকে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও চব্বিশপরগণা জেলার অন্যান্য নদী নালাগুলোতে নবজীবনের স্পন্দন জাগিয়ে তোলা হবে। গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য ব্যয় অনুমিত হয়েছে ৩৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে রেলপথ ও মোটর চলাচলের রাস্তা তৈরীর খরচ বরাদ্দ হয়েছে ৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা। এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমানভাগে বহন করবেন বলে জানা গেছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে যে খরচ হবে তা'র উপর বছরে লাভ হবে শতকরা প্রায় ৫ টাকা হারে। রেলপথে বাহিত মালের শুল্ক থেকেই এই লাভ অর্জিত হবে বলে অনুমিত হয়েছে। অতএব হিসেব মত দেখা যাচ্ছে যে গঙ্গাবাঁধ শেষ হবার ১৫।২০ বছরের মধ্যেই এর জন্যে ব্যয়িত অর্থের সবটাই উঠে আসবে লাভ মারফৎ।

যাইহোক এককথায় বলতে গেলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র পূর্ব ভারতের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে। প্রথমতঃ উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে রেল ও মোটর পথে যোগাযোগ স্থাপন হওয়ায় এই দুই অঞ্চলেরই শিল্প বাণিজ্য সমৃদ্ধ হবে এবং সেইসঙ্গে জনসাধারণের যাতায়াতের পথ সুগম হবে। দ্বিতীয়তঃ নদীপথে কলিকাতার সঙ্গে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের যাতায়াত ও মাল পত্র পাঠান চলবে। এতে করে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাৎভূমি বাড়বে এবং বন্দর সমৃদ্ধ হবে। তৃতীয়তঃ উৎপ্রবাহে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলপ্রবাহ পেয়ে মুমূর্ষু ভাগীরথী ফিরে পাবে তা'র স্বাভাবিক গতি এবং নদীগর্ভে বালি ও পাথর জমা বন্ধ হয়ে যাবে। এতে করে কলিকাতা বন্দর তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রক্ষা পাবে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে। ভাগীরথী উৎপ্রবাহে তাঁর স্বাস্থ্য জলের পূর্বপ্রবাহ ফিরে পাওয়ায় একদিকে যেমন কলিকাতা ও ভাগীরথী তীরের শিল্পাঞ্চলের পানীয় ও শিল্পে প্রয়োজনীয় স্বাদুজলের অভাব মিটে যাবে অন্যদিকে তেমনি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ ক'রে সুন্দরবন অঞ্চলের জল ও চাষের জমির অতি লবণতা কমে যাওয়ায় কৃষিরও যথেষ্ট উন্নতি হবে। এছাড়া নতুন জলপ্রবাহ পাবার ফলে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার বদ্ধ জলাশয় গুলোর সংস্কার সম্ভব হবে; কৃষি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা আজ পশ্চিমবঙ্গের জীবনমরণের সমস্যা। যতদিন যাবে এ সমস্যা ততই জটিলতর হয়ে উঠবে। এ পরিকল্পনাকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রহণ না করবার পেছনে প্রধানতঃ অর্থাভাবের দোহাই দেওয়া হয়েছিল; তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাও সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও হবে এমন কোন আশা ও আশ্বাসের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এখন হেনলান রিপোর্টের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। পশ্চিম বাংলার বিধান সভায় বিরোধী সদস্যদের চাপে যে কথা বাংলার মেচমন্ত্রী বলেছেন, তার মধ্যে সত্যতা থাকলেও আজ আর আস্থা স্থাপন কেউ করতে পারেন না। এতে তার অযোগ্যতা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়েছে। আর নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে আজ একথা স্বীকার করতে হচ্ছে যে গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার আজ পর্যন্ত যে মনোভাব দেখিয়েছেন সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের অপক্ষপাত নীতি ও অঙ্গীকার বোধের বিরুদ্ধে চিরদিন সাক্ষ্য দেবে।

মাঝারি আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঋণ দানের জন্য রিফাইন্যান্স কর্পোরেশন গঠিত

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে রিফাইন্যান্স কর্পোরেশন অব ইনডাষ্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি প্রাইভেট যৌথ প্রতিষ্ঠান রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। বোম্বাইস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখনে ঐ প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্টার্ড অফিস থাকিবে। বেসরকারী প্রচেষ্টায় মাঝারী আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই কর্পোরেশন গঠন করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে নাম হইতে উপলব্ধি হয় যে ইহা কোন প্রতিষ্ঠানকে নিজে অর্থ-ঋণ দেওয়ার জন্য গঠিত হয় নাই, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ঋণ দানের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যই ইহা গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন ব্যাঙ্ক যাহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যাহাতে নিয়ম মানিয়া ঋণ দেয় সেজন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করা। এই কর্পোরেশনের মঞ্জুরীকৃত মূলধন ২৫ কোটি টাকা। আপাততঃ সাড়ে বারো কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং ১৫টি বড় বড় তপশীলিভুক্ত ব্যাঙ্ক দিবেন। এই ব্যাঙ্কগুলি হইল ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ন্যাশন্যাল ওভার্সিজ এণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, এলাহবাদ ব্যাঙ্ক, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, মারকেনটাইল ব্যাঙ্ক দেবরণ নানজি ব্যাঙ্কিং কোং এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ হায়দ্রাবাদ।

১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে ভারত সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে যে কৃষিপণ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তদনুযায়ী উল্লিখিত ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে ভারতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরায় ঋণ দেওয়ার জন্য কাউন্টারপার্ট তহবিল হইতে প্রায় ২৬ কোটি টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। ভারত সরকার মধ্যে মধ্যে সুদবাহী ঋণ হিসাবে কর্পোরেশনকে টাকা দিবেন এবং কউাণ্টারপার্ট তহবিল হইতে যথাসময়ে টাকা লইবার ব্যবস্থা করিবেন।

এখন কর্পোরেশনের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় সাড়ে আটত্রিশ কোটি টাকা। এই টাকা হইতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তপশিলী ব্যাঙ্ক বরাদ্দ মত টাকা পাইবেন। সদস্য ব্যাঙ্কগুলি যে টাকা ঋণ দিবেন সেগুলি মাঝারী আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য। কোন প্রতিষ্ঠানকে ৫০ লক্ষ টাকা বেশী ঋণ দেওয়া চলিবে না। ঋণের মেয়াদ তিন বৎসরের কম বা সাত বৎসরের বেশী হইবে না। যে সকল প্রতিষ্ঠানের আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত টাকার পরিমাণ অনধিক আড়াই কোটি টাকা কেবল সেই সকল প্রতিষ্ঠান ঋণ পাইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই ঐ টাকা কাজে লাগাইতে হইবে।

ঐ কর্পোরেশনের ডিরেক্টার বোর্ডে আছেন সাতজন সদস্য—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর (চেয়ারম্যান) একজন ডেপুটি গভর্ণর, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান, জীবন বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং এই পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির তিনজন প্রতিনিধি।

———

হস্তলিপির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সাহায্য দান

নিখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ডের সুপারিশক্রমে উড়িষ্যা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম রাজ্যে হস্তশিল্পের উন্নয়নের কয়েকটি পরিকল্পনা ভারত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। এই সকল পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চারি লক্ষাধিক টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ১১টি পরিকল্পনার কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। সুরাইনার কাঠ ও পাথরের খোদাই কাজ শিল্প ও করস্থলের কারুকার্য খোচিত ছুরী উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ এবং শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির বাঁশ ও বেতের কাজ শিক্ষণ এবং উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ চালাইয়া যাওয়া হইবে। কৃষ্ণনগরে সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধার জন্য খেলনা এবং সুদৃশ্য মৃৎপাত্র,উৎপাদন কেন্দ্রস্থাপনের কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরেই সম্পূর্ণ হইবে। হস্তশিল্পীদের জন্য উন্নত যমুনা সরবরাহের কাজ চলিতে থাকিবে। মালদহ জেলার বিস্তাপীঠে হাতে ছাপার কাজ এবং গ্রামমাণ হস্তশিল্প শিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ পূর্বের ন্যায়ই চলিবে। আসাম রাজ্যে পুতুল, খেলনা এবং বাঁশ ও বেতের কাজ চাইবার জন্য ৩৪,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

বিহার রাজ্যে ৪টি উৎপাদন কেন্দ্র, তিনটি শিক্ষণ কেন্দ্র এবং তিনটি শিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ পূর্বের ন্যায়ই চলিবে। রাঁচীতে খেলনা উৎপাদন কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং দ্বারভাঙ্গা জেলায় বাঁশের কাজের কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য বিহার রাজ্যকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

উড়িষ্যা রাজ্যে বর্তমান আর্থিক বৎসরে পিতল, লৌহের ধাতু, সোনা, রূপা এবং শিংয়ের কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ, বেত ও বাঁশের কাজ, সুগন্ধি দ্রব্য ও খেলনার কাজ চালাইবার জন্য অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া পুরীর শিল্প ও কলা কেন্দ্র কটক ও বোড়কোলার দুইটি হস্তশিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শনশালা এবং হস্তশিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য গ্রামমাণ ভ্যান পূর্বের ন্যায় চালু থাকিবে।

ভারত হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি

গত ১৯৫৭ সালে ভারত হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানি কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারত হইতে প্রায় ১২০ রকমের ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে ডিজেল ইঞ্জিন, সেলাই কল, বৈদ্যুতিক পাখা, সেন্ট্রিফুগ্যাল পাম্প, কৃষি সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ও তৈল কলের যন্ত্রপাতির রপ্তানি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ডিজেল, ইঞ্জিনের রপ্তানি ১৯৫৬ সালের ৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৭ সালে ১০ লক্ষ টাকা হয়। ভারতের ডিজেল ইঞ্জিন ২৫টি দেশে রপ্তানি হইয়াছে। তবে বেশী রপ্তানি হইয়াছে বাহ্‌রাইন, ওমান, সাইপ্রাস ও থাইল্যাণ্ডে। আলোচ্য বৎসরে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার সেলাই কল রপ্তানি হয়, পূর্ববর্তী বৎসরে রপ্তানি হইয়াছিল ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার কল। ১৮টি দেশে কল রপ্তানি হয়, তন্মধ্যে বেশী রপ্তানি হয় অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল ও কেনিয়ায়। ১৯৫৭ সালে বৈদ্যুতিক পাখা রপ্তানি হইয়াছিল ১৮ লক্ষ টাকার, পূর্ববর্তী বৎসরে রপ্তানি হয় ১২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার। ৩০টি দেশে পাখা চালান হইয়াছিল। তবে বেশী চালান গিয়াছিল সিংহল,

ব্রহ্ম, মালয়, সিঙ্গাপুর, কুয়াইট ও পাইলাতে। আলোচ্য বৎসরে ও উহার পূর্ববর্তী বৎসরে সেন্ট্রিফুগাল পাম্প রপ্তানি হয় যথাক্রমে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ও ৫৩ হাজার টাকার।

কতকগুলি দ্রব্যের রপ্তানি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	১৯৫১ সাল	১৯৫৭ সাল
কৃষি যন্ত্রপাতি	৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা	১১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা
ছুরি কাঁচি ইত্যাদি	৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা	৮ ,, ,,
তেল কলের যন্ত্রপাতি	৮ ,, ৬০ ,, ,,	১৪ ,, ২০ ,, ,,
কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি	১ ,, ৫০ ,,	২ ,,
চাউল কল ও ময়দা কলের যন্ত্রপাতি	৩০ হাজার টাকা	১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা
জুতা তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি	১ লক্ষ ৮১'৫ হাজার টাকা	৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা

আলোচ্য বৎসরে চিনি কলের যন্ত্রপাতি, বল্‌টু, নাট রিভেট প্রভৃতি দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। তবে হারিকেন লণ্ঠন, সাইকেলের টুকরা অংশ, ড্রাই ব্যাটারি, সীল ব্যাবেল ও ট্রাক্টরের আমদানি হ্রাস পায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য সর্বাধিক পরিমাণে চালান যায়। ১৯৫৭ সালে রপ্তানিকৃত মোট ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানির পরিমাণ ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ও ৭৬ লক্ষ টাকা : অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ডে রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ৫ লক্ষ ও ২ লক্ষ টাকা। অন্যান্য দেশে রপ্তানির পরিমাণ ২৮ লক্ষ টাকা।

ভারতে তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যশস্যের উৎপাদন

১৯৫৭-৫৮ সালের চূড়ান্ত হিসাব

ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থ ও পরিসংখ্যান অধিকারের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতে মোট ১৬কোটি ৩৫লক্ষ ৫০হাজার একর জমিতে ৪কোটি ১২লক্ষ ২২হাজার টন ধান, জোয়ার, বজরা, ভুট্টা ও রাগী উৎপন্ন হয়। পূর্ববর্তী বৎসর মোট ১৬কোটি ২৫লক্ষ ৯৯হাজার একর জমিতে ৪কোটি ৩১লক্ষ ৪০হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসর অতিরিক্ত ৯লক্ষ ৫১হাজার একর জমিতে ঐ সকল তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যশস্যের চাষ হইলেও উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৯লক্ষ ১৮হাজার টন হ্রাস পাইয়াছে।

নিম্নে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ পৃথক পৃথকভাবে দেখান হইল :—

১৯৫৭-৫৮ সালে মোট ৭কোটি ৯০লক্ষ ২৭হাজার একর জমিতে ২কোটি ৪৮লক্ষ ২১হাজার টন ধান উৎপন্ন হইয়াছে ; পূর্ববর্তী বৎসর মোট ৭কোটি ৯৩লক্ষ ৩০হাজার একর জমিতে ২কোটি ৮০লক্ষ ৮২হাজার টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর ভারতে মোট ৪কোটি ১৪লক্ষ ১১হাজার একর জমিতে ৩৪লক্ষ ১৮হাজার টন জোয়ার উৎপন্ন হইয়াছিল ; পূর্ববর্তী বৎসর মোট ৪কোটি ৩লক্ষ ৬৭হাজার একর জমিতে ৭২লক্ষ ৪৯হাজার টন জোয়ার উৎপন্ন হইয়াছিল।

এই বৎসর ভারতে মোট ২কোটি ৭৪লক্ষ ৫৩হাজার একর জমিতে ৩৫লক্ষ ৬৫হাজার টন বজরা উৎপন্ন হয় ; ১৯৫৬-৫৭সালে মোট ২কোটি ৭৮লক্ষ ৮৪হাজার একর জমিতে ২৮লক্ষ ৮৫হাজার টন

বজরা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতে মোট ৯৭লক্ষ ৮২হাজার একর জমিতে ৩৫লক্ষ ৬৭হাজার টন ভুট্টা উৎপন্ন হয়; পূর্ববর্তী বৎসর মোট ৯১লক্ষ ৯৭হাজার একর জমিতে ৩০লক্ষ ৯হাজার টন ভুট্টা উৎপন্ন হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর ভারতে মোট ৫৮লক্ষ ৯৭হাজার একর জমিতে ১৭লক্ষ ১৯হাজার টন রাগী উৎপন্ন হয়; পূর্ববর্তী বৎসর মোট ৫৮লক্ষ ৩১হাজার একর জমিতে ১৭লক্ষ ১৫হাজার টন রাগী উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসর ভারতে ৩৫লক্ষ টন কম ধান উৎপন্ন হয়। চাষের জমির পরিমাণ হ্রাসই উহার একমাত্র কারণ। তথাপি এই বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের গড়পড়তা উৎপাদনের প্রায় সমান।

১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে অনাবৃষ্টি চলতি থাকায় আলোচ্য বৎসর ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও বোম্বাইয়ে অপেক্ষাকৃত কম জমিতে ধানের চাষ হয়। আলোচ্য বৎসর ধান উৎপাদনের ঘাটতি বহুলাংশে জোয়ার ও বজরার উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা পূরণ হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসর উহাদের উৎপাদন প্রায় ১৫লক্ষ টন বৃদ্ধি পায়; দেশের অধিকাংশ রাজ্যে বিশেষতঃ অন্ধ্রপ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মহীশূর, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে উহাদের উৎপাদন বাড়ে। অনুকূল আবহাওয়াই উহার কারণ। ১৯৫৭-৫৮ সালে দেশে ভুট্টা ও রাগীর উৎপাদনও কিছুটা বাড়ে।

আগামী লোকগণনাতে অর্থনৈতিক তথ্যসংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ

ভারতে ১৯৬১ সালের লোক গণনাতে অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হইবে। পরিকল্পনা রচনাকালে ইহা খুবই কাজে লাগিবে। সেজন্য পরিকল্পনা কমিশন, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং লোক গণনার তথ্য ব্যবহারকারী বিভিন্ন সংস্থার সহিত পরামর্শ করিয়া লোক গণনার প্রশ্নাবলী চূড়ান্তভাবে রচিত হইবে। তবে পূর্বের মত পরিবারের কর্তার সহিত অন্যান্যদের সম্পর্ক, বয়স, ধর্ম, জন্মস্থান, মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান, প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রশ্ন করা হইবে।

জীবিকার ভিত্তিতে—১৮৫১ সালের লোক গণনার মত এবারেও ধর্ম নয়, জীবিকার ভিত্তিতেই লোকদের শ্রেণীবিভাগ করা হইবে। কৃষিজীবীদের পুরাপুরি অধিকাংশ মালিকানা বিশিষ্ট জমির কৃষক, পুরাপুরি বা অধিকাংশই অনধিকৃত জমির কৃষক, কৃষি মজুর, জমির মালিক কিন্তু জমি চাষ করে না এবং খাজনা গ্রাহক। প্রত্যেক শ্রেণীতে আবার পোষ্যদের ধরা হইবে।

যাহারা বাণিজ্য, পরিবহন, অন্যান্য কাজ ও বিভিন্ন সূত্রে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন তাঁহারা এবং তাঁহাদের পোষ্যদের অকৃষিজীবি শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

ধর্মভেদ—ভারত সরকারের নীতি অনুসারে বিভিন্ন ধর্ম গণনা করা হইবে না। তবে তপশীলী ও তপশীলী উপজাতিদের বেলায় ইহা চলিবে। কারণ সংবিধানে তাহাদের যে সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা পালনের জন্য ইহা প্রয়োজন। সেন্সাস কমিশনের উপর লোক গণনার সকল কর্তৃত্ব থাকিবে। পূর্ববর্তী লোকগণনার মত ১লা মার্চ তারিখের ভিত্তিতে সকল গণনা করা হইবে।

পরিচালনা—লোকগণনা, রিপোর্ট তৈরী ও তালিকা প্রকাশের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করা হইবে। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে সংলগ্ন রাজ্যের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লোক গণনা কার্যের তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রত্যেক জেলায় লোক গণনার দায়িত্ব জেলা অফিসারের। তিনি এই উদ্দেশ্যে কর্ম নিয়োগ করিতে পারিবেন। ১৯৬০ সালের মে বা জুন মাসের মধ্যে কর্মীদের প্রস্তুত রাখিতে হইবে। সরকারী কর্মচারী, মিউনিসিপালিটি ও স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রয়োজন হইলে বেসরকারী লোকদের মধ্য হইতে কর্মী সংগ্রহ করিতে হইবে। লোকগণনা আংশিক সময়ের কাজ এবং এ পর্যন্ত ইহার জন্য কোন পয়সা দেওয়া হয় নাই।

সঙ্কর তুলা উৎপাদন

ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি জানাইয়াছেন যে, সুরাটের তুলা গবেষণা কেন্দ্রে এশীয় তুলার সঙ্গে মার্কিণ তুলার সংমিশ্রণ ঘটাইয়া সঙ্কর তুলা উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। এই জাতীয় সঙ্কর তুলা ভারতে এই প্রথম সৃষ্টি করা গিয়াছে। এই পদ্ধতিতে এশীয় তুলার কঠিনতার সঙ্গে মার্কিণ তুলার উন্নত অর্থনৈতিক দিকের অপূর্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। শুধু তাই নয় এই সঙ্কর তুলা কীট ও রোগের হাত হইতে আত্মরক্ষা করায় যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। উৎকর্ষের জন্য ইহা বোম্বাই রাজ্যের সবারকণ্ঠ, কেরা, পাঁচ মহল, বরোদা, ব্রোচ ও সুরাট জেলা এবং দাক্ষিণাত্যের খাল অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার গাঁইট। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১ লক্ষ ২০ হাজার গাঁইট।

এই সঙ্কর তুলার আঁশ লম্বা হইলেও সুতা কাটার দিক হইতে ইহার ক্ষমতা খুব বেশী নাই। সেজন্য সুরাটের গবেষণা কেন্দ্রে উপযুক্ত ক্ষমতা বিশিষ্ট তুলা নির্ধারণে ব্যাপক পরীক্ষা চলিতেছে। আশা করা যায়, বর্তমানের ভারত-মার্কিণ সঙ্কর তুলার পরিবর্তে বস্ত্রশিল্পের চাহিদা মিটাইবার উপযোগী সঙ্কর তুলা উৎপাদন সম্ভব হইবে এবং এইভাবে যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাইবে।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের রপ্তানির প্রচেষ্টা

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী শ্রীসতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে একদল বাণিজ্য প্রতিনিধি পূর্ব ইউরোপের কতকগুলি দেশ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ৩রা জুন (১৯৫৮) এখান হইতে রওনা হইয়াছেন।

বাণিজ্য প্রতিনিধিগণ ঐ সকল দেশে বাজারের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবেন এবং চা, কফি পাটজাত দ্রব্য নারিকেল ছোবড়াজাত দ্রব্য, তামাক, সপনা প্রভৃতি নানা প্রকার ভারতজাত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির পথে সহায়তা করিবেন। তাঁহারা ঐ সকল দেশের বাণিজ্য বিভাগ, বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থা ও সরকারের পদস্থ কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং বাণিজ্য-সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিবেন। তাঁহারা ঐ সকল দেশের বাণিজ্যগুলির প্রতিনিধিদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবেন।

ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিদল চেকোশ্লোভেকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লভিয়া, হাঙ্গেরি ও পূর্ব জার্মানি পরিদর্শন করিবেন। তাঁহাদের সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণেরও ইচ্ছা আছে। এই সুযোগে প্রতিনিধিগণ ভারতীয় দ্রব্যের উপযোগিতা বুঝাইয়া দিয়া রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করিবেন।

প্রতিনিধিদলে নেতা ছাড়া নয়জন সদস্য আছেন। উহাদের চারজন চা-শিল্পের, দুইজন পাট-শিল্পের এবং এক একজন নারিকেল ছোবড়া শিল্পের ও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের প্রতিনিধি।

নিউজপ্রিণ্ট বণ্টনের সুষম ব্যবস্থা

বর্তমান বৎসরের মার্চ মাস পর্যন্ত ছয় মাসে বিদেশ হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানীর লাইসেন্স প্রদানে নূতন পদ্ধতি গৃহীত হওয়ায় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হইয়াছে। অপর দিকে, যাহাতে উহা সর্বত্র পাওয়া যায় এবং সকল সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের দাবী মিটান যায় তাহার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী সংবাদপত্রসমূহে প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। প্রথমতঃ উহাদের আকৃতি, পৃষ্ঠা সংখ্যা, প্রচার সংখ্যা ও মুদ্রণের নিয়মানুবর্তিতা অনুযায়ী। দ্বিতীয়তঃ উহাদের অতীত ব্যয়ের হিসাবও পরীক্ষা করা হয়। ইহার ফলে সর্বত্রই আবেদনের তুলনায় কম পরিমাণে কাগজ আমদানীর লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার নিদারুণ অভাব দেখা দেওয়ার ফলেই আলোচ্য পদ্ধতি গৃহীত হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী লাইসেন্সের আবেদনপত্র পরীক্ষাকালে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, অনেক সংবাদপত্র বন্ধ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও বিদেশ হইতে কাগজ আমদানীর জন্য আবেদন করিয়াছেন আবার এমন কতকগুলি সংবাদপত্র আছে যেগুলি নিয়মিতভাবে বাহির হয় না অথচ পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণেই বিদেশ হইতে নিউজপ্রিন্ট আমদানী করে। কতকগুলি ছোট সংবাদপত্র আছে যাহাদের আকার খুবই ছোট এবং পৃষ্ঠা সংখ্যাও একের বেশী নয়। পূর্বেকার নিয়মানুযায়ী উহাদেরও অন্যূন ৫ টন নিউজপ্রিন্ট আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া হইত। এইভাবে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত নিউজপ্রিন্ট বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া অনেক প্রকাশকই উহা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করিত। যাহাতে সংবাদপত্র সমূহের ন্যায্য চাহিদার উপর অযথা চাপ না পড়ে সেজন্য ভারত সরকার ঐ দুর্নীতি রোধের জন্য আলোচ্য নূতন পদ্ধতিতে লাইসেন্স মঞ্জুরীর সিদ্ধান্ত করেন।

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় সঙ্কোচ পর্ষদের এক বৈঠকে বিদেশ হইতে নিউজপ্রিন্ট আমদানী হ্রাসের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা চলে। বৈঠকে স্থির হয় যে, ভারতের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রারের হিসাবের ভিত্তিতে প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রয়োজনের পরিমাণ কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। ইহাও স্থির হয় যে, এভাবে যে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হইবে তাহা অন্যান্য যে সকল সংবাদপত্র এতদিন পর্যন্ত বিদেশ হইতে নিউজপ্রিন্ট আমদানীর অনুমতি পাইত না, তাহাদের অনুকূলে ছাড়া হইবে।

স্থির হয় যে, প্রত্যেক সংবাদপত্র অনধিক ছয় মাসের প্রয়োজনীয় নিউজপ্রিন্ট মজুত করিতে পারিবে এবং যাহাদের মজুতের পরিমাণ কম প্রয়োজনবোধে তাহাদের লাইসেন্সের পরিমাণ বাড়ান হইবে। অপর দিকে, যাহাদের মজুতের পরিমাণ বেশী, তাহাদের লাইসেন্সের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে কমান হইবে। নূতন পদ্ধতি গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্র সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করা হয়। ভারতের মেসা মিলস এ প্রস্তুত নিউজপ্রিন্টের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ঐ নিউজপ্রিন্ট বণ্টনের ভার প্রেস রেজিষ্ট্রারের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

অর্থনৈতিক সমাজে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

ইউনাইটেড প্রভিন্সেস কমার্শিয়াল কর্পোরেশানের কারখানা পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী শ্রীঅজিত কুমার জৈনের ভাষণ

শ্রীঅজিত কুমার জৈন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী উপরোক্ত কারখানাটি পরিদর্শন করিয়া বলেন, আজ আমার কারখানাটির বিভিন্ন দিক পরিদর্শন করিতে করিতে মনে হইল, যে, আপনারা আমাদের দেশের মস্তবড় একটা অভাব পূরণ করিতেছেন। বহু সংখ্যক ট্রাক্টরের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য অংশ আপনারা এইখানে প্রস্তুত করিতেছেন—যেগুলি আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করি। আমি এমন মনে করি না যে প্রত্যেক দেশই তাহাদের প্রয়োজনীই সমস্ত জিনিষই তাহারা নিজেরাই উৎপন্ন করিবে বা প্রস্তুত করিবে। কারণ তাহাতে বিশ্বশান্তি অথবা বিশ্ব বাণিজ্য কোনটীরই উন্নতি সাধন হইতে পারে না। যদি কোন দেশ সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন করিতে চায় এবং কাহারও নিকট হইতে কিছু না লইতে চায়, তবে অন্যান্য দেশও তাহাদের নিকট হইতে কিছু লইবে না। ইহাতে ঐ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ক্ষুণ্ণ হইবে। কিন্তু কতকগুলি জিনিষ, বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য সামগ্রী আমাদের যতদূর সম্ভব প্রস্তুত করিতে হইবে এবং আমাদিগকে যতদূর সম্ভব স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে হইবে। আমাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আমরা ইহার উপর জোর দিয়াছি। আপনারা জানেন যে বর্তমান সভ্যতা মুখ্যতঃ দুইটি জিনিসের উপরেই নির্ভরশীল (একটি শক্তি অপরটি ইস্পাত) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ইহার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশ কৃষিসম্পন্ন। আমরা কৃষির উপরই শিল্পের চেয়ে বেশী জোর

দিয়াছি। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে কৃষি উৎপাদন হার অত্যন্ত নিম্ন এবং আমাদিগকে ইহা বাড়াইতে হইবে। পৃথিবী কোন দেশই কৃষি ও শিল্পের সমন্বয়পূর্ণ উন্নতি ব্যতীত অগ্রগতি লাভ করিতে পারে না। এবং আমাদের পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য আমাদিগকে অধিকতর খাদ্য উৎপন্ন করিতে হইবে। আমি কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য আমাদিগকে খাদ্য উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। আমাদের দেশের ৭৫ ভাগ লোক কৃষিকর্মে নিযুক্ত; সুতরাং আমাদিগকে শুধু পর্যাপ্ত কৃষি-পণ্য উৎপন্ন করিলে চলিবে না, উদ্বৃত্ত রাখিতে হইবে।

এই কারখানাটি কৃষি কার্যে যান্ত্রিকতার জন্য বিরাট আয়োজন করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ইহা যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। যখনই যান্ত্রিকতার কথা বলা হয়, তখনই একদল বলেন যে ইহার ফলে আমাদের গবাদি পশু নষ্ট হইয়া যাইবে এবং বহুলোক বেকার সমস্যার সম্মুখীন হইবে। কিন্তু ব্যাপারটি তাহা নয়। ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। এখানে বহু পতিত ও অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে। এমন নহে যে ভবিষ্যতে সমস্ত জমি ট্রাক্টর দিয়া চাষ হইবে, তবে যেখানে কঠোর শ্রম ও দ্রুত উন্নয়ন প্রয়োজন, সেখানে ইহা অবশ্যই কাজে লাগিবে। সম্প্রতি সুরাটে গড়ে ৩০ হাজার একরের একটি কৃষি-ক্ষেত্র আমি দেখিয়া আসিয়াছি। ঐরকম কৃষি খামারে সমস্ত জমি বিনা যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করা সম্ভব নহে, প্রকৃতপক্ষে ট্রাক্টর ঐখানে বিশেষ উপযোগী।

আপনারা এই শিল্পের সাহায্যে দেশের কল্যাণ করিতেছেন। আপনাদের শিল্পটি বেসরকারী ক্ষেত্রে একটি জাতীয় শিল্প। আমি আনন্দিত হইলাম যে আপনারা ২।৩ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ ট্রাক্টর প্রস্তুত করিতে পারিবেন। আমি আশা করি শ্রমিকের সহযোগিতায় এবং শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মৈত্রীতে এই কারখানাটির উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করিবেন। আমি ভবিষ্যতে আবার সুযোগ পাইলে আসিব এবং আপনাদের অগ্রগতি লক্ষ্য করিতে থাকিব।

———

প্রখ্যাত শিল্পবিদের বাণিজ্য সফর

কলিকাতার বিখ্যাত শিল্পবিদ, হ্যাশন্যাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীকেদার নাথ মুখোপাধ্যায় গত বৃহস্পতিবার (১৯শে জুন) এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশন্যালের বিমানযোগে বাণিজ্য সফরে গিয়াছেন। তিনি প্রথমে জাপান যাইবেন। পরে যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিবেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, হ্যাশন্যাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স পূর্বে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ছিল। সম্প্রতি ইহা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপায়িত হইয়াছে। ইহার সম্প্রসারণও দ্রুত চলিতেছে। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও অভিনব উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি আদর্শ রবার জাত দ্রব্য উৎপাদনের কারখানায় পরিণত করা শ্রীমুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য। তাঁহার এই সফরের উদ্দেশ্য এই কারখানার জন্য আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এবং ঐসব দেশের বৈজ্ঞানিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা।

———

আর্থিক সংবাদ

ভারত সরকার সম্প্রতি যে নূতন ঋণপত্র বিক্রয়ের ঘোষণা করিয়াছেন তাহার হিসাব নিম্নরূপ :

১৯২৩ সালে	পরিশোধনীয়	ঋণ (৩½%)	৫৩·০৬	কোটি টাকা
১৯৬৮	„	জাতীয় পরিকল্পনা ঋণ (৩½%)	৩৪·৩৪	„
১৯৭৩	„	ঋণপত্র	৪২·৪৭	„
		মোট	১৪১·৮৭	„

চা-এর রপ্তানি কর অপরিবর্তিত—কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, চা-এর রপ্তানি কর বাবদ উদ্দেশ্যে ভারত সরকার চা-এর মূল্য পাউণ্ড প্রতি ৩ টাকা ২৪ নয়া পয়সার স্থলে ৩ টাকা ৫০ নয়া পয়সা করিয়াছেন। বর্তমানে পাউণ্ড প্রতি ৩৮ নয়া পয়সা হারে যে রপ্তানি কর লওয়া হয় তাহা অপরিবর্তিত থাকিবে।

নিচুস্তরা চায়ের উৎপাদন শুল্ক হ্রাস—কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে চা শিল্পকে কিছুটা সাহায্য করার বিষয়ে সরকার চিন্তা করিতেছেন। তবে এ পর্যন্ত উৎকৃষ্ট চা-উৎপাদকের তুলনায় সাধারণ চা উৎপাদকের আরও বেশী সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা রচনা করা যায় নাই।

এই সমস্যাটি সমাধানে আরও সময় লাগিবে। তবে ভারত সরকার অবিলম্বে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—(১) যে চা প্যাকেটে বিক্রয় করার জন্য ব্যবহৃত হয় না তাহার উপর উৎপাদন শুল্ক পাউণ্ড প্রতি আধ আনা হ্রাস করা হইবে। (২) ১৯৪৩ সালের চা আইনের ২৫(১) ধারা অনুসারে ভারতের বাহিরে চা রপ্তানি কালে একশত পাউণ্ডের উপর ৪ টাকা হারে যে সেস লওয়া হয় তাহা অর্ধেক কমান হইবে। আগামী ১লা জুন (১৯৪৮) হইতে এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী হইবে।

১৯৬৭ সালে খনিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি—ভারতীয় খনি সংস্থার প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৭ সনে ভারতে মোট ১২৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার খনিজ সম্পদ আহরণ করা হইয়াছে ; ১৯৪৬ সনে ১০৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকার খনিজ সম্পদ আহরণ করা হইয়াছিল। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসর অতিরিক্ত ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অথবা ১৬ শতাংশ অধিক হারে খনিজ সম্পদ আহরিত হইয়াছে। অধিকতর পরিমাণে কয়লা, লৌহপিণ্ড, সীসা, দস্তা, চূণ এবং লবণ খনি হইতে উত্তোলনই উহার প্রধান কারণ। বৎসরের প্রথমার্ধে ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড এবং শেষার্ধে কয়লার মূল্য বৃদ্ধি উহার অন্যতম কারণ।

১৯৪৭ সনে ভারতে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টন কয়লা খনি হইতে উত্তোলন করা হয়। উহার মূল্য ৮১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসর ৪১ লক্ষ টন কম কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর ভারতে খনি হইতে আহরিত অন্যান্য সম্পদের মূল্য নিম্নরূপ—

ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড—১০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। লবণ ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, সোনা ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, লৌহ পিণ্ড ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, চূণ ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, তামা ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, অভ্র ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ও ইলমেনাইট ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সনের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সনে ভারতে খনিজ দ্রব্যাদির উৎপাদনের মান হয় ১২৩·২ ; ১৯৪৬ সনে উহা ১১৬·৭ ছিল।

সুন্দর কেশগুচ্ছ

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

নিখুঁত গঠন সৌষ্ঠবের একটি চিত্র

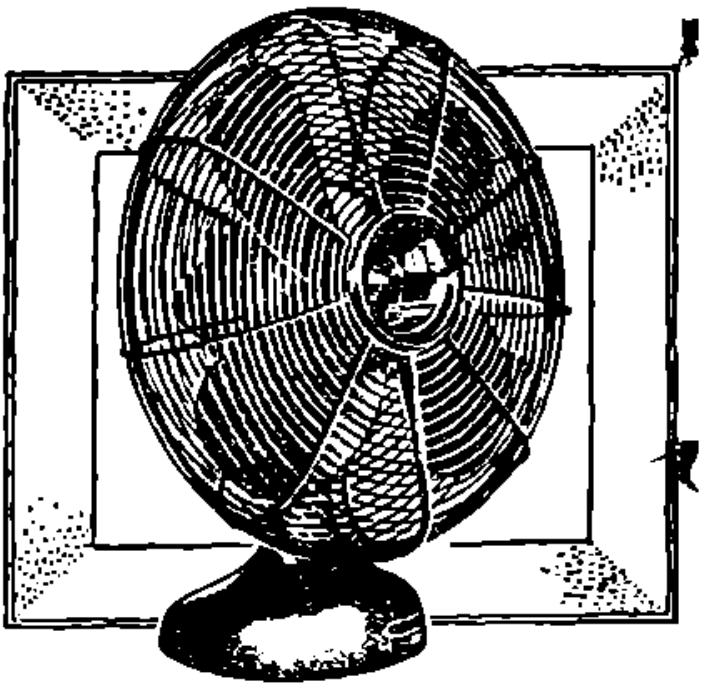

সার্থক সৃষ্টির জন্য মানুষের গবেষণার, অনুশীলনের সাধনার বিরাম নাই। উপরের চিত্রটি বহু ডিজাইনার, টুল ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিসিয়ানের কারুকৌশল ও শিল্প-নৈপুণ্যের সমবেত প্রচেষ্টার সার্থক সৃষ্টি। একটি 'ওরিয়েন্ট ফ্যান' নির্মাণের জন্য এদের অনুশীলনী মন ও কর্মঠ বাহু সদা-জাগ্রত। 'ওরিয়েন্ট ফ্যান' মানুষের নিখুঁত গঠন সৌষ্ঠবের সাধনার সার্থক পরিণতি।

ওরিয়েন্ট কারখানার অবিশ্রান্ত পরিকল্পনা ও অনুশীলনের ফলে এমন ধরণের বৈদ্যুতিক পাখা নির্মাণ সম্ভব হয়েছে—যাতে সকলের সর্বরকম সুযোগ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে; নিত্য-নূতন পদ্ধতি গ্রহণের ফলেই অতুলনীয় গঠন সৌষ্ঠব সম্পন্ন ও কার্যকারিতায় শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন বৈদ্যুতিক পাখার রূপায়ন সম্ভব হয়েছে।

ভবিষ্যৎ গঠনভঙ্গী ও কার্যকারিতার প্রতীক

Orient FANS

ওরিয়েন্ট জেনারেল ইণ্ড

৬, ঘোষ বিবি লেন, কলিকা

পরিবেশক :

হিন্দুস্থান ডিলার্স লিমিটে

৪৮, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকা

ফোন : ৩৪—১৩৩০, ২০৮

কাটতিতে
দুনিয়ার
সেরা
সাইকেল

র‍্যালে
রবিনহুড

কী দিন কী রাত্রে মিনিটে দুটিরও বেশী র‍্যালে-র সাইকেল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও বিক্রি হয়। তার মধ্যে আবার সব চেয়ে কদর পায় র‍্যালে আর রবিন হুড—কেননা দেখতেও সুন্দর, চড়তেও আরাম আর চালু রাখতেও খরচ কম।

SRC-48 BEN

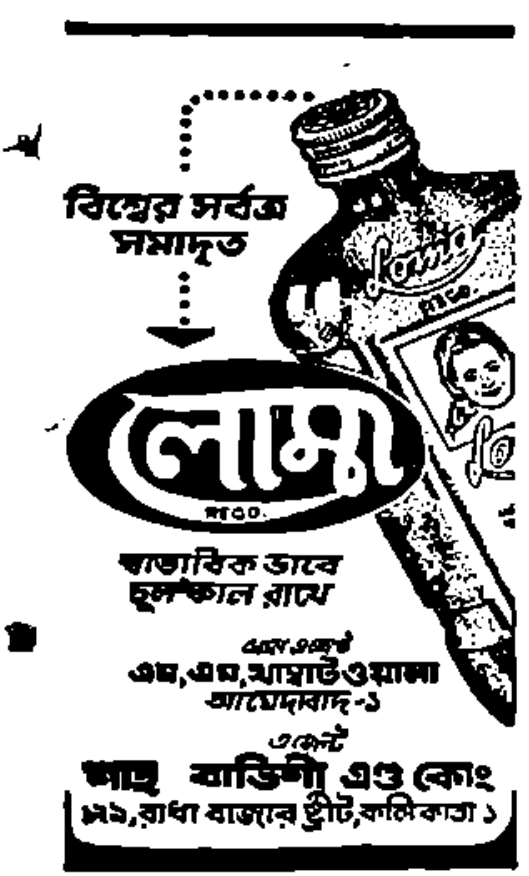

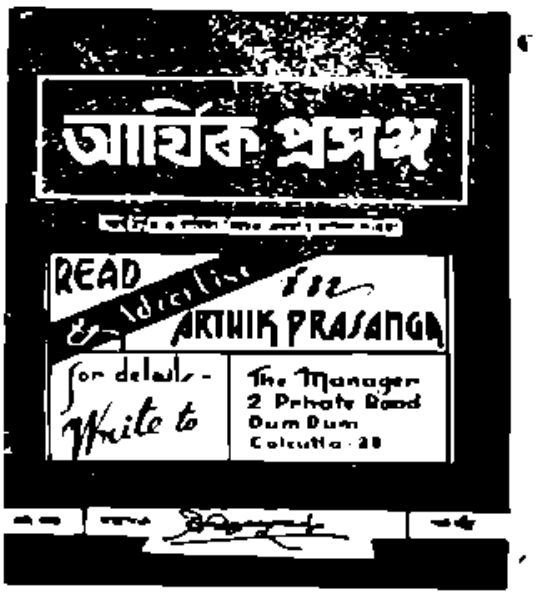

বার্ষিক চাঁদা— ৯৲ টাকা
ষাণ্মাসিক চাঁদা—৫৲ "
ছাত্রদের জন্য :—
বার্ষিক—৭৷৷০　ষাণ্মাসিক—৪৲ টাকা।
এই সংখ্যার মূল্য—বারো আনা।

Who's Who of Arthik Prasanga.

PATRONS

Dr. P. N. Banerjea, Late Minto Professor of Economics, Calcutt University and formerly, member, Indian Legislative Council.
Sri Arun Kumar Sen Pricipal, City College, Commerce Department Member of the Senate, Calcutta University.
Sri Satish Chandra Sen Vice Principal, Vidyasagar College, Com. Dept
Sri Bimal Chandra Sinha, Minister, Land Revenue, West Bengal.
Sri S. C. Dey, President, Federations of small & Medium Industries.
Sri B. K. Bhattacharya, Director, Union Drug Co. Ltd.
Sri S. Maitra, Manager Director, Sulekha works Ltd.
Prof. Kesabeshwar Basu, Member, Academic Council, Calcutta Univerci
Sri T. Ghose Director, Bureau of Industrial Statistics.
Dr.Dasrathi Banerjee, General Manager, National Rubber Manufacturer
Sri J. P. Podder, Jaipuria Brothers Ltd.

EDITORIAL COUNCIL

Principal Sri Khagendranath Sen, President. Prof. Himanshu Roy.
Prof. Sris Chandra Das, Vice President. „ Anath Bandhu Dutt
„ Alak Ghosh Sri Umapada Majumdar
„ Prabhat Sarbadhikary. „ Hemaranjan Basu
„ P. Agarwala

Prof. D. Mukherjea, Editor.

Associated Editors.

Sri Achal Baodopadhaya. Sri P. Banerjee

ADVISORY BOARD

Prof. Rabindranath Sengupta. City College & Calcutta University.
„ Biswanath Mukherjee. Maharaja Manindra Chandra College.
„ Jitendra Krishna Mitra, Calcutta University.
„ Lalit Kumar Mitra, City & Belur College.
„ Shyamsundar Banerjee, Vidyasagar College.
„ Sudhir Kumar Mukherjee, City College.
„ Sudin Bhattacharya, Victoria & City College.
„ Arun Banerjee, City & Scotish Church College.
„ D. P. Choudhuri, City College.
„ Benoy Sarker, City College
„ Kastur Chand Lalwani, Institute of Technology, Kharagpur.
„ Swadesh Bhusan Bhuniya, City College.
„ Mukunda B. Mitra, City College.
Sri Prakiti Ranjan Bhadhuri.
„ Rabindra Nath Bhattacharya Asst. Editor, Municipal Gazette.
„ Abbas Dasgupta, Formerly of Commercial Section, Jugantar.
„ Mohan Chand Ganderiwal, Merchant.

Hony Auditors : M/s. Ghose Nandy & Co.

শ্রীবিমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নবগোপাল প্রেস, ১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ, ৯ হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ট্রেনে
বিনা টিকিটের যাত্রী

আছে কিনা
লক্ষ্য
রাখুন

ট্রেনে সে অনধিকার প্রবেশ করেছে।
অহেতুক ভীড় বাড়িয়ে সে আপনাকে
আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

এই পাপ দূর করতে
রেলওয়েকে সাহায্য করুন

বিনা টিকিটে ভ্রমণের দরুণ
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েকে প্রতি বৎসর গড়ে
প্রায় **ষাট লক্ষ** টাকা লোকসান দিতে
হচ্ছে।

দ ক্ষি ণ - পূ র্ব রে ল ও য়ে

আদর্শ পথ্য, পানীয় ও খাদ্য

লিলি বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত.

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা] আষাঢ় • ১৩৬৫ [জুন-জুলাই • ১৯৫৮

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

ভারতে সর্বাধিক
বিক্রয়ের গৌরব অর্জন
করেছে

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

লক্ষ্মী ঘি'য়ে
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥

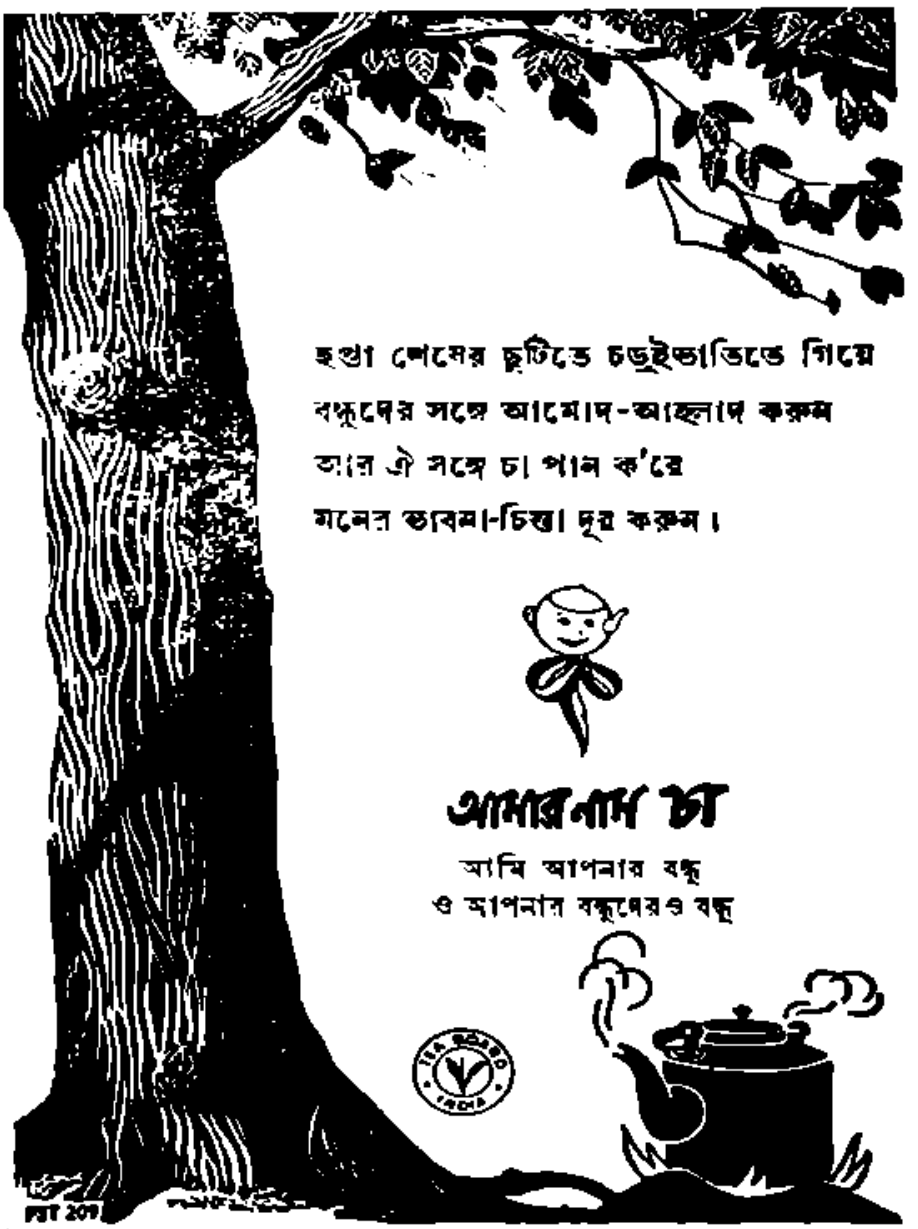
হপ্তা শেষের ছুটিতে চড়ুইভাতিতে গিয়ে
বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করুন
তার ঐ সঙ্গে চা পান ক'রে
মনের ভাবনা-চিন্তা দূর করুন।
আমার নাম চা
আমি আপনার বন্ধু
ও আপনার বন্ধুদেরও বন্ধু
TEA BOARD INDIA
FST 209

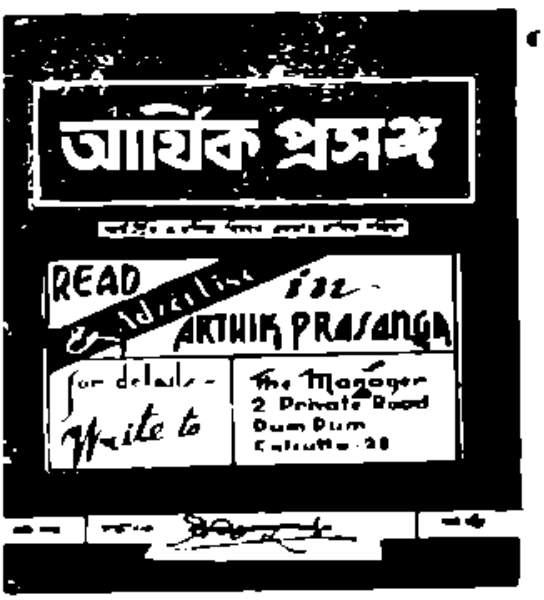

বার্ষিক চাঁদা— ৯৲ টাকা
ষাণ্মাসিক চাঁদা—৫৲ "
ছাত্রদের জন্য :—
বার্ষিক—৭৷৷০ ষাণ্মাসিক—৪৲ টাকা
এই সংখ্যার মূল্য—বারো আনা

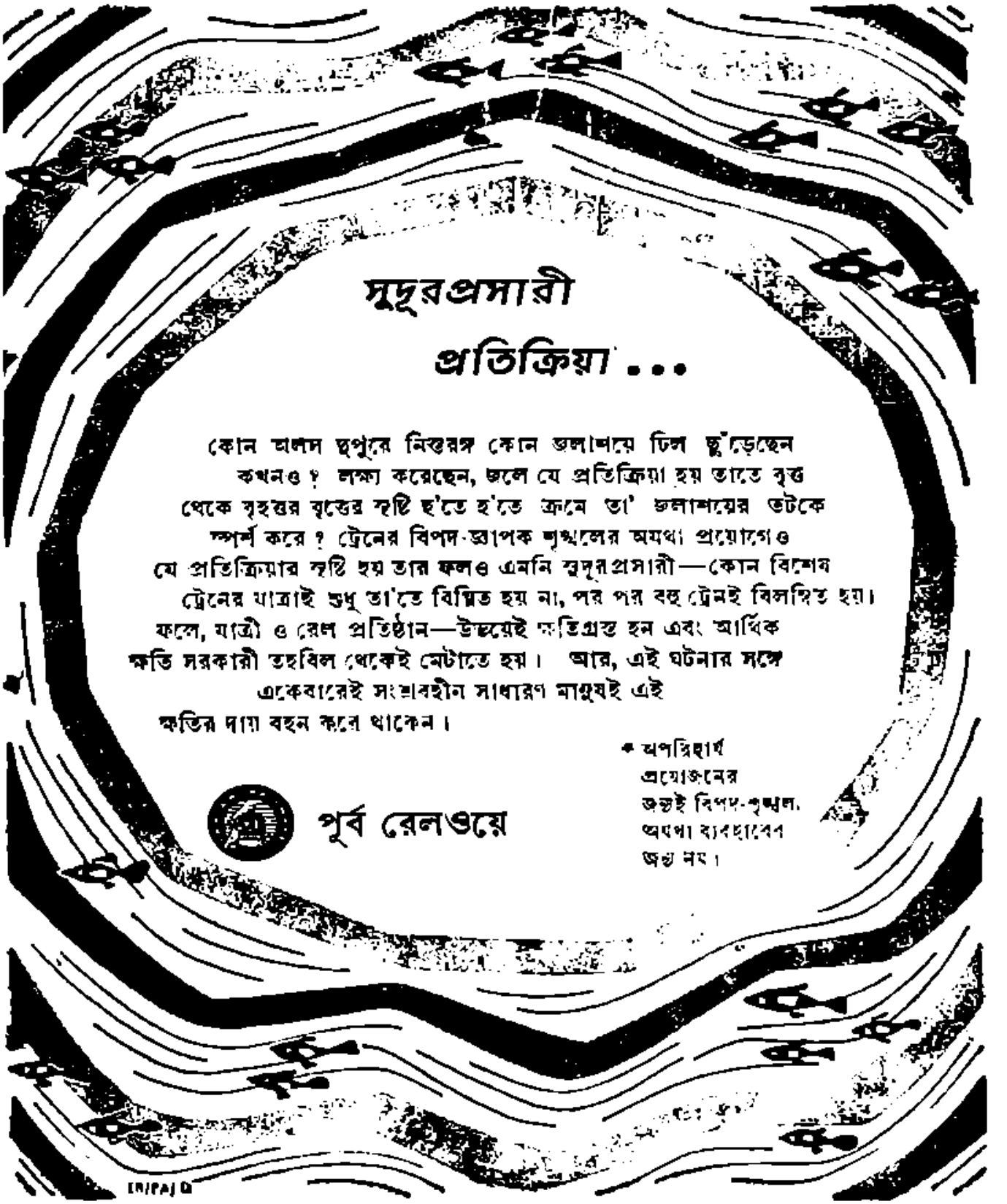
সুদূরপ্রসারী
প্রতিক্রিয়া ...
কোন অলস দুপুরে নিস্তরঙ্গ কোন জলাশয়ে ঢিল ছুঁড়েছেন কখনও ? লক্ষ্য করেছেন, জলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে বৃত্ত থেকে বৃহত্তর বৃত্তের সৃষ্টি হ'তে হ'তে ক্রমে তা' জলাশয়ের তটকে স্পর্শ করে ? ট্রেনের বিপদ-জ্ঞাপক শৃঙ্খলের অযথা প্রয়োগেও যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার ফলও এমনি সুদূরপ্রসারী—কোন বিশেষ ট্রেনের যাত্রাই শুধু তা'তে বিঘ্নিত হয় না, পর পর বহু ট্রেনই বিলম্বিত হয়। ফলে, যাত্রী ও রেল প্রতিষ্ঠান—উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং আর্থিক ক্ষতি সরকারী তহবিল থেকেই মেটাতে হয়। আর, এই ঘটনার সঙ্গে একেবারেই সংস্রবহীন সাধারণ মানুষই এই ক্ষতির দায় বহন করে থাকেন।
* অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই বিপদ-শৃঙ্খল, অযথা ব্যবহারের জন্য নয়।
পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের কথা গল্প করার মতোই বটে। দেশীয় শিল্পের অগ্রগতির ইতিহাসে এ গল্পকে বলা চলে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৫৬ সালে আমাদের এসেম্বলী লাইন থেকেই ভারতের সর্বপ্রথম 'রিং স্পিনিং ফ্রেম' বের হয়। এর পরে 'লাঙ্কাশায়ার টাইপ বয়লার', 'ওয়াটারটিউব বয়লার' ইত্যাদি অনেক কিছুই সর্বপ্রথম তৈরী করার গৌরব আমরা অর্জন করেছি। ভারতের বৃহত্তম গ্রুইম-গেট সমূহের কয়েকটি গেট কপারে আমরাই নির্মাণ করেছি। হীরাকুদে আমাদের তারাই সম্ভব হয়েছে বহুদানব 'পেন-স্টক লাইনার'-এর প্রবর্তন। ভারতীয় রেলপথের জন্য গাড়ি ও ইঞ্জিনের বয়লার আমরাই প্রথম করে থাকি; আমাদেরই যন্ত্রপাতি সাফল্যসহকারে আজ নানা শিল্পে সক্রিয়। চিনি এবং পাটকলের যন্ত্রপাতিও নির্মাণ শুরু করেছি আমরা; ডি ডি সির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজও হাতে নিয়েছি। আন্তর্জাতিক মানবিশিষ্ট আমাদের এই সব যন্ত্রপাতি বিশ্বের সেরা বিশেষজ্ঞদের কারিগরি সহযোগিতায় তৈরী। ভারতের মূলধনের যোগায় টেক্সমাকো এইভাবেই আত্মনিয়োগ করেছে।

একটি শোনাবার মতোই গল্প

টেক্সটাইলমেশিনারী কর্পোরেশন লিমিটেড

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীবিষ্ণুমুরারি

আষাঢ় : ১৩৬৫
জুন—জুলাই : ১৯৫৮

কার্য্যালয় :
৭৩এ, বাইলেন রোড, নবম, কলিকাতা-৬
সিটি অফিস
১০৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯

এই সংখ্যার মূল্য বারো আনা

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অবস্থা রোগের সংস্পর্শে শরীর ও মস্তিষ্ক সুস্থ হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তার পুষ্টিসাধন করে; তাই রক্তকে প্রাণশক্তির প্রধান উৎসরূপে গণ্য করা হয়। সেই রক্তই যদি দূষিত হয়ে পড়ে, তখন শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রোগের আক্রমণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

সারিবাদি সালসা প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ভারতের সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রচলিত। সারিবাদি সালসা সেবনে বিভিন্ন ফোঁড় পরিষ্কার হয়, ঘোড়, পীড়কা, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাত ও রক্ত দূষিতজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, শিরদাঁড়ার ব্যথা অন্তর্হিত হয়, মুখে সুন্দর শ্রী আসে এবং শরীরে নতুন নিরোগ যৌবন ফিরে আসে।

সারিবাদি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-বি (কলিঃ), আয়ুর্বেদ-আচার্য।
ভূতপূর্ব ঘোড়াসাঁকো ঘোষ, কলিকাতা-৬

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

শাখা ও এজেন্সী-পৃথিবীর সর্বত্র

কাটতিতে
দুনিয়ার
সেরা
সাইকেল

র‍্যালে রবিনহুড

কী দিন কী রাত্রে মিনিটে দুটিরও বেশী র‍্যালে-র সাইকেল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও বিক্রি হয়। তার মধ্যে আবার সব চেয়ে কদর পায় র‍্যালে আর রবিন হুড—কেননা দেখতেও সুন্দর, চড়তেও আরাম আর চালু রাখতেও খরচ কম।

নিয়োগ কর্তারা শুনুন !

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এখন বর্তমান জটিল জীবনযাত্রার সব প্রয়োজন মেটায় না। পাশ্চাত্যে বিশেষ করে সঙ্ঘবদ্ধ বীমা পরিকল্পনার সুবিধাগুলি জনসাধারণ উপলব্ধি করেছে। এর ফ নিয়োগ কর্তার খরচ কমই হয়; কিন্তু হাজার হাজার পরিবার যে সুরক্ষিত হয়, হাজার হাজার কা বার্ধক্য শান্তির ও আনন্দের হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯৫৮ সালের শেষে ৩৫ কোটি সঙ্ঘবদ্ধ বীমা পরিকল্পনার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল জীবন বীমার মান অনুযায়ী যার মূল্য হচ্ছে ৫৫,০০০ কোটি টাকা। এই সংখ্যাটি সত্যিই আশ্চর্যজনক মনে হয় যখন আমরা ভেবে দেখি ভারতবর্ষে সঙ্ঘবদ্ধ এবং ব্যক্তিগত জীবনবীমার মূল্য মাত্র ১,২০০ কোটি টাকা।

তিন বছর আগে ভারতবর্ষেও কর্মীদের জীবন-বীমার একটি পরিকল্পনা চালু করবার প্রচেষ্টা হয়। নিয়োগ কর্তারা এবং কর্মীরা সবাই সাদরে এই পরি-কল্পনাটিকে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত করার সময় কয়েকটি ত্রুটির ফলে পরিকল্পনাটির অকাল মৃত্যু ঘটে। এখন লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পো-রেশন নতুন কয়েকটি সঙ্ঘবদ্ধ বীমার পরিকল্পনা চালু করছেন এবং আগের ভুল ত্রুটির যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয় তারা যথেষ্ট সচেতন।

এই সঙ্ঘবদ্ধ বীমা পরিকল্পনাগুলির সুযোগ নিতে পারেন কলকারখানার কর্মীরা, ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন এমন লোকেরা, কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলি এবং এই ধরণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি। এই পরিকল্পনাগুলি সুসংবদ্ধ দলের জন্যে এবং এতে প্রিমিয়ামের হার কম। সাধারণতঃ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোন দরকার করে না। সঙ্ঘবদ্ধ বীমা পরিকল্পনার মোটামুটি দুটি ভাল দিক আছে :

অবসর গ্রহণের সময় সুবিধে

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্ধক্যে মাসোহারা পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মোটা টাকা খুব তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে যায়। তখন লোককে টাকা পয়সার জন্যে হয় আত্মীয়স্বজনের ওপর নির্ভর করতে নয়তো চাকরি খুঁজতে হয়। সুপার অ্যানুয়েটি পরিকল্পনা এই সমস্যাটির সমাধান করেছে।

চাকরিতে থাকাকালীন উপকার

এই জাতীয় বীমাকে বলা হয় সঙ্ঘবদ্ধ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মী চাকরিতে থাকাকালীন অর্থের সংস্থান থা অকাল মৃত্যু হলে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বিশেষ ব কাজে লাগে না। এই ত্রুটিটি পূরণ করেছে সঙ্ঘ বীমা পরিকল্পনা। কিন্তু এই পরিকল্পনা অনু মেয়াদী বীমা করালে চাকরিতে থাকার সময় চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর কোন অ অনিশ্চয়তা থাকে না।

এই দুইটি পরিকল্পনাই বর্তমান প্রভিডেন্ট ফ বদলে করা যায় এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের উপরেও করা

সঙ্ঘবদ্ধ বীমার দুটি দিক্ আছে। একটি নিয়োগকর্তা এর ফলে পাবেন কর্মীদের আনুগত্য নিষ্ঠা এবং কর্মীরা এতে পাবেন কাজের উত্তম উৎসাহ।

সঞ্চয়

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা] সূচীপত্র [আষাঢ়, ১৩৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
কারিগর বেলমন্দির্গী	প্রচ্ছদপট
বিক্ষুব্ধ আরব জগৎ	২৬৪
বিপন্ন বাঙ্গালী	২৬৬
একখানা বিরাট্-গ্রন্থের বংকিঞ্চিৎ—অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু	২৭১
উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে উত্তরবঙ্গ—শ্রীঅনাদিবন্ধু বিশ্বাস	২৭৪
বেকার সাহায্য ভাণ্ডারের পরিকল্পনা—শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	২৭৭
পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবাসীর জীবনযাত্রার গতি—শ্রীরণজিৎ বসু	২৭৮
কর ধার্যের নূতন পদ্ধতি ও ভারতীয় অর্থনীতিতে ইহার প্রতিক্রিয়া—শ্রী এ. ডি. শ্রফ	২৭৭
বৈদেশিক মুদ্রা ও ভারতবর্ষ শ্রী এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার	২৮৯
১৯৫৭ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং-এর গতি-প্রকৃতি	২৯২
ভারতে রবারজাত দ্রব্য প্রস্তুত শিল্প—অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	২৯৩
দেশ-দেশান্তরে	২৯৭
আর্থিক দিকদর্শন—তপ্যাসেবী	৩০০
অর্থনৈতিক সমাজে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব	৩০৩
ইষ্টার্ণ রেলওয়ের দপ্তরে ন্যায় বিচারের স্বরূপ	৩০৮
যৌথ কোম্পানী প্রসঙ্গ	৩০৯
গ্রন্থ পরিচয়	৩১০

সৌন্দর্য্যে ও সংরক্ষণে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট য়্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস, প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা : আসানসোল : শিলিগুড়ি : মাদ্রাজ

OUDH SUGAR MILLS LIMITED
NEW INDIA SUGAR MILLS LIMITED
UPPER GANGES SUGAR MILLS LIMITED
NEW SWADESHI SUGAR MILLS LIMITED
BHARAT SUGAR MILLS LIMITED
GOBIND SUGAR MILLS LIMITED

MANUFACTURERS OF

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

MANAGING AGENTS :

THE COTTON AGENTS PRIVATE LTD

BOMBAY .... CALCUTTA

Who's Who of Arthik Prasanga.

PATRONS

Dr. P. N. Banerjea, Late Minto Professor of Economics, Calcutta University and formerly, member, Indian Legislative Council.
Sri Arun Kumar Sen, Pricipal, City College. Commerce Department. Member of the Senate, Calcutta University.
Sri Satish Chandra Sen Vice Principal, Vidyasagar College, Com. Dept.
Sri Sukomal Kanti Gosh, Amrita Bazar Patrika.
Principal Akshoyjiban Basu, Principal, Woman's College.
Sri Bimal Chandra Sinha, Minister, Land Revenue, West Bengal.
Sri S. C. Dey, President, Federation of Small & Medium Industries.
Sri B. K. Bhattacharya, Director, Union Drug Co. Ltd.
Sri S. Maitra, Managing Director, Sulekha works Ltd.
Prof. Kesabeshwar Basu, Member, Academic Council, Cal. University Ltd.
Sri T. Ghose, Director, Bureau of Industrial Statistics.
Dr. Dasrathi Banerjee, General Manager, National Rubber Manufacturers
Sri J. P. Podder, Jaipuria Brothers Ltd.

EDITORIAL COUNCIL

Principal Sri Khagendranath Sen, President. Prof. Himanshu Roy.
Prof. Sris Chandra Das, Vice President. „ Anath Bandhu Dutta
„ Alak Ghosh Sri Umapada Majumdar
„ Prabhat Sarbadhikary. „ Hemaranjan Basu
„ P. Agarwala

Prof. D. Mukherjea, Editor.

Associated Editors.

Sri Achal Bandapadhaya. Sri P. Banerjee

ADVISORY BOARD

Prof. Rabindranath Sengupta, City College & Calcutta University.
„ Biswanath Mukherjee. Maharaja Manindra Chandra College.
„ Jitendra Krishna Mitra, Calcutta University.
„ Shyamsundar Banerjee, Vidyasagar College.
„ Sudhir Kumar Mukherjee, City College.
„ Sudin Bhattacharya, Victoria & City College.
„ Arun Banerjee, City & Scotish Church College.
„ D. P. Choudhuri, City College.
„ Benoy Sarker, City College
„ Kastur Chand Lalwani, Institute of Technology, Khargpur.
„ Swadesh Bhusan Bhuniya, City College.
„ Mukunda B. Mitra, City College.
Sri Prakiti Ranjan Bhadhuri.
„ Rabindra Nath Bhattacharya Asst. Editor, Municipal Gazette.
„ Abhas Dasgupta, Formerly of Commercial Section, Jugantar.
„ Mohan Lal Gauderiwala, Merchant.

Hony Auditors : M/s. Ghose Nandy & Co.

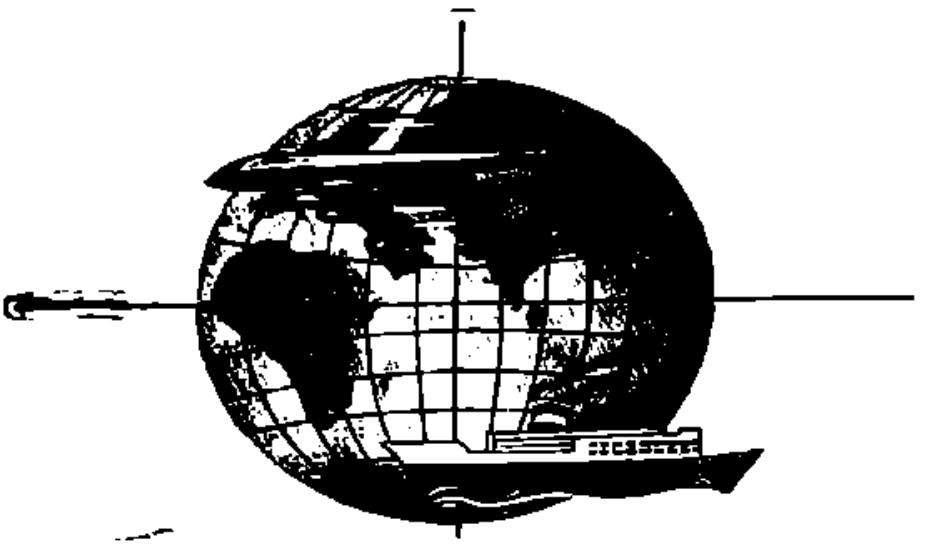

জাতীয় পরিকল্পনা ও
বহির্বাণিজ্যের প্রসার ...

সকল যুগেই, বিশেষতঃ এই জাতীয় পরিকল্পনার যুগে, দেশের সমৃদ্ধিসাধন বহুলাংশে বহির্বাণিজ্যের প্রসার সাপেক্ষ। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের প্রসার সর্বতোভাবে নির্ভর করে দেশের উন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর।

বহির্বাণিজ্য ব্যাপারে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অভিজ্ঞ কর্মচারী মারফৎ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ববিধ সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ নয়।

পৃথিবীর যাবতীয় উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্রে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নিজস্ব এজেন্ট ও করেসপনডেন্ট আছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা] [আষাঢ় ১৩৬৫

বিক্ষুব্ধ আরব জগৎ

আজ মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির যে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার লেলিহান শিখা সমগ্র পৃথিবীকে পুনরায় ভস্মস্তূপে পরিণত করিবে তাহার ইঙ্গিত এখনই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্য কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি এবং বৃহৎ আরব রাষ্ট্র গোষ্ঠীর অন্তর্গত। একদা-অবহেলিত আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি আজ আত্মচেতনা লাভ করিয়াছে, যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সভ্য জগতের বাস্তব মনুষ্যত্বের মর্যাদা উপলব্ধি করিয়াছে, দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে। প্রাচ্য হইতে পশ্চিমে প্রবেশের দ্বারদেশ জিব্রালটার প্রণালী হইতে শুরু করিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকূল বাহিয়া অন্যদিকে লোহিত সাগর, আরব সাগর ও পারস্য উপসাগর বেষ্টন করিয়া আফগানিস্থানের পশ্চিমপ্রান্ত দিয়া সোভিয়েৎ রাশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে তুর্কম্যান, কাস্পিয়ান সাগর, ট্রান্স-ককেসিয়া ও কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ উপকূল দিয়া তুরস্কের ইস্তাম্বুল হইয়া আঁকাবাঁকা পথে যে একটি চক্রের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই আরব জগৎ। মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর, সৌদি আরব, ইয়েমেন, ইরাক, জর্ডন, লেবানন, সিরিয়া লইয়া আরব জগৎ গঠিত। একদিন এখানকার অধিবাসীরা যাযাবর ছিল,- মরুভূমির প্রান্ত হইতে প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত তাগিদে, প্রাণধারণের নিত্যদিনের প্রয়োজনে। প্রকৃতি বিরূপ ছিল এই দেশে, সম্পদের অভাব ছিল নিতান্তই।

দিনের পরিবর্তন হইল। প্রকৃতির শুষ্ক আবরণের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত তৈল সম্পদের আবিষ্কার এক দিন অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিল। কিন্তু অভাব ছিল অর্থের। বিদেশীশক্তি পর-সম্পদ লুণ্ঠনকারী ইংরেজ, ফ্রান্স, মার্কিন অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের শোষণ চক্রের অভিযান শুরু করিল। সুয়েজ খাল খনন করা হইল ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী স্বার্থের পরিপুষ্টির জন্য। বিশাল বিস্তৃত পাইপ লাইন নির্মাণ করা হইল। সাগর উপসাগরের কূলে কূলে বন্দর গড়িয়া উঠিল। চক্রগোষ্ঠীর পণ্যবাহী জাহাজ আরব জগতের পণ্য সামগ্রী, তৈল, কাঁচামাল, আরও কত সম্পদ লুণ্ঠন করিবার কাজে নিযুক্ত হইল। দীন আরববাসী দরিদ্রই রহিল। উচ্ছিষ্টারের মত যৎকিঞ্চিৎ আর্থিক পুরস্কার দিয়া সেকালের তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়কে তুষ্ট করিয়া সমগ্র আরব ভূমিকে শোষণের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত করিল।

কালের রথচক্র দিনের পরিবর্তন আনিল। মরুপ্রান্তরবাসী আরব জাতি আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করিল। আজ মধ্য প্রাচ্যে যে অশান্তির অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা নিতান্তই অবহেলিত যাযাবর জাতির নিজ বাসভূমে আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিব্যক্তি। ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন-চক্রগোষ্ঠীর স্বার্থে ইহা চরম আঘাত। সেইজন্যই শয়তানের মুখে ধর্মের বাণীর মতই এই স্বার্থলুব্ধ পরস্বহরণকারী শক্তিগোষ্ঠী আজ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির রক্ষার জন্য এত ব্যগ্র,

এত কাতর। আজ মার্কিন সৈন্য হাজার হাজার মাইল দূর হইতে আসিয়া সেখানে শান্তি রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশন ও অভিমত গ্রহণের সময় তাহাদের নাই। ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে। শান্তি প্রচারক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এমনি শুভবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়াছিল কোরিয়া ও জাপানে! পাকিস্থানের সাময়িক শক্তি-বৃদ্ধিতে বন্যায় শান্তিরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের দরদের পরিচয় আমরা বহুপূর্বেই পাইয়াছি। ইহা শান্তিরক্ষা না চক্রগোষ্ঠীর আত্মরক্ষা আজ বিশ্ববাসীকে নূতন করিয়া শিখিতে হইবে না!

সুয়েজখাল উন্মুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যেদিন ভারত মহাসাগর হইতে প্রসারিত জলপথ আতলান্তিকের সঙ্গে যুক্ত হইল, সেই দিনই পরধনলোভী চক্রগোষ্ঠীর পরস্বহরণের উন্মাদনার অট্টহাসি সমগ্র জগতকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল। শতাব্দী ধরিয়া ইহারা শাসন করিয়াছে, শোষণ করিয়াছে, শোষণের ব্যাভিচারে মাতিয়া উঠিয়া কালনেমির মতই লঙ্কাভাগের জন্যই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্যাভিচার পাপলিপ্ত হইয়া উল্ক-ফরাসী-মার্কিন চক্রগোষ্ঠীর শেষ দিন আসন্ন। দক্ষিণ এশিয়া হইতে ইহাদের বিদায়ের ঘন্টা বাজিয়া গিয়াছে। পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ইহাদের বিদায়ের দিনও সমাগত। উন্মাদ দুশ্চরিত্রের মত ইহাদের শুভবুদ্ধি আজ লালসা কামনার পাপলোভে আচ্ছন্ন। আজ তাহারই বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানিবার দিন আসিয়াছে। কোন্ দধিচীর হাড়ের দ্বারা কোন বজ্রবাণ এই সব ক্রূর সংহারের কাজে নিযুক্ত হইবে তাহাই বিশ্ববাসী আশঙ্কিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে। আফ্রিকায় বিক্ষোভ তাহারই পূর্ব সূচনা।

মহাযানবের জয় অবশ্যম্ভাবী। মানুষের মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা কালের করাল পদক্ষেপে অবশ্যই ঘটিবে। আরব জাতিগোষ্ঠীরও দুর্দিনের অবসান ঘটিবে ইহা যেমন সুনিশ্চিত তেমনি অত্যাচারী লুব্ধ শোষকের পরাভবও নিয়তির নির্মম আঘাতের শেষ পরিণতি। হয়ত এখানেই আরব ভূমিতেই ইতিহাসের অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট অতীত সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপেই শক্তিগোষ্ঠীর সমাধি রচিত হইবে! হয়তো বা মিশরের ম্যামী ও পিরামিডের পাশে পাশে ইহাদের দম্ভের কলঙ্ক কাহিনী পুরাগৃহে স্থান পাইবে।

বিপন্ন বাঙালী

বাঙালী আজ বড়ই বিপন্ন। বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন লইয়া আজ সর্বত্রই আলোচনা হইতেছে। কিন্তু সে ঐ পর্যন্তই। যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বাঙালীকে জীবন্মৃত অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া কর্মমুখর প্রাণ চঞ্চল সুস্থ সুন্দর জীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিত, আজ তাহার একান্তই অভাব।

বাঙালী আজ নিজভূমে পরবাসী। বাঙালী স্বার্থরক্ষার জন্য আজ বাঙালী অবাঙালীর দ্বারে প্রত্যাশী হইয়া ফিরিতেছে। সেখানের সে অবহেলিত উপেক্ষিত। বাঙালীর জীবন মরণের সমস্যাগুলি আজ নিতান্তই কৃপাভরে বিচার বিবেচনা করা হইতেছে। বাংলাদেশে বাঙালী আজ বাঙালীর নিকট সম্যক সমাদর পায় না। বাংলাদেশে বাঙালীর শিক্ষা-ব্যবস্থার মত অব্যবস্থা,

যেরূপ সংবেদনশীল মনোভাবের অভাব, যতখানি মুনাফা বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত সেরূপ ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে দেখা যায় না। রাজ্যাধিকরণ হইতে প্রাথমিক স্কুলের পরিচালনাতেও নানা নিদারুণ ব্যবহার ও অযোগ্য পরিচালনার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রভূমি। ইংরাজ শাসনের যুগেও এই প্রদেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ঐতিহ্য ও দীপ্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা আজও অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব ভারতের শিক্ষা সাধনার পীঠভূমি। এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাঙালীকে বাঙালী করে নাই; মানুষকে মানুষ করিয়াছে। মনুষ্যত্বের মহৎ মর্যাদার উপলব্ধি হইয়াছিল এই পীঠভূমির পাদপীঠে। সর্ব ভারতীয় জ্ঞান-গরিমার যে উন্মেষের জন্য যে সব ভারতবাসী বিশ্বের দরবারে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহাদের অনেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য সাধকদের দান অপরিসীম। আজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন দলীয় স্বার্থপরতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে মুনাফা বৃত্তির ঘাঁটিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শের ভাঙ্গন ধরিয়াছে, পরিচালনায় স্বজন ও সদল পোষণে আগ্রহ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার রূপায়ণে ইহারা আদর্শভ্রষ্ট। দিল্লীর দরবারে ইহাদের মাথা সর্বদাই নত ও লুণ্ঠিত। শিক্ষা মজুরী কমিশন ও তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্স লইয়া ইহারা যে কদর্য অবহেলা, অবিবেচনা ও অবাঞ্ছিত প্রশ্রয়কে সহ্য করিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ দেখিলে সহজেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি ধরা পড়িবে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা উন্নয়নের নামে মজুরী কমিশনের প্রদত্ত অর্থ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার অথবা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় অর্থের ভাগ বাটোয়ারা লইয়া "বিড়ালের পিঠা ভাগের" অভিনয় আমরা বৎসরাধিক ধরিয়া দেখিতেছি ও দেশবাসী শুনিতেছে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কোন সময় কোনও একদিন কোন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা প্রেরণায় গড়িয়া উঠিলেও কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি নহে, ইহাই দেশবাসীর ধারণা। অভিভাবকদের রক্ত জল করা টাকায় যে সব ছাত্রেরা শিক্ষা লাভ করিয়াছে, যে সব অধ্যাপক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, মুখে রক্ত তুলিয়া অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও কোন দিন এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন অংশ দাবী করিতে আসিবেন না। আজ যাঁহারা আছেন, তাঁহাদেরও এই রকম কোন প্রবৃত্তির কথা কেহ শোনে নাই। এই সব প্রতিষ্ঠান জাতির প্রতিষ্ঠান, জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এইসব প্রতিষ্ঠানে বিশেষতঃ বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠানে যদি এমন একটা মনোবৃত্তি দেখা যায়—যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে কলঙ্কিত হয়, তবে তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। গতকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছাত্র-বেতন-বৃদ্ধির কারণ দর্শাইয়া অধ্যাপকদের শিক্ষা মজুরী কমিশনের প্রস্তাবিত ২০০-৫০০ স্কেলের পরিবর্তে যে ২০০-৬০০ স্কেল দিবার কথা বলিয়াছেন তাহাতে আমরা বিস্ময় বোধ করিতেছি। সভাপতি মহাশয় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি অধ্যক্ষ হইয়া অধ্যাপকের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন ইহাতে তাঁহার পদমর্যাদা শুধু ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তিনি অধ্যাপনার কাজকে অবমানিত করিয়াছেন। কলেজের অধ্যাপকগণ মহৎ কার্যে লিপ্ত, তাঁহারা দালালী ও দর কষাকষির ব্যবস্থাকে নিন্দা করিতেই অভ্যস্ত; তাঁহারা রাজপথে বসিয়া ধর্মঘট করিতেও পারিবেন না। জীবন যাত্রার মান অনুযায়ী তাঁহারাও অন্যান্য সকলের মতই সম্মানজনক পারিশ্রমিক পাইবেন—ইহাই তাঁহাদের আশা ও সমাজের প্রত্যাশা। বর্তমানে অধ্যাপকদের মাহিনা বৃদ্ধির অনুপাতে যে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে অধ্যাপকদের নিকট তাহা বেদনাদায়ক।

কারণ অধ্যাপকগণও অভিযাবক। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে এবং সম্প্রসারিত অর্থনীতির পট ভূমিকায় অধ্যাপকদের মাহিনা বৃদ্ধি কি এতই দুরূহ কার্য যে কোন কর্তৃপক্ষ ছাত্র তথা অভিভাবক নিধন না করিয়া এই মহৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিতেন না!

বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক দুর্গতি এই খানেই শেষ নহে, পরন্তু বাঙ্গালী জীবনের কর্মসূচীর অন্যতম কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালী কাজ পায় না, পাকে চক্রে বাঙ্গালীকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করা হইতেছে। অন্য প্রদেশের যোগ্য লোকদের আমরা দেখি নাই এমন নহে, তবে তাহাদের মত কুকাজে বাঙ্গালী এক জোট হইতে পারে না, দিল্লীর দরবারে বাঙ্গালী মাথা মুড়াইয়া নূতন চৈতন্য প্রেমে হিন্দী গান গাহিতে পারে না; সেই জন্য যদি বাঙ্গালী অযোগ্য হইয়া পড়ে, তবে বিতাড়নই সেটা সাময়িক মাত্র; কারণ ভাগীরথী যখন বাহিয়ে না কলিকাতার বন্দরের নিকট যখন ভাগীরথীর জলপ্রবাহ যখন শুষ্ক হইয়া যাইবে তখন কলিকাতার ৬৬ জন বাঙ্গালী মরিলেও ৩৪ জন অ-বাঙ্গালীকে পস্তাইতে হইবে। দিল্লীতে সব কারখানা বসিবে না, বসিতেও পারে না; সুতরাং বহুবার বলিয়াছি আজ বাঙ্গালী নিধনের জন্য রাজসূয় যজ্ঞের যে আয়োজন চলিতেছে তাহাতে সকলেই মারা পড়িবে। ফরাক্কা বাঁধ ও ভাকড়া বাঁধের নির্মাণ কালের পশ্চাতে একই নীতি পদ্ধতি বর্তমান। ভাকড়া হইতে পারে ফরাক্কা পারে না, ভাকড়ার ক্ষেত্রে পাকিস্থানের বাধা অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে ফরাক্কার ক্ষেত্রে তাহা পারা যায় না—এমন কি পাকিস্থানের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সুরুল আমিন তাহাতে সম্মতি দিলেও তাহা কার্যকরী করিতে বিলম্ব হয়. ইহা দলীয় চক্রান্ত না রাজসূয় যজ্ঞে বাঙ্গালী নিধনের আয়োজন?

বাঙ্গালী আজ বেকার। কথা ছিল দুর্গাপুরে প্রচুর সংখ্যক বাঙ্গালী কাজ পাইবে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বাঙ্গালী বঞ্চিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকাশ পাইয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কলিকাতার সওদাগরী অফিসে, মহলতলীর কারখানায় সর্বত্র একই দৃশ্য, একই অভিযোগ। ইহার জন্য দায়ী কে বা কাহারা?

পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য হঠাৎ অতিরিক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে—যাহা বাঙ্গালীর ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। সরকার হুমকী দিয়াছেন যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন! লোহার রড ও বার দ্বিগুণ মূল্যে কালোবাজারে বিক্রয় হয়। চিনির মূল্য বাড়িয়াছে, পূজা আসিতেছে বস্ত্রের বাজারেও কারসাজি দেখা যাইবে। গভর্ণমেণ্ট কি কাহারও বিরুদ্ধে কোন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন? আমরা একটি মাত্র নমুনা দেখিতে চাই—যাহাতে মুনাফাকারীকে সমূলে উৎখাৎ করা হইল।

বাঙ্গালী আজ সর্বদিকে বঞ্চিত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত অবহেলিত। আমরা কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট বুঝি না; জাতির সমৃদ্ধিতে জাতীয় নেতৃত্ব আজ একান্ত প্রয়োজন। পাপ-লিপ্ত কলুষচরিত্র, স্বজন-পুষ্ট ও দলীয় স্বার্থে পরিচালিত নেতার দ্বারা জাতির অভ্যুত্থান সম্ভব নহে। আমরা সেই সুদিনের প্রত্যাশা করিতেছি।

একখানা বিরাট-গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ

(শুম্‌পিটারের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ইতিহাস)

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু

এই প্রবন্ধে একখানা বিরাট ও বিখ্যাত গ্রন্থের সামান্য একটু পরিচয় দেওয়া হইবে। গ্রন্থখানা যে শুধু আয়তনে বৃহৎ তাহা নয়, বস্তু সম্ভারেও সমৃদ্ধ। বহু শতাব্দীর উপর দিয়া গ্রন্থকারের মননশীল চিত্ত বহিয়া চলিয়াছে এবং বহু তত্ত্ববিদের চিন্তাধারা ও বিবিধ তত্ত্বের উপরে তিনি সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণের আলোকপাত করিয়াছেন। এ যুগে ঐতিহাসিক টয়েনবির গ্রন্থের পরে এমন সারগর্ভ বিপুলায়তন পুস্তক আমাদের হাতে পড়ে নাই। গ্রন্থের নাম "অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ইতিহাস"—History of Economic Analysis এবং গ্রন্থকার হইতেছেন জোসেফ্ এ. শুম্‌পিটার। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরে তাঁহার সহধর্মিনী শ্রীমতী এলিজাবেথ্ বুডি শুম্‌পিটার বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থখানার সম্পাদন কার্য সম্পন্ন করেন।

শুম্‌পিটারের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে দুই চারি কথায় সারিতেছি। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অষ্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং সেখান থেকে ১৯০৬ সালে ডক্টর অব ল' ডিগ্রি প্রাপ্ত হ'ন। কাইরোতে বছর দুই ব্যবহারাজীবের কাজ করার পরে তিনি শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। তিনি প্রথমে জারনো উইজ্ বিদ্য-বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং পরে গ্রাজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা'ন এবং ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সেখানেই কাজ করেন। তিনি ১৯১৯-১৪ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সচেঞ্জ্ অধ্যাপক হইয়া কাজ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শুম্‌পিটার রাজনীতিতে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং স্বল্পকালের জন্য অষ্ট্রিয়ার রাজস্বমন্ত্রী পদেও অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তারপর তিনি হ'ন বিডেডারম্যান্ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু ১৯২৪ সালে ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার পরে তিনি শিক্ষা-জগতে এবং শিক্ষক-জীবনে ফিরিয়া আসিতে সংকল্প করিলেন। তিনি ১৯৩২ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়া যোগদান করেন এবং ১৯৫০ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ঐ পদেই কাজ করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্যমান বিরাট গ্রন্থ ছাড়াও শুম্‌পিটার বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন, যথা—**Theory of Economic Development, Business Cycles, and Capitalism, Socialism and Democracy** ইত্যাদি।

শ্রীমতী শুম্‌পিটার বলেন যে তাঁহার স্বামীর জীবনের শেষ নয় বৎসর ঐ বিরাট-গ্রন্থ-রচনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ঠিকভাবে দেখিলে বলিতে হয় যে তিনি সারাজীবনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ পুস্তক-রচনার কাজই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত লেখা ও বক্তৃতা তাঁহার এই মহাগ্রন্থের মধ্যেই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের পরিণতরূপ ও সার্থকতা লাভ করিয়াছিল—যেমন নদী, উপনদী ও শাখানদী সমুদ্রের মধ্যে লাভ করে তাহাদের চরম পরিণতি। যতদিন যাইতে লাগিল ততই শুম্‌পিটার জোর দিয়া বলিতে লাগিলেন যে তাঁহার ঈপ্সিত গ্রন্থ হইবে **অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ইতিহাস, অর্থনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস নয়।** ১৯৪৯ সালে তিনি এ বিষয়ে তাঁহার মত বেশ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

"The book will describe the development and the fortunes of scientific analysis in the field of Economics, from Graeco-Roman times to the

present, in the appropriate setting of social and political history and with some attention to the developments in other social sciences and also in philosophy. The ideas on economic policy that float in the public mind or may be attributed to legislators and administrators, whether or not embodied in elaborate systems, such as liberalism or solidarism and the like, which are commonly referred to as economic thought, come in only as part of that setting. The subject of the book is the history of the efforts to describe and explain economic facts and to provide the tools for doing so.

Since the very possibility of treating the history of economics like the history of any other science is controversial, Part 1 of the Book is dovoted entirely to the methodological questions that this approach raises and specially to the question how far the distinction between scientific economic analysis and economic thought is valid inspite of the interaction between the two.

উপরের উদ্ধৃতি হইতে গ্রন্থকারের মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস পাওয়া যায়। পরে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যথাস্থানে ইহা আরও পরিস্ফুট করা হইবে। এবার শ্রীযুতী শুমপিটারের সম্পাদন কার্য্যের বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করিতে হয়। শ্রীযুতী অক্লান্ত পরিশ্রম, অটুট অধ্যবসায়, অসাধারণ নিপুণতা এবং একান্ত নিষ্ঠা ও অনুরাগের সঙ্গে তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শুমপিটারের বিভিন্ন সময়ের লেখা এবং নানাস্থানে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে ঠিকভাবে বিন্যাস করিয়া গ্রন্থ-সম্পাদন তদীয় সহধর্ম্মিনীর পক্ষে সহজ হয় নাই। সম্পাদন কার্য্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় যে গুণ লক্ষিত হইয়াছে তাহা হইল বিশ্বস্ততা। সম্পাদিকা মূল-পাণ্ডুলিপি যথাযথ রাখিয়াছেন! কোন কিছুর অনুরোধেই কোন কিছু বাদ দিয়া বা বদল করিয়া মূলের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে দেন নাই। গ্রন্থখানার মধ্যে একটী পংক্তিও প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই। সম্পাদন-কার্য্যে এই নৈষ্ঠিক বিশ্বস্ততার মধ্যে যে শুধু মানসিক সততার (intellectual honesty) পরিচয় মিলে তাহা নয়, ইহার মধ্যে পাওয়া যায় প্রীতি-পূর্ণ হৃদয়ের স্পর্শ। ভক্ত শিষ্য পরলোকগত গুরুর পূজা-ঘরের সব উপকরণ ও আসবাব যেন ঠিক পূর্ব্ববৎ রাখিয়াছেন—কোশাকুশি, পুষ্পপাত্র, দীপাধার, ধূপাধার, আসন, নামাবলী, গঙ্গাজলের কমণ্ডলু, গুরুর ব্যবহৃত খড়ম জোড়া পর্য্যন্ত যেটী যেখানে ছিল সেটীকে ঠিক সেখানেই বসাইয়াছেন। একটু অদল বদল করিয়া সরাইয়া গুছাইয়া সাজাইলে হয়ত বিন্যাস সৌষ্ঠব বাড়িত, কিন্তু গুরুর পরিত্যক্ত জিনিষগুলির বিন্যাসে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তনেও গুরুগত প্রাণ শিষ্যের বুকে বিষম বেদনা বাজে। স্বামীর গ্রন্থ-সম্পাদন কার্য্যে শ্রীযুতী শুমপিটার যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের ভাষার নীচে বর্ণিত হইল। তাঁহার কাজ যে কিরূপ দুঃসাধ্য ছিল, তাহাও ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে।

"I conceived my editorial task to be the simple one of presenting as complete and accurate a version of what J. A. S actually wrote as possible but not to attempt to complete what he had not written. No outline of the whole work existed, and I had read none of it before his death because J. A. S. wished me to begin with the introduction, upon

which he was working……The material was found in many places—some of it in file boxes, some of it piled on shelves—in the Cambridge study on Acacia street in the Taconic study and a little of it in his office at Littauer. It took me two or three months to discover that the History was nearly completed, and sections and sub-sections kept turning up for some time. The initial fitting together of the pieces was made difficult by the fact that the manuscript pages were often not numbered at all, and that the typescript was not numbered consecutively from the beginning but only in small batches as typed…… There was a minor complication due to the fact that the number of chapters originally planned was reduced from eight to seven in the case of part II and from ten to eight in the case of Part IV……The task was immensely complicated by the length of the book. Even though I am an economist with some editoial experience, it was not easy to put togetter so long a work dealing with so many economists, writing in so many languages, over so long a period …. One difficulty should perhaps be touched upon here. It applies especially to the unfinished portions of the History. J. A. S. often started and abandoned many treatments of the same subject. He kept all these trial efforts and his original notes together with the finished bits of manuscript so that it was not always easy to know what was a more or less final version. আমাদের আলোচনা যেমন অগ্রসর হইতে থাকিবে শ্রীমতী শুমপিটারের উক্তির যাথার্থ্য এবং মন্তব্যের তাৎপর্য ক্রমশঃ প্রতীয়মান হইবে।

জোসেফ্ এ. শুমপিটার এত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন, এত বই ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন যে তাহারও একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাঞ্ছনীয়। তবে তাঁহার সকল লেখার মধ্য দিয়া সারাজীবন ধরিয়াই যেন তাঁহার মহাগ্রন্থ "অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ইতিহাসের" প্রস্তুতি চলিয়াছে। এই মহাগ্রন্থই তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার সিদ্ধি। আমার মনে হয়, সাধারণতঃ কোন লেখকই গ্রন্থের মত গ্রন্থ এক খানার বেশী লিখিতে পারেন না। তাঁহার অপরাপর পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তক এই গ্রন্থেরই ভূমিকা, উপক্রমণিকা বা প্রস্তুতি এবং পরবর্ত্তী পুস্তক এই গ্রন্থেরই পুনরুক্তি, ভাষ্য বা টীকা। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে প্রতিভা একাধী বাণের মত। একটী লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে তাহা অব্যর্থ। কিন্তু ঐ লক্ষ্য বিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শক্তি যেন নিঃশেষ হইয়া যায়। আগুন নিবিয়া গেলে ছাই পড়িয়া থাকে—প্রতিভার ক্ষেত্রেও বোধহয় সচরাচর এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

'বর্ত্তমান'

সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যামূলক নিরপেক্ষ পাক্ষিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যা—দুই আনা

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে উত্তরবঙ্গ

শ্রীঅনাথবন্ধু বিশ্বাস

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বহুভাগ্য বিড়ম্বিত একদল জনতা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্থান হতে ছুটে এসেছিল ভারতের দিকে নিরাপদ আশ্রয় পাবে বলে। পাকাব প্রত্যাগত জনতা আজ তাদের নিজেদের স্থান কিছুটা বেছে নিয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলোয় এ সমস্যার আজও সমাধান হল না! এর জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে নানা পরিকল্পনা করতে মোটেই ত্রুটি করেননি। কিন্তু এই সকল পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়নে তাহারা কতটুকু সফলকাম হয়েছেন, এ প্রশ্নই আজ করতে হয়। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী এই সমস্যা সমাধান সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন, যে আজ পর্যন্ত ২·৯ লক্ষ পূর্বাঞ্চলের বাস্তহারার বসতির সংস্থান সরকার করতে পেরেছেন। বর্তমানে যে সংখ্যা তাদের সামনে রয়েছে এবং যাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে বলে তারা মনে করেন তাদেরও সংখ্যায় ৫০,০০০ হাজার। কিন্তু কথা হচ্ছে যে সরকারের এই পরিসংখ্যান কি নির্ভুল? এই ৫০ হাজার সরকারী অনুমোদিত উদ্বাস্তু ছাড়াও এমন বাস্তহারা রয়েছেন যারা পূর্ববাংলার ভিটেমাটি ছেড়ে দিয়ে এদেশে চলে এসেছেন স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে ভারত সরকারের উদ্বাস্তু নীতির কড়াকড়ির ফলে তারা উদ্বাস্তু বলে তাদের নাম সরকারী পরিসংখ্যান বিভাগে তালিকাভুক্ত করতে পারেননি। এই ধরণের লোক সংখ্যায় কম নয় এবং সরকার আজি সরাসরি ভাবে এই দায়িত্ব না নিলেও দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে তাদের সমস্যা কোন অংশেই কম নয়।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা এ প্রচেষ্টার এক নূতন অধ্যায়। বাংলা দেশে আর নূতনের স্থান নেই। তাই উদ্বাস্তুকে পাঠাতে হবে বাংলার বাইরে, তাদের ভাগ্য পরীক্ষায়। আজ কাল এমন কথাও উঠেছে যে এই সকল উদ্বাস্তু বাংলার বাইরে যেতে চায় না। কাহারও মতে বাঙ্গালী ঘরকুনো, তাই ঘরের বাইরে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষায় রাজী নয়। কেউ বা বলছেন যে, এ মোটেই সত্যি নয়। নিজ প্রদেশের বাইরে গিয়ে তারা পায় বিমাতৃ সুলভ আচরণ এবং এতে তাদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। এই বহু সমস্যা বিজড়িত প্রশ্ন বাদ দিয়েও পশ্চিমবংলায় যে আরও বেশ কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হতে পারে এবং এতে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে না গিয়ে পুনর্জীবন পেতে পারে তার আলোচনাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

কিছুদিন আগে আমার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলার নানাস্থানে যাবার সুযোগ ঘটেছিল। এই সকল জেলার গ্রাম, সহর ও শিল্পাঞ্চল (বিশেষ করে চা শিল্প) গুলির মধ্য দিয়ে যখন গিয়েছি তখন বার বার মনে হয়েছে যে পূর্ববাংলার বিড়ম্বিত জন সম্পদ এই সকল জেলার উন্নয়নে কাজ লাগাতে পারলে উদ্বাস্তুদের বিরাট একটা অংশ যেমন নিজেদের অন্নবস্ত্রও বাসস্থানের সংস্থান করতে পারবে অন্যদিকে এই জিলাগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের মানও উঁচু হয়ে যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এই তিনটি জেলার প্রায় প্রত্যেকটিই অনুন্নত জেলা। গ্রাম অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা পতিত পড়ে রয়েছে। গাঁয়ে রাস্তা ঘাট নেই। শিক্ষার ও সুব্যবস্থা হয় নি। জেলাগুলি বনজ সম্পদের আকর। এই সকল জেলায় উদ্বাস্তু পাঠানোর পূর্বে উদ্বাস্তুদের আতিগত পেশার দিকে বিশেষ করে নজর রাখতে হবে। চাষী সেখানে গিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। কারণ চাষের জমি তাদের পক্ষে জোগাড় করা হয়তঃ সম্ভব হবে না। কিন্তু তন্তুবায় ছুতার জেলে

কুম্ভকার প্রভৃতি জাতি সেখানে পাঠালে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে। অন্য ধরণের কুটির শিল্প, যেমন বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিষের কারখানা গড়ে উঠারও প্রচুর সম্ভাবনা সেখানে রয়ে গিয়েছে। যে তিস্তা, জলঢাকা প্রভৃতি নদী প্রতি বৎসর বানের জলে সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিভীষিকার সৃষ্টি করে, সরকার যদি এই সকল উদ্বাস্তুদের কাজে লাগিয়ে বন্যা নিরোধ করে নদী পরিকল্পনা কাজে রূপায়ন করেন তবে সমগ্র উত্তরবঙ্গ যে শস্য শ্যামলা হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। এই সকল পরিকল্পনায় উদ্বাস্তু যুবকদের নিয়োগে সাময়িক ভাবে কতকগুলি উদ্বাস্তু পরিবার কর্মসংস্থান পাবে। পরে যখন ঐ সকল পরিকল্পনাগুলি সফল হয়ে উঠবে তখন ঐ সকল নদীর পারে গড়ে উঠবে নূতন নূতন সুন্দর গ্রাম যাতে থাকবে সকল শ্রেণীর লোক। জেলে পাবে নদীর মাছ, আর কুটিরশিল্পী পাবে বনজ সম্পদ যা দিয়ে তারা তাদের দৈনন্দিন আহারের সংস্থান করবে। এই সকল পরিকল্পিত সুন্দর গ্রাম হয়ত: একদিনে গড়ে উঠবে না, কিন্তু এখন হতে যদি সরকারী সহযোগিতায় উদ্বাস্তুদের নিয়ে যাওয়া হয় এই সকল গ্রাম উন্নয়নের কাজে, তবে উদ্বাস্তুরা নিজের হাতেই যে গড়ে তুলবে তাদের ভবিষ্যত তাতে সন্দেহ নেই। এই ধরণের নদী পরিকল্পনা যে অসম্ভব নয় তার সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ী নদী তোরসা ও তার গায়ে বাধানো পাথরের বাঁধ। সরকার প্রতি বৎসরই ত কোটি কোটি টাকা বন্যা নিরোধ করে খরচ করেন। কিন্তু এমন ধরণের কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে ত মনে হয় না। এই বিজ্ঞানের যুগে এমন কোন পরিকল্পনা কি এতই কঠিন? প্রতি বৎসর এই অঞ্চল গুলিতে খাদ্যশস্যেরও অভাব দেখা দিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ঘটায়। কিন্তু ঐ ধরণের নদী পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয় এবং তার সঙ্গে জল সেচের ব্যবস্থা হয় তাহলে খাদ্য শস্যের অভাব ত দেখা দিবেই না উপরন্তু বাড়তি ফসল বাইরে পাঠানো যাবে। কুটির শিল্প ছোট ছোট গ্রাম গুলিতে ছড়িয়ে গড়ে উঠলেও শিলিগুড়ি, আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি সহরগুলি হবে শিল্পজাত পণ্যের কেন্দ্রস্থল। সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই ধরণের কুটির শিল্পদ্রব্য যাতে বাজারজাত করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্বাস্তু পাঠিয়ে এই সকল অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে সুন্দর ও সুখী পরিবার গড়ে তুলতে হলে চাই সরকারের পুনর্বাসন; গ্রামোন্নয়ন ও শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনার সম্পূর্ণ যোগাযোগ। এই সকল অঞ্চলে উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও ছোট ছোট শিল্প নগরী স্থাপন উদ্বাস্তুদের সহায়তায় কেবল মাত্র বাস্তুহারাই ঠাঁই পাবে না, সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জিলার আর্থিক পুনর্গঠনও হবে। আজকের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় যদি বাস্তুত্যাগীদের বাংলার বাইরে গিয়ে ঐ ধরণের উদ্যমের মারফতে নিজেদের বসবাসের উপায় করতে হয়, তবে অনুরূপ পরিকল্পনায় বাংলাকে গড়তে সাহায্য না করার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। বাইরে পাঠিয়ে দায়িত্ব লাঘব করা যদি একমাত্র বাংলা সরকারের উদ্দেশ্য হয় তবে অন্য কথা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলে ওকলা ষ্টেট যদি স্থাপিত হতে পারে, বাংলায় এ ধরণের কোন পরিকল্পনা কেন নেওয়া হবে না তার কারণ অজানা। এই ধরণের শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের পক্ষে বোধহয় উত্তরবঙ্গই প্রশস্ত।

উপসংহারে শুধু একথাই বলার রইল যে বাংলার উন্নতি যেমন অনাদৃত উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে হবার নয় তেমনি বাঙ্গালীও পূর্ববঙ্গ প্রত্যাগত গৃহহীন জনসাধারণকে ছেড়ে বাঁচতে পারবেনা। তাই এই দুইটি সমস্যা একই দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে সমাধানের চেষ্টা করলে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী উভয়েই বাঁচবে।

বেকার সাহায্য ভাণ্ডারের পরিকল্পনা

শ্রীআশিস্তাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ হলেন ভারত সরকারের শ্রমদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। নৈনিতালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে বিগত ১৯শে মে তারিখে তিনি সমবেত প্রতিনিধিদের বেকার সাহায্য ভাণ্ডার গঠনের প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। অবশ্যি প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য ব্যাপক নয়। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের দেশে অনেক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আরো কয়েকটা শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই আজ প্রশ্ন উঠেছে, এই সব কারখানায় যে সব শ্রমিক কাজ করত তাদের উপার্জনের কি ব্যবস্থা হবে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বেকার সাহায্য ভাণ্ডার গঠনের উপর জোর দিয়েছেন। শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকের যোজগারের পথ যা'তে একেবারে বন্ধ হয়ে না যায় এবং শ্রমিকের কাজের ধারাবাহিকতা যা'তে ব্যাহত হতে না পারে সেজন্য শ্রীনন্দ চেষ্টা করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে, যে বেকার সাহায্য ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তার উপর অতটা জোর দেওয়া হচ্ছে কিভাবে সে ভাণ্ডার গঠন করা হবে। শ্রীনন্দ নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ লেভীর সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে এই সাহায্য ভাণ্ডার গঠন করা হবে। এ কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, প্রস্তাবিত লেভীর পরিমাণ বেশী হবে না। দি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার নয়াদিল্লীস্থ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন" In Co-operation with other economic Ministries of the Central Government, the Union Labour Ministry will soon examine the feasibility of Mr Nanda's recent proposal for creating an unemployment relief fund. It is officially explained here that Mr Nanda's suggestion envisages neither unemployment insurance nor giving of doles to the unemployed. What he aims at is to vitalize the proposed fund to prevent any addition to the existing unemployment through closure of mills and other units of production."

যাঁরা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন আগে যে সব শিল্প সংস্থা সহজে পরিচালিত হয়েছে সে সব শিল্প সংস্থার অবস্থা আজকাল খুব জটিল হয়ে উঠছে। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে খরচ করতে না পারলে নূতন ব্যবসা কিম্বা শিল্প পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি যে আবহাওয়ার মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চলছে সে আবহাওয়া যেন দিনের পর দিন প্রতিকূল আকার ধারণ করছে। প্রশ্ন হতে পারে, এজন্য দায়ী কে? প্রধানত দায়ী হলেন সরকার। অব্যবস্থা এবং দুর্বল নীতি দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করে ফেলছে। বেকার সাহায্য ভাণ্ডার যদি গঠন করা হয়, তাহলে বেকার শ্রমিক উপকৃত হবে, সন্দেহ নেই। তবে বেকার সাহায্যকে স্থায়ী উপার্জন বলা যেতে পারে না। তাছাড়া কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ নিজেই বলেছেন, বেকার সাহায্য ভাণ্ডারের পরিকল্পনা সাময়িক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, কোন ব্যবসা কিম্বা শিল্প সংস্থার যখন মুনাফার পরিমাণ কমে যেতে থাকে তখন পরিচালকবৃন্দকে প্রথমে কর্মচারীর সংখ্যা কমাবার জন্য চেষ্টা করতে দেখা

যায়। আর যদি কর্মচারীর সংখ্যা কমান যুক্তিযুক্ত বিবেচিত না হয় তাহলে এঁরা কর্মচারীদের পারিশ্রমিক কমিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেন। কর্মচারীরাও আর কোন উপায় না দেখে কম বেতন গ্রহণ করে থাকেন। শোনা যায়, কম বেতন নিতে স্বীকৃত হয়েই শ্রমিকরা নাকি শোলাপুর মিলকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, যখনই কোন মিল কিম্বা শিল্প সংস্থার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে তখন সরকারী মহল এই শোলাপুর মিলের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এইভাবে একটা সংস্থাকে কতদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ নিজেই অবশ্য স্বীকার করেছেন, এইভাবে কোন সংস্থাকে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না, যদিও সাময়িকভাবে সংস্থাকে হয়ত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত সংস্থা এবং সংস্থার কর্মচারীদের সত্যিকারের কোন উপকার হবার আশা নেই। বহুক কর্মচারীরা যতই নিরুৎসাহ হয়ে পড়বেন ততই সংস্থার অবস্থা খারাপ হবার আশঙ্কা আছে। কাজেই সাময়িক ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, সংস্থাটিকে যদি আবার ঠিকভাবে চালু করতে হয় এবং এর সামগ্রিক উন্নতি যদি কাম্য হয়ে থাকে তাহলে এটা যাতে ভালভাবে পরিচালিত হতে পারে সেদিকে সবচাইতে বেশী নজর দিতে হবে। অবশ্য যে সব সংস্থার অবস্থা শোচনীয়ভাবে খারাপ হয়ে পড়েছে এবং উন্নত হবার আশা নেই বলেই চলে সে সব সংস্থার কথা স্বতন্ত্র। সরকারী সাহায্য সে সব সংস্থার ক্ষেত্রে হয়ত মোটেই ফলপ্রসূ হবে না! কিন্তু যে সব ব্যবসা এবং শিল্পের অবস্থা সাময়িকভাবে খারাপ হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য পেলে যে সব ব্যবসা এবং শিল্প পুনরুজ্জীবিত হবার আশা আছে সে সব ব্যবসা এবং শিল্পকে সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনন্দ নিজেই বুঝতে পাচ্ছেন না কেন আজ সর্বত্র "shrinkage of employment in the establishmements. তিনি স্বীকার করেছেন "It is difficult to comprehend why the wheels of industry should slow down in this manner in a developing economy with a rising tempo of investment." অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, যে সময়ে অর্থলগ্নীর পরিমাণ বর্ধিত হচ্ছে সে সময়ে কি কারণ বশতঃ এইভাবে কাজের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে সেটা বুঝা কষ্টকর।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিল্পে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অশান্তি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এছাড়া এমনি সব অন্তরায় রয়েছে যেগুলোর ফলে নূতন শিল্পও ঠিকভাবে প্রসারিত হতে পাচ্ছেনা। কাজেই যদি ক্রমবর্ধমান অশান্তি এবং শিল্প প্রসারের পথে বিদ্যমান অন্তরায়গুলো দূর করা না হয় তাহলে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং শ্রমিকরা যে কর্মসংস্থান সমস্যার সম্মুখীন সে সমস্যার সমাধানের আশা সুদূরপরাহত। শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে যে সব শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছেন তাঁদের কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্য দেবার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। তবে কেবলমাত্র আর্থিক সাহায্য দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। তাছাড়া শিল্পসংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা নিজেদের বেকারত্ব ঘুচাবার জন্য কাজের সন্ধানে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এঁদেরও যাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া যেতে পারে সেজন্য চেষ্টা করতে হবে। অথচ শ্রীনন্দ এঁদের সম্পর্কে

কোনও মন্তব্য করেন নি। তিনি কেবলমাত্র শিল্পসংস্থাগুলোর কথাই চিন্তা করেছেন। শ্রম সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিদের তিনি বুঝাতে চেয়েছেন" In cases of units which have already closed down or where closure is inevitable the best course is to bring about quick liquidation and pending transfer of an establishment to new hands, employment may be offered to workers as a measure of relief more or less on lines agreed to in a Sholapur mill." অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে এর মধ্যে শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে কিম্বা অনিবার্যভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সে সব ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না কারবার গুটাবার কাজ তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করে নূতন হাতে এর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শোলাপুর মিলে শ্রমিকদের কষ্ট লাঘবের জন্য যে ভাবে কাজ দিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে শ্রমিকদের কাছে সেভাবে কাজে বহাল থাকার প্রস্তাব করলে অন্যায় হবেনা। শ্রীনন্দ যা বলেছেন সেটার সমর্থনে যুক্তি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে গেল কিম্বা অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে সে সম্বন্ধে ভালভাবে তদন্ত করা দরকার। প্রসঙ্গতঃ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার নূতন দিল্লীস্থ সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত একটা খবরের উল্লেখ করছি। তিনি জানিয়েছেন "Action is likely to be initiated soon to ensure that where mills apply for voluntary liquidation, the necessary proceedings are completed speedily so that workers' idleness is not unduly prolonged.

———

পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবাসীর জীবনযাত্রার গতি

শ্রীরণজিৎ বসু

ভারতের জীবন যাত্রার মান পৃথিবীর বেশীরভাগ উন্নত দেশের তুলনায় এতটা নিম্নস্থানে রহিয়াছে যে, তাহার আলোচনা করিতে বসিয়া সত্যই বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যাইতে হয়। কেন এমনটা হয়? ভারতের ৩৮ কোটি নরনারীর জীবনযাত্রার মান কি এমন কোন পর্যায়ে আনা সম্ভব নহে, যেখানে আমরা দেখিতে পাইব সুখী-সমৃদ্ধ ভারতের এক উজ্জ্বল ছবি—হাসি-খেলায় উচ্ছলতায় সুখী ভারতের সুস্থ সুন্দর মানুষের শোভাযাত্রা?

দুইশত বৎসর ধরিয়া বিদেশী শাসনের নির্মম বুটের নীচে থাকিয়া ৩৮ কোটি মানুষ অনিবার্যভাবেই নিশ্চিতঃ মৃত্যুর দিকে দিনের পর দিন আগাইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের বুকে মানুষ আর না খাইয়া মরিতে চায় না, বিনা চিকিৎসায় মরিতে চায় না—গৃহহীন ভাবে পথে পথে ঘুরিতে চায় না। অনাহারে থাকিতে চায় না – মানুষ মানুষের মতই বাঁচিতে চায়।

তাই স্বাধীন ভারতের কাছে আজ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান কোথায়, কোন পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? তথা হইতে আরও উন্নততর জীবনযাত্রার মানে পৌছানো যায় কি না? এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াই দেশের যত পরিকল্পনা। এক একটি করিয়া পরিকল্পনার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নততর করাই লক্ষ্য। সামাজিক রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যই হইল সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা। ইহাই হইল এই সকল পরিকল্পনার সার্থকতা বা ব্যর্থতার মাপকাঠি। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা জীবন ধারণের ও জীবনযাত্রার এই পাঁচটি মূল প্রয়োজন মিটিলে তবেই মানুষ তাহার মনুষ্যজীবনের বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছাইবার সাধনা করিতে পারে। এই পাঁচটি মূল সমস্যার সমাধান না করিলে ভারতের মানুষের জীবনযাত্রার মান যে অবস্থায় অস্তাবধি দাঁড়াইয়া আছে, তাহা অপেক্ষা আরও নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দিকে দৃষ্টি দিয়া ইহা নির্ভুল ভাবে বলা চলে। কিন্তু এই বিরাট দেশ, বিশাল যাহার জনসংখ্যা—তাহার এই প্রয়োজন মিটাইতে হইলে যে পরিকল্পনার প্রয়োজন তাহাতে এত অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন যে দরিদ্র ভারতবাসী তাহা যোগাইতে পারে না। অর্থের অনিবার্য তাগিদে দরিদ্র জনসাধারণের স্কন্ধে করভার আসিয়া পড়ে এবং সেই অতিরিক্ত কর যোগাইতে গিয়া দরিদ্র ভারতবাসী আরও দরিদ্র হয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনের সৌধ যাহার উপর নির্ভরশীল, তাহার আশু সমাধান করিতেই হইবে, জীবনযাত্রার মানের সহিত শুধু যে বস্তুতান্ত্রিক জগতেরই সম্পর্ক আছে তাহা নহে, দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসাবে তাহার একটি মূল্য আছে। কাজেই জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সামাজিক পুনর্গঠনেরই একটা অঙ্গ। সুখের বিষয় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া, আশা আকাঙ্ক্ষার আহ্বান জানাইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছিল এবং তাহা কতকাংশে (যত সামান্যই হউক সফল হইয়াছে—দ্বিতীয় পরিকল্পনা আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়তা নিয়া আগাইয়া চলিয়াছে, আশা করিতে বাধা নাই, ইহার সফলতার মধ্যে অগণিত দরিদ্র ভারতবাসীর আরও কিছুটা উন্নতি হইবেই।

পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় ভারতের জীবনযাত্রার মান বহু নিম্নে অবস্থিত। ভারতবাসীর দারিদ্র্যের পরিমান বুঝিতে হইলে, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, আশ্রয় ও স্বাস্থ্য এই পঞ্চমুখী মানদণ্ডে ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান যাচাই করিতে হইবে। খাদ্যসমস্যা যুদ্ধকালীন সময় হইতেই ভারতের একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ৩৮ কোটি মানুষের অন্ন যোগাইতেই হিমসিম খাইয়া যাইতে হইতেছে। প্রতি বৎসরই বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য আমদানী করিতে হইতেছে। আমাদের দেশে খাদ্য ঘাটতি নূতন নহে। ১৯৩০ সালের পর হইতেই ভারতের খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। তাহার আগেও ব্রহ্মদেশকে বাদ দিলে ভারতকে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইত। আমাদের খাদ্য সমস্যার বহু কারণ থাকিলেও, প্রধান কারণ হইল অতিদ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। যে পরিমাণে দেশের জনসংখ্যা বাড়িতেছে, সেই পরিমাণে দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়িতেছে না। কিন্তু ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, শতকরা ৬৮ ভাগ অধিবাসী কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও ভারত খাদ্য সমস্যা হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস্ (Malthus) খাদ্য সমস্যার সহিত জনসংখ্যা সমস্যাকে জড়িত করিয়াছিলেন। ম্যালথাসের মতে কোন দেশের জনগণের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহের ঘাটতি হইলেই সেই দেশ অতি জনাকীর্ণ (over-populated)। ম্যালথাসের নীতি বর্তমান জগতে গৃহীত না হইলেও জনসংখ্যার সহিত খাদ্য সমস্যার যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। পরিকল্পনা কমিশনের মতে আমাদের খাদ্যশস্যের গড়পড়তা উৎপাদন হইল প্রায় ৪৪।৪৫ মিলিয়ন টন। কিন্তু ১৩·৭ আউন্স খাদ্যদ্রব্য যদি জনপ্রতি ধরা হয় (যাহা অত্যন্ত সামান্য) তবুও মোট উৎপাদনের দ্বারা দেশের লোক সংখ্যার শতকরা ১৮

জনের খাদ্য সংস্থান হয়। এই ভয়ঙ্কর খাদ্যের অপ্রতুলতার পরও দেশের মধ্যে রহিয়াছে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী—যাহাদের শয়তানী হস্তস্পর্শে বাজারের জিনিষ কোন সময়ের স্বাভাবিক মূল্যে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল—দেশের বুকে চোরাকারবারী ও অসাধু ব্যবসায়ী মহলের জন্ম এবং সাম্প্রতিক কালে তাহাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি। এই অসাধু ব্যবসায়ীদের সাধুতায় ভারতের সাধারণ লোক পূর্বে খাদ্যদ্রব্যে যে পরিমাণ পুষ্টিকর পদার্থ পাইতো এখন তাহা অপেক্ষা অনেক কম পাইতেছে বা কিছুই পাইতেছে না। ভারতের খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিনের ঘাটতি শতকরা ৩৮ ভাগ, চর্বি জাতীয় পদার্থের ঘাটতি শতকরা ৬৪ ভাগ। ভারতের জনসাধারণের মুখে অন্ন যোগাইতে হইলে যে হারে উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, তাহা বর্তমান অবস্থায় সম্ভব কি? প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে খাদ্য শস্যের ঘাটতি সাময়িকভাবে (আংশিক) মিটাইয়া আনা গিয়াছিল, কিন্তু তৎকালীন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পশ্চাতে পরিকল্পনার দান অত্যন্ত সামান্য—প্রকৃতির দানই বেশী। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের যে প্রাচুর্যে দেখা দেয় তাহা প্রধানতঃ প্রকৃতির অকৃপণ দান—অর্থাৎ সময় মত প্রচুর বৃষ্টি ও আবহাওয়া অনুকূল থাকায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রশ্ন হইল, এই হঠাৎ খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের কি লাভ হইল? তাহারা কি পেট ভরিয়া খাইতে পাইল? না। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারী নীতির দুর্বলতার সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ী মহলের তৎপরতায় খাদ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্যে ঘৃতাহুতি পড়িল।

সুতরাং সাধারণ মানুষের তাহা কিনিয়া খাইবার মত সুযোগ ঘটিল না। উৎপাদিত জিনিষ সাধারণ বাজারে প্রচুর পরিমাণে আসে না। আর যে সামান্য আসে তাহা অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় হইবার জন্য—সাধারণ মানুষের তাহাতে সুবিধা হয় না। দরিদ্র ভারতের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এতো কম যে অধিক মূল্য দিয়া খাদ্যশস্য ক্রয় করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। সুতরাং এই অসাধু ব্যবসায়ীদের কর্মতৎপরতা রোধ করিতে না পারিলে—দ্রব্য মূল্যের সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। সরকারী সুনির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে চোরাকারবারী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কর্মতৎপরতা রোধ করিতে হইবে ও সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি ও করিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খাদ্যশস্যের অভাবকে অতি দ্রুত এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছে। পরিকল্পনার শেষে কি অবস্থা হইবে এখনই বলা উচিত নহে, তবুও বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যের যে অগ্নি মূল্য দেখা দিয়াছে তাহাতে আশঙ্কা হয়—দেশের লোক বাঁচিবে তো? পরিকল্পনা কমিশনের বক্তব্য, পরিকল্পনা শেষে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া (১৯৬০-৬১) দাঁড়াইবে ৭৭০ লক্ষ টন। সর্বদিকে, সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে বাৎসরিক খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭৭০ লক্ষ টন। কিন্তু সম্প্রতি ভারত সরকার নিযুক্ত অশোক মেহতা কমিটি ইহার রিপোর্টে বলিয়াছেন—যে ১৯৬০-৬১ সালের ভারতের বাৎসরিক খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হইবে ৯৯০ লক্ষ টন—অর্থাৎ (বাৎসরিক) ২০ লক্ষ টন ঘাটতি থাকিবে। এই ২০ লক্ষ টন আমাদের বাহির হইতে আমদানী করিতে হইবে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যও আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করিতে পারিবে না বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। তাই কালবিলম্ব না করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে আরও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন। কম করিয়াও চর্বিজাতীয় জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে দেড়গুণ, ফলের শতকরা ৫০% ভাগ, সব্জীর দ্বিগুণ, দুধের

তিনগুণ, মাছের ৫ গুণ, মাংসে ৩ ডিম এর ৫ গুণ, চালের শতকরা ৪০% ভাগ ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে শতকরা ৩০% ভাগ। এই উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক চেষ্টা সফল না হইলে সাধারণ মানুষ যে তিমিরে—সেই তিমিরেই থাকিবে।

সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য দুধ। ভারতের মানুষ কি পরিমাণ দুধ পায়? অতি সামান্য। পৃথিবীর গো সম্পদের হিসাব লইলে, ভারতের স্থান খুব উচ্চেই থাকিবে, অন্ততঃ সংখ্যার দিক বিচার করিলে। কিন্তু এই বিপুল গো সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এদেশের মানুষ কতটুকু দুধ পায়? অতি সামান্যই পায়। কারণ এই গো সম্পদের উপর কোন নজর রাখা হয় না। এদেশের মানুষ গড়ে মাত্র ৫ আউন্স দুধ পায়। অথচ একটি পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক যেখানে আধ সের দুধের প্রয়োজন সেখানে মাত্র পায় (২ ছটাকের একটু বেশী) ৫ আউন্স। ভারতের লোকসংখ্যার অনুপাতে শতকরা প্রায় ২০টি পরিবার এক ফোঁটাও দুধ পায় না। অথচ পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে জনপ্রতি গড়ে দৈনিক নিউজিল্যাণ্ডের লোক ৬০ আউন্স, ডেনমার্কে ৪৪ আউন্স, বৃটেনে ৩২ আউন্স দুধ পাইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পশ্চিম দেশগুলির তুলনায় এদেশের মানুষ অতি সামান্যই দুধ পাইয়া থাকে—যাহা শরীর রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

খাদ্যদ্রব্যের পরেই বস্ত্র। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। শীত প্রধান দেশে জনপ্রতি যে পরিমাণ বস্ত্রের প্রয়োজন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ততটা প্রয়োজন হয় না। ভারতের মানুষ স্বভাবতই কম কাপড় ব্যবহার করে। কৃষিপ্রধান দেশে যাহারা কৃষিকার্যে ব্যাপৃত থাকে (যাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী) তাহাদের বস্ত্রের প্রয়োজন অত্যন্ত অল্প। তবু অভাগা ভারতবাসী তাহাদের এই নিম্নতম প্রয়োজনটুকুও মিটাইতে পারে না। সারা বৎসর জনপ্রতি ১৩ গজের বেশী কাপড় পায় না। কিন্তু সরকারী বক্তব্য ও বস্ত্রের মিলগুলির হিসাব মত এদেশের লোকের বস্ত্রের ঘাটতি পড়া উচিত নহে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালেই বস্ত্রের উৎপাদন লক্ষ্যস্থল ছাপাইয়া গিয়াছিল অথচ সাধারণ মানুষ যে জনপ্রতি অতীতে ছিল বর্তমানে ও সেই জনপ্রতিই রহিয়া গিয়াছে। উৎপাদন লক্ষ্যস্থল ছাপাইয়া যায় কিন্তু সাধারণ মানুষ কাপড় পায় না বা বাজার দর কমে না কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। যুদ্ধপূর্বকালে ভারতে বস্ত্রের ব্যাপারে এই ধরণের ঘটনা প্রায় ঘটিত। তখন বাহিরের বাজারে ভারতের মিলগুলি বাৎসরিক ৮০।৯০ কোটি গজ কাপড় রপ্তানি করিল—অথচ ভারতের মানুষ অর্ধনগ্ন হইয়া থাকিল—কাপড় এত দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা সহজলভ্য ছিল না। বোম্বাইএর মিলে—গুদামজাত কাপড় পচিয়া নষ্ট হইবে—আর এই ধারে অগণিত, কোটি কোটি মানুষ 'হা কাপড়—হা কাপড়' করিয়া গলা ফাটাইয়া মরিবে।

বাসস্থান? ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যাহাদের আমরা নীচের তলার মানুষ বলি, তাহারা যে স্থানে বাস করে তাহাতে আর যাহাই বলা যাউক, স্বাস্থ্যকর বলা যায় না। কুকুর বিড়াল ও অন্যান্য জন্তু জানোয়ার যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অন্ধকার রাত্রে কোন প্রকারে মাথা গুঁজিবার একটু স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি ভারতের ৩৮ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ৭০ এমনিতর কোন প্রকারে যেখানে সেখানে রোদবৃষ্টির হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য নিজ

নিজ আস্তানা জোগাড় করিয়া লইয়াছে। আধিকার ভারতে বাসস্থানের অভাব এক নূতন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

সহরাঞ্চলে লোকবসতি আগের তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ সেই অনুপাতে সহরগুলি প্রসার লাভ করে নাই, বা আরও পর্যাপ্ত গৃহনির্মাণের মত স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। বর্তমান কালের মানুষ অতি মাত্রায় সহরকেন্দ্রিক হওয়ায়—বাসস্থান সমস্যা ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। ফলে যেখানে সেখানে বাস করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। সহরাঞ্চলে শতকরা প্রায় ৮৮টি পরিবারকেই মাত্র একটি লোককে কেন্দ্র করিয়াই বিরাট সংসার পাতিতে হয়। একই ঘরে স্বামী স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও সংসারের অন্যান্য ব্যক্তি যাবোয়ারী বিছানা পাতিয়া লয়। ইহাতে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়—তাহা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যকর নয়। মজুর ও নিম্নশ্রেণীর লোকেদের অবস্থা আরও শোচনীয়-মিল এলাকাগুলিতে শতকরা ২৮টি পরিবারকেই একটি ঘর লইয়া বাস করিতে হয়। বর্তমানে সরকার শিল্পশ্রমিকদের গৃহ সমস্যার উপর বিশেষ নজর দিলেও সহরাঞ্চলে তাহাদের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। সহরাঞ্চলের ফুটপাথে ও গ্রামের গাছতলায় আজিও যে অগণিত মানুষ কালাতিপাত করিতেছে, তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। ইহা ছাড়াও রাজনৈতিক টানা পোড়নে পড়িয়া লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু আজ ভারতের কাছে আশ্রয় প্রার্থী, নিঃসম্বল লক্ষ লক্ষ লোকের গৃহ সমস্যার সমাধান কিন্তু আজিও হয় নাই। জন্তু জানোয়ারের মতন আজিও তাহারা কোন প্রকারে এখানে সেখানে পড়িয়া আছে। তাহারা প্রকারে এখানে সেখানে ফুটপাথে দারুণ গ্রীষ্মে ভয়ঙ্কর জলে আর ঝড়ে পচিয়া মরিতেছে। তাদের গৃহসমস্যা এক বিরাট সমস্যা।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে আর বেশী করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার কিছুই থাকে না- যে কোন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন, এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যেখানে শতকরা ৯০টি লোক বাস করিতেছে, যেখানে অতি অল্প পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের উপর এদেশের মানুষ জীবন ধারণ করে—তথাকার স্বাস্থ্য কি হইতে পারে? এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপুর্ব শিশুমাতার গৃহে যখন শিশু জন্মায়, তখন তাহার নিকট হইতে কতখানি আশা করা যায়! জন্মাইবামাত্রই তাহার ভাগ্য সুস্পষ্ট-ভাবেই নির্ধারিত হইয়া যায়—সে মাত্র ৩৮।৩২ বৎসর এই পৃথিবীতে বাঁচিবে। ইহার বেশী নহে। পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশের তুলনায় এই সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। সব জাতকের আয়ুকাল ব্রুটেনে যখন ৬২ বৎসর, আমেরিকায় ৬৩ বৎসর, জাপানে ৫২ বৎসর সেখানে ভারতবাসীর মাত্র ৩৫ বৎসর। ৩৫ বৎসর বয়স, যে বয়সকালে অন্যান্য সভ্যদেশ মানুষের সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা প্রকাশ পাইবার সময় তখন অরাজীর্ণ দেহে এদেশের মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, চিকিৎসার অভাব ও দুঃসহ দারিদ্র্য, এই সব মিলিয়া এদেশের মানুষকে নিশ্চিত অকাল মৃত্যুর দিকে অতি দ্রুত পৌঁছিয়া দিতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে প্রতি বৎসর এই দেশে ম্যালেরিয়া রোগে মারা যাইতেছে ১৫ লক্ষেরও বেশী, বসন্তে ভুগিতেছে ৩০ লক্ষ লোক, বিনা চিকিৎসায় যে কত লোক মরিতেছে তাহার ভয়াবহ সংখ্যা প্রকাশ না করাই ভাল।

শিক্ষার যে কি অবস্থা তাহা নিজেরাই হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছেন। যেদেশে আজিও নাম সহি করিতে অপারগ ব্যক্তিরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিতে

গেলে—এক বেদনাদায়ক চিত্র প্রকাশ করিতে হয়, এবং তাহা বিরাটাকার প্রবন্ধের অবতারণা করিবে। মোটকথা এদেশে শিক্ষা আজিও সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে নাই। আজিও অর্থাভাবই শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করিবার একটি বিরাট বাধা। গণতান্ত্রিক এই দেশের বুকে আজিও বিনামূল্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে চালু হইল না—ইহাই দুঃখের। স্কুল কলেজ যথেষ্ট সংখ্যায় নাই। যাহা আছে সেইগুলিতেও আবার স্থান সঙ্কুলান হয় না। ফলে হাজার হাজার ছাত্র এর ভীড়ে বারোয়ারী পূজা মণ্ডপের হই-হুল্লোড়ের মধ্যে আর যাই হোক বিদ্যার্জন হয় না—হইতে পারে না। অথচ সরকারী প্রচেষ্টায় নূতন নূতন স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা নাই—অর্থের বরাদ্দ নাই। কথায় কথায় নেতারা বলেন—'বাবাবাহিক বিদ্যার্জনের নেশা ছাড়িয়া—কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করো'—কিন্তু দেশে কারিগরী শিক্ষার যথেষ্ট স্থান নাই। নামমাত্র ছাত্রই সেখানে ভর্তি হইবার সুযোগ পায়। হাজার হাজার ছাত্র কোন প্রকারে দুই বেলা টুইশানি করিয়া পরের বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া চালাইতেছে—ইহা আমাদের দেখা। অসাধারণ ও অসহ্য দারিদ্র্যতা, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার পথের অন্তরায়—অথচ ইহাদেরই আবার মাহিনা বাকীর দরুণ কলেজ হইতে নাম কাটা যায়—কোন সহানুভূতি দেখাইবার উপায় থাকে না। সরকারী অযোগ্যতার জন্য দেশে বেকার সমস্যার সমাধান হয় না;—প্রতি-বৎসর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বাজেটে পুলিশ ও অন্যান্য খাতে বিপুল ব্যয় বরাদ্দ করা হয় এবং মাসে মাসে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াইয়াও লওয়া হয়—কিন্তু শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ কই আশানুরূপ বাড়িতেছে না তো! জানি, দেশরক্ষার খাতিরে পুলিশ ও অন্যান্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন আছে কিন্তু প্রশ্ন হইল সাথে সাথে যদি দেশে শিক্ষিত মানুষ তৈয়ারী করিবার পথ প্রশস্ত না করা হয় তবে—পুলিশ রক্ষা করিবে কাহাদের? কতকগুলি অমানুষকে! সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। কিন্তু এই বিরাট গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলে যে নেতৃত্বের প্রয়োজন, তাহা আজ কোথায়? এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন যে অবস্থায় বা যে ধারায় প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে গোটা দেশকে অন্যান্য সভ্য জাতিগুলির শিক্ষার মাপে লইয়া যাইতে এদেশের মোট ১৫০ বৎসর সময় লাগিবে। কিন্তু এই বিরাট সময়কে আরও নিকট করিতে হইবে—নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশকে ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা কোথায়? দুই—দুইটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খাদ্য ও কৃষিতে দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প লইয়া আসিয়াছিল; দ্বিতীয় পরিকল্পনা আসিয়াছে শিল্পোন্নয়নের গুরুদায়িত্ব মাথায় লইয়া—শিক্ষা ব্যবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিল।

আমরা খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য বাসস্থান ও শিক্ষা, এই পাঁচ মানদণ্ডে ভারতের মানুষকে বিচার করিয়া দেখিলাম, তাহাদের জীবনযাত্রা সুষ্ঠু পথে চালিত করিতে কত বাধা। তাই, আজ প্রশ্ন এই অবস্থার অবসান কবে হইবে? আমরা কি আমাদের এই সমস্যাগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা করিব না! করিব। কিন্তু কি উপায়ে? দিশাহারা নেতৃত্বহারা ভারতের কোটি কোটি মানুষের কাছে কে দেখাইবে পথ!

সরকারী বক্তৃতাতো শুধু জাতীয় আয় বৃদ্ধির দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়াই খালাস। কিন্তু ইহা যে কোন সুস্থ মানুষই বুঝিতে পারেন যে শুধু মাত্র জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে পারিলেই মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা যায় না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের ঢাক পিঠাইতে গিয়া সর্বত্রই

যাহারা বলিয়া বেড়ায়—National Income কত বাড়িয়াছে। কিন্তু জাতীয় আয় বাড়ার সহিত সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার প্রবাহের গতি পরিবর্তনের তফাৎ অনেকখানি। বেশ কিছুদিন আগের জলন্ত উদাহরণে ইহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। গত কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, দরিদ্র ভারতবাসী ১৯৩৯ সালের পূর্বে যে আর্থিক অবস্থার মধ্যে বাস করিত, তাহা অপেক্ষা অধিক আর্থিক দরিদ্রতার মধ্যে জীবন ধারণ করে ১৯৪৪ সালে। তুলনামূলক ভাবে বিচার করিতে গেলে যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা যে অসহনীয় দরিদ্রতার মধ্যে জীবন ধারণ করে তাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি সামান্যই পাওয়া যায়—অথচ ঠিক সেই সময় মুদ্রাস্ফীতির অনিবার্য কারণেই ভারতের জাতীয় আয় অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তখনও দুর্ভিক্ষে মৃত্যু বন্ধ হয় নাই—অনাহারে মৃত্যু বন্ধ হয় নাই। কেন? কারণ আয়ের পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল—টাকার মূল্য তদপেক্ষা অধিক অনুপাতে কমিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সনে ভারতের আর্থিক আয় মাথাপিছু বর্ধিত হইয়া ২৫৫ টাকায় দাঁড়ায়—কিন্তু তবু কেন লোকে অভাব ক্লিষ্ট—দারিদ্র্য দেশ ছাড়িয়া পালায় নাই কেন! ১৯৪৮-৪৯ সালের রিপোর্ট হইতে দেখা যায়, তখন জাতীয় আয় মাথাপিছু কৃষিতে ৪০০৲, শিল্প প্রতিষ্ঠানে—১৭০০৲ ছোট শিল্পে—৬০০৲ এবং বাণিজ্য, পরিবহন প্রভৃতিতে মাথাপিছু ১৬০০৲ টাকা, কিন্তু অর্থের পরিমাণ দিলেই চলিবেনা। এই আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতিও অন্যান্য কারণে দ্রব্যমূল্যের আনুপাতিক এত বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল যে, তাহা ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ১৯৩২ সনে মানুষ যে দরিদ্র ছিল মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ সেই দরিদ্রই রহিয়া গিয়াছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালের অবস্থা বর্তমানেও প্রত্যক্ষ করা যায়। মাথা পিছু আয় কোন কোন মহলে সামান্য বাড়িয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু সেই অনুপাতে দ্রব্য মূল্য এত ভয়ঙ্কর অগ্নিরূপ ধারণ করিয়াছে যে—তাহার নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সর্বশ্রেণীর মানুষের আয় বাড়ে নাই। বরং বহুলাংশে কমিয়াছে কিন্তু জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে অস্বাভাবিক রূপে। এই জন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেকার সমস্যা জর্জরিত ভারতের বেকার বাড়িতেছে দিনে দিনে। কিন্তু অন্নসংস্থানের উপায় নাই। ফলে একটি পরিবারে লোকসংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতেছে অথচ আয়ের পরিমাণ সীমাবদ্ধ—কর্মক্ষম যুবক চাকুরী পাইতেছে না—সাথে সাথে পরিবার স্ফীতি লাভ করিতেছে—সুতরাং ইহার অনিবার্য ফল জীবন যাত্রার মান নিম্নাভিমুখী করিতেছে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের বর্তমান অবস্থার যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইতেছে। বর্তমানে দেশে রাতারাতি কোন শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা নাই—সুতরাং যথেষ্ট সংখ্যক লোকের চাকুরীর সংস্থান করাও সম্ভব নহে, ইহা একপ্রকার সুস্পষ্টরূপেই বলা যায়। অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সমাধান করিতেই সীমাবদ্ধ আয় নিঃশেষিত হইয়া যাইবার পর শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—ইহাই শতকরা ৯০টি পরিবারের অবস্থা। পরিবারস্থ সকলের অন্ন, বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটাইতে পারিলে তবেই মানুষ উন্নততর জীবন যাত্রার আশা করিতে পারে। কিন্তু এই হারে অন্নহার বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উন্নততর জীবনযাত্রার আশা কোথায়? আমরা যে সমাজে বাস করি তাহাতে বহু কুসংস্কার বিদ্যমান—যে পোড়ো দেশে কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া বৃদ্ধা ঠাকুরমা দিদিমাকে নাতি দেখাইবার সখ মিটাইতে আজিও বেকার যুবক বিবাহ করিতে পিছপা'ও হয় না, সে দেশের নিকট হইতে আর কতটা আশা করা যায়। নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার ক্ষমতা যাহার অনিশ্চিত তাহার বিবাহ এদেশে অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক প্রয়োজনে অনিবার্য হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, দীর্ঘ আলোচনার এই খানেই পরিসমাপ্তি প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে যে, ভারতের জীবনযাত্রার মান এতটা নিম্নস্তরের হইবার মূলে শুধু মাত্র দারিদ্রাই কারণ নহে, অজ্ঞতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মূল পাঁচটি সমস্যার সমাধান প্রয়োজন সর্বাগ্রে, তাহা অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে তাহার জীবনযাত্রার বাবার অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিবার সংযম অর্জন করিতে হইবে। নতুবা এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ নাই। জীবনযাত্রা নিম্নাভিমুখী হইবার কারণগুলি খুজিয়া বাহির করিবার পর তাহার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। যে করিয়াই হউক এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা দূর করিতেই হইবে। পশ্চিমী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই হউক আর আধাদী সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেই হউক, যে ভাবেই হউক দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আবার নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। দেশের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কুঠারাঘাত করিতে হইবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। যাহাতে দরিদ্র ভারতবাসী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাড়ের পর নিঃস্বহাতেও শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত না হয়—তাহার জন্য বেশী পারিশ্রমিকে, বিনা খরচায় সার্বজনীন শিক্ষা চালু করিতে হইবে। আরও ব্যাপকরূপে গ্রামে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা চালু করিতে হইবে।

জনস্বাস্থ্য বিভাগ শুধু সহরে সহরে পোষ্টার মারিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না—গ্রামে গ্রামে রোগ বীজাণুর বিরুদ্ধে লড়াইয়া করিবার জন্য আগাইয়া যাইতে হইবে। অজ্ঞতা প্রসূত সর্বনাশা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠিন হাতে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

স্বাধীন ভারতের মানুষ যেন জানিতে শেখে, যে অবস্থায় সে বাস করে তাহা মোটেই সভ্য জাতির পরিবেশ নহে, তাহাকে নূতন উন্নততর জীবনযাত্রার রূপ সম্পর্কে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে। বনান্তে পুষ্পে ভরা সুন্দর দেশের বুকে স্বাস্থ্যবান, নিরোগ, নিশ্চিত মানুষ আবার যেন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারে। এ দেশের মানুষ বহু কষ্ট, বহু দারিদ্র্য লাঞ্ছনা, অত্যাচার ভোগ করিয়াছে। আবার যেন এদেশের মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের সাথে শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতার এক আসনে গিয়া বসিতে পারে - সেই চেষ্টাই আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

কিন্তু সে আয়োজন কোথায়? জানিনা সেই শুভদিন কবে আসিবে—আমরা বাঁচিয়া থাকিতেই —নাকি আমাদের মৃত্যুর পর?

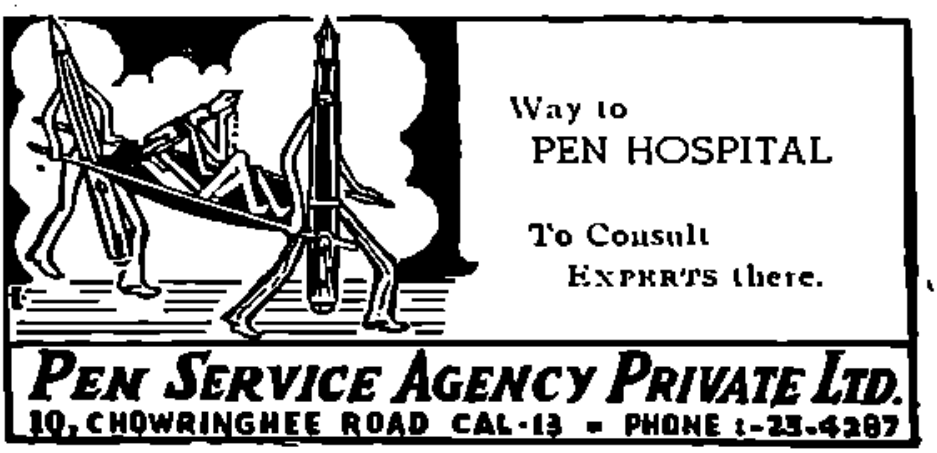

কর ধার্যের নূতন পদ্ধতি ও ভারতীয় অর্থনীতিতে ইহার প্রতিক্রিয়া

শ্রী এ. ভি. ব্রাফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শিল্প উৎপাদন নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমার বিশ্বাস যে তাহাও বে-সরকারীক্ষেত্রের প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। যদিও বেসরকারী ক্ষেত্রকে নানা অন্তরায়ের মধ্যে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে তথাপি ইহাই জাতীয় অর্থনীতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি এখানে একটি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিতে চাই। আমি নিজেই এক সময় আমদানী নিয়ন্ত্রণের অনুকূলে সুপারিশ করিয়াছিলাম কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের অজুহাতে যে ধরণের কড়াকড়ি সুরু করিয়াছেন তাহাতে শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুনরায় মন্দার ভাব আসিবে। কিছুদিন ধরিয়া আমি দেখিতেছি কয়েকটি শিল্প কারখানা তাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নির্দিষ্ট মানের ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য আমদানী করিতে না পারিয়া তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা কমাইয়া দিতেছে। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও হয়ত কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এ পর্যন্ত উৎপাদন গতি অব্যাহত আছে। আর আমাদের অর্থনীতিতে এইটাই সবচেয়ে আশাপ্রদ বিষয়।

জনসাধারণের বিশ্বাস ক্যালডরের সুপারিশক্রমে ভারত সরকার নূতন কর পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে অধ্যাপক ক্যালডর নাকি নয়া দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহার ঔরসজাত ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সন্তানগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। তিনি তাহাদের বিকলাঙ্গ দেখিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়েন। যতদূর জানি দিল্লীতে তিনি তাহার কয়েক বন্ধুর কাছে তিনি বলিয়াছেন যে সর্বোচ্চ আয় সম্পন্ন লোকেরা অন্ততঃ ২৬ শত অর্থ কর প্রদানের পর ভোগ করিতে পারিবে, ইহাই তাহার সুপারিশ ছিল। কিন্তু যে ভাবে কর পদ্ধতির প্রয়োগ হইয়াছে তাহাতে ঐ সব শ্রেণীর লোকেদের কোন উদ্বৃত্ত আয় ত থাকিবেই না, উপরন্তু আয়ের ১০০ শতাংশের অধিক কর দিতে হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া আমার এমন কোন দেশের কথা মনে পড়ে না যেখানে উপার্জনকারীকে ১০০ শতাংশের মত কর দিতে হয়। অবশ্য রাশিয়ার করের হার প্রায় আয়ের সমানই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার রূপায়নে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন যতই জরুরী হউক না কেন, কোন ব্যক্তি তাহার আয়ের বিন্দুমাত্র ভোগ করিতে পারিবে না, কোন কর পদ্ধতির এই যুক্তির কোন নৈতিক সমর্থন নাই। এই জন্যই বর্তমান কর কাঠামো নিন্দার্হ।

এই সব করের আদায় সম্পর্কে যে কল্পনামূলক আনুমানিক হিসাব করা হইয়াছে তাহার বাস্তব সমর্থন নাই। সম্পত্তিকর প্রবর্তনের সময় তদানীন্তন অর্থ মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে এই কর হইতে ৪ হইতে ১৫ কোটী টাকা পর্যন্ত আদায় হইতে পারে। গত ৪ বৎসরে যেরূপ আদায় হইয়াছে তাহার চিত্রটি নিম্নরূপ।

১৯৫৪-৫৫	০·৮১ কোটি টাকা	১৯৫৬-৫৭	২·১১ কোটি টাকা
১৯৫৫-৫৬	১·০১ কোটি টাকা	১৯৫৭-৫৮	২.৫২ কোটি টাকা

নয়াদিল্লীর কর্তারা ও ইন্‌কামট্যাক্স অফিসাররা ধনী লোকেদের আশাতীত দ্রুততার সহিত অবলুপ্তি ঘটিতেছেনা দেখিয়া নিতান্ত হতবাক হইয়া পড়িয়াছেন। গত বৎসর সম্পদ কর বসানো হইয়াছিল। অনুমান করা গিয়াছিল যে অন্ততঃ ৯ কোটি টাকা এই বাবদ আদায় হইবে। ১৯৫৮ সালের

৩১শে মার্চ পর্যন্ত আদায়ের পরিমাণ মাত্র ৬১ কোটি টাকা। ইহাতে আমার আত্মপ্রসাদ লাভের কোন ইচ্ছা নাই ; কারণ আমি জানি সরকার এই করের সাহায্যে আনুমানিক হিসাব অপেক্ষা অধিক টাকা আদায় করিতে সমর্থ হইবেন।

এই সব করের প্রতিক্রিয়া এতই সুস্পষ্ট যে তাহা আর ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। সঞ্চয়ের সম্ভাবনা বিলীন হইতে চলিয়াছে। তাহার প্রমাণ শেয়ার বাজারের মূল্য তালিকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে। ১৯৫৮-৫৭ সালে পরিবর্তনশীল লভ্যাংশের সূচক সংখ্যা ছিল ১২১.২, ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহার সূচক সংখ্যা ২৬৭। যে প্রেফারেন্স শেয়ারে বিনিয়োগ সবচেয়ে নিরাপদ ছিল ; যাহা বিধবা ও নির্ভরশীল পোষ্যদের ভবিষ্যত সংস্থানের অবলম্বন ছিল, তাহাই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কারণ, বর্তমানে ইকুয়িটি শেয়ারের ডিভিডেণ্ডের পরিমাণ ৭ হইতে ৯ শতাংশ। সুতরাং যাহারা বিনিয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল এবং সব সময়েই লগ্নীর ব্যাপারে নিরাপত্তার উপরই জোর দিত, তাহারা আজ নূতন কর ব্যবস্থায় তাহাদের মূলধনের ২৫-৩০ শতাংশ খোয়াইয়াছে। যৌথ কোম্পানীসমূহ আজ নূতন শেয়ার বিক্রয় করিতে গিয়া বেগ পাইতেছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ও ভাটার টানে বহিতেছে। বাজেটের সহিত দেশের আর্থিক ব্যবস্থার যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে এই চিত্রটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ঐ বিবরণী হইতে দেখা যায় যে পরিকল্পনা কমিশনের আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে গভর্ণমেণ্ট ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত আদায় হইয়াছিল মাত্র ৬৬ কোটি টাকা। আলোচ্য বৎসরের দশ মাসের হিসাব আরও হতাশাব্যঞ্জক। গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট হইতে ১৪০ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহের আশা করিয়াছিলেন। সেক্ষেত্রেও মাত্র ৬৮ কোটি টাকা পাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। ইহা হইতেই লোকের সঞ্চয় ও লগ্নীর ক্ষমতা বুঝিতে পারা যায়।

দেশে লগ্নীযোগ্য উদ্বৃত্ত অর্থ কিছু আছে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গত এক বৎসরে ব্যাঙ্ক সমূহের মেয়াদী আমানতের বৃদ্ধিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে লগ্নীর ফলে আজ শুধু লোকের মূলধনের হ্রাস ঘটিয়াছে, তাহা নহে, মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়া জনসাধারণ আজ আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সেজন্য যদিও কোথাও লগ্নীযোগ্য উদ্বৃত্ত অর্থের সঞ্চয় দেখা যায়, লোকের আস্থা হীনতার ফলে আজ তাহারা লগ্নী করিতে নারাজ। নূতন কর ব্যবস্থাই ইহার জন্য সর্বাপেক্ষা দায়ী।

গত দশ বৎসরে আভ্যন্তরীণ শুল্ক দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ইহার প্রতিক্রিয়া বিবিধ। প্রথমতঃ মূল্যবৃদ্ধি ও তাহার পরিণতি মুদ্রাস্ফীতিতে। দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্ট আয়ের লোকেদের উপর আধিক চাপ ও কষ্ট। গভর্ণমেণ্টের শুল্ক বৃদ্ধি ক্রমবর্দ্ধমান। লোকের ক্রয়ক্ষমতার নিষ্ক্রিয়তার সীমাকে গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন না। ন্যায্য মূল্যে যতদিন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হইবে ততদিন লোকে কিনিতে থাকিবে। আয় বৃদ্ধি পাইলে এই ক্রয়শক্তি বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু দাম ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে লোকের ক্রয়বিমুখতাও বাড়িবে। গত দুই বৎসরে মূল্য বৃদ্ধির দরুণ বস্ত্রের বিক্রয় হ্রাস ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাপড়ের বাজারে তেজী ভাব ছিল। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছিল, এবং মিলগুলিও কাপড় বিক্রয় করিতে কোনও বেগ পায় নাই। কোনও মিলে ২।৩ সপ্তাহের

উৎপাদনের বেশ মজুত জমিতে পারে নাই। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুল্ক ধার্যের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। ক্রেতাদের ক্রয়বিমুখতা এমনই বৃদ্ধি পায় যে মূল্য হ্রাস পাইলেও কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পায় নাই। তাহার ফলে প্রত্যেক মিলে কাপড়ের মজুত এমনই বাড়িতে থাকে যে, মিল-মালিকরা জীবনেও তাহা কল্পনা করেন নাই। ইহারই পরিণতি স্বরূপ ২৬টী মিল বন্ধ হইয়া যায়। যদিও সম্প্রতি এই শুল্ক কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছে, তথাপি আরও কয়েকটী মিলের বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ শুল্ক যে মাত্রাতিরিক্ত ধার্য করা সম্ভব নহে তাহা বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা কি পরিমাণ সাধারণ লোকের ক্রয়বিমুখতা সৃষ্টি করে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে সরকারের চোখও খুলিয়া যাওয়া উচিত ছিল।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে পরিকল্পিত ব্যয় ও কর-ফাঁকির সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করা, এই বিবিধ উদ্দেশ্যেই গভর্ণমেণ্ট বর্তমান কর ব্যবস্থা গ্রহণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। পরিকল্পনায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৮০০ কোটী টাকা কর-বাবদ আদায়ের যে হিসাব ধরা হইয়াছিল, তাহার পরিবর্তে মাত্র ১২২ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। কর-ফাঁকির ছিদ্রগুলি বন্ধ করিতে সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সরকার এবং কর-ফাঁকিদারদের মধ্যে বেশ একটা টানা-পোড়েন সুরু হইয়া গিয়াছে। যদি মাত্রাতিরিক্ত ভাবে কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় তবে মানুষও স্বভাবতই কর-ফাঁকির নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে উদ্যোগী হইবে। বে-আইনী স্বর্ণ মজুত রাখা ও ধরার যে সংবাদ নিত্য প্রকাশিত হইতেছে, তাহা হইতে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়। গভর্ণমেণ্টের শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্বর্ণের চোরাই চালান ও আমদানী নিয়মিত চলিতেছে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি ইহাই নির্দেশ করে যে উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারের ভাণ্ডারে না গিয়া অন্যত্র জমিতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে আমি প্রাক্তন বৃটিশ অর্থ-মন্ত্রীর একটি উক্তি আমাদের সরকারের দৃষ্টি-গোচর করিতে চাই। প্রাক্তন-অর্থমন্ত্রী তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই বলিয়াছেন যে টাকার হের-ফের সরকারের তহবিল অপেক্ষা জনসাধারণের নিকটই বেশী দেখা যায়। আজিকার আর্থিক পরিস্থিতি নিতান্ত দুর্যোগময়। গভর্ণমেণ্ট যদি এখনও বর্তমান নীতি আঁকড়াইয়া থাকেন তবে আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ অধঃগতির দিকে চলিতে থাকিবে। ইহার ফলে আমাদের দ্রুত ও বৃহৎ-শিল্পের সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইবে। আমার বিশ্বাস, আমরা নিরাশ হইব না।

নূতন অর্থমন্ত্রী আসিয়াছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ নহেন। তথাপি বিশ্বাস করি জটিল ও দুরূহ সমস্যাসমূহ তিনি নূতন ভাবে পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিবেন। সুযোগ্য পরিচালক হিসাবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস নূতন অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই করনীতির যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি আমি উল্লেখ করিলাম সেগুলি তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিবেন।

কর প্রসঙ্গে

জনৈক ইনকামট্যাক্স বিশেষজ্ঞ আয়করের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আর্থিক প্রসঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিবেন। কাহারও কোন বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি তাহার উত্তর ও সমাধান আর্থিক প্রসঙ্গ মারফৎ লিখিবেন। আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে এসম্পর্কে অনুরোধ করিতেছি।

বৈদেশিক মুদ্রা ও ভারতবর্ষ

শ্রী এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার, গভর্ণর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

প্রতিকূল বাণিজ্যিক অবস্থার জন্য বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে ভারতের ষ্টার্লিং ব্যালেন্স প্রায় একোটি টাকা করিয়া হ্রাস পাইতেছে। বৎসরের প্রথম ভাগে এই হ্রাসের পরিমাণ ছিল সপ্তাহে দুই কোটি টাকা। ফলে বহুলোক আমাদের আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রা সংস্থানের সহিত জাতীয় অর্থনীতির দৃঢ়তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এই ধারণাটি ভুল।

বস্তুতঃ স্বর্ণমান (gold standard) বা স্বর্ণ বিনিময় মান (gold exchange standard) চালু থাকা কালে জাতীয় অর্থনীতির দৃঢ়তার সহিত দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সংস্থানের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের অস্তিত্ব ছিল। কারণ তখন দেশের ভিতর ও বাহির উভয়ক্ষেত্রেই প্রচলিত মুদ্রা স্বর্ণদ্বারা পরিশোধ্য ছিল। সুতরাং তখন প্রতিটি দেশেরই লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করা। প্রথম যুদ্ধের পর যখন স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহুদেশের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষিত হওয়ার পর হইতেই উক্ত অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। একথা আজ সর্ববাদী সম্মত যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় শুধুমাত্র প্রতিকূল বাণিজ্যিক অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য. দেশের অর্থনৈতিক দৃঢ়তার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। তাই আজ সবদেশেই বৈদেশিক মুদ্রার সহিত নোট ছাপার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং দুই বৎসর পূর্বেকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সংশোধন) আইনে এইরূপ নিয়মের প্রবর্তন করা হইয়াছে।

যদিও এখনও করণীয় অনেক কিছুই বাকী, খাদ্য উৎপাদনে অদ্যাপি আমরা স্বাবলম্বী নহি, তথাপি সামগ্রিক বিচারে আমাদের অর্থনীতির দৃঢ়তা ক্রমবর্ধমান। ভারতের শিল্পোৎপাদন শক্তি ক্রমবর্ধমান। নিত্য নূতন কারখানা ও কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সৃষ্টি হইতেছে। আমেরিকার মিঃ ডগলাস ডিলনের (Mr. Douglas Dillon) একটি মাত্র মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া করিয়া আমাদের আর্থিক প্রগতির সম্যক পরিচয় দেওয়া যায়। মিঃ ডগলাসের মতে আগামী দশ হইতে পনের বৎসরের মধ্যে ভারতীয় টাকা দুর্লভ মুদ্রায় পরিণত হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য হইল প্রতিকূল বাণিজ্যিক অবস্থা হইতে রক্ষা পাওয়া। ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলির এমন কি অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় উন্নত দেশেরও বৈদেশিক বাণিজ্য কয়েকটি প্রধান খাদ্যশস্য বা কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল বলিয়া প্রতিবৎসর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র ঠিক অনুরূপ অবস্থা দেখা না দিলেও খাদ্য আমদানীর পরিমাণ প্রতি বৎসর একরূপ না থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৪১-৪২ সালে ২২৮ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইয়াছিল, ১৯৪৫-৪৬ সালে ফসল ভাল হওয়ার দরুণ ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ২৯কোটি টাকা। ১৯৪৭-৪৮ সালে আবার ইহা ১৫২ কোটি টাকায় পরিণত হয়। সুতরাং বিশেষ যুক্তি তর্ক ব্যতিরেকেই ইহা প্রমাণ করা চলে যে, আমাদের বহির্বাণিজ্যের অনুকূল প্রতিকূলতা মুখ্যতঃ খাদ্যশস্য আমদানীর উপরই নির্ভর করে।

অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংস্থান নিম্নতম। পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়নের জন্য বিদেশ হইতে যে সব যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইতেছে তাহার জন্য আমাদের বৈদেশিক বিনিময়ের উপর একটা অস্বাভাবিক চাপ পড়িতেছে। অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রেরই জানা আছে যে, সকল দেশেরই শিল্পোন্নয়ন বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এমনকি সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। উপরন্তু বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে ভোগ হ্রাস করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বর্তমান ভারতে তাহা সম্ভব নয়।

রপ্তানিঘাত আয় ও জাতীয় আয়ের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে অন্যান্য দেশের দেশের নিকট আমাদের ঋণ এমন কিছু বেশী নয়। তবে একমাত্র অসুবিধার কথা হইল আমাদের ঋণগুলি স্বল্প মেয়াদী, আমাদের সম্মুখে এমন সমস্যা দুইটি :—

(১) পরিকল্পনা কমিশনের মতে মূল পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিতেই ৫০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের ২০০ কোটি টাকার মত ষ্টার্লিং জমা আছে এই ধারণাতেই এইরূপ পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল।

(২) ১৯৬১-৬২ সাল হইতে ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে আমাদিগকে অনেকগুলি ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। এবং তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সময়মত আরম্ভ করিতে হইলে ইহা অবশ্যই করিতে হইবে।

এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যা সমাধানের মাত্র চারিটি পথ আছে (ক) উন্নয়ন পরিকল্পনার কতক অংশ বাদ দেওয়া (খ) আমদানী হ্রাস করা (গ) রপ্তানী বৃদ্ধি করা এবং (ঘ) পুনরায় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা।

অনেকে বলেন পরিকল্পনাটি অতিরিক্ত আশাব্যঞ্জক। অনেকে বলেন, প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা একটু বৃহত্তর আকারে দ্বিতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন আমাদের এই বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত নয়। কাজ যখন আরম্ভ করা হইয়াছে তখন যে কোন প্রকারে তাহা শেষ করিতেই হইবে, অগ্রগতি যেটুকু করা হইয়াছে তাহা বিফলে যাইবে। আমদানী নিয়ন্ত্রণের সকল প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে ও হইতেছে। শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় ও পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি ব্যতীত সকল প্রকার আমদানীই বন্ধ করা হইয়াছে। রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য আমরা চেষ্টা যথেষ্ট করিতেছি এবং এই কাজে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। সেই সঙ্গে করিতে হইবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপকতর প্রচেষ্টা।

সবশেষে আসে ঋণের কথা। বলাবাহুল্য পরিকল্পনা রচনার সময় বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তার ভাব বিদ্যমান ছিল এখনও আর সেরূপ অবস্থা নাই। বহু দেশ হইতে বিশেষ করিয়া যুক্তরাজ্য হইতে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি এবং ভবিষ্যতেও পাইব বলিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। প্রসঙ্গক্রমে কোন দেশ হইতে আমরা কতটা ঋণ ও সাহায্য পাইয়াছি তাহার একটি মোটামুটি চিত্র এখানে উপস্থিত করা হইতেছে।

দেশের নাম	সাহায্যের প্রকৃতি	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
যুক্তরাজ্য	দান	৬৮
	ঋণ	২৪৬
পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক	ঋণ	১৩১
সোভিয়েট রাশিয়া	ঋণ	১২৩
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা	ঋণ	২৪
কানাডা	দান	১৯
	ঋণ	১২
অবশিষ্ট দেশসমূহ	দান	৩
	ঋণ	১৩৫

বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ভারত অন্য দেশ হইতে ঋণ বা সাহায্য গ্রহণ করে না। তথাপি উপরোক্ত সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের আরও বহু বৈদেশিক সাহায্যে প্রয়োজন হইবে। সুখের বিষয় বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা (International Finance Corporation)—যাহার আগামী বার্ষিক অধিবেশন অক্টোবর মাসের প্রথমে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে—ইহারা সকলেই অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক মান উন্নয়নের দিকে নজর দিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস ভারতসহ সকল অর্ধোন্নত দেশই ইহাদের দ্বারা উপকৃত হইবে।

* (International Bank for Reorganisation and Development)

১৯৫৭ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং-এর গতি-প্রকৃতি

১৯৫৬ সালে ভারতীয় অর্থনীতির উপর যে বিশেষ চাপ সৃষ্টি হইয়াছিল ১৯৫৭ সালে সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুখ্যতঃ সেই ক্ষত আরোগ্য করিতেই ব্যস্ত ছিলেন।

পরিকল্পনায় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও জাতীয় আয় উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদার তুলনায় সরবরাহের স্বল্পতা সকল সময়েই লক্ষিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৭ সালের আগষ্ট পর্যন্ত খাদ্যশস্যের দর শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালের পাইকারী মূল্যমানকে ১০০ ধরিলে ১৯৫৭ সালের মার্চমাসের শেষে ১০৪·১-এ এবং আগষ্ট মাসের প্রথমে ১১৩·১-এ পরিণত হয়। বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছে।

এই প্রতিকূল অবস্থার প্রতিকারকল্পে অতিরিক্ত কর বসান হইয়াছে। আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য খাদ্যশস্যের আমদানী বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং দেশের মধ্য হইতে খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপক সরকারী চেষ্টা চলিতেছে। ন্যায্যমূল্যের সরকারী দোকান হইতে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাদ্যশস্যের কাটকা বাজার বন্ধের উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ Selective credit control দ্বারা দাদন সংকোচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সুদের হার বৃদ্ধি ও নৈতিকচাপের ব্যবস্থাও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে সরকারী বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির দিকে হইলেও বেসরকারী বিনিয়োগের হার ক্রম-হ্রাসমান। রিজার্ভব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত Trend and Progress of Banking in India during the year 1957 নামক বিবরণীতে প্রকাশ যে ১৯৫৬ সালে তপশীল ভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের জমার পরিমাণ ছিল ৭৭ কোটি টাকা, ১৯৫৭ সালে ইহার পরিমাণ হইয়াছিল ২৩ কোটি টাকা, জমার এই পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ বহুল পরিমাণে দায়ী। অবশ্য সুদের হারও এই ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন ও ব্যাঙ্কগুলির জমার হার বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। অনেকে মনে করিতেছেন বিগত দু'এক বৎসরের জমার আয় ব্যাঙ্কে আসিয়াই পড়াতেই জমার পরিমাণ এরূপ লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫৬ সালে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির দাদনের পরিমাণ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া ২২৬ কোটি টাকা হয়। ধান, চাল, গম, ছোলা ও চিনির উপর দাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি দ্রব্যের উপর ফাটকা দাদন মুদ্রাস্ফীতির সূচনা করায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সেইসব দাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে তৎপর হন। কিন্তু এত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতির বেগ ক্রমবর্ধমান। মুখ্যতঃ এজন্যই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর জুন মাসের শেষে সমস্ত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের উদ্দেশ্যে লিখিত এক পত্রে বৎসরের মন্দী সময়ে (Slack season) দাদনের পরিমাণ হ্রাস করিতে বলেন। পত্রে একথাও জানানো হইয়াছিল যে প্রয়োজন বোধে তাহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে বিনাশুদ্ধে যে অধিক সাহায্য পাইতেছিলেন প্রয়োজনবোধে তাহার পরিবর্তন করা হইতে পারে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কারদের সহিত পরামর্শক্রমে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট দাদনের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকা স্থির করেন। তদনুসারে ব্যাঙ্কসমূহ দাদনের পরিমাণ কমাইতে সচেষ্ট হইলেও নির্ধারিত লক্ষ্য পর্যন্ত দাদন কমান সম্ভব হয় নাই।

আলোচ্য বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট-এর সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনের মূল্য উদ্দেশ্য হইল যে-সরকারী ব্যবসায়ীদিগের জন্য মধ্য-মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করা, ষ্টেট ব্যাঙ্কের কৃষিদাদন, সমবায় সমিতি এবং ক্ষুদ্রকায় শিল্পগুলিকে ঋণের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে ভবিষ্যতের জন্য কয়েকটি কার্যক্রমের কথা বলা হইয়াছে; যথা—Central Warehousing Corporation (কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশান) স্থাপন, হায়দ্রাবাদ ষ্টেট ব্যাঙ্কের পুনর্গঠন, ব্যাঙ্কারস্ ট্রেনিং কলেজ স্থাপন, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন প্রভৃতি। ১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৭ সালে ব্যাঙ্ক সমূহের ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হওয়ায় মোট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এসম্পর্কে নিচের তালিকাটি উল্লেখযোগ্য।

(কোটি টাকার হিসাবে)

		১৯৫৬	১৯৫৭
১। মোট আয়	(১) সুদ ও বাটা	৪৪·০	৪৩·৭
	(২) অন্যান্য আয়	৩২·৯	৪১·০
		১১·১	১২·৭

২। মোট ব্যয়	৩৬·৩	৪৫·২
(১) জমা ও ঋণের জন্য দেয় সুদ	১৪·৫	২০·৬
(২) স্থায়ী ব্যয়	১৬·২	১৮·৩
(৩) অন্যান্য ব্যয়	৫·৬	৬·৩
৩। নীট লাভ	৭·৭	৮·৫

পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়নের প্রয়োজনে আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এজন্য রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের সমীক্ষাতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাও পরিকল্পনা শীর্ষক অধ্যায়ে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ব্যাঙ্কগুলির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যথোপযুক্ত সম্প্রসারণ আজও সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য একথা ঠিক যে পরিকল্পনার বিপুল ব্যয়ভার সংগ্রহের জন্য গ্রামাঞ্চলের অর্থ সম্পদ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন এবং ১৯৫৭ সালে ব্যাঙ্কের জমার পরিমাণ বৃদ্ধির পিছনে ষ্টেট ব্যাঙ্কের পল্লী অঞ্চলে শাখা স্থাপন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অবশ্য স্থায়ী আমানতের সুদের হার বৃদ্ধিও এজন্য অনেকাংশে দায়ী।

ভারতে রবারজাত দ্রব্য প্রস্তুত শিল্প

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সেক্রেটারী, ডানলপ রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেড।

ভারতের সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে রবারজাত দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। ডানলপ ইন্‌কোয়ারি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টেও দেখা যায় যে এই শিল্পটি জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ১৯৩৯ সালে ৮·৫ এবং ১৯৫০ সালে ১০·১ শতাংশ টাকা সাহায্য করিয়াছিল। বহির্বাণিজ্যের হিসাবেও দেখা যায় এই শিল্পটির উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানী ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং আমদানী হ্রাস পাইতেছে। নিম্নে ইহার একটি হিসাব দেওয়া হইল।

রবারজাত শিল্পের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি (পরিধেয়, বুট ও জুতা বাদে)

লক্ষ টাকায় আঙ্কিক হিসাব

	আমদানী	রপ্তানী		জের
১৯৪৫-৪৬	৯·১৪	৭·২৮	—	২·৪০
১৯৫১-৫২ হইতে ১৯৫৫-৫৬	৪·৩১	১০·৫৮	+	৬·২১

গত ত্রিশ বৎসরে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে সংগ্রাম করিয়া এই অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। ১৯২০ সালে ভারতে প্রথম রবারজাত দ্রব্য উৎপাদন সুরু হইলেও ১৯৩০ সালের পূর্বে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব হয় নাই। এই সময় ডানলপ, বাটা, ফায়ারষ্টোন প্রভৃতি কোম্পানী উৎপাদন আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হয় ও উৎপাদন সুরু করে। এই শিল্পের প্রথমাবস্থাতেই ১৯৩০এর বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজার ও বৈদেশিক প্রতিযোগিতা অন্তরায় সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধকালীন চাহিদা সৃষ্টির ফলে বহুবিধ নূতন ধরণের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ হয় এবং নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরে

এই শিল্পটি শুধু দ্রুত অগ্রগতি লাভ করিয়াছে তাহাই নহে, ইহার ভিত্তিও সুদৃঢ় হইয়াছে। বর্তমানে শিল্পটির অবস্থান নিম্নে দেওয়া হইল :

অবস্থান : পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই, নাগপুর, দিল্লী এবং দক্ষিণ ভারত শিল্পের সংখ্যা : ১০০টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ৩০০টি ক্ষুদ্র আয়তনের। নিয়োজিত মূলধন (আদায়ী মূলধন ও ঋণ)—১৩ কোটি টাকানিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা—২১'০০০ (২০০০ কারিগরী শিক্ষা সম্পন্ন) এই শিল্পটি নানাবিধ নিত্য ব্যবহার্য ও উৎপাদনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করে। যথা :— (ক) টায়ার ও টিউব (খ) বিবিধ

(১) রবার আবৃত বিদ্যুতের তার (২) ওয়াটার প্রুফ রবার মিশ্রিত বস্ত্রজাত দ্রব্যাদি (৩) জুতা (৪) খেলনা ও খেলার দ্রব্যসামগ্রী (৫) সাধারণ রবারের জিনিসপত্র ও কারখানার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও সামগ্রী যথা হোস্, বেল্‌টিং ভি-বেল্‌টিং ও ফ্যান বেল্‌টিং রবারের চাদর, খেলের সরঞ্জাম, মোটরগাড়ী ও এরোপ্লেনের অংশ বিশেষ, ল্যাটেক্স ও স্পঞ্জ, রবারের প্রস্তুত মেঝের উপর বিছাইবার চাদর ও অন্যান্য ঢালাই দ্রব্যাদি। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও রবারের টায়ার ও টিউব উৎপাদন এই শিল্পে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধিকার করিয়া আছে। এই শিল্পের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

	টায়ার ও টিউব	অন্যান্য	মোট
লগ্নীকৃত মূলধন	৬৬%	৩৪%	১০০%
কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা	২৭%	৭৩%	১০০%
মজুরির মূল্য	৮৫%	১৫%	১০০%

বিভিন্ন ধরণের টায়ার ও টিউবের উৎপাদন পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

বিষয়	একক	উৎপাদন ১৯৫০	উৎপাদন ১৯৫৫	বর্তমান উৎপাদনের ক্ষমতা	উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
মোটরগাড়ীর ও ট্রাক্টর ও এয়ার ক্রাফ্‌ট্ টায়ার	"	·৬৪	·৯১	·৯৫	২
টিউব ঐ	,,	·০৭	·৮১	·৯৫	২
সাইকেলের টায়ার	"	৩·৩৩	৫·৭৫	৬·০৩	৬
" টিউব	"	৪·২১	৫·৫৯	৮·১৩	৫

উপরোক্ত উৎপাদনের মধ্যে ডানলপ ও ফায়ার্ষ্টোন কোম্পানী মোটরগাড়ী প্রায় ১০০ শতাংশ টায়ার ও টিউব উৎপন্ন করে। এবং সাইকেলের টায়ার ও টিউব ৯০ শতাংশ উৎপন্ন করে। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন করে। ১৯৫০ সালে টায়ার উৎপাদন শিল্পে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি শুল্ক সমিতি গঠন করা হইয়াছিল। ঐ সমিতি তিনটি বৃহৎ কারখানা পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে উহারা একজোট হইয়া প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়াছে। ১৯৪৬ হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে টায়ারের যে মূল্য ছিল তাহাতে দেখা যায় যে উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় টায়ারের মূল্য অত্যধিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সমিতি উক্ত তিনটি কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত টায়ারের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের সুপারিশ করেন। অবশ্য কাঁচা মালের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির জন্য টায়ারের মূল্যের উঠা-নামা ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাব

করেন। ইহারই ফলে ১৯৫৫ সালের অক্টোবর হইতে টায়ারের মূল্য হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া সমিতি আরও কতকগুলি সুপারিশ করেন।

(ক) একটি ছোট পরীক্ষামূলক কারখানা স্থাপন এবং টায়ার উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ আর্থিক সাহায্য দেওয়া। (খ) উক্ত তিনটি বিদেশী কোম্পানীতে ভারতীয় মূলধন নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা যাহাতে মুনাফার অধিকাংশ ভাগই এই দেশে থাকিয়া যায়। টায়ার উৎপাদনের তুলনায় এদেশে রবারজাত অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন নিতান্ত কম নহে। তবে টায়ার উৎপাদন শিল্প যতটা যত্নের সাহায্যে সম্ভব হয় অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা তত নহে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে এই শিল্পটির উৎপাদন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :—

	ইউনিট	উৎপাদন	উৎপাদন ক্ষমতা		
				বর্তমান	
		১৯৫০	১৯৫৭		কারখানার সংখ্যা
রবার ইনস্যুলেটেড কেবল	মিঃ গজ	৩৩·২৬	১০২·৯		২
রবার মিশ্রিত ওয়াটারপ্রুফ বস্ত্র	,,		৩·০০	৫·৬০	১২
রবারের জুতা	মিঃ জোড়া	১৬·৫৬	৩৬·৯	৪০·১৩	১৯
রবারের খেলনা, অন্যান্য দ্রব্য	মিঃ ডজন	১০·৫৬	১৯·৮	৪৬·৯০	১৬
ফ্যান বেল্ট	লক্ষ	১·৬১	৬·৫৩	৮·৮২	৫
রেডিয়েটার হোস	,,	২·০৬	১৭·০	৪·৭৪	৯
বেলওয়ে স্প্রিং	১০ লক্ষ	·২৬	১·৮	১·২৯	৪
ভ্যাকুয়াম ব্রেক	লক্ষ	৩·৩৪	৭·৭	৯·৩৪	৪
অন্যান্য হোস	মিঃ ফুট	২·৮২	৭·৯	৯·৯২	১৪
ভি বেল্ট	লক্ষ	—	—	১·৭৪	৪
এবোনাইট	মিঃ পাউণ্ড	—	২·৩	১·১৬	১৪
ল্যাটেক্স স্পঞ্জ	,	—	১·৯	১·১৩	৭

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে রবারজাত দ্রব্য উৎপাদন শিল্পে কিরূপ অগ্রগতি হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ নিম্নে দিতেছি।

মোটর গাড়ীর সাজ সরঞ্জাম—টায়ার ও টিউব উৎপাদন ব্যতীত হিন্দুস্থান, মরিস, ষ্টাণ্ডার্ড, অষ্টিন প্রভৃতি গাড়ীর ও ট্রাকের রেডিয়েটার হোস্, ফ্যান বেল্ট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বর্তমানে প্রস্তুত হইতেছে। উন্নত ধরণে ফ্যান বেল্ট, ব্রেক হোস্ ও ধাতুনির্মিত রাবার বডিংস্ এবং তেলের পাম্পের জন্য রবারের সরঞ্জাম এদেশে প্রস্তুত হইতেছে। এসব ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন প্রকারের গাড়ী নির্মাণের পরিবর্তে যদি কয়েকটি নির্দিষ্ট মডেল গাড়ী ও ট্রাক প্রস্তুতের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তবে এই শিল্পে অধিকতর উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে। ট্যারিফ কমিশন ও অটোমোবাইলস্ এক্সপার্টস্ কমিটি অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এয়ার ক্র্যাফ্‌টের অংশ—ভারতে বিমান পরিবহনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রবার দ্রব্য প্রস্তুত শিল্প ও কতকগুলি অংশ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেইগুলি অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফ্‌ট্ কারখানায় প্রতিরক্ষা বিভাগে এবং বিমান পরিবহন দপ্তর কর্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে।

ফ্যান বেল্টিং—সম্প্রতি রবারের কারখানাগুলি রবার স্লাই বেল্টিং ও কমভেয়ার বেল্টিং উৎপাদন করিতেছে। এগুলি আধুনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত হইতেছে। চামড়ার বেল্টিং-এর তুলনায় এগুলির কার্যকারিতা অনেক বেশী এবং গুণে উৎকৃষ্ট। কারখানাগুলি এই ধরণের বেল্টিংএর উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে চাহিদা অনেক বেশী। তৎসত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট আমদানী করিতেছেন। ইহার ফলে কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হইতেছে।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ভি-বেল্টস্—গত কয়েক বৎসরে ভি-বেল্টস্ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু এক্ষেত্রেও উৎপাদন ক্ষমতার সম্যক ব্যবহার হইতেছে না।

হোস্—জলসেচ ও অন্যান্য প্রয়োজনে আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকারের হোস্ প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমানে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ষ লাভ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে হইয়াছে। ইহা ছাড়া আজকাল নানাবিধ রবারজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। যথা—চেয়ারের উপরকার গদি, স্পঞ্জ, মেঝের পাতিবার রবারের চাদর ও এবোনিট।

রবারজাত দ্রব্য উৎপাদন শিল্পে যুদ্ধোত্তরকালে এই দ্রুত অবনতি ভারত সরকারকে ও ইহার পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৯৫১ সালে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনে ইহা অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার পর আরও কয়েকটি শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ও এই শিল্পের উন্নয়ন সূচী গৃহীত হইয়াছে।

টায়ার ও টিউব—এই পরিকল্পনায় টায়ার ও টিউব উৎপাদনে যে উৎপাদন সূচী গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

			আনুমানিক চাহিদা ১৯৬০-৬১ (রপ্তানীসহ)	উৎপাদন ক্ষমতা (লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও বর্তমান)	মোট উৎপাদন ঘাটতি ক্ষমতা
	মিলিয়ন	সংখ্যা			
মোটরগাড়ীর টায়ার	,,	১·৪৬	—	·৯৫	·৫১
,, টিউব	,,	১·৪৬	—	·৯৫	·৫১
সাইকেল টায়ার	,,	১১·৮০	৩·২৯	১০·০০	১·৮০
,, টিউব	,,	১১·৮০	২·২২	১০·৩০	১·৫০

১৯৫৬-৬১ সালের মধ্যে উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য ৩ ২·০৪ এবং ৩·২০ মিলিয়ন সাইকেল—টায়ার ও টিউব প্রস্তুতের জন্য কারখানাগুলির অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। মোটরগাড়ী, টায়ার ও টিউব উৎপাদনের জন্য আরও একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করা হইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় আর একটি টায়ার প্রস্তুত শিল্পের কারখানা স্থাপন করিতে গেলে অতিরিক্ত ৪ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন হইবে। তাহাতে ৭ হাজার লোকের কর্ম সংস্থান হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অন্যান্য রবারজাত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের যে উৎপাদন সূচী গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

দ্রব্যসামগ্রী	ইউনিট	অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা (যাহার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে)
ভি ও ফ্যান বেল্ট	লক্ষ	৮·৬৪
ট্রান্সমিশান ও এডেন বেল্টিং	লক্ষ ফুট	৪·৩৭

শিওল টেপ	লক্ষ গজ	১৩·৩২
অন্যান্য টেপ	লক্ষ পাঃ	৩·০০
রবার ম্যাটিং	০০০ গজ	২৮·০০
রবার মিশ্রিত বস্ত্র	লক্ষ গজ	১·৪৪
মাইক্রোপোরাস সেপারেটার	মিলিয়ন	৭·২০
ক্যানভাসজুতা	মিঃ জোড়	৩·০০
রবার জুতা ও গোড়ালি	লক্ষ	৮·০০
রবার সোল ও গোড়ালি	মিলিয়ন	১·৯৮
রেডিয়েটর হোস্	০০০	১৭·১৮
টেনিস বল	০০০ ডজন	৭৪·০০
রবার কট	লক্ষ	১৮·০০
রবার এ্যাপ্রন	,,	১·২০

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেল্টিং, হোস্, জুতা, রবার মিশ্রিত বস্ত্র, ম্যাটিং, খেলার দ্রব্য সামগ্রী, সার্জিক্যাল সরঞ্জাম ছাড়ার কতকগুলি নূতন দ্রব্য যথা—টেনিস বল, মাইক্রোপোরাস সেপারেটার, রবারের ফিতা ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ছাড়াও পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে তেলের পাম্প, এয়ার ক্র্যাফ্‌ট্, ট্যাঙ্কার এবং আগুন নিবাইবার জন্য নানা প্রকারের হোস্, জ্যাকেট এবং রবারের প্রফাইল্যাটিক্ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। ভারতে রবার শিল্প কেবলমাত্র বেসরকারী ক্ষেত্রের দ্বারা পরিচালিত। আলোচ্য প্রবন্ধ হইতে দেখা যাইবে যে নানাবিধ অন্তরায়ের মধ্যেও এই শিল্পটি প্রথম পরিকল্পনাকালে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। আলোচ্য সময়ে শুধু উৎপাদনেই বাড়ে নাই, গবেষণা, কারিগরী উন্নতি, মান-উন্নয়ন এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধি সর্বক্ষেত্রেই দেখা দিয়াছে। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিতে ও ইহার অবদান কম নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেও এই শিল্পটি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছেন।

এখানে বলা যাইতে পারে যে কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৃত উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশী। সরকারের ত্রুটিপূর্ণ নীতি ইহার জন্য অনেকটা দায়ী। কোথাও নূতন কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে; কোথাও বা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হইয়াছে। কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধা, মজুরী বৃদ্ধি প্রভৃতি ও সমস্যারূপে পরিণত হইয়াছে। কোম্পানীগুলির মজুত তহবিল সরকারের নিকট জমা দেওয়ার নীতি লভ্যাংশের উপর অধিক হারে কর আদায় নূতন মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্তরায় হইয়াছে। ব্যাঙ্কের দাদন সম্পর্কে কড়াকড়ি নীতিও শিল্পের বিঘ্ন স্বরূপ। এই সমস্ত অসুবিধা দূর না হইলে এই শিল্পটি ইহার উৎপাদন ক্ষমতা সম্যক ব্যবহার করিতে পারিবে না; বা সম্প্রসারণ-নীতি গ্রহণ করিতে পারিবে না। এমত পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

দেশ দেশান্তরে

চীনে জলশক্তি থেকে তড়িৎ সংগ্রহ

চীন নদীবহুল দেশ। জলশক্তির প্রাচুর্য বহুমুখী শিল্পবৃদ্ধির সম্ভাবনা দ্রুত কার্যে পরিণত করছে। চীনের জলশক্তি থেকে ৫৯০ মিলিয়ন কিঃ ওঃ তড়িৎ সংগ্রহ করা যাবে। এখানে আমেরিকা বৃটেন ফরাসী, জাপান ইটালী ও কানাডা প্রভৃতি দেশের সামগ্রিক জল তড়িৎ সম্ভাবনার চেয়েও অনেক

বেশী। চীনের জাতীয় নেতারা প্রকৃতির এই বিশেষ দান সামগ্রিক ও কুটির শিল্পের প্রয়োজনে আহরণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বিপ্লবের পর রসায়ন ও কারিগরী শিল্পের জন্য ইহা বিশেষ ভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এর মধ্যেই উত্তর পূর্ব, উত্তর চীনে ও অন্তর্ভূত ম্যাঞ্চোরিয়ার জলশক্তি থেকে তড়িৎ উৎপাদনের জন্য অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসান হয়েছে। ইহা ছাড়া পুরাতন কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৪-৬২) দক্ষিণ পশ্চিম, স্থানেও সানমেন প্রভৃতি পাহাড়তলীতে এই তড়িৎ সাহায্যে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

চীনের ভূপ্রকৃতি ও আকৃতি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ সাহায্যজনক। পশ্চিমে উচ্চভূমি, দক্ষিণ পূর্বে নিম্নভূমি ; সুতরাং নদী নালা পশ্চিম থেকে পূর্বে বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। এই সকল নদীর গতি অনেক স্থানেই অত্যন্ত দ্রুত। অনেক সময় দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়ে ইহারা দ্রুত বয়ে যায়। এই স্থানগুলিই জলতড়িৎ কেন্দ্রের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এইসব স্থানে ষ্টেশন খুব কম খরচে নির্মাণ করা যায়। চীনের জলতড়িৎ প্ল্যান্ট বসাতে পশ্চিম দেশের থেকে অনেক কম খরচ করতে হচ্ছে। সেই কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ চীনে খুব কম।

আধুনিক চীনে যে শিল্পবিন্যাস হচ্ছে তাতে এই জলশক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে। যে সমস্ত স্থানে কয়লা পাওয়া যায় না বা কম পাওয়া যায় সে সমস্ত স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দক্ষিণ পশ্চিমে কয়লা একরকম পাওয়া যায় না। কিন্তু জল তড়িতের উপর নির্ভর করে নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠছে। চীনে জল তড়িৎ উৎপাদনের সঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ১৯৪৯ পর অনেক জলাধার ও বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালের মধ্যে দুই নদীর উপর সাতটি জলাধার নির্মিত হয়েছে। ইয়ালো নদী সানমেন জলাধার পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহত্তম জলাধার। ইহা ১৯৬১ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। গত আট বৎসরে ১৫২৮টি নদীতে তড়িৎ উৎপাদনের ব্যবস্থার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯৫৩ সাল থেকে চারিটী জলতড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। এই নূতন কেন্দ্রগুলো থেকে ৫,২০,০০০ কিঃ ওঃ তড়িৎ উৎপাদন হচ্ছে। ইহা কোমিংটাং শাসনকালের উৎপাদন থেকে ৪২ গুণ বেশী। ইহা ৫,৩৪০,০০০ টন কয়লা বাঁচিয়ে দিচ্ছে। শীঘ্রই আরও দুই মিলিয়ান কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়বে। ইলি, সিনান প্রভৃতি নদীতে অনেক বড় ও ছোট ষ্টেশন বসান হচ্ছে। সমস্ত গুলোই দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে শেষ হবে। এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যেসিন দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থার জন্য গ্রামে অনেক ছোট ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

চীন এখন কারিগরী বিদ্যার কথা কৌশলেও বেশ পারদর্শী হয়েছে। স্বাধীন ভাবে পর্যবেক্ষণ ও নক্সা প্রস্তুত করা ছাড়াও নিজেরাই বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে সমর্থ। জলতড়িৎ শিল্পে ১৯৪৯ সালে মাত্র ১০০ জন ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন এখন ইহাদের সংখ্যা ৪০০০। রাশিয়া এবিষয়ে খুবই সাহায্য করেছে।

চীনের চাষ আবাদ—উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার চীনে অনেক বেড়েছে। ধান চাষের জমিতে ফসল বাড়াবার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই সব জমিতে যাতে বৎসরে দুটী ফসল তোলা যায় তার জন্য ব্যাপক আন্দোলন হচ্ছে। চীনের জনসাধারণ আশা করছেন যে শস্যের আবাদে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ জমিতে দুটী ফসল তোলা যাবে। প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন একর

জমিতে গত ছ মাসে সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন ২৮০ মিলিয়ন আবাদী জমির মধ্যে ১২৫ মিলিয়ন একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা হ'ল।

উন্নত ধরণের বীজ গত মরসুমে ২৬০,০০০ টন চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের প্রথম চার মাসে ২৮ মিলিয়ন একর জমিতে নূতন গাছ রোপণ করা হ'ল। এ বৎসরে ৫০ মিলিয়ন একর জমিতে বন তৈরীর ব্যবস্থা করা হবে। আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই ২৫০ মিলিয়ন একর বনকে ৫০০ মিলিয়ন একরে পরিণত করা হবে। আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে ১৩ মিলিয়ন একর জমিতে আপানী পশ্‌লার রোপণ করা হবে। ইহার কাঠ বাড়ী ও কাগজ তৈরীর সাহায্য করবে। এখন প্রত্যেক কৃষি সমবায়ে সার প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নানকিংয়ের ফসফেট ফ্যাক্টরী থেকে বৎসরে ২০০,০০০ টন ক্যালসিয়াম ফসফেট পাওয়া যাবে। ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছে।

বার্মা ও হাঙ্গেরী—এক বৎসরের জন্য একটি নূতন বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এই চুক্তিমুসারে বার্মা চাউল, খনিজ ও প্রাথমিক সামগ্রী হাঙ্গারীকে বিক্রয় করবে আর সেই মূল্যে হাঙ্গারী থেকে যন্ত্রপাতি মোটর গাড়ী বিদ্যুৎ যন্ত্র ও কাপড় প্রভৃতি আমদানি করবে।

বার্মার শিক্ষা মন্ত্রী য়ুটেন ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশ ভ্রমণ করে চেকোশ্লোভাকিয়াতে যান। মন্ত্রীমহাশয় ওখানে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করেছেন। বার্মা এখন চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে মোটর সাইকেল গাড়ী, ডিজেল ইঞ্জিন আমদানি করছে।

এবৎসরে বার্মার চাউলের দাম বেড়ে গিয়ে বোধহয় টন প্রতি চার পাউণ্ডে দাঁড়াবে। উৎপাদন কম হওয়ায় দাম বাড়ার সম্ভাবনা। গত বৎসর দুই মিলিয়ন চাউল রপ্তানি হয়েছিল কিন্তু এবৎসর কম হবে।

বার্মার বৈদেশিক বাণিজ্যে ১৯৫৭ সালে ৩২১ মিলিয়ন কিয়াট (২৮,০৭৫,০০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং) ঘাটতি হয়েছে। ১৪০৭ মিলিয়ন মূল্যের দ্রব্য আমদানি করা হয়েছে। গত বৎসরের তুলনায় ৫৩ ভাগ বেশী।

ইন্দোনেশিয়া—ইন্দোনেশিয়াকে আমেরিকা পরমাণু তড়িৎ উৎপাদনের সাজ সরঞ্জাম দিতে রাজি হয়েছে। বান্দুংএর কাছে একটি রিয়াক্টর বসান হবে। জাকার্তা বোধ হয় এই দান গ্রহণ করবে।

ইন্দোনেশিয়া সরকার মালবাহী জাহাজ প্রস্তুত করবার মনস্থ করেছেন। এক হাজার টন থেকে দশ হাজার টনের জাহাজ তৈরী করবার জন্য জাহাজ নির্মাণ ইয়ার্ড খোলা হবে। বন্দর গুলোর সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য ২২৬ মিলিয়ন ডলার খরচ করা হবে। আর চীনদের সাহায্যে একটা কাপড়ের কল নির্মাণ করা হবে। জাকার্তার বাইরে রাশিয়ানদের সাহায্যে একটি কাঁচ ফ্যাক্টরী বসান হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার ডাচদের সমস্ত তৈলখনির কর্মভার ইন্দোনেশিয়া লেল কোং নামে একটি কোম্পানী গ্রহণ করেছে। নূতন আইনমুসারে কোন খনিজ সংস্থা ইন্দোনেশিয়ার বাইরে সমিতিবদ্ধ হতে পারবে না।

আর্থিক দিগ্‌দর্শন

তথ্যাবলী

১৯৫৭-৫৮ সালে সমিতিবদ্ধ নূতন সংস্থা—কোম্পানী ল' এডমিনিষ্ট্রেশান অফিস থেকে নূতন সমিতিবদ্ধ কোম্পানীগুলোর একটি তালিকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৫৬ সালে ৮৪৮টি নূতন কোম্পানী জন্মগ্রহণ করেছে আর ১৯৫৭ সালের সংখ্যা ছোট ৯৬১। কিন্তু সংখ্যায় বেশী হলে কি হবে অনুমোদিত মূলধন ১৯১৬ সালে ছিল ২১১ কোটি টাকা আর ১৯৫৭ সালে মাত্র ১০৩ কোটি। আবার আদায়ী মূলধনের হিসাব নিলে দেখা যায় যে গত দশ মাসে মাত্র ৪ কোটি টাকা নূতন কোম্পানীতে লগ্নী হয়েছে কিন্তু ১৯৫৫ সালে ছিল সারা বৎসরে ১৩ কোটি টাকা। ১৯৫৭ সালে মাত্র ৫১ কোটি টাকা লগ্নী হয়েছে তার মধ্যে ৪৩ কোটি পুরাতন কোম্পানীর সম্প্রসারণের জন্য আর ৪ কোটি টাকা নূতন কোম্পানীর জন্য ৫১ কোটির মধ্যে সরকারী কোম্পানী খরচ করেছে ১১ কোটি আর বেসরকারী ৪০ কোটি।

গত ৩ বৎসরে আদায়ীকৃত মূলধন ১০৭ কোটি টাকা বেড়ে ১১০৭ কোটিতে এসেছে। এর আগের ৩ বৎসরে ১১৪ কোটি বেড়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩ বৎসরে মাত্র ২৩ কোটি বেড়েছে। ১৩৭ কোটির মধ্যে সরকারী লগ্নী ৭০ কোটি (এর আগের ৩ বৎসরে ছিল ৩৫ কোটি) আর বেসরকারী লগ্নী প্রথম ৩ বৎসরে ৭১ কোটি আর পরের ৩ বৎসরে ৬৭ কোটি) আমাদের শিল্পপতিরা এই অবস্থায় সুখী হতে পারছে না।

আমেরিকা—ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লবের নিগ্রহ যতখানি না আমেরিকার সাধারণ মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে তার চেয়ে ভাবিয়ে তুলেছে "রিসেশান" কথাটি। এর মোটামুটি প্রতাপটা মোটর গাড়ী শিল্পের উপর পড়ে এই শিল্পকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এই রিসেশান এমন এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি উঠেছে যা পোড়া অর্থবিদরা কখন স্বীকার করেননি। কয়েক মিলিয়ন বেকার হয়ে গেল, সামগ্রিকভাবে ক্রয় শক্তি মেহনতী মানুষদের কমল কিন্তু খাদ্য কিম্বা প্রাথমিক দ্রব্য মূল্যের অধোগতি দেখা গেল না। বরঞ্চ গত বৎসরের চেয়ে এ বৎসরে মূল্য ৮।৯ বিন্দু চড়ল।

জনসাধারণ ঠিক বুঝতে পারছে না সরকার কি নীতি নেবেন। রিসেশান না ঊর্ধ্বমুখী মূল্যকে আটকাবেন। দুটো একচিলে মারা যায় না। সুতরাং সাধারণ লোক সরকারের নীতি না বুঝতে পারায় নিজেদের মতানুসারে পথ ধরেছেন। তাঁরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য যতটা সম্ভব ডলার হাতে রাখছেন খরচ করছেন।

অবশ্য এর মধ্যে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে. ইস্পাত উৎপাদন কিছু বেড়েছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ও টেলিভিসন সেটের বিক্রয় বেড়েছে। দক্ষিণ পূর্বের ষ্টেটগুলোতে আসবাব পত্রের বিক্রয়ও বাড়ছে। মেয়েদের জামা কাপড় আগের চেয়ে বেশী বাজারে কাটছে। আর সব চেয়ে বড় কথা মেসিন টুলের বিক্রয় বাড়ছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে উৎপাদন সম্প্রসারনের পথ নিয়েছে।

গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রে কর্ম চাঞ্চল্যের অভাব নেই। সামরিক উদ্দেশ্যে বহু বাড়ী নির্মিত হচ্ছে। আর তা ছাড়া ৮০০০ থেকে ২০,০০০ ডলারের মত বাড়ীর বিক্রয় গত বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে।

১৯৫৭ সালে ভারতে যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন বেড়েছে—ভারতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি আজ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কটের সময়ে ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন সংরক্ষণে ও সম্প্রসারণে বিশেষ সাহায্য করছে।

১৯৫৭ সালে কাপড় কলের যন্ত্রপাতি উৎপাদনের হার বেড়েছে। কার্ডিং এনজিন ১৯৫৭ সালে ৮৮৩ হয়েছে, গত বৎসরে ছিল ৭২৬, রিং ফ্রেম ১৯৫৭ সালে ১২২৫ গত বৎসরে ছিল ১,১১০, ড্রয়িং ফ্রেম ৩০ গত বৎসরে ২৪ অটোমেটিক তাঁত ২৮২ গত বৎসরে ১৮১, স্পিনিং মেসিন ১,৮৪১, গত বৎসরে ১,১৫৮। ভারতে প্রস্তুত রিং ফ্রেম, কার্ডিং এনজিন ও তাঁত বহুলাংশে ভারতীয় মিলের প্রয়োজন মিটাচ্ছে।

অনেক প্রকার চটকল যন্ত্রপাতিও এখন এদেশে প্রস্তুত হচ্ছে। চিনি কলের যন্ত্রপাতি তৈরী সুরু হয়েছে। একটি বোম্বের শিল্প প্রতিষ্ঠান চেক সরকারের সহযোগিতায় চিনি শিল্পের যন্ত্রপাতি তৈরী করছেন। Crushing Plant ছাড়াও Vacuum Pans evaporators condiusions প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। আরেকটি প্রতিষ্ঠান জার্মানদের সহযোগিতায় চিনি শিল্পের যন্ত্রপাতি তৈরী করছে।

একটি প্রতিষ্ঠান দুধের ধরণের রোটারী মেসিন তৈরী করছে। নূতন ধরণের পাথরভাঙ্গা যন্ত্র ও granulators বৃটিশদের সহযোগিতায় তৈরী হচ্ছে। কয়েকটি বৃটিশ, সুইডিশ ও জার্মান প্রতিষ্ঠান কাগজ শিল্পের যন্ত্রপাতি তৈরী করবার জন্য ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা চেয়েছে। ১৯৫৬ সালের তুলনায় মেসিন টুল উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়েছে। এসবটারই কৃতিত্ব হিন্দুস্থান মেসিন টুলস কোম্পানীর। এই ফ্যাক্টরী মাসে ৩০টি মেসিন টুল উৎপাদন করছে। হিন্দুস্থান মেসিন টুল মিলিং মেসিন প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা করছে।

অতুল প্রোডাক্টস লিমিটেড—কোম্পানির সভাপতি কস্তুর ভাই লাল ভাই বলেছেন যে সমস্ত নূতন প্ল্যান্টে কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাপড় কলগুলোর উৎপাদন কমে যাওয়ায় কোম্পানীর মাল বিক্রয় কয়েক মাস হতে বেশ কমে গিয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে কার্য্যক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য কোম্পানী I. C. I-এর সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হচ্ছে। রাসায়নিক উৎপাদন ও অন্যান্য রং প্রস্তুত করবার জন্য কোম্পানী Atul Industries Private Ltd এর সাহায্য নিবে। শ্রীকস্তুর ভাই লাল ভাই মনে করেন যে সম্প্রসারণের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় মূলধন তুলতে পারবেন আর সরকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করবার লাইসেন্স দেবেন।

ইকাফে—Economic Survey of Asia & Far East 1957, পুস্তিকায় এসিয়ার দেশগুলোর শিল্পোন্নতির মান নির্ণয় করেছেন। তাঁদের মতে এসিয়ার অনেক দেশই সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী মূলধন ও বৈদেশিক মুদ্রা পায়নি। তাঁদের মতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নয়ন কার্যের অগ্রগতির একটি বিশেষ কারণ। ১৯৫৭ সালে ভারত ও জাপানে উৎপাদন বৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়েছে। চীন বাদে এই দুইটী দেশ এসিয়ার শিল্প উৎপাদনের মধ্যে ৩ ভাগ করে ইকাফে মনে করে মুখ্যত মূলধন, বৈদেশিক মুদ্রাও কাঁচামালের অভাব এই অবস্থার জন্য দায়ী। ভারত ও জাপানের উৎপাদনবৃদ্ধি ১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৭সালে বিশেষভাবে কমেছে। অবশ্য দক্ষিণ কোরিয়া হংকং, ফিলিপাইন ও পাকিস্তানের উৎপাদনের উৎপাদনের হার সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাছে।

জাপান যদিও ১৯৫৭ সালের প্রথম অর্দ্ধে উৎপাদন বৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রার অনটনে তাকে মূলধন লগ্নী সঙ্কোচননীতি গ্রহণ করতে হয়। ভারতের উৎপাদন ১৯৫৩ সালে ১০০ ধরলে

১৯৫৬ সালে ১৩৪ হয়েছিল কিন্তু ১৯৫৭ সালের প্রথম চার মাস অনুসারে হিসাব করলে ইহা কমে ১৩৩ হয়েছে। প্রত্যেক দেশকেই শিল্প সম্প্রসারণ করিয়ে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরলে ১৯৫৬ সালে ১৪২ হয়েছে ও ১৯৫৭সালে আরও বেড়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধি ১৪৩ (১৯৫৬) থেকে ২১১ (১৯৫৭) হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া বর্মা কিম্বা সিংহলে বিশেষ শিল্পোন্নতি হয়নি।

জাতীয় আয়ের কত অংশ শিল্প উৎপাদন থেকে বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায় তাহা এই বিবরণীতে দেওয়া হয়েছে। জাপান বরাবর ২৮·৩ ভাগ জাতীয় আয় শিল্প উৎপাদন থেকে পাচ্ছে। ভারতের শিল্প আয় ১৬ ভাগ থেকে ১৯ভাগ এসেছে। এসবদেশে মাথা পিছু শিল্প আয় খুবই কম। মাথা পিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ভারতে ২৫ কিলোওয়াট চীনে ৩০ জাপানে ৮০১ কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ১৭০২ কয়লা ভারতে মাথা পিছু ১০৪ কিলোগ্রাম চীনে ১৮৯, জাপানে ৫০৬ কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ৪,৪০৫। কয়লা উৎপাদন জাপান চীন ও ভারতে বেড়েছে। লোহা ও ইস্পাত উৎপাদন এশিয়াতে বেড়েছে। জাপানে ও চীনে বিশেষভাবে বেড়েছে। ভারত, জাপান ও চীনের ইস্পাত-উৎপাদন পৃথিবীর উৎপাদনের ৫·৭ ভাগ থেকে ৮·৪এ এসেছে এখন সিমেন্ট উৎপাদন ১৯৫২-৫৭ সালে দ্বিগুণ হয়েছে এবিষয়ে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব চীন জাপান ও পাকিস্তানের। এই সমস্ত দেশে কাপড় উৎপাদন কমে গিয়েছে।

জয়শ্রী টেক্সটাইল—জয়শ্রী টেকস্টাইল একটি বিড়লা প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানী আর একটি ডিবেঞ্চার ছেড়ে ২৫লক্ষ টাকা ধার নিচ্ছে। ডিবেঞ্চারে শতকরা ৭ভাগ সুদ দেওয়া হবে। ইহার মেয়াদ ১৯৮৮ সালের ১লা জানুয়ারীতে শেষ হবে। ইচ্ছা করলে ১৯৬৩ সালের পর কোম্পানী এই ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। এই টাকার মধ্যে ১১লাখের বেশী টাকা কোম্পনীর কার্য্যক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য খরচ করা হবে। এই প্রতিষ্ঠান অনেক প্রকার নূতন জিনিষ প্রস্তুত করা আরম্ভ করেছে, যেমন ক্যানভাস, হোস পাইপ, ট্যাপল ফাইবার, উলের জিনিষ প্রভৃতি।

চা শিল্পের কর রেহাই—যে কর ভার থেকে চা শিল্প আপাততঃ রেহাই পেয়েছে তাতে এই শিল্পের পকেটে প্রায় ১·২৫ কোটী টাকা থেকে যাবে। আর সরকার এই টাকা থেকে বঞ্চিত হবে। ২০ লক্ষ বাঁচবে বহির্বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস থেকে। প্রত্যেক একশত পাউণ্ড রপ্তানী চা চার টাকা শুল্ক ছিল এখন দুই টাকা হ'ল। আর ৩০ লক্ষ টাকা উৎপাদন কর রেহাই থেকে বেঁচে যাবে। এই কর হ্রাস ক্রমশ চা রপ্তানির হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি—ভারতীয় ম্যাঙ্গানীজ শিল্প আজ এক বিশেষ সঙ্কটময় অবস্থায় এসেছে। ভারত তার পুরান বাজার হারাতে বসেছে। অত্যধিক মূল্য সময়মত সরবরাহের অভাব ও অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল রপ্তানি নীতি এই অচল অবস্থার জন্য দায়ী।

১৯৫৮ সালের যে মাসে যে নূতন রপ্তানি নীতি গৃহীত হয়েছে তাতে যে বিশেষ সুবিধা হবে তা ব্যবসায়ীরা মনে করেন না। তাঁরা পুনঃ পুনঃ বলছেন যে এই রকম কাঁচা মালের বাজার যদি ঠিক রাখতে হয় তবে একটি বিনিয়ন্ত্রিত রপ্তানি নীতি গ্রহণ করতে হবে। আর তাছাড়া বিক্রেতারা টন প্রতি ৩০ টাকা বহির্বাণিজ্য শুল্ক রেহাই চেয়েছিল। সরকার রাজি হয়নি। ভারতীয় ম্যাঙ্গানীজের দাম অন্য দেশের ম্যাঙ্গানীজের চেয়ে টন প্রতি ছয় ডলারের উপর বেশী।

অবশ্য রপ্তানির পুরো দায়িত্ব State Trading Corporation এর ১৫০,০০০ টন কেনা সত্ত্বেও State Trading Corporation এই মালের কোন বিলি ব্যবস্থা করেনি। ভারতীয় ম্যাঙ্গানীজ টন প্রতি মূল্য ৩৬ ডলার কিন্তু অন্য দেশ থেকে ৩০ ডলারে পাওয়া যায়। এর মধ্যে অনেক খনির কাজ বন্ধ হয়েছে ও অনেক লোকের জীবিকার্জনের পথ বন্ধ হয়েছে। সরকার কি কোন ব্যবস্থা করবেন না?

চিনি রপ্তানি—দশমাস দরাদরির পর চিনি রপ্তানির বিষয়ে একটা ব্যবস্থা হ'ল। চিনির রপ্তানি উন্নয়নের জন্য একটি অর্ডিনান্স জারি করা হয়েছে। প্যারী কোম্পানির শ্রী জে, এস, প্রভু এই উন্নয়ন সমিতির কর্ণধার। এই জরুরী আইন অনুযায়ী বৎসরের উৎপাদনের ১৫ ভাগ রপ্তানি করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক রপ্তানির জন্য সরকার অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৪০,০০০ টন চিনি নির্ধারিত করেছেন। চারিদিকে বেশ গুজব রটেছে যে ২ লক্ষ টন চিনি রপ্তানি হবে। সুতরাং চিনির দাম বেশ ভালভাবেই চড়ছে। চিনি মালিক সমিতি বলেছিলেন যে চিনির দাম বাড়বে না। চিনির দাম বাড়ার জন্য বহু গৃহস্থ বিপন্ন হয়েছে। সমিতি ও সরকার এ বিষয়ে যে কার্যকরী ব্যবস্থা করবেন তা অবিলম্বে করা উচিত।

এখন দেখা যাক বিদেশের বাজারে আমরা কিভাবে চিনি বিক্রয় করছি। প্রতি টন ভারতের বাজারে দাম হচ্ছে উৎপাদন কর ও ইক্ষু সেস্ বাদে ৭৩৩ টাকা কিন্তু বিদেশী বাজারে যদি ভাল দরে বিক্রয় হয় তবে ৪৫৩ টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কর বাদে আমাদের টন প্রতি লোকসানি হচ্ছে ২৮০ টাকা। এ লোকসান কে বইবে? ক্রেতা কি—যারা ১৮ বৎসর ধরে মুনাফা জুগিয়েছে? এ বিষয়ে সরকারের ঘোষণা আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত।

বোম্বে ষ্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন—গত বৎসরের কার্য বিবরণী থেকে জানা গেল যে এই উপরোক্ত কর্পোরেশন সৌরাষ্ট্র কর্পোরেশনের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার পর ১৯৫৭ সালে ১৯৫৬ সালের তুলনায় কিছু বেশী লাভ করেছে। ১৯৫৬ সালের লাভ ছিল ৭·৩৮ লক্ষ টাকা আর ১৯৫৭ সালে হয়েছে ৮·২৯ লক্ষ। তবে আবেদন পত্রের সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও লাভ বেশী হয়েছে। কিন্তু লাভ বৃদ্ধি সত্ত্বেও কর্পোরেশনকে শতকরা ২½ ভাগ ডিভিডেন্ট দিতে সরকারের সাহায্য নিতে হচ্ছে।

অর্থনৈতিক সমাজে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

ইস্পাত রি-রোলিং মিল সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

গত ৫ই জুলাই ভারতের ইস্পাত রি-রোলিং মিল সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনকালে কেন্দ্রীয় ইস্পাত, খনি ও জ্বালানি মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং ঘোষণা করেন যে, ভারতের যে সকল অঞ্চলে রি-রোলিং মিল নাই সেই সব অঞ্চলে চারিটি রি-রোলিং মিল স্থাপনে ভারত সরকার সম্মত হইয়াছেন। কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম ও বিহারে (গঙ্গার উত্তরে) নূতন মিল স্থাপিত হইবে।

তিনি বলেন যে, রি-রোলিং শিল্পকে শেষ পর্যন্ত দেশী কাঁচামালের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। এই কাঁচামাল উৎপাদনের পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। ভাষ্যমূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামাল

সরবরাহ করা সম্ভব হইলেই এই শিল্প আর সরকারী সাহায্যের প্রত্যাশায় থাকিবে না বলিয়া তিনি আশা করেন। সর্দার সিং বলেন, ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টুকরা লোহার সরবরাহও বৃদ্ধি পাইবে। তিনি জানান যে, এই বৎসরের শেষাশেষি বা আগামী বৎসরের গোড়ার দিকে ভিলাইতে একটি ও রৌরকেলাতে আর একটি নূতন চুল্লীতে কাজ সুরু হইবে।

কাঁচা লোহা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে আর ঘাটতি নাই এবং ১৯৫৯ সালে রৌরকেলা ও ভিলাইতে ইস্পাত নির্মাণ ও রি-রোলিং মিলে কাজ সুরু হইবে। তিনটি ইস্পাত কারখানায় বর্তমানের অগ্রগতির হার বজায় থাকিলে ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি হইতে ক্রমে ক্রমে ঘাটতির অবসান ঘটিবে এবং পরিকল্পনাকালের শেষের দিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইবে। সর্দার শরণ সিং আরও জানান যে, ইস্পাত, মিশ্র ধাতু ও বিশেষ ধরণের ইস্পাত নির্মাণের কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি লাভ করা গিয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তাহাতে আমরা যে মোটামুটি সাফল্য লাভ করিয়াছি সে বিষয়ে সকলেই একমত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। শিল্পায়নের ভিত্তিই হইল ইস্পাত। সেজন্য এই পরিকল্পনায় ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা ঠিক যে, সম্পদ বিশেষ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রার দিক হইতে আমরা কতগুলি অসুবিধায় পড়িয়াছি।

পরিকল্পনার সাফল্য—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণকালে ইহার সাফল্য যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দূর করার জন্য বিদেশ হইতে পর্যাপ্ত সাহায্য, একটা স্থায়ী মূল্যমান বজায় রাখা এবং দেশের সম্পদ ও সম্পত্তি ঠিকমত কাজে লাগানর উপর নির্ভর করিতেছে তাহা উপলব্ধি করা হয়। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে আমরা নিঃসন্দেহে অনেক কিছু সাধন করিয়াছি। কিন্তু আমাদের উপর যথেষ্ট চাপও পড়িয়াছে। এই চাপের কারণগুলি সবাই জানেন। উন্নয়নের জন্য আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্পের ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমরা যদি সকলে অত্যাবশ্যক নয় এমন জিনিষগুলি বর্জনে প্রস্তুত থাকি তাহা হইলে বর্তমান চাপ আমরা শীঘ্রই এড়াইতে এবং আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিব।

ইস্পাত রি-রোলিং শিল্প—কাঁচামাল যেমন বিলেট ও টুকরা লোহার ঘাটতিই এই শিল্পের প্রধান সমস্যা। তবে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও যে এই শিল্পে ১৯৫৭ সালে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ২৪ শতাংশ অধিক উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে তাহা খুবই আনন্দের বিষয়। কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি না পাইলে উৎপাদন বৃদ্ধিও এভাবে সম্ভব হইত না। বিলেট এবং টুকরা লোহার উৎপাদনের হার স্থির থাকিলেও এই শিল্পের উৎপাদন বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিদেশ হইতে লোহা আমদানী করিয়াই ইহা সম্ভব হইতে পারে। সরকার যদি বিলেট আমদানি করিয়া থাকেন তবে ভারতের এই কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত রি-রোলিং শিল্পের উৎপাদনের হার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহা করিয়াছেন। তবে আমদানি এই সমস্যার সঠিক সমাধান হইতে পারে না। দেশেই ইহা উৎপাদন করিতে হইবে এবং আমরা সেই পরিকল্পনাই করিতেছি। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব হেতু চলতি বৎসরে গত দুই তিন বৎসরের তুলনায় আমদানি কিছুটা কম হইতে

পারে। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির যে আশা করা যাইতেছে তাহা ঘটিলে কোন অসুবিধা থাকিবে না।

তিনি বলেন, এক শিফ্‌টে কাজ হইলে বি-য়োলিং মিলে উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় প্রায় ৭ লক্ষ টনে। যে কোন মান অনুযায়ী হিসাব করা হোক না কেন এই মিলের উৎপাদন ক্ষমতা খুবই বেশী বলিয়া মনে হইবে। আপনারা দুই শিফ্‌টে কাজ চালাইবার জন্য ১৪ লক্ষ টন বিলেট প্রয়োজন হইবে বলিয়া হিসাব করিয়াছেন। অল্প ব্যয়ে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে সেই দ্রব্যের বাজার কিরূপ দাঁড়াইবে তাহার হিসাব করিয়াই কাঁচা মালের প্রয়োজন নির্দেশ করা উচিত। দেশেই কাঁচামাল যখন উপযুক্ত পরিমাণে এবং ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যাইবে তখন শিল্পকে সরকারী সাহায্য লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

টুকরা লোহার সরবরাহ—সর্দার শরণ সিং বলেন, বিলেটের অভাব একটা সাময়িক ব্যাপক মাত্র। ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টুকরা লোহার সরবরাহও বৃদ্ধি পাইবে। বৈদ্যুতিক চুল্লী সংস্থাপনের প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন এবং দেশের কোন কোন সংস্থানে কতগুলি চুল্লী সংস্থাপন করা হইবে সে সম্বন্ধে সরকার শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় টুকরা লোহা কিরূপ পাওয়া যাইবে সে কথা অবশ্যই বিবেচনা করা হইবে।

ইস্পাত কারখানার অগ্রগতি—তিনি বলেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। রৌরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে তিনটি নূতন ইস্পাত কারখানা সংস্থাপন করিয়া এবং বর্তমান কারখানাগুলির সম্প্রসারণ করিয়া সেই লক্ষ্য পূরণ করা হইবে। টাটা কারখানা ও ইণ্ডিয়ান আয়রণ কারখানা সম্প্রসারণের সুফলও এই বৎসরের শেষাশেষি পাওয়া যাইবে। নূতন কারখানাগুলির কাজও পূর্ণ পরিকল্পনা মতই অগ্রসর হইতেছে। নির্দিষ্ট সময়ে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার উপরে আমাদের বর্মপন্থা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ইস্পাত এদেশে প্রয়োজনমত উৎপাদন হইলে সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়া যাইবে। ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে একমাত্র ইস্পাত আমদানির জন্যই আমরা ১২৪কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছি। ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রাও আমাদের অনেক পরিমাণে বাঁচিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করিয়া আমরা কিছু বৈদেশিক মুদ্রাও উপার্জন করিতে পারিব। বর্তমান বৎসরের শেষাশেষি বা আগামী বৎসরের প্রথম দিকে ভিলাই ও রৌরকেলার নূতন দুইটি চুল্লীতে উৎপাদন আরম্ভ হইবে। ১৯৫৯ সালে দুর্গাপুরে একটি এবং ভিলাই ও রৌরকেলায় আরও দুইটি চুল্লীতে কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কাঁচা লোহার সরবরাহ—তিনি বলেন, কাঁচা লোহার ঘাটতির সময় শেষ হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে ও তাহার পরবর্তী সময়ে কাঁচা লোহার প্রাচুর্য ঘটিবে। এই সময় রৌরকেলা ও ভিলাইতে বি-য়োলিং মিলেও কাজ আরম্ভ হইবে। ১৯৬০ সালে রৌরকেলায় কোল্ড রি-য়োলিং এবং দুর্গাপুরে চাকা ও য়্যাকস্‌ল কারখানায় কাজ আরম্ভ হইবে। এইভাবে কাজ চলিতে থাকিলে ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময় হইতে ক্রমে ক্রমে ঘাটতি মিটিয়া যাইবে এবং পরিকল্পনা কালের শেষাশেষি আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণ করিতে সমর্থ হইব।

তৃতীয় পরিকল্পনা।—কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়াই আমাদের আত্মতুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে বা প্রচেষ্টা শিথিল করিলে চলিবে না। কারণ আমাদের সম্পদ এবং কিরূপ দ্রুত গতিতে আমরা উন্নয়নের কাজ চালাইয়া যাইতে সমর্থ করিব তাহার উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। তবে এখনই আমরা কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি। রৌরকেলাতে চতুর্থ ইস্পাত কারখানা সংস্থাপনের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করিয়াছি। সরকারী উদ্যোগে সংস্থাপিত ইস্পাত কারখানাগুলি সম্প্রসারণের কার্যসূচী সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ এই উদ্দেশ্যে সঠিক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। ইস্পাত, মিশ্র ধাতু ও বিশেষ ধরণের ইস্পাত নির্মাণের জন্য নূতন কারখানা সংস্থাপনের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি লাভ করা গিয়াছে। আমরা যদি দ্রুত কাজ চালাইয়া যাইতে না পারি তাহা হইলে এই ধরণের ইস্পাতের জন্য পরিকল্পনাকালের শেষের দিকেও আমাদিগকে আমদানির উপরই নির্ভর করিতে হইবে। আমরা যাহা তৈরি করিতে পারি তাহা আমদানি করা অন্যায়। কয়েক মাসের মধ্যে ইস্পাত, মিশ্র-ধাতু ও বিশেষ ধরণের ইস্পাত নির্মাণের কাজ সুরু করার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আশা করি এই সংবাদে দেশের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প উৎফুল্ল হইবে।

এসোসিয়েশনের বিদায়ী সভাপতি শ্রী বি. পি. খৈতান বি-রোলিং শিল্পের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। তিনি বলেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অর্থনীতিতে এই শিল্পটির অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কাঁচামালের অভাব এই শিল্পটির অগ্রগতির পথে বিরাট অন্তরায়। গত বৎসর ২লক্ষ ২৫ হাজার টনের মত বি-রোলিং দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদন ছিল ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৪ শত টন। এই উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ২৪ শতাংশ। কিন্তু নিষ্ক্রিয় উৎপাদন ক্ষমতা এত বেশী যে তাহার তুলনায় এই উৎপাদন বৃদ্ধি নিতান্ত সামান্য। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ৭ লক্ষ টন বিলেট উৎপাদনের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অর্ধেক মাত্র উৎপাদিত হয়। শকসেনা কমিটি ভারতে বি রোলিং মিলগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। উক্ত কমিটি বৎসরে ৭ লক্ষ টন বিলেট সরবরাহের সুপারিশ করিয়া ছিলেন। মিলগুলিকে দুইটি শিফ্‌টে কাজ করিতে হইলে আরও বেশী বিলেট সরবরাহ প্রয়োজন। কমিটি ইহার সুপারিশ করিয়াছিলেন। যেহেতু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে চাহিদার অনুপাতে বিলেট উৎপাদন বা সরবরাহ সম্ভব নয়, সেজন্য শকসেনা কমিটি বিলেট আমদানীরও সুপারিশ করিয়াছেন। ভারতে সর্বপ্রকার উৎপাদন ধরিয়া ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ৮,১৬,১৫০ টনের বেশী ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব নহে। অনেকে মনে করেন যে রোলিং মিলগুলি পুরাদমে কাজ করিলেও ১৫লক্ষ টন বিলেট কাজে লাগাইতে পারিবে না। কিন্তু ইহা অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। বিলেটের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। নূতন কারখানাগুলির উৎপাদন শুরু হইলে এই চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে যাহাতে বি-রোলিং মিলগুলি ১৫লক্ষ টন বিলেট পাইতে পারে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করা উচিত। অথচ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৫ লক্ষ টন বিলেট উৎপাদনের বিষয় গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করিতেছেন।

বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাওয়া সম্ভব হইলে ভারতে বি রোলিং শিল্প রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে অনিশ্চিত অবস্থার ফলে বি-রোলিং মিলগুলি

অব্যাহত গতিতে কাজ করিতে পারিতেছে না। অনেক সময় মিলগুলিকে অল্প সময় কাজ করিতে হয়, কখনও বা বন্ধ রাখিতে হয়। ইহাতে শুধু উৎপাদন হ্রাস পায় না, কারখানার আর্থিক ক্ষতি হয় না, বহু শ্রমিককে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। ভারতের কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে এই শিল্পটি যথেষ্ট সংখ্যক লোক নিযুক্ত করিতে পারে। এই শিল্পটি মাঝারি ধরণের বলিয়া শ্রম-প্রধান, সেই জন্য কুশলী ও অকুশলী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা ইহার অত্যন্ত বেশী।

আলোচ্য বৎসরে আন-রেজিষ্টার্ড উৎপাদনকারীরা সর্বাপেক্ষা বেশী কাঁচামাল অভাবের সম্মুখীন হইয়াছিল। সমিতির সদস্যদের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে টাটা কোম্পানীর দান উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ড হইতে টুকরা লোহা ও ইস্পাত পাওয়া যাইতেছে। আয়রণ ও ষ্টীল কণ্ট্রোলার এক্ষেত্রেও বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করিতেছেন।

পরিশেষে তিনি বলেন যে সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ড ইণ্ডিয়ার সাপ্লাই মিশনের মাধ্যমে লোহার রড্ আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে ভারতে এই শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা যখন নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে তখন বিদেশ হইতে আমদানীর আয়োজন অতীব দুঃখের কথা। লোহার রড্ আমদানী অপেক্ষা বিলেট আমদানী অনেকখানি আর্থিক সাশ্রয় করে, কিন্তু এক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি শিল্পটির সামগ্রিক উন্নতির জন্য শকসেনা কমিটির সুপারিশগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় ইস্পাত খনি ও জ্বালানী মন্ত্রী সর্দার সিংএর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আগামী বৎসরের জন্য শ্রী খৈতান পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন।

ইষ্টার্ণ রেলওয়ের দপ্তরে ন্যায় বিচারের স্বরূপ

স্মৃতিশক্তি সকলের সমান নহে। কোনও একটি ঘটনা জনচিত্তকে যত তাড়াতাড়ি উত্তেজিত করিতে পারে, সেই ঘটনাটি তেমনি তাড়াতাড়ি জনচিত্তে বিস্মৃতি লাভ করিতে পারে। কিছুদিন পূর্বে 'যুগান্তর' পত্রিকায় ইষ্টার্ণ রেলওয়ের হাওড়ার মাল গুদামের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি ঘটনা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা লইয়া 'যুগান্তরের' নিরপেক্ষ লেখকও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা করিয়াছিলেন। 'স্বাধীনতা' স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে গিয়া পার্লামেন্ট পর্যন্ত গিয়াছিলেন এবং লোক সভায় বিরোধী দলের কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীডাঙ্গে এই লইয়া প্রশ্ন উত্থাপনও করিয়াছিলেন। তাহার পরবর্তী কার্যকলাপ দেখিয়া জনসাধারণ বিস্ময় বোধ করিবে।

রেলের কর্মচারীরা কেন, যে কোন অফিসের কর্মচারীরা বিশেষতঃ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কর্মব্যস্ত অবস্থায় অনেক সময় এমন সব কাজ করিয়া থাকেন বা করিতে বাধ্য হন যাহা হয়তো ন্যায় বিচারের তুলাদণ্ডে অন্যায় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কার্য পরিচালনার দিক হইতে তাহার এদিক ওদিক অবশ্য করণীয় হইয়া পড়ে এবং তাহা সর্বত্রই হয়। ঠিক এমনি ব্যাপার লইয়া হাওড়া গুড্‌স্ অফিসে একটি দুষ্ট চক্রের সহায়তায় কম্যুনিষ্ট পার্টি বেতাঘের সুযোগ লন এবং তাহার পরিণতি স্বরূপ যে তদন্ত হয় তাহাতে পদস্থ কর্মচারীসহ ছয়জন পদচ্যুত হন। এই ঘটনার পশ্চাতে যে রাজনৈতিক দলীয় মনোভাব, তদন্তকারী অফিসারদের যে স্বার্থবোধক সিদ্ধান্ত, তাহা যে কোনক্রমেই রেল কর্তৃপক্ষকে পদচ্যুতিতে উৎসাহিত করিতে পারে না তাহা দেখিয়া আমরা শুধু বিস্মিত হই নাই, মানুষের বিচার বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে হতাশ হইয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে স্বার্থবোধক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কর্তৃপক্ষ কখনই ১৫ হইতে ২০ বৎসরের অভিজ্ঞ কর্মচারীদের বরখাস্ত করিতে পারেন না।

বর্তমানে জেনারেল ম্যানেজার শ্রীকৃপাল সিংএর যে খ্যাতি ও মর্যাদা আছে তাহা এই বিচারের আপীলের সময় যথাযথভাবে নিযুক্ত হইবে আমাদের বিশ্বাস। তিনি যদি তাহা না করিতে পারেন, তবে বুঝিতে হইবে তিনিও তাঁহার উধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রভাবান্বিত বা দুষ্টচক্রের ভয়ে ভীত।

আলোচ্য তদন্তে দুইটি মন্তব্যের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারী" যাহারা পরিচালনা করিয়াছেন তাঁহারা তদন্ত করিতে গিয়া 'Dubious Conclusion" ও "Mental Reservation" দ্বারা তদন্তের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই ধরণের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া রেল-কর্তৃপক্ষ কর্মচ্যুতির নোটিশ জারী করিয়াছেন।

রেল কর্তৃপক্ষের ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে অদূরদর্শিতা, নিরপেক্ষ মনোভাবের অভাব, দলীয় প্রভাব, প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রয়োচনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব নজীর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে যখনই বরখাস্ত কর্মচারী সুবিচারে বঞ্চিত হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তখনই আদালত রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন মন্তব্য করিয়াছেন। সম্প্রতি শিয়ালদহ মুন্সেফ কোর্টে একজন বরখাস্ত কর্মচারীর অনুকূলে রায় দিয়া বিচারক শুধু কর্মচ্যুত ব্যক্তিকে কর্মে বহাল করিবার নির্দেশ দেন নাই তাহার প্রমোশন ইত্যাদির পথে যে সব অন্তরায় ছিল তাহাও তুলিয়া লইবার জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়াছেন।

আলোচ্য ঘটনার তদন্তের স্বরূপ দেখিয়া এবং স্বার্থবোধক সিদ্ধান্তের কেরামতী দেখিয়া আমরা ভাবিতেছি রেলকর্তৃপক্ষকে এই ক্ষেত্রে আদালতে হাজির করিলে কি পরিণতি হইবে! যদি

বরখাস্ত কর্মচারীকে নাজেহাল করিবার বাসনায় কোন একটি দলীয় প্রভাব কর্তৃপক্ষকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে তবে কর্তৃপক্ষের শাসন ক্ষমতায় ঘুণ ধরিয়াছে বলিতে হইবে। ইহা সমাজ তান্ত্রিক আদর্শের ঘোষণা, না গণতান্ত্রিক চেতনার নমুনা কর্তৃপক্ষকে আমরা আবার ভাবিতে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীকৃপাল সিং দীর্ঘ কর্ম জীবনের পথ প্রান্তে বেলসাণ্ডারের অদৃশ্য হস্তের নির্মম লিখন স্মরণ করিতে পারিবেন।

বর্তমান যুগে মানুষের কাছে মানুষের মূল্য ক্রমেই হ্রাস পাইতে চলিয়াছে। মনুষ্যত্ব লাল ফিতার বাঁধনের উৎকণে আত্মহত্যা করিয়াছে। পদোন্নতির লোভে পদ লেহনের প্রসাদে মানুষ আজ মানুষকে বিচার করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। নচেৎ যে ব্যক্তি ২০ বৎসর বয়সে কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি দীর্ঘ ১৫ হইতে ২৩ বৎসর পর্যন্ত দাসত্বের কর্তব্য যথাযথ পালন করিয়া পদচ্যুতির অবমাননার লাঞ্ছনায় কলঙ্কিত হইতে পারেন, ইহা বিংশ শতাব্দীর শেষে কোন সভ্য দেশে কল্পনা করিতে পারা যায় না। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি মানুষের শুভ বুদ্ধির উদয় একদিন হইবেই। শ্রীকৃপাল সিং তাঁহার শুভ বুদ্ধির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং তাঁহার খ্যাতি ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন আশা করি।

নূতন কোম্পানী প্রসঙ্গ

ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ—আলোচ্য কোম্পানীটির ১৯৫৭ সালের কার্য বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইতিপূর্বে কোম্পানীটি প্রাইভেট লিমিটেড ছিল। কাজ কর্ম বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৫৭ সালে ইহা পাবলিক লিমিটেডে পরিণত হয়। শেয়ার বিক্রয় সুরু হওয়ার চার দিনের মধ্যেই সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হইয়া যায়। ইহা হইতেই কোম্পানীটির জনপ্রিয়তা বুঝা যাইবে। বর্তমানে কোম্পানীটির মূলধন হইল ৩৪,০০,০০০,০০ টাকা। আলোচ্য বৎসরে আয়কর, সম্পত্তিকর ও লভ্যাংশের টাকা বাদ দিয়া লাভ-ক্ষতির হিসাবে ১,৮০,৩৯২,০৫ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ১,২৬,৭৭৮,১৭ টাকা। ১৯৫৭ সালের আয়করের জন্য ১,৩০,০০০,০০ টাকা এবং সম্পত্তিকরের জন্য ২২,০০০,০০ টাকা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। লভ্যাংশ বণ্টনের জন্য আয়কর মুক্ত ১,২২,৪৩০,০০ টাকা (অর্ডিনারী শেয়ারের জন্য ২,৯০০০০,০০ টাকা এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য ২,৪৩০,০০ টাকা) বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল মাত্র ১,৬০,০০০,০০ টাকা। শ্রমিক, মালিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যও কর্তৃপক্ষ প্রশংসনীয় চেষ্টা করিয়াছেন।

অন্যান্য রবার জাত দ্রব্য উৎপাদন ছাড়া সাইকেলের টায়ার ও টিউব তৈয়ারীর যে ব্যবস্থা কোম্পানী করিয়াছেন তাহাতে এবৎসর কোম্পানীটির কাজ কর্মের আয়ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

গ্রন্থ-পরিচয়

Calcutta Port Annual—1958. Editor—Arati Srimal Price - Rs. 15/- Published by—Institutional Journals. 14, Bentink Street, Calcutta 1. Calcutta Port কলিকাতা বন্দর সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল ও সুসম্পাদিত বার্ষিক সংকলন। সমস্যাসঙ্কুল কলিকাতা বন্দর আজ এমন একটি স্থান অধিকার করিয়াছে যাহার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। ঠিক সেই সময়ে এই বন্দরটির বিভিন্ন দিকের আলোচনা তবু যে বন্দরটির কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে নূতন চিন্তার প্রেরণা যোগাইবে তাহা নহে, বন্দরের নানা সমস্যার প্রতিও অবহিত ও সমাধানে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে এবং দেশবাসীও প্রচুর তথ্য ও তত্ত্ব অবগত হইবে।

শ্রীযুক্তা আরতি শ্রীমল এই তথ্যই সম্পাদনা কার্যে যে নৈপুণ্য ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। রচনা, মুদ্রণ ও উৎপাদন কৌশল গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

The Word Alananac—1958 and the Book of Facts—73rd Edition. Published by Newyork World-Telegram and the Sun, 125 Barclay Street, Newyork 15, N. Y. Price 1.35.

আলোচ্য বিশ্বপঞ্জী বার্ষিকীখানি বিশ্ব সমাচারের সুসম্পাদিত একটি অভিধান। ইহা আন্তর্জাতিক খবরা-প্রবাহের সংক্ষিপ্ত সংকলন। উক্ত গ্রন্থে যুক্তরাষ্ট্রের বিবরণীর অংশ অপেক্ষাকৃত বেশী হইলেও গ্রন্থখানি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও সন্ধানের কাজে লাগিবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

City College, Commerce Depsrtment College Annual, 1958. Published by Publication Section. 13 Surya Sen Street, Calcutta 12.

সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগের বার্ষিকীখানি অন্যান্য বারের মতই রচনা ও তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ। বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের তথা অধ্যাপকদের এই পত্রিকাখানি বিশেষ কাজে লাগিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীবিনোদনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নবগৌরাঙ্গ প্রেস, ১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ, ৯ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

INDIA MARCHES AHEAD.....

It has been truly said that a country's industrial progress is measured by its output of Steel.

That is why India's Second Five-Year Plan accords highest priority to increase in Steel production.

145 Re-Rolling Mills dotting the whole country, with capacity to roll 2 million tons of Bars, Rods and other sections per annum, can justly take pride in contributing their share also in the fulfilment of this objective—only they need the required quantity of raw materials which is their chief anxiety.

Inserted by

THE STEEL RE-ROLLING MILLS' ASSOCIATION OF INDIA
20, Strand Road, Calcutta.

আদর্শ পথ্য, পানীয় ও খাদ্য

লিলি বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

আর্থিক প্রসঙ্গ

প্রথম বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা] শ্রাবণ • ১৩৬৫ [জুলাই-আগষ্ট • ১৯৫৮

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

ভারতে সর্বাধিক

বিক্রয়ের গৌরব অর্জন

করেছে

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

লক্ষ্মী ঘি'র্‌ো
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥

Who's Who of Arthik Prasanga.

PATRONS

Dr. P. N. Banerjea, Late Minto Professor of Economics, Calcutta University and formerly, member, Indian Legislative Council.
Sri Arun Kumar Sen, Pricipal, City College, Commerce Department. Member of the Senate, Calcutta University.
Sri Satish Chandra Sen Vice Principal, Vidyasagar College, Com. Dept.
Sri Sukomal Kanti Ghose, Amrita Bazar Patrika.
Principal Akshoyjiban Basu, Principal, Women's College.
Sri Bimal Chandra Sinha, Minister, Land Revenue, West Bengal.
Sri S. C. Dey, President, Federation of Small & Medium Industries.
Sri B. K. Bhattacharya, Director, Union Drug Co. Ltd.
Sri S. Maitra, Managing Director, Sulekha works Ltd.
Prof. Kesabeshwar Basu, Member, Academic Council, Cal. University.
Sri T. Ghose, Director, Bureau of Industrial Statistics.
Dr. Dasrathi Banerjee, General Manager, National Rubber Manufacturers.
Sri J. P. Podder, Jaipuria Brothers Ltd.

EDITORIAL COUNCIL

Principal Sri Khagendranath Sen, President.
Prof. Sris Chandra Das, Vice President.
„ Alak Ghosh
„ Prabhat Sarbadhikary.
Prof. Himanshu Roy.
„ Anath Bandhu Dutta
Sri Umapada Majumdar
„ Hemaranjan Basu
„ P. Agarwala

Prof. D. Mukherjea, Editor.

Associated Editors.

Sri Achal Bandapadhaya. Sri P. Banerjee

ADVISORY BOARD

Prof. Rabindranath Sengupta, City College & Calcutta University.
„ Biswanath Mukherjee, Maharaja Manindra Chandra College.
„ Jitendra Krishna Mitra, Calcutta University.
„ Shyamsundar Banerjee, Vidyasagar College.
„ Sudhir Kumar Mukherjee, City College
„ Sudin Bhattacharya, Victoria & City College.
„ Arun Banerjee, City & Scotish Church College.
„ D. P. Choudhuri, City College.
„ Benoy Sarker, City College
„ Kastur Chand Lalwani, Institute of Technology, Khargpur.
„ Swadesh Bhusan Bhuniya, City College.
„ Mukunda B. Mitra, City College.
Sri Prakiti Ranjan Bhadhuri.
„ Rabindra Nath Bhattacharya Asst. Editor, Municipal Gazette.
„ Abhas Dasgupta, Formerly of Commercial Section, Jugantar.
„ Mohan Lal Gauderiwala, Merchant.

Hony Auditors : M/s. Ghose Nandy & Co.

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

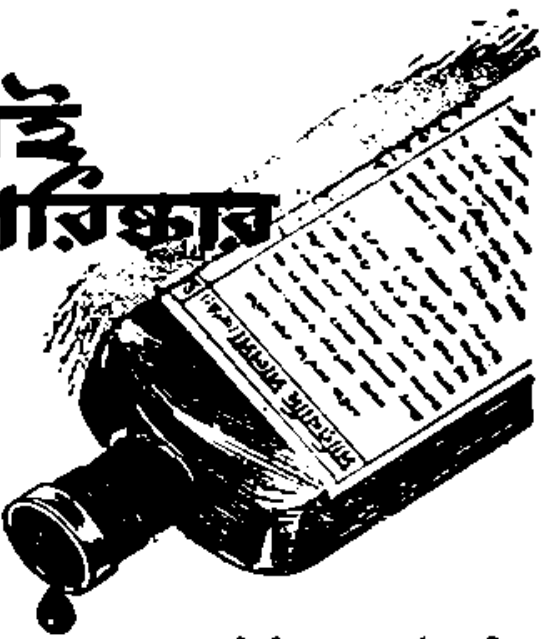

যে অসার জোয়ে সমস্ত শরীর ও মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ হয়, রক্ত প্রবাহের সমস্যাই তার পুষ্টিসাধন করে; তাই রক্তকে প্রাণশক্তির প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন সকলরকমই বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। আরোগ্যের জীবন মুক্তি হয়ে ওঠে।

সারিবাদি সালসা রোগ বীজাণু সমূহকে নষ্ট করে। সর্বপ্রকার সর্দিজনিত রক্ত দোষের মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদি সালসা সেবনে বিষাক্ত ফোঁড় নির্মূল হয়, ঘেমো, পীড়ক, ঘা কত, একজিমা প্রভৃতি সর্দ্দিজনিত চর্ম্মরোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল হয়, শিশুদের বিনা আয়াসে হয়, দূষিত দুগ্ধ পান এবং শরীরে নূতন বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধি

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল, কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, বেঙ্গল কেমিক্যাল, বোম্বাই ফার্ম্মেসী, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, ক্যালকাটা ফার্ম্মেসী প্রভৃতি বিখ্যাত ঔষধালয়ের ব্যবহৃত।

▲ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ—ডাঃ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এল-সি (এডিঃ), আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য। ৯৯নং মোহনবাগান রোড, কলিকাতা-৪৭

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা

ঢাকা ও অন্যান্য-পৃথিবীর সর্ব্বত্র

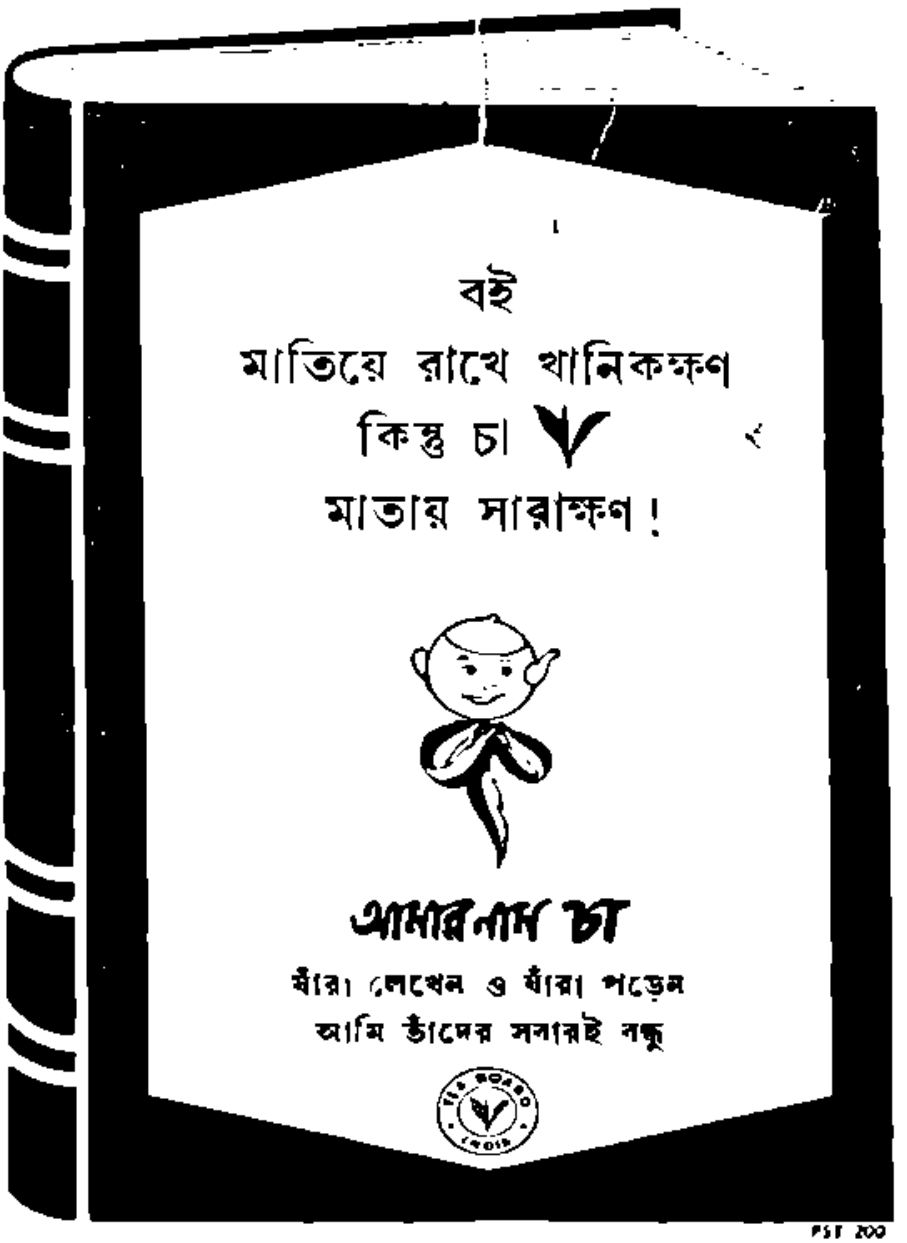
বই
মাতিয়ে রাখে খানিকক্ষণ
কিন্তু চা
মাতায় সারাক্ষণ!
আমার নাম চা
যাঁরা লেখেন ও যাঁরা পড়েন
আমি তাঁদের সবারই বন্ধু
TEA BOARD
INDIA
PST 200

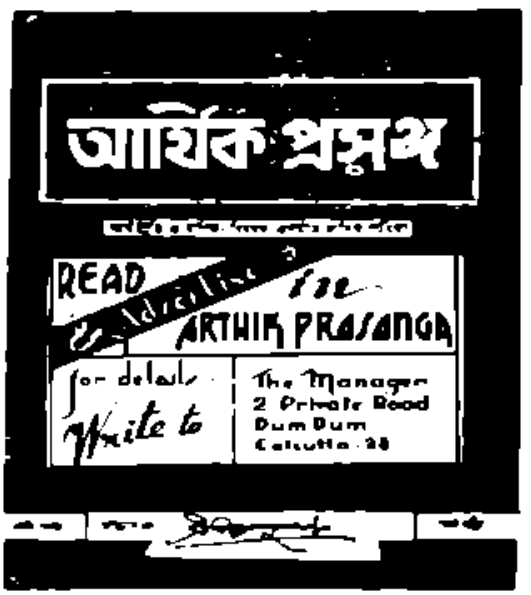

নূতন টেলিফোন : ৫৭ : ২২০০

বার্ষিক চাঁদা—৯৲ টাকা
ষাণ্মাসিক চাঁদা—৫৲ "
ছাত্রদের জন্য :—
বার্ষিক—৭৷৷০ ষাণ্মাসিক—৪৲ টাকা
এই সংখ্যার মূল্য—বারো আনা

NATIONAL SHEET
Serves EVERY INDUSTRY

TIN PRINTERS AND
CONTAINERS MANUFACTURERS
INCLUDING
DRUMS KEGS BUCKETS Etc

PHONE: 55-4696 GRAM-NASMET WORK

NATIONAL SHEET & METAL WORKS
PRIVATE LIMITED.

36-A, SAHITYA PARISAD ST. ★ CALCUTTA-6

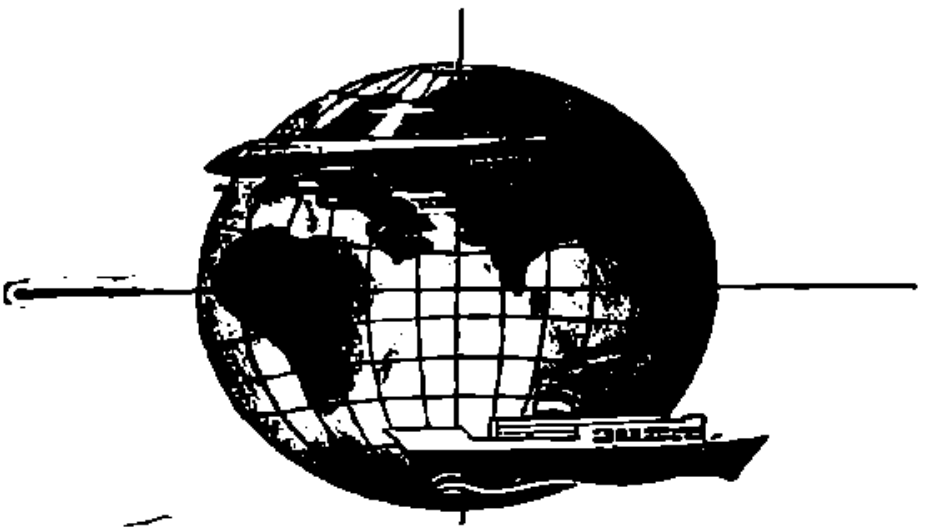

জাতীয় পরিকল্পনা ও
বহির্বাণিজ্যের প্রসার ...

সকল যুগেই, বিশেষতঃ এই ভারতীয় পরিকল্পনার যুগে, দেশের সমৃদ্ধিসাধন বহুলাংশে বহির্বাণিজ্যের প্রসার সাপেক্ষ। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের প্রসার বহুলাংশে নির্ভর করে দেশের উন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর।

বহির্বাণিজ্য ব্যাপারে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অভিজ্ঞ কর্মচারী মারফৎ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ববিধ সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ।

পৃথিবীর যাবতীয় উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্রে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নিজস্ব এজেন্ট ও করেস্পণ্ডেন্ট আছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদক

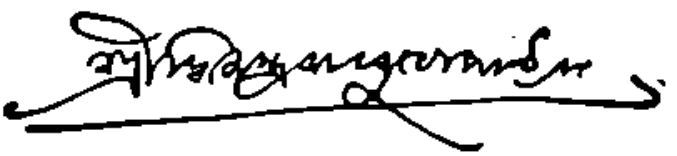

শ্রাবণ : ১৩৬৫

জুলাই—আগষ্ট : ১৯৫৮

কার্য্যালয় :
৮, লাইব্রেরী রোড, বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬
সিটি অফিস
১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি.৯

এই সংখ্যার মূল্য

ষাট নয়া পয়সা

দেশব্যাপী বিক্রয় ও মেরামতি কেন্দ্র

উষা
সেলাই মেসিন

দি জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকা

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] সূচীপত্র [শ্রাবণ ১৩৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বাধীনতার একাদশ বৎসর	৩১৭
ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অবস্থা—শ্রীমতুভাই দেশাই	৩১৯
রেশম শিল্পের সমস্যা ও সংরক্ষণ—পর্যবেক্ষক	৩২২
পরিকল্পনার বিচার—অধ্যাপক ডি. জি. কার্ভে	৩২৭
অর্থনীতিবিদ জর্জ বার্ণার্ড শ'—শ্রীআভাস দাশগুপ্ত	৩৩০
খাদ্য চিন্তা—অধ্যাপক শ্রীসুদিন কুমার ভট্টাচার্য	৩৩৩
ভারতের উৎপাদনশীলতা আন্দোলন	৩৩৬
দশমিক পদ্ধতির ওজন	৩৩৮
রাজস্বকার ও নয়া ঋণপত্র—শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত	৩৪১
স্বাধীনতার এগারো বৎসর পরে—শ্রীউমাপদ মজুমদার	৩৪৩

সৌজন্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট য়্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা : আসানসোল : শিলিগুড়ি : মাদ্রাজ

পশ্চিমবঙ্গ

রেশম শিল্পী

সমবায় মহাসংঘ লিঃ

(রেশম শিল্পী সংঘ)

বাংলার রেশমের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয় :—১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১

আজ ১৫ই আগষ্ট ১৯৫৮

স্বাধীনতা এক্সপ্রেস বাসিকীতে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শুদ্ধ রেশম বস্ত্রাদি আপনাপার প্রিয়জনের জন্য সুবিধাজনক মূল্যে ক্রয় করিয়া গ্রামীন দুঃস্থ শিল্পীদের মুখেও হাসি ফোটান।

- নূতনতম ডিজাইনের মুর্শিদাবাদী ছাপাশাড়ী, গরদের সার্টিং, ডসর, মটকা, বাপতা প্রভৃতি সাড়ম্বর আয়োজন।
- খদ্দরের ধুতি, সার্টিং, তৈয়ারী জামা ইত্যাদির বিপুল আয়োজন।
- টাকা প্রতি তিন আনা (১৯ নঃ পঃ) রিবেট।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় উৎপাদিত।
- খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত।

খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র

১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১

১৫৯/১এ, রাসবিহারী এভেনিউ,
গড়িয়াহাটা মার্কেটের নিকট,
কলিকাতা—২৯।

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের নিকট
কলিকাতা—৭

স্নিগ্ধ শির... মুগ্ধ মন

মস্তিষ্ক উত্তপ্ত থাকার পিছনে কোনো গভীর কারণ থাকতে পারে এবং তা' দূর করবার জন্য সম্ভবতঃ কেউ কেশতৈল ব্যবহার করেন না। কিন্তু মস্তিষ্কের উপর স্নিগ্ধকর প্রভাব যে তেলের বেশী, সেটি আপনার মনকে স্পর্শ করবেই যে!

কেশরঞ্জন শুধু চুলের সৌন্দর্যই বাড়ায় না, এর আর একটি প্রধান গুণ হ'ল যুগপৎ মস্তিষ্ক ও মনের উপর এক স্নিগ্ধভাব প্রলেপ বুলিয়ে দেওয়া। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, উত্তপ্ত মস্তিষ্ক চুলের ভবিষ্যৎকে অনুস্কল করে তোলে!

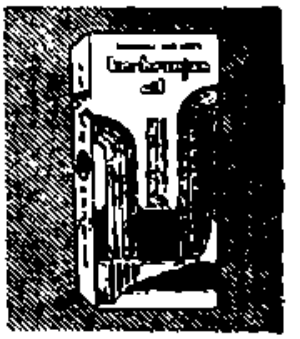

ফরিরাজ এন.এন.সেনের

কেশরঞ্জন

অজোধারন কেশতৈল

কেশরঞ্জন একটি অতিরাত্ত প্রসাধনী হ'লেও এর আবেদন কিন্তু সকলেরই মনে, যেহেতু এর কেশরঞ্জনটি অনস্বীকার্য।

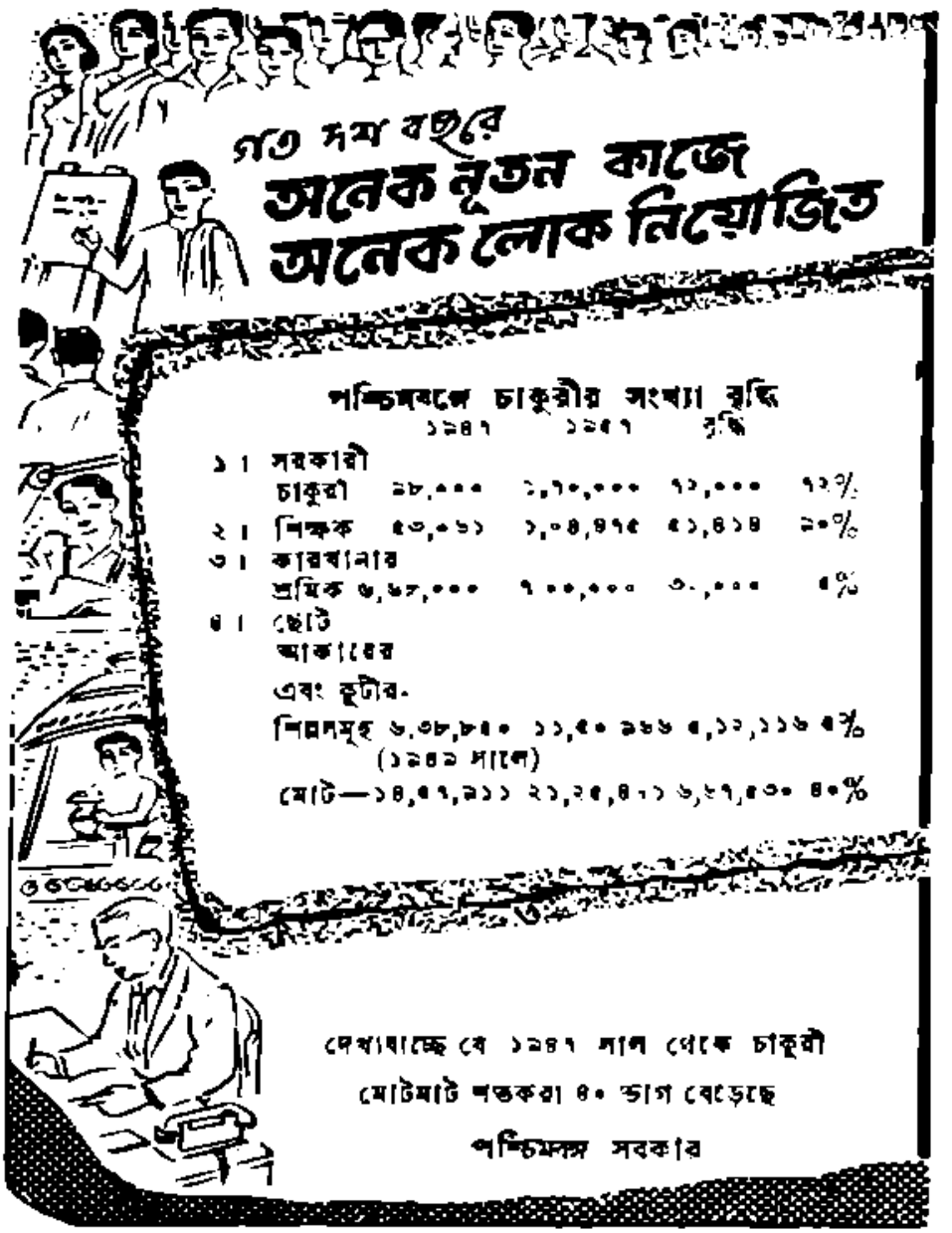
গত সাত বছরে
অনেক নূতন কাজে
অনেক লোক নিয়োজিত
পশ্চিমবঙ্গে চাকুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি
১৯৪৭ ১৯৫৭ বৃদ্ধি
১। সরকারী চাকুরী ২৮,০০০ ১,৭০,০০০ ৭২,০০০ ৭২%
২। শিক্ষক ৫৩,০৬১ ১,০৪,৭৭৫ ৫১,৪১৪ ৯০%
৩। কারখানার শ্রমিক ৬,৬৮,০০০ ৭,০০,০০০ ৩২,০০০ ৫%
৪। ছোট আকারের এবং কুটীর-শিল্পসমূহ ৬,৩৮,৮৪০ ১১,৫০ ৯৬৬ ৫,১২,১১৬ ৪%
(১৯৪৯ সালে)
মোট—১৪,৫৭,৯১১ ২১,২৫,৪০১ ৬,৬৭,৪৩০ ৪০%
দেখা যাচ্ছে যে ১৯৪৭ সাল থেকে চাকুরী
মোটমাট শতকরা ৪০ ভাগ বেড়েছে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আপনার কল্যাণ

এবং

জাতির প্রগতি

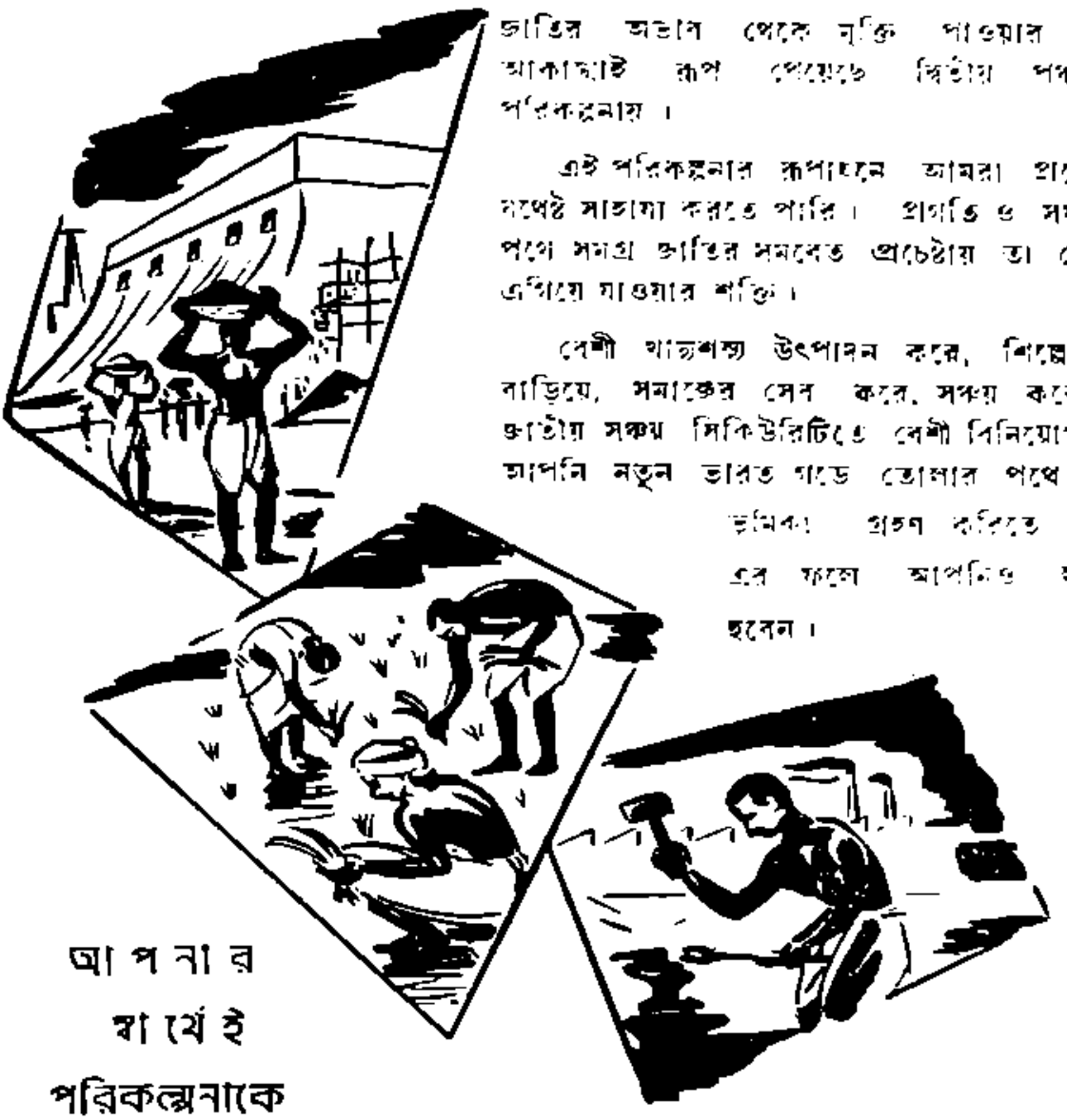

জাতির অভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার বিপুল আকাঙ্খাই রূপ পেয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়।

এই পরিকল্পনার রূপায়নে আমরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট সাহায্য করতে পারি। প্রগতি ও সফলতার পথে সমগ্র জাতির সমবেত প্রচেষ্টায় তা যোগাবে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি।

বেশী খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, শিল্পোৎপাদন বাড়িয়ে, সমাজের সেবা করে, সঞ্চয় করে এবং জাতীয় সঞ্চয় সিকিউরিটিতে বেশী বিনিয়োগ করে, আপনি নতুন ভারত গড়ে তোলার পথে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন, এর ফলে আপনিও লাভবান হবেন।

আপনার স্বার্থেই পরিকল্পনাকে

সাহায্য করুন!

DA-SB/112

আর কোন গাড়ীর এতগুলি সুবিধা নেই।

আপনি ছোট গাড়ীর দাম দিয়ে বড় গাড়ীর মত প্রশস্ত জায়গা পাবেন—তার আরাম-বিলাস উপভোগ করবেন।

আপনি এমন একটী গাড়ী কিনছেন, যার গঠন-সৌষ্ঠব নিখুঁত। আপনি এ গাড়ীতে চড়ে নিজেই গর্ব অনুভব করবেন। এর কর্মক্ষমতা অতি উন্নত এবং অল্প খরচে অনেক বেশী মাইল যায় এবং অন্যান্য অনেক যান্ত্রিক বিশিষ্টতা আছে যাতে আপনার ভ্রমণ নিরাপদ করবে—এক কথায়, আপনি অবাক হবেন যে কত অল্প দামে কত বেশী ভাল গাড়ী আপনি কিনেছেন।

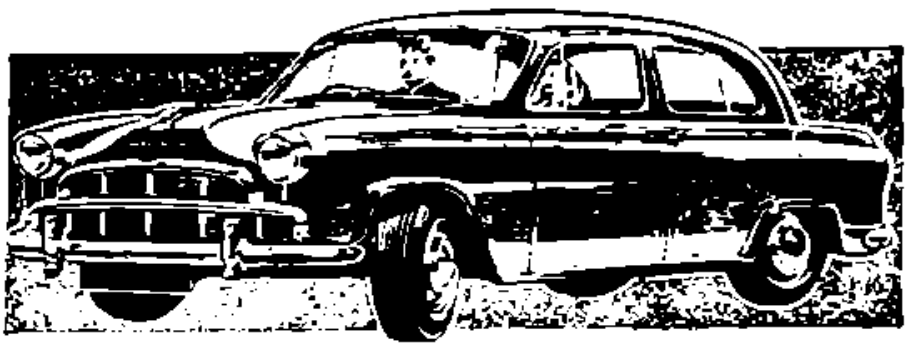

গাড়ীর মত গাড়ী একটিই—সেটি

এ্যামবাসাডার

নিরাপত্তাসূচক যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য :
- ডিপ-সাঙ্ক সেফটি ষ্টিয়ারিং হুইল
- শ্যাটার্ড ফেদিং রেইনস্
- সেফটি লক ডোরস্ এবং সেফটি গ্লাস চারদিকে
- অতুলনীয় রাস্তা চলার ক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্য ব্রেকস্

PRICE : Rs. 11161/- EX-PLANT

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড, কলিকাতা

পরিবেশকগণ :—

ইণ্ডিয়া অটোমোবাইলস্, ১২ গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইষ্ট, কলিকাতা

(কলিকাতা ও ২৪ পরগণার জন্য)

ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট লিমিটেড, ৭১ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার জন্য)

আর্থিক প্রসঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা] [শ্রাবণ ১৩৬৫

স্বাধীনতার একাদশ বৎসর

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস। ১৫ই আগষ্ট। ভারতবাসী স্বাধীন বলিয়া স্বীকৃত হইল। সেদিন শতাব্দিক বৎসরের পরাধীনতার রুদ্ধশ্বাসক্লিষ্ট নিপীড়িত ভারতবাসী নব উদ্ভাসিত প্রভাত সূর্যের বর্ণচ্ছটায় প্লাবিত নির্মল বাতাসে যে নবজীবনের প্রথম পরশ লাভ করিয়াছিল, তাহার ঐকান্তিক উপলব্ধির একটি প্রেরণা আসে প্রতি বৎসর এই দিনটিতে—১৫ই আগষ্ট। আমরা এই দিনটি পালন করি জাতির দীর্ঘ সংগ্রামলব্ধ স্বাধীনতার নিপীড়িত মানুষের স্বধিকার প্রতিষ্ঠায় স্মরণীয় দিন হিসাবে শুধু নয়, ইহার পিছনে যে দীর্ঘ ইতিহাস আছে—রক্তাক্ষরে লিখিত সেই ইতিহাসের পর্যালোচনার দ্বারা আমাদের জাতীয় সত্তার উপলব্ধির জন্য— স্মৃতির সেই উপলব্ধি যেন বিস্মৃতির অতলে বিলুপ্তি না ঘটে; যেন ফেলে-আসা সেইদিনগুলি আমাদের পরবর্তী কালের যাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করে, শ্রদ্ধাবনত করিয়া তোলে অতীতের লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ক্লিষ্ট-ক্লান্ত মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের জন্য শতাব্দীর সংগ্রামের প্রতি, তাহাদের প্রতিটি কর্মের প্রতি, আর অনুপ্রাণিত করে যেমন সেই স্বাধীনতার জন্য, তেমনি জাতির অগ্রগতি ও ও সমৃদ্ধির জন্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দ্বারা জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য।

বিশ্বের দরবারে আজও ভারতবাসী দরিদ্র, আজও তাহাদের জীবনমান নিম্ন, আজও সকলে দুইবেলা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারে না; কর্ম নাই, খাদ্য নাই, বাসস্থান নাই, উপযুক্ত শিক্ষা, রোগ-নিরাময়ের ব্যবস্থা নাই, সামর্থ্য নাই —আজও মুষ্টিমেয় নিরক্ষর রোগজীর্ণ দরিদ্র দুর্বল ভারতবাসী বিশ্বের দরবারে কৃপার পাত্র। চল্লিশ কোটি ভারতবাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতার দশ বৎসর পরেও কেন এই দুঃসহ গ্লানি বহন করিবে, আর কতদিন বহন করিতে আজ সেই প্রশ্নই সকলের মনে 'বড়' করিয়া দেখা দিয়াছে।

স্বাধীনতা আসিয়াছে যেমন মানুষের স্বাধিকারের স্বীকৃতি বহন করিয়া, তেমনি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আসিয়াছে সেইসব মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি মোচনের জন্য। একটি পরিকল্পনা সমাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যভাগেও আজ ভারতবাসীর জীবনযাত্রার প্রকৃত অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া কেহই মনে করিতেছে না। ব্যাপক কৃষি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, তথাপি খাদ্য সমস্যার সমাধান 'যে তিমিরে, সেই তিমিরেই' রহিয়া গিয়াছে। আমরা আবার যুদ্ধ কালীন খাদ্য সঙ্কটের পরিস্থিতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কেন আমাদিগকে আজও এগারো বৎসর পরে এই গ্লানি বহন করিতে হয় তাহা সকলেরই প্রশ্ন! শিল্প উৎপাদন বাড়িয়াছে, শিল্পদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায় নাই, জন সাধারণ ভোগ্যপণ্যের সামান্যতম প্রয়োজন আজ ক্রয় করিতে পারে না। দুগ্ধ পোষ্য শিশু, যাহারা ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক, তাহাদের সামান্যতম দাবী—কয়েক ফোঁটা খাঁটি দুগ্ধ, তাহাও মিলিতেছে পায় না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য এসবের প্রশ্ন নাই বা আলোচনা করিলাম। আমরা এই সংখ্যায় ভারতে অর্থনৈতিক অবস্থার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তুলনামূলক

আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে চীন মাত্র বৎসরে যে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে, ভারতের অগ্রগতি সেই তুলনায় নিতান্তই সামান্য। সুতরাং ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশ চীন যদি তাহার অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য দেশবাসীর মধ্যে অর্থনৈতিক বিপ্লবের সাড়া জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম হয়, তবে ভারতে তাহা না হইলে তাহা কি জাতির নেতার নেতৃত্বের অক্ষমতা প্রকাশ করিবে না?

দেশবাসীরস্বার্থ ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন, জাতির অগ্রগতির জন্য একান্তই প্রয়োজন তাহা অস্বীকার করা যায় না। দেশবাসী ও সমগ্র জাতি ইহার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু একটা অনির্দিষ্ট কালের আশায় কেহ প্রতিক্ষা করিতে পারে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথম হইতে ঘাটতি ব্যয় ও বৈদেশিক মুদ্রা সংস্থান সম্পর্কে যেসব আশঙ্কা দেখা গিয়াছিল, বিভিন্ন মতবাদ মতভেদের যেসব আলোচনা হইয়াছিল, তাহা তর্কের খাতিরে সরকার খণ্ডন করিলেও আজ যেরূপ আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সম্প্রতি শিল্প উপদেষ্টা পরিষদে ডাঃ ডি, কে, আর, ভি, রাও বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা দেশবাসীকে না জানাইবার জন্য ইহাকে "Fraud" বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "It had concealed from the people from the serions implications of the Second Plan" তাহার উত্তরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন, "No government could move according to the dictates of some economists". ইহা হইতে বোঝা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনামুখী কার্যকলাপ শুধু দেশবাসীর নহে, তথাভিজ্ঞ ও ওয়াকিবহাল মহলে আস্থা হারাইতে বসিয়াছে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত (Report on Currency and Finance) একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেও ভারতে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি সুস্পষ্টরূপে দেখানো হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে উৎপাদন সূচীর বৃদ্ধি হইয়াছিল ৮·১ ভাগ, ১৯৫৭ সালে বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র ৩·৫ ভাগ ১৯৫৮ সালের প্রথম তিন মাসের হিসাব দেখিয়া বলা হইয়াছে যে বর্তমান বৎসরের হারও আশানুরূপ নহে। কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও অবনতির দিকে, বলা হইয়াছে। সুতরাং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য আজ দেশবাসী মনে সন্দেহের সূচনা করিতেছে।

দেশবাসীর আস্থা, বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সংবেদনশীল মনোভাবে পরিকল্পনার সাফল্য ও জাতির কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ন সম্ভব করিতে পারে। স্বাধীনতা এগারো বৎসর পরে ভারতের জন-মানস সরকারের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর সহিত মিলনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করিতে পারে নাই। ইহাই গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সর্বৃহৎ অন্তরায় এবং তাহাই নেতৃত্বের ব্যর্থতার অভিব্যক্তি। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রত্যেকেরই কাম্য; সুতরাং যে পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীন স্বীকৃতি নাই, সামগ্রিক প্রচেষ্টার আন্তরিক স্ফূরণ নাই—সেখানে জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে কিসের প্রেরণায়, কাহার প্রয়োজনে! আজ স্বাধীনতার বাদশ বৎসরের প্রথম দিনে আমরা জাতির জীবনের এই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি উল্লেখ ও আলোচনা করিতে গিয়া যেমন বেদনা বোধ করিতেছি, তেমনি আশা করিতেছি স্বার্থলুব্ধ নেতৃত্ব যেন ভারতের অগ্রগতির অন্তরায় না হয়! আমরা সমগ্র দেশবাসীকে জাতির সামগ্রিক কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করিতেছি—আবার ভারত যেন জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারে।

ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অবস্থা

শ্রীমণুভাই দেশাই, কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে যে সব নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিংশিল্প তাহাদের অন্যতম। এদেশে পূর্বে নিত্য ব্যবহার্য পণ্য কেবল আমদানী হইত। ভারতের বৈদেশিক শাসকরা এদেশে নিত্য ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন শিল্পে কোন আগ্রহ দেখান নাই; এমন কি নিতান্ত ছোট-খাট শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠায় কোন উৎসাহও দেখান নাই। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, আমরা জানি, মূল শিল্প, বৃহৎ, মাঝারী ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিলে বৈদেশিক দ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলি একদিকে যেমন মূলধনী দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করে অন্যদিকে তেমনি উৎপাদক শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে। সামগ্রিক ভাবে দেশের শিল্পক্ষেত্রে ইহারা একটি ব্যাপক চক্রের সৃষ্টি করিয়া শিল্প-ব্যবসায়ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবিক পদ্ধতির সৃষ্টি করে। আনন্দের কথা যে ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প স্বাধীনতার দশ বৎসরের মধ্যে দ্রুত অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। ১৯৫২ সালে শিল্পসূচী উৎপাদন ১০০ ধরিলে ১৯৫৮ সালে প্রথম দুই মাসের হিসাবে দেখা যায় ইহার সূচী ২৭২·২। ১৯৫৭ সালে ইহা ছিল ১৩৭·১। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা একটি বৃহৎ সার্থকতা। জোরের সঙ্গে বলিতে পারা যায় যে আমাদের দেশে শিল্প ব্যবস্থায় একটা বিপ্লব আসিয়াছে। অগ্রাধিকার অনুযায়ী পরিকল্পনা রচয়িতাগণ ও সরকার শিল্প উন্নয়নের সার্থকতা উপলব্ধিও করিয়াছিলেন।

হাল্কা যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প—গত এক বৎসরে সেলাই কলের উৎপাদন ২৭ শতাংশ বাড়িয়াছে। বাইসাইকেলের অন্তর্ভুক্ত অংশ ৫০ শতাংশ। ব্লেড ৩১ শতাংশ। রেফ্রিজেটার ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৬ সালের তুলনায় বল-বিয়ারিং এর উৎপাদন ৬০ শতাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জলের মিটারের উৎপাদন এক বৎসরে ৯০ শতাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামগ্রিক ভাবে হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের উৎপাদন গত ১০ বৎসরের মধ্যে ২ কোটি টাকা মূল্য হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে।

ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি—এক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দৃষ্ট হয়। ইলেকট্রিক মোটর, ট্রান্সফরমার, সুইচ-গিয়ার, কন্ট্রোল-গিয়ার, কন্ডাক্টার, কেবল প্রভৃতির উৎপাদনের মূল্য ১৯৫৮ সালে ৪·৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৮·৫ কোটি টাকা হইয়াছে। ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের উৎপাদন প্রশংসনীয়। ১৯৫৭ সালে ১৯৫৬ সাল অপেক্ষা ৩৫ শতাংশ উৎপাদন বেশী হইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬০ কোটি টাকার মত উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে। তজ্জন্য এই শিল্পের উৎপাদনের বিভিন্ন অঙ্গের প্রতি যেমন সহযোগিতা করিতে হইবে তেমনি যাহাতে বৎসরে ৩২ কোটি টাকার মত উৎপাদন সম্ভব হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে।

ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প—ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে মোটর গাড়ীর উৎপাদন উল্লেখ-যোগ্য। ১৯৪৮ সালে মাত্র ৬ কোটি টাকার মত মোটর গাড়ী নির্মিত হইয়াছিল।

১৯৫৭ সালে ইহার মূল্য ৬০ কোটি টাকা। মোটর গাড়ী, ট্রাক, জীপ প্রভৃতি অংশের উৎপাদন পরিমাণ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং একটি গাড়ীর ক্ষেত্রে বিচার করিতে ইহার পরিমাণ ৬০ হইতে ৬৫ শতাংশ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আরও দুই তিন বৎসরের মধ্যে ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। মেসিন টুল নির্মানের বেলায় দেখা যায় লেদ, ড্রিল, মিলিং মেসিন বোরিং মেসিন, প্লানিং মেসিন, সেপিং মেসিন, কাটিং মেসিন এবং অন্যান্য এই ধরণের যন্ত্রপাতি নির্মান কারিগরী জ্ঞানসাপেক্ষ। তৎসত্ত্বেও নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া আমরা এক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি। ১৯৫৬ সালে উৎপাদন দ্রব্যের মূল্য ছিল ১·৫ কোটি টাকা। ১৯৫৭ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩·৫ কোটি টাকা হইয়াছে। এখনও আমাদের বৎসরে ১০ হইতে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের এইসব যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হয়; দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালে এই চাহিদা ১৮-২০ টাকা হইবে বলিয়া মনে হয়। মেসিন টুল নির্মান শিল্প, কি সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে অন্ততঃ আগামী তিন বৎসরে ১০ কোটি টাকার মত উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। আমার মনে হয় আমরা এই লক্ষ্যে পৌছিতে পারিব। সরকারী ক্ষেত্রে আমরা উৎপাদন লক্ষ ২ কোটি টাকা হইতে ৬ কোটি টাকায় উন্নীত করিতে পারিব বলিয়া মনে করি। নির্মাণ মূলক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। ট্রাভেলিং ক্রেন, হোয়ার্ণ ক্রেন, মোবাইল ক্রেন, আণ্ডার ক্রেম, হেভী ব্রীজ সেকসান, মাঝারী ও ভারী নির্মাণ জাতীয় সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য সকল প্রচেষ্টা নিয়োগ করিতে হইবে। ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি ও নির্মান সংক্রান্ত দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে হইলে আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া দরকার। এ দিকে আমাদের যথা সম্ভব তৎপর হইতে হইবে—বিশেষতঃ ১৯৬০ সালের পর হইতে যখন আমরা প্রচুর পরিমানে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে পারিব।

যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প—ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে যন্ত্রশিল্পের স্থান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা প্রতিবৎসর বহু টাকার যন্ত্রপাতি আমদানী করি। ১৯৫৭ সালে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়াছি এবং ১৯৫৮ সালে ১৬৮ কোটি টাকার মত যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইবে। ১৯৪৮ সালে আমাদের দেশে এই ধরণের যন্ত্রপাতি নির্মিত হইত না বলিলেই হয়। কিন্তু ১৯৫৭ সালে আমরা প্রায় ৩৫ কোটি টাকার মত আমদানী করিয়াছি। বর্তমানে বস্ত্র, পাট, চিনি, সিমেন্ট, শিল্পের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য রকমের বহু যন্ত্রপাতি আমরা প্রস্তুত করিতেছি। আমদানীর তুলনায় অবশ্যই ইহার পরিমাণ নিতান্তই কম এবং চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘাটতির পরিমাণও বাড়িয়া যাইবে। সরকার অবশ্য এ বিষয়ে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। রাঁচিতে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে একটি বৃহৎ ও ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হইবে। এই কারখানাটি প্রতি দুই বৎসর অন্তর একটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানার প্রয়োজনীয় সমস্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিবে। এই কারখানাটি সোভিয়েৎ সরকারের সহযোগিতায় নির্মিত হইবে। ইহার জন্য ৯০-১০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। চেকোশ্লোভাকিয়া সরকার রাঁচীতে আর একটি ফাউণ্ড্রী স্থাপন করিবে। এই দুইটি কারখানা পারস্পরিক সহযোগিতায় এমনভাবে কার্য করিবে যাহাতে প্রকৃতপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠানের দুইটি অঙ্গ হিসাবে পরিণত হয়। এই কারখানায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প রসায়ন শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হইবে।

দুর্গাপুরে রাশিয়ার সহযোগিতায় আরও একটি কারখানা স্থাপিত হইবে। খনিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এই কারখানায় নির্মিত হইবে। ইহার জন্য ব্যয় হইবে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। জাহাজের তলা নির্মাণের প্রয়োজনে ভারী লোহার পাত নির্মাণের জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের সহিত আলোচনা চলিতেছে। ইহা সম্ভব হইলে একটি Heavy Plate and Vessels Works এবং একটি Heavy Structurals Shope গড়িয়া উঠিবে। জার্মান সহযোগিতায় আর একটি নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার ফলে আমাদের শিল্প বনিয়াদ গঠণের প্রথম ধাপ সমাপ্ত হইবে। ভূপালে ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানার কাজ ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে। যুক্তরাজ্যের এ্যাসোসিয়েটেড ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এখানে হেভী ট্রান্সফরমার, ক্যাপাসিটী সুইচ গিয়ার, কণ্ট্রোল গিয়ার, টারবাইন, জেনারেটার, ইলেক্‌ট্রিকেল মোটর, ক্রেন মোটর প্রভৃতি ভারী যন্ত্রপাতি নির্মিত হইবে। এই কারখানাটি নির্মাণ করিতে ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। কারখানাটি সম্পূর্ণ হইলে দুইটি শিফ্‌টে কাজ করিয়া ২৫ কোটি টাকার মত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিতে সমর্থ হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আমাদের এইসব পরিকল্পনা সফল হইলে আমরা তৃতীয় পরিকল্পনার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইব। আমাদের এই সুবৃহৎ পরিকল্পনার পশ্চাতে আজ প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টার লইয়া যে সব তর্ক বিতর্ক চলিতেছে তাহারও অবসান হইবে। সমগ্র জাতি ইহার দ্বারা উপকৃত হইবে।

লৌহ বর্জিত ধাতু শিল্প—লৌহ বর্জিত ধাতুর উৎপাদন শিল্প ও আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অগ্রগতির পথে আর একটি অন্তরায়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আমরা সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি। ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে আমরা ৪০ মিলিয়ান টনের অধিক ইস্পাত উৎপাদন করিতে পারিব। পরবর্তী ৫ বৎসরে প্রায় ১০ মিলিয়ান টন ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব হইবে। এক্ষেত্রে যেমন আমরা বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করিয়াছি, তেমনি লৌহ বর্জিত ধাতু উৎপাদনের ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়িয়াছি।

আমাদের পর্যাপ্ত বক্সাইট্ আছে। কিন্তু তামা, সীসা ও দস্তা খনির অভাব আছে। বৎসরে আমাদের ৩০ কোটি টাকার মত লৌহ বর্জিত ধাতুর প্রয়োজন হয় এবং ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ৪৫ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। আমাদের আভ্যন্তরীন উৎপাদনের পরিমাণ কোন মতেই ৭ কোটি টাকার বেশী নহে; কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ৪০ হাজার টন এ্যালুমিনিয়াম, ৪৫ হাজার টন তাম্র, ৫০ হাজার টন দস্তা, ২০ হাজার টন সীসা। হীরাকুদ, রিহান্দ, মেট্টুর, জে কে নগর, পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে যথাক্রমে ২০ হাজার, ১০-২০ হাজার, ৭ হাজার, ১০ হাজার টন এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন হইবে। ভবিষ্যতে মোট উৎপাদন ৭ হাজার টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। এই উৎপাদন সূচী সম্পূর্ণভাবে বেসরকারীভাবে পরিচালিত হইবে।

লৌহ বর্জিত ধাতু উৎপাদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্থানে জহর খনি অঞ্চলে দস্তা সংশোধনের জন্য একটি কারখানা গড়িয়া তুলিতেছেন। অনুরূপভাবে তাম্র, দস্তা ও সীসার উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে সত্য যে কোন দেশ খনিজ শিল্পের প্রকৃত উন্নতি ব্যতীত সুদৃঢ় শিল্প কাঠামো গড়িয়া তুলিতে পারে না। সুতরাং যতদূর সম্ভব আমাদের সম্পদের পরিমাণ স্থির

করিতে হইবে উপযুক্ত সমীক্ষার সাহায্যে। অবশ্য কোন দেশই সর্বপ্রকার খনিজ সম্পদে স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে। আমরাও হইতে পারিব এমন কোন কথা নাই; তবু আমাদের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও তাহার সম্যক অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমদানীকৃত খনিজ আকরের গালানো ও পরিশোধন যাহাতে এখানেই সম্ভব হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। হয়তো বাণিজ্য চুক্তির সাহায্যে আমরা কয়েকটি দেশ হইতে এই সব খনিজ আকর আমদানীর ব্যবস্থা করিতে পারি এবং পরিশোধন প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্ভব হইলে ভবিষ্যতে ধাতু আমদানী না করিয়া এখানেই ঐসব ধাতু প্রস্তুত করা সম্ভব হইতে পারে।

পরিশেষে আমি বলিতে চাই যে আমাদের শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলেই চলিবে না আমাদের রপ্তানীর দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। আমাদিগকে ইহার জন্য উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে এবং উন্নত মানের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে। আমরা বৎসরে মাত্র ৪ কোটি টাকার ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানী করিতে পারি (ভবিষ্যতে আরও বেশি হইবে আশা করা যায়)। এই উদ্দেশ্যে রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ সরকারের সহযোগিতায় কাজ করিতেছেন। আমরা এখন বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতির সঙ্কটময় আবর্তে পড়িয়াছি। বর্তমান উৎপাদন হার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কাঁচামাল, সাজসরঞ্জাম, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির অংশ বিশেষ প্রভৃতি আমদানীর অগ্রাধিকার দিয়া আমদানী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখিতে হইয়াছে। নূতন পরিকল্পনাগুলির জন্য মূলধনী দ্রব্য সামগ্রী ও যন্ত্রপাতির অংশ সমূহ আমদানীর ক্ষেত্রেও কিছুটা কড়াকড়ি করা হইয়াছে। যে সব শিল্পের উন্নয়নের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটিবে সেইগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারি শিল্পগুলির দ্রুত উন্নতি করিতেছে এবং ভবিষ্যতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রচুর সাশ্রয় ঘটাইবে আশাকরা যায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অন্তরায় অনেক। বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা তো আছেই, লৌহ পিণ্ডের অভাব আছে আর তার চেয়ে বেশী অভাব ইস্পাতের। ১৯৫৮ সাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পক্ষে একটি মিতব্যয়িতার বৎসর। সকল দিকেই সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমানের জরুরী প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়া অপেক্ষাকৃত কম জরুরী বিষয়কে বিলম্বিত করিয়া কার্যসূচী স্থির করিতে হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সমিতিগুলি ছোট ছোট কমিটি করিয়া তাহাদের সুবিধা অসুবিধা শিল্পের অন্তরায় ও অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারের সহিত সহযোগিতা করা উচিত।

রেশম শিল্পের সমস্যা ও সংরক্ষণ

পর্যবেক্ষক

রেশম শিল্প পশ্চিমবঙ্গে কেন ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বস্ত্রশিল্প। পশ্চিমবঙ্গের রেশম বস্ত্র এক সময় বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত হইত। ইংরাজ শাসনের যুগে এই শিল্পটির যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল। স্বাধীনোত্তর কালে আবার ইহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হইতেছে। কিভাবে শিল্পটি তার গৌরব ফিরাইয়া আনা যায় তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড এই শিল্পটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এক বিস্তৃত কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি শুল্ক কমিশন গঠিত হইয়াছে। কমিশনের উদ্দেশ্য, রেশমশিল্পের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহার সংরক্ষণ সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা করা।

পশ্চিমবঙ্গের রেশম শিল্পটি আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই শিল্পে প্রায় ৬ হাজার তাঁত নিযুক্ত আছে। প্রায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড কাঁচা রেশম ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ বৎসরেই প্রতিটি তাঁত ৭০ পাউণ্ডের মত কাঁচা রেশম ব্যবহার করে। কিন্তু বর্তমানে অনিশ্চিত বাজারের জন্য মাত্র ৪ হাজার তাঁত বিশুদ্ধ রেশম বস্ত্র বয়ন করিতেছে। তাহাতে এই রাজ্যে উৎপাদিত ২ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড কাঁচা রেশম ব্যবহৃত হইতেছে। ধীরে ধীরে অবশ্য বাজারের অবস্থা উন্নত হইবে। খাদি এবং গ্রামীন শিল্প কমিশনের উদ্যোগে তাঁতী এবং রেশম শিল্পীরা সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইতেছে। তাহারা নির্দিষ্ট মজুরীরও নিশ্চয়তা পাইতেছে; অথচ এদিকে রেশম ক্রেতারা রিবেট পাইতেছে। অপরদিকে All India Handloom Board ও All India Handicraft Board রেশম জাত দ্রব্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে সমিতিবদ্ধ সংস্থার দ্বারা বর্তমানে ১২ শত তাঁত পরিচালিত হইতেছে। আশা করা যায় যে সমিতিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই শিল্পের আরও উন্নতি সম্ভব হইবে। পশ্চিমবঙ্গে আগামী তিন বৎসরে এই শিল্পটির কিরূপ সম্ভাব্য উন্নতি ঘটিবে নিম্নে তাহার একটি আনুমানিক বিবরণ দেওয়া হইল :—

বর্তমানে পরিচালিত রেশম	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১
বয়নে নিযুক্ত তাঁতের সংখ্যা	৪০০০	৪৫০০	৫২০০	৬০০০

অনেক সময় দেখা যায় যে তাঁতীরা আমদানীকৃত কাঁচা রেশম পছন্দ করে। তাহার কারণ আমদানীকৃত রেশম সুতা কাটা সুবিধাজনক। এইগুলি পরিষ্কার করা থাকে (Re Reeled)। দেশীয় কাঁচা রেশমের অবস্থা ঠিক বিপরীত। তাহা ছাড়া এখানকার গুটিগুলি নানান আকারের। তাহার ফলে তন্তুও বিভিন্ন প্রকারের হয়। তবে এই অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। রেশম চাষের প্রসারের সঙ্গে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি উৎকর্ষও বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতীয় রেশম শিল্পের সমস্যাগুলির মধ্যে একটি সমস্যা হইতেছে ক্রেতার বিরূপ মনোভাব। ক্রেতা সাধারণের ধারণা যে আমদানীকৃত রেশমবস্ত্র গুণে স্বদেশী রেশম বস্ত্র অপেক্ষা অনেক ভাল। প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। কিন্তু ভারতীয় রেশমবস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা ও উৎকর্ষের প্রচার কার্য হয় নাই। সম্প্রতি 'মার্কা' ব্যবহারের সাহায্যে উৎকৃষ্ট বস্ত্র বিক্রয়ের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতীয় মানক সংস্থাকেও মান নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে, আশা করা যায়, ভারতের রেশম বস্ত্র বৃহত্তর বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। দ্বিতীয় সমস্যা, ভারতে কৃত্রিম তন্তু হইতে প্রস্তুত বস্ত্রের প্রতিযোগিতা। আর্টসিল্ক, রেয়ন, নাইলন প্রভৃতি বস্ত্রের প্রতিযোগিতা প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট রেশমজাত বস্ত্রের চাহিদার হ্রাস ঘটাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ জাপানী কাঁচা রেশমের প্রতিযোগিতা। জাপানী রেশমসুতা উন্নত উপায়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত এবং দামেও সস্তা। সুতরাং ভারতে চরকায় কাটা ও হাতে বোনা রেশম বস্ত্র মূল্যের প্রতিযোগিতায় পিছু হটিতে বাধ্য হইতেছে। অথচ গুণে উৎকৃষ্ট, কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্ভাবনাসম্পন্ন ভারতের এই শিল্পটি সুযোগ-সুবিধা পাইলে অনতিবিলম্বে দেশের আর্থিক কাঠামোর বেকার সমস্যার সমাধানে প্রভূত কল্যাণের সূচনা করিবে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের মনে হয়, রেশমশিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা কর্তব্য। ভারতের রেশম শিল্প সমিতি বদ্ধ সমবায় প্রতিষ্ঠান, বা অনুরূপ সংস্থা দ্বারা

পরিচালিত হইলে মহাজনের প্রভাব মুক্ত হইয়া কাটুনীরা সম্মানজনক নির্দিষ্ট মজুরীতে শিল্পে উৎসাহিত হইবে। রেশম চাষীকেও মহাজনের আওতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। রেশম চাষী যাহাতে উন্নত গুটিপোকার চাষ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে গুটি পোকা পালনের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করিতে পারে। ইহা কোন কালীন শিল্প ৩।৪ বৎসরের পরিকল্পনায় সফল হইবে না। অন্ততঃ ১০ বৎসরের একটি পরিকল্পনা সুসম্পন্নভাবে পরিচালিত হইলে তবেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে। খাদি ও গ্রামীন শিল্প সংঘ, রেশম শিল্পী সংঘ, সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সমবেত ভাবে এই পরিকল্পনায় যোগদান করিয়া শিল্পটিকে বিক্ষিপ্ত মালিকানা ও বৈষম্যমূলক স্বার্থ হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃত শিল্পগঠনের নীতি-পদ্ধতিতে পরিচালিত করিতে হইবে। আজই জাপানী যন্ত্রপাতি ও জাপানী পদ্ধতির গ্রহণ সম্ভব নয়। ইহা বিচার বিশ্লেষণ সাপেক্ষ ও আভ্যন্তরীন সমস্যার প্রতি সমধিক দৃষ্টি দিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

এই ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দানও দীর্ঘ মেয়াদী কালের জন্য করিতে হইবে। কারণ কোন স্বল্পকালীন সংরক্ষণের সময়ে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার সুফল পাওয়া যায় না। একদিকে যেমন স্বদেশী শিল্পকে বিদেশী রেশম বস্ত্র, কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন বস্ত্র হইতে রক্ষা করিতে হইবে, তেমনি আমদানীকৃত কাঁচামালের প্রতিযোগিতাও রোধ করিতে হইবে। দেশের ভিতরে ক্রেতাদিগকে স্বদেশী রেশম বস্ত্রের গুণাগুণ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে উৎসাহিত করিতে হইবে। সেক্ষেত্র বর্তমানের হিংবেট দান পদ্ধতি বাঞ্ছনীয়।

রেশমের উপজাত দ্রব্যের সুষ্ঠু ব্যবহার দেশে ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। অনেকের মতে বিদেশে Waste Silk-এর চাহিদা আছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে। কিন্তু যখন দেশেই ইহা হইতে নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে এবং বিদেশে তজ্জাত দ্রব্য রপ্তানী হইতেছে, তখন এখানেই সেগুলিকে কাজে লাগানো উচিত। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই Waste Silk হইতে সুতা কাটা ও বয়ন কার্যে ৮০০০ স্ত্রীলোক নিযুক্ত আছে। এই ধরণের রেশম মহীশূর হইতেও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশে বেকার ও বিধবা স্ত্রীলোকেরা এই ধরণের পরিত্যক্ত রেশম হইতে তকলির সাহায্যে সুতা কাটিয়া জীবিকা অর্জন করে। আজ ইহাকে সংঘবদ্ধ ভাবে গড়িয়া তুলিলে দেশের গ্রামীন শিল্প কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। ১৯৫৭-৫৭ সালের হিসাবেই দেখা যায় যে উন্নত চরকার সাহায্যে প্রায় ১৪০০ লোক বিশেষতঃ স্ত্রীলোক (ইহাদের মধ্যে উদ্বাস্তুও আছে) এই কার্যে নিযুক্ত ছিল। প্রায় ৪০,০০০ পাউণ্ড পরিত্যক্ত রেশম হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়াছে। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলে অন্ততঃ আরও ৫০০০ লোকের জীবিকা উপায়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। পরিত্যক্ত রেশম হইতে প্রস্তুত জিনিসপত্র বিদেশেও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং বিদেশে রপ্তানিও ভাল হইতেছে। আশা করা যায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রেশমশিল্পের এই অঙ্গটিকে উন্নত শিল্পের পর্যায়ে দাঁড় করাইতে পারিবেন।

সুতরাং আমরা আশা করি কমিশন যেন শিল্পের বিচার-বিশ্লেষণে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার সুফলের কথা চিন্তা করেন। রেশমশিল্প ভারতের ঐতিহ্যসম্পন্ন শিল্প। কর্মসংস্থানে ইহা অবদান অসামান্য। সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত হইলে ইহার অর্থ নৈতিক কাঠামোতে একটি সমৃদ্ধ অংশ গ্রহণ করিবে, আমাদের বিশ্বাস।

আর্থিক দিক-দর্শন

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি—জয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অনুমোদিত মূলধন ১কোটী টাকা। আদায়ী মূলধন ৬০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং ডিবেঞ্চারের পরিমাণ আরও ৬০ লক্ষ টাকা। উপরোক্ত মূলধন লইয়া জয় ইঞ্জিনিয়ারিং সেলাই কল, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতি উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং যাদবপুরে একটি সর্বাধুনিক কারখানা নির্মাণ করেন। এই কারখানায় বৎসরে ৩ লক্ষ সেলাইকল এবং ইহার বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কারখানাতে ভারতে সর্বপ্রথম সেলাই কলের সূঁচ প্রস্তুতের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বৈদ্যুতিক পাখা নির্মাণের কারখানাটি ২নং ফ্যাক্টরী বাণিজ্যশ্রেণীতে স্থানান্তরিত করা হয়। আলোচ্য কোম্পানীর সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যাপক। ইহারা একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সেলাইকলের কতকগুলি যন্ত্রপাতি শ্রমিকদের কুটীরে বসিয়া প্রস্তুত করাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে জাপানের ন্যায় কুটির শিল্পে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। চলতি বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে এইভাবে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল ২০০০ হাজার এবং ইহারা ৩ লক্ষ৫৮ হাজার টাকা মজুরী পাইয়াছে।

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং সেলাইকল ও বৈদ্যুতিক পাখা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতে অনেকগুলি শাখা অফিস খুলিয়াছে; ইহা ছাড়া ৩ শতাধিক সেলাই শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেছেন। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে বিভিন্ন বয়সের প্রায় ২০ হাজার ছাত্রী শিক্ষা লাভ করে। ইহার ফলে শুধু এইসকল ছাত্রীকে স্বাবলম্বী করা হয় না, সেলাইকল বিক্রির বাজারকেও সম্প্রসারিত করা হয়। রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জয় ইঞ্জিনিয়ারিং যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, হল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, আবিসিনিয়া, আফগানিস্থান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, নিউক্যালিডোনিয়া, ম্যাডাগাস্কার, বৃটিশ গিয়ানাতে সেলাইকল এবং সাইপ্রাস, সিরিয়া লেবানন, জর্ডন, মিশর, সৌদি আরব, সুদান, এডেন, বাহেরিন, কুয়েট, ইরাক, ইরান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ফিজি, বৃটীশ পূর্ব আফ্রিকা, পোর্তুগীজ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, নিয়াসাল্যাণ্ড, বেলজিয়াম কঙ্গো, এ্যাঙ্গোলা, নাইজিরিয়া, ঘানা, সিয়েরা লিওন, মরক্কো, ডাকার, ক্যামারুকা, জিব্রাল্টার, জামাইকা। কোম্পানী যুক্তরাষ্ট্রে সেলাইকল রপ্তানীর জন্য একটী চুক্তিও করিয়াছেন। এই চুক্তির ফলে ৪৪½ হাজার সেলাইকল রপ্তানী হইবে। ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে এই চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে। কোম্পানী কার্য পরিচালনা শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ থাকায় অনুপস্থিতির পরিমাণ নিতান্ত কম এবং কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির গতি অব্যাহত আছে।

বৃটেনের বহির্বাণিজ্যে রূপান্তর—সম্প্রতি বৃটেনের রপ্তানীতে বেশ মন্দা দেখা দিয়েছে। এতদিন যুদ্ধের পর থেকে বৃটেনের বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ দ্রুত গতিতেই চলছিল। বৃটেন যুদ্ধে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ও তার আন্তর্জাতিক লগ্নীর বিশেষ ভাবে অপচয় হলেও ১৯৪৬সালের মধ্যেই রপ্তানী ব্যবসা যুদ্ধপূর্ব সীমানায় এসে গিয়াছিল। তারপর ইহা বিগুণ হয়। কিন্তু ১৯৫০সালের পরই ইহাতে মন্থর ভাব আসে। ১৯৫১-৫৬সালে শতকরা ৬ ভাগ বাড়লেও ১৯৫৬-৫৭ সালে ইহা মাত্র শতকরা দুভাগ বেড়েছে। ১৯৫৭-৫৮ তে আরও কমে গিয়েছে। ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বৃটেনের অংশ শতকরা ২১ ভাগ ছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সালে ইহা ১৯এ নেমেছে। আর পশ্চিম জার্মানীর রপ্তানী ১৫ থেকে ১৮তে উঠেছে এবং জাপানের রপ্তানি ৪থেকে ৬তে গিয়েছে। বৃটেনের কর্তৃপক্ষরা মনে করছেন যে বৃটেনের ব্যবসা আরও কমে যাবে। আর তাছাড়া আন্তর্জাতিক ব্যবসাই কমে যাবে ও তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যাবে। কিন্তু যদি বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নিরীখ দিয়ে বৃটেনের অবস্থা মাপা যায় তবে দেখা যাবে যে এবিষয়ে বৃটেনের উন্নতি ছাড়া অবনতি হয়নি। গত দশ বৎসরে বৃটেন বহির্বাণিজ্য থেকে গড়পড়তা ১০০ মিলিয়ন পাউণ্ড বাড়তি পেয়েছে। ১৯৫৭ সালে বাড়তি ২৩৭ মিলিয়ন পাউণ্ড হয়েছে। যদি বৃটেনকে

আন্তর্জাতিক লগ্নীর দায়িত্ব আবার নিতে হয় আর ষ্টার্লিংকে বিশ্বমুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করতে হয় তবে ইহা যথেষ্ট নয়। বৃটেনের বহির্বাণিজ্যের আর একটি লক্ষণীয় বিষয় যে তার আমদানী দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে। ১৯৫৮ সালের প্রথম তিন মাসের রপ্তানি ১৯৫৭ সালের ঐ সময়ের রপ্তানির চেয়ে শতকরা ১½ ভাগ কম হয়েছিল কিন্তু আমদানি ১১½ ভাগকম হয়েছে। বৃটেনে জাপানি ও কাপড়ের রপ্তানির বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। এবৎসরে জাপানির রপ্তানি গত বৎসরের তুলনায় অর্ধেক। অবশ্য জাপানীর বাজার খুব মন্দা। বহুপাতির ব্যবসায় বৃটেন কিছু খারাপ করেনি। মেসিন টুলের ব্যবসায়ে বৃটেনের শিল্পপতিরা উচ্চাশা পোষণ করছেন। তাঁরা মনে করছেন ব্যবসা বাড়বেই কারণ আজ পৃথিবীব্যাপি লগ্নীর হিড়িক লেগে গিয়েছে। গত কয়েক বৎসর বৃটিশ মেসিন টুল খুব প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাজার করেছে। গত বৎসরের রপ্তানির ১০ ভাগ আমেরিকায় ৫৮ ভাগ কানাডাতে বিক্রয় করেছে। একথা মনে রাখা দরকার যে বৃটেনের মেসিন টুল উৎপাদন জার্মানীতে ও আমেরিকার থেকে কম। গত বৎসর বৃটেন উৎপাদনের শতকরা ২৬ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করেছে। জার্মানী ৪৩ ভাগ আর আমেরিকা ১৪ভাগ। বৃটেনের প্রধান বাজার অষ্ট্রেলিয়া ভারত ও ফরাসী।

ইন্টারন্যাশন্যাল রিকেটেবমেণ্ট ডেভলাপমেণ্ট—এই ব্যাঙ্ক ১৯৫৭ সালের শেষ পর্যন্ত বেসরকারী শিল্পকে ১২৪ মিলিয়ন ডলার ও সরকারী শিল্পকে ১৬৩ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। সম্প্রতি কলিকাতা ও মাদ্রাজের বন্দর উন্নয়নের জন্য ৪৩ মিলিয়ন ডলার ধার দিয়েছে। সাধারণতঃ এই সকল ঋণ শতকরা ৪½ থেকে ৬ ভাগ সুদে ১১ থেকে ২০ বৎসর মেয়াদে দেওয়া হয়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে বেসরকারী শিল্পও কেবলমাত্র সরকারের মুচলেখায় বড় বড় প্রজেক্টের জন্য ঋণ পায়।

ইন্টারন্যাশন্যাল ফাইনান্স করপোরেশান—এখানে ঋণের জন্য সরকারী মুচলেখার প্রয়োজন হয় না। ইহা কেবলমাত্র বেসরকারী শিল্পকে ঋণ দেয়। ইহা বেসরকারী, শিল্পের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায় যদি পরিচালনা উন্নত ধরণের হয়। ইহা সম্প্রসারণ, উন্নয়ণ কিম্বা নূতন কোম্পানী স্থাপনের জন্য ঋণ দেয়। কিন্তু এইসব কোম্পানীর মূলধন কমপক্ষে ৫০০,০০০ ডলার হওয়ার চাই। করপোরেশন যে টাকা দেয় তা খানিকটা ঋণের মত; কেননা তারা সুদ নেয় ও খানিকটা লগ্নীর মত; কারণ তারা পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে। ইহা ৫ থেকে ১৫ বৎসরের জন্য ঋণ দেয় ও সুদের হার শতকরা সাত ভাগ। ভারতের কোন কোম্পানী এখনও পর্যন্ত ইহার কোনরূপ নেয়নি।

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক—এর প্রকৃত উদ্দেশ্য আমেরিকার মাল রপ্তানি বৃদ্ধি করা। ইহার সুদের হার কিছুটা কম। ঋণের মেয়াদ ১½ বৎসর থেকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত। ১৯৫৭ সালে ৪টি ভারতীয় সংস্থা এই ব্যাঙ্ক থেকে ১·৮ মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণ করেছে। এই ব্যাঙ্ক ভারতকে মেসিনারী কিনতে এই বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পকে ও প্রজেক্টে ১৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়ে মঞ্জুর করেছে। এই ঋণের পর এই ব্যাঙ্ক থেকে আর বিশেষ ঋণ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এই ব্যাঙ্কের আয়োজনে যে যন্ত্রপাতি আমদানি করা হবে তা সরাসরি করা যাবে।

ডেভালপমেণ্ট লোন ফাণ্ড—ইহা পরিচালনা করে আমেরিকা সরকার। এই ফাণ্ডের টাকা দিয়ে অনগ্রসর দেশের বেসরকারী প্রজেক্টকে সাহায্য করা হয়। যাহাকে এই ঋণ দেওয়া হবে তার নিজস্ব ৫০০,০০০ ডলার থাকা চাই। ১০০,০০০ ডলারের কম ঋণ দেওয়া হয় না। ভারত সম্প্রতি ৭৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণ করেছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পাটকল গুলো এর থেকে ৫ মিলিয়ন ডলার পাবে। ইহার সুদের হার শতকরা ৩½ ভাগ।

কমনওয়েলথ ডেভলাপমেণ্ট কাইনেন্স করপোরেশন—ইহা ক্ষেত্র বিশেষে বেসরকারী শিল্পের ডিবেঞ্চার বা শেয়ার প্রভৃতি ক্রয় বা আণ্ডাররাইট করে। সাধারণতঃ ২৫০,০০০ পাউণ্ডের কম এরা ঋণ দেয়না। এখন পর্যন্ত এই কোম্পানী ভারতীয় Industrial Credit and Investment Corporation-এর ১০০ টাকা করে ২০,০০০ শেয়ার কিনেছে।

পরিকল্পনার বিচার

অধ্যাপক ডি. জি. কার্ভে

এখন হইতে দাত বৎসর পূর্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। তখন হইতে উন্নয়নের গতি উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বস্তুতঃ যখন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করা হইতেছিল, তখন সকলের মনেই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তখন সব কিছুই এমন অনুকূল ছিল যে আমরা বিনা আয়াসে পরিকল্পনার অসাধ্য সাধন করিতে পারিব - এই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু এই কাজটাই ছিল অসম্ভব। আমাদের অগ্রগতির পথে যে বাধা অবশ্যম্ভাবীরূপে আজ আমরা তাহারই সম্মুখীন হইয়াছি। পরিকল্পনার এই সব বাধা অনুধাবন করা এবং তাহার প্রতিকার নির্দেশ করা উচিত তাহা হইলে বাধা বিপত্তিতে বিস্মিত হইবার কিছু থাকিবে না।

গত মে মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠক বসে। এই সময় পরিকল্পনা কমিশন পরিষদে জানান যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সম্পদ ৪৮০০ কোটি টাকার অধিক হইতে পারে না। অথচ পূর্বের হিসাব অনুযায়ী উহা ছিল ৫৫০০ কোটি টাকা। জানা যায় যে, দ্বিতীয় বৎসরে উহার আয়তন বৃদ্ধি না করিয়া হ্রাস করা হইবে—এই ঘোষণা এক বিরাট আঘাত স্বরূপ। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ মনে করেন যে, পরিকল্পনার সম্পদের অবস্থা এমন যে, তাহাতে জাতির পক্ষে ৫০০০ কোটি টাকার বেশী ব্যয় করা সম্ভব নহে। অথচ উন্নয়নের গতি মামামাঝি রাখাও জাতির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন। কাজেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পনার কাজ শেষ করিতে গেলে আর কি প্রকার চেষ্টা চালাইতে হইবে তাহা দেশবাসী জানিতে উৎসুক হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। হিসাব করা হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে জাতিকে অতিরিক্ত তিনশত কোটি টাকা যোগান দিতে হইবে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উন্নয়ন পরিষদের বিচার করিতে হইবে। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে জাতির প্রচেষ্টা মোটেই হতাশাব্যঞ্জক নয়। পরিকল্পনার টাকা সংগ্রহের সকল প্রকার উপায়ের মধ্যে সব চেয়ে অপ্রিয় এবং কঠিন উপায় হইল কর ধার্য করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সম্পদের জন্য যে হিসাব করা হইয়াছিল তাহাতে অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকা কর ধার্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল। পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে ৯০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর ধার্যের কথা বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, শুধু যে কর ধার্যের প্রচেষ্টা সন্তোষজনক হইয়াছে তাহা নয়, অধিকন্তু মূল হিসাবের ৫০০ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণ করা গিয়াছে। যে জাতির এই কঠোর কর সাধনের সামর্থ রহিয়াছে তাহার পক্ষে পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নাই।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কি কারণে পরিকল্পনা ছাঁটাই করা অথবা উন্নয়নের গতি শিথিল করার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে? এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর আছে। প্রথমত, পরিকল্পনার ব্যয় ছাড়া প্রতিরক্ষার জন্য ২২৫ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত ব্যয় হইতে পারে। পরিকল্পনা-রচনাকারীদের পক্ষে প্রতিরক্ষার এই ব্যয়ের কথা পূর্বেই চিন্তা করা এবং তাহার ব্যবস্থা করা উচিৎ ছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালে আমাদের কোন কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ স্থায়িত্বের দ্রুত অবনতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিলে, তাহাকে বিদেশী শক্তির সহিত আমাদের সম্বন্ধে তিক্ত করার অভিযোগে

অপব্যয়ী করা হইত। প্রতিরক্ষার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় আমাদের শান্তিপূর্ণ উন্নয়নের পথে অপ্রত্যাশিত বাধা। সেজন্য আমরা পরিকল্পনা রচনা-কারীদিগকে দায়ী করিতে পারি না।

খাদ্যসমস্যা—আমরা সাধারণ ভাবে কৃষি সম্পর্কে এবং বিশেষ ভাবে খাদ্য সম্পর্কে একই প্রকার উক্তি করিতে পারি না। কৃষি পরিকল্পনার তিনটি বিশেষ দিক আছে। সেগুলি সম্পর্কে পরিকল্পনায় অনুমোদিত উৎপাদনের লক্ষ্য সাধনের জন্য সতর্কতামূলক যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই বলিয়া মনে হয়। প্রথমত ঋতুর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এদেশের কোন লোকেরই খামখেয়ালী ঋতুর জন্য বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই। ইহাতে আমরা অভ্যস্ত। তবে পরিকল্পনা রচনা-কারীদের ভবিষ্যতের অস্বাভাবিক ঋতুর প্রতি অধিকতর সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মধ্যে ত্যাগের ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব জাগ্রত হউক ইহা আমরা চাই। তেমনই ব্যাপক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাও অতি সতর্কতার সহিত সুনির্দিষ্ট ভাবে রচনা করা দরকার। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। তাহা ছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, রাসায়নিক সার উৎপাদন প্রভৃতিও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সুসংবদ্ধ কৃষি পরিকল্পনার দুইটি প্রধান যোগসূত্রই ছিল অত্যন্ত শিথিল।

সাধারণত কৃষকেরা যেভাবে ও যে হারে শস্য উৎপাদনে অভ্যস্ত তাহা উন্নত করিতে হইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত লাভের প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। কেন্দ্রীয়, বিশেষতঃ রাজ্য সরকার সমূহ ক্রমেই এই বিষয়ে অবহিত হইয়া উঠিতেছেন। কার্যকরী মূলনীতি সুপরিকল্পিত উন্নয়নের অংগ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। শুধুমাত্র ন্যায্য মূল্যের কথা বলিলেই চলিবে না। বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহা রক্ষার জন্য উপযুক্ত সংস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু কোন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে আমাদের অস্বাভাবিক সময় লাগিয়াছে। অথচ ইহা না থাকায় সমাজ-বিরোধীরা, বিশেষত ফাটকাবাজীরা পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের পরিকল্পনার সংগে সংগে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে একটা চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে এবং পরিকল্পনাহীন যা অবাধ উদ্যোগও তাহার চেয়ে অনেক ভাল।

কৃষি সমবায়—যে-সকল ক্ষুদ্র জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে ও হইতেছে সেগুলির লাভজনক ব্যবহারের জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন করা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের অংগ হিসাবে আমরা কৃষক মালিকের জাতি হইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। যদি বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র জমির মালিককে ব্যাপক কৃষি পরিকল্পনার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়, তবে সমবায় সমিতি কৃষক সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমে এই প্রয়োজন উপলব্ধি করা হইয়াছিল। কিন্তু ভূমি সংস্কার ও সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি যথেষ্ট হয় নাই, সেইজন্য কৃষি পরিকল্পনার লক্ষ্য পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ, যদিও সেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনায় উহার সম্ভাবনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে ও উন্নয়নের ব্যয় বাড়িয়াছে। দেশের পল্লী অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত সমবায় সমিতি গঠন আবশ্যক। উহার অভাবে পল্লীগ্রামের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বিপুল পরিমাণে মূলধন ব্যয়ের ফল দরিয়ায় জল ঢালার মতই নিরর্থক। এখানেও অতীত দোষ ত্রুটি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিলেই আমরা ভবিষ্যতে শক্তি সঞ্চয়ে অধিকতর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইব। ইতিমধ্যেই ভারতে জাতীয় ও রাজ্য ভিত্তিতে অনেকগুলি সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি যে

হতাশার ভাব দেখা দিয়াছে তাহাতে এখন আমাদের অধিকতর দৃঢ়তার সহিত প্রাথমিক সংস্থাগুলি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এ পর্যন্ত আমরা যে গতিতে চলিয়াছিলাম, ভবিষ্যতে দ্রুততর গতিতে চলিয়া একটি সমৃদ্ধশালী সমবায়মূলক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

বৈদেশিক লেনদেন অবস্থা—আমাদের বৈদেশিক লেনদেন সম্পর্কেও এক সাংঘাতিক অসাম্য দেখা দিয়াছে। আমাদের প্রয়োজন ঠিকমত নির্ধারিত না হওয়াও ইহার একটা প্রধান কারণ। অবশ্য আমাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন যদিও উপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। তবে বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির শিকার যাইবে না বলিয়াই আশা করি। ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই বটে, তবে অপর দিকে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ, বিশেষতঃ ভোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়াছে, এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্য অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু শিল্প কারখানায় উৎপাদনের ব্যয় হার মোটামুটি স্থির থাকিলেও উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধির প্রভাব মূল্য হারের উপর বিশেষ দেখা যায় নাই। অথচ পরিকল্পনার ব্যয় (অংশতঃ ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হইলেও) যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং উহা মনে রাখিয়াই ভবিষ্যতের অর্থ বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন। এমন কি বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ৫০০ কোটি টাকা করা হইলেও তাহাতে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ পূর্বের মতই রাখা হইয়াছে। কিন্তু শিল্প ও পরিবহনের ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ ১২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সেচ ও সমাজ সেবায় বরাদ্দ হ্রাস করা হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কৃষি খাতে যথোচিত অর্থ বিনিয়োগ করা হইতেছে না। যদি কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্য সাধন সম্ভব না হয়, তবে তাহার কারণ হইবে পর্যাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ না করা ও প্রতিষ্ঠানগত পরিকল্পনার অভাব।

রাজ্যসরকারের প্রচেষ্টা—পরিকল্পনার সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় দেখা গিয়াছে, রাজ্য সরকারগণ সন্তোষজনক ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। রাজ্য সরকারগণ কর বৃদ্ধির লক্ষ্য সাধন করিতে ত পারেন নাই, অধিকন্তু কেন্দ্রে ও রাজ্যের মধ্যে কর পুনর্বণ্টনের ফলে রাজ্য সরকার সমূহ যে অতিরিক্ত ১৭০ কোটি টাকা পাইয়াছেন তাহার অধিকাংশই পরিকল্পনা এমন কি উন্নয়নমূলক কাজের বহির্ভূত ব্যাপারে ব্যয় করিয়াছেন। রাজ্যগুলির নিজেদের কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়ার থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু যদি রাজ্যগুলি অর্থ সংগ্রহে ও ব্যয় সংকোচে অধিক আগ্রহী না হয় তবে পরিকল্পনা লাভজনক নাও হইতে পারে। পরিকল্পনা কমিশন এমন কি ৪৫০০ কোটি টাকার লক্ষ্য সাধনের জন্য অতিরিক্ত ২৪০ কোটি টাকা সংগ্রহের উপর জোর দিয়াছেন। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য কর ধার্য করিয়া ৬০ কোটি টাকা, ঋণ সঞ্চয়ের দ্বারা ৬০ কোটি টাকা, পরিকল্পনার বহির্ভূত বিষয়ে ব্যয় সংকোচ করিয়া ৮০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এসব কঠিন কাজ সন্দেহ নাই তবে ভারত সরকারের জন্য নির্দিষ্ট কাজের তুলনায় এগুলি কঠিন নয়। উন্নয়নের গতি একটা ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে রাখিতে গেলেও এই অর্থ বিনিয়োগ অপরিহার্য। পরিকল্পনার গতি অব্যাহত রাখিতে হইলে জনসাধারণের সংকল্প ও সহযোগিতা মূলক মনোভাব এবং সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্ব অবশ্যই চাই।

———

অর্থনীতিবিদ জর্জ বার্ণার্ড শ'

শ্রীআভাস দাশগুপ্ত

ইংরাজী সাহিত্যের খ্যাতনামা নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ'র আর একটি বড় পরিচয় অর্থনীতিবিদ হিসাবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি একনিষ্ঠ সমাজতন্ত্রবাদী। বস্তুতঃ সমাজতন্ত্রবাদী বার্ণার্ড শ' কে না জানলে, তাঁর নাটকগুলির মূল বক্তব্য পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধি করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ'য়ের মূল অবদান রয়েছে। অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় শ'য়ের জীবনে সমাজতন্ত্রবাদের গভীর আধিপত্য বিস্তারের কারণ, তাঁর (১) বাল্য ও যৌবনের প্রচণ্ড আর্থিক অনটন এবং (২) বিশ্লেষণ ক্ষমতা, গভীর অধ্যয়ন ও সহকর্মী ও কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবীর প্রভাব।

বাল্যে ও যৌবনে বার্ণার্ড শ'কে গভীর অর্থকষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। মাত্র ১১/১৩ বছর বয়সে তাঁকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ত্যাগ করে অফিসে পিওনের চাকুরী নিতে হয়। তারপর যৌবনে কমপক্ষে ষোলো বছর তাঁকে প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। প্রথম যৌবনে লণ্ডনে এসে তাঁকে বেশ কয়েক বছর তাঁর মায়ের গানের টিউসিনির টাকার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম ৯৭ বছরে তিনি মোট ১০/১২ পাউণ্ডের বেশী রোজগার করতে পারেননি। একই কোট প্যাণ্ট পরে থাকতে হয়েছে তাঁকে দীর্ঘদিন, নতুন জামা কাপড়ের পয়সা জোটেনি। প্রকাশকেরা নবীন লেখকের বই ছাপাতে রাজী হয়নি, কোন সংবাদ পত্রেও তাঁর স্থায়ী চাকুরী জোটেনি। এই দারিদ্র্য ও অভাব তাঁকে জীবন সম্বন্ধে এক গভীর অভিজ্ঞতা এনে দেয়, কিন্তু তাঁর সচেতন মনকে পঙ্গু করতে পারেনি। মানুষের সমাজে একদিকে ভোগ বিলাসীদের দল আর একদিকে অভাব গ্রস্তের ভীড় সমাজব্যবস্থাকে কত দুর্বল ও অযৌক্তিক করে তোলে; বার্ণার্ড শ' তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বণ্টনের সমতার প্রয়োজনের কথা তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা থেকে শেখা।

বার্ণার্ড শ'র গভীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা ছিল। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রত্যেকটি রচনায়। তিনি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজের মূল প্রয়োজন হ'ল অর্থনৈতিক সাম্য। গভীর অধ্যয়ন তাঁকে বিশ্লেষণে ও এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে সাহায্য করেছিল। ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, রাজনীতি, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যথেষ্ট পড়াশুনা করেছিলেন। আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদেরা একথা কল্পনাও করতে পারেননা যে ভাল অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ হতে হলে 'জেনেটিক্স'এ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তারপরে শ'য়ের জীবনে আসে বন্ধু ও বান্ধবীর প্রভাব। এই বন্ধু ও বান্ধবীরাও ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদী। এদেরই সহযোগিতায় গড়ে ওঠে ফেবিয়ান সোসাইটি। তাঁর বন্ধু ও বান্ধবীদের মধ্যে সিডনে অলিভার, জেমস্ লে জোনস্ হেনরী সল্ট, উইলিয়ম মরিস, এনি বেশান্ট, সিডনে ও বিয়েট্রিস ওয়েব প্রভৃতির নাম বিখ্যাত। এদের মধ্যে এনি বেশান্ট (যিনি পরে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন) তাঁর একটি সাময়িক পত্রে বার্ণার্ড শ'কে ধারাবাহিকভাবে লিখবার সুবিধা করে দেন এবং সিডনে ও ওয়েব দম্পতি বহুভাবে শ'কে সাহায্য করেন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার শিক্ষাগত বিকাশের উদ্দেশ্যে ওয়েব দম্পতি বর্তমানের প্রসিদ্ধ লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স প্রতিষ্ঠা করেন।

শ' য়ের জীবনে সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম সার্থক ছোঁয়া লাগে তাঁর ২৬ বছর বয়সে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, জমি রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে হেনরী জর্জের একটি বক্তৃতা শুনে। এই সময়ে হেনরী জর্জের মত শ'য়েরও ধারণা ছিল, যে, কেবলমাত্র জমি রাষ্ট্রীয়করণ অথবা একটি মাত্র কর ধার্য করে (by introducing single tax) অর্থনৈতিক বৈষম্যের সুরাহা হওয়া সম্ভব—থাকুক না অন্যান্য প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বাধীন। কিন্তু শীঘ্রই শ'য়ের এই নরম নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে তিনি ক্রমশঃ পুরোদস্তুর সমাজতন্ত্রবাদী হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল সকল প্রকার অর্থনৈতিক ও উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া প্রয়োজন, ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব থাকলেই অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেবে—যার ফল আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শ' ও তাঁর সহকর্মীরা ফেবিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেন। ফেবিয়ান গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডে সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম করা। কিন্তু মার্কসীয় পথের সাথে তাদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। মার্কসীয় পথ পুঁজিবাদী ও মালিকগোষ্ঠীর সাথে জয়লাভ না করা পর্যন্ত শ্রেণীর আপোষহীন ও রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ। ফেবিয়ানরা এই আপোষহীন ও রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। ইংরাজী ভাষায় ফেবিয়ান (Fabian) কথাটীর অভিধানগত অর্থ হচ্ছে 'সতর্ক' 'বা হুঁশিয়ার'। জনৈক ইয়োরোপীয় যোদ্ধার নাম থেকে (যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে খুব সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতেন) এই কথাটীর সৃষ্টি হয়েছে। ফেবিয়ানগোষ্ঠীরাও চেয়েছিলেন প্রচারের সাহায্যে জনমত গঠন করে ক্রমশঃ নিয়মতান্ত্রিক পরিস্থিতির মধ্যে ভোটের জোরে শাসন ক্ষমতা দখল করে আস্তে আস্তে আইন পাশ করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবেন। রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ থেকে বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে দূরে থেকে নিয়মতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়াই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

এই জন্যে তাঁরা প্রথমে জনমত গঠনে ব্যস্ত হলেন। অসংখ্য পুঁথি পত্তর ও রচনা প্রকাশিত হতে লাগলো ফেবিয়ান লেখকদের কলম থেকে। শ'ও তাঁর তেজী কলম ধরলেন। প্রথমে ফেবিয়ান মতবাদ দানা বাঁধলো শিক্ষিত মহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও ছাত্রসমাজে। তখন গ্রেটবৃটেনে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিলনা যেখানে ফেবিয়ান সোসাইটীর শাখা গড়ে ওঠেনি ; বিপুল সাড়া পেল ফেবিয়ানবাদ শিক্ষিত মহল থেকে। তারপর ফেবিয়ান কর্মীরা হাত বাড়ালেন শ্রমিক সংগঠনের দিকে। গাঁটি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্রষ্টা এই ফেবিয়ানেরা। তাঁরা বহু পরিশ্রম করে অনেক হিসাব পত্তর করে শ্রমিকদের বোঝালেন যে কলকারখানার মুনাফায় তাদের একটা ন্যায্য অংশ আছে, যা তারা বোনাস হিসাবে পেতে পারে, কলকারখানায় তাদের জন্য বিশেষ রকমের সস্তা সুবিধা ও ছুটি-ছাটার দরকার। এই সময়ে ফেবিয়ান কর্মীরা প্রচারের উদ্দেশ্যে কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে হাইড পার্কে ও অন্যান্য পার্কে সমাজতন্ত্রবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। শ'ও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ফেবিয়ানদের কার্যপদ্ধতির আর একটি অঙ্গ ছিল ভোটের জোরে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দখল। এজন্যে প্রথমে তাঁরা অবতীর্ণ হলেন শাসনব্যবস্থাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের ভোটযুদ্ধে। কয়েকটী ক্ষেত্রে ফেবিয়ান প্রার্থী জয়লাভ করলেন। শ'ও ছিলেন তাঁদের একজন। নির্বাচিত হয়ে একটী ব্যরো কাউন্সিলের সদস্য থাকা কালীন শাসন-শাসিত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সম্বন্ধে শ' একটী মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন।

স্বল্পকালের মধ্যে ফেবিয়ান দল কেবল মাত্র বৃটেনের নয়, সমগ্র ইউরোপের চিন্তা জগতে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেন। কিন্তু ফেবিয়ানের দল সক্রিয় ভাবে বেশীদিনটিকে থাকতে পারেননি,

তার কারণ ঘোষণার গ্রেটব্রটেনের রক্ষণশীল মস্তিষ্ক। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই ফেবিয়ানদলের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ফেবিয়ান যদি বেঁচে রইল তারই সৃষ্ট গ্রেটব্রটেনের শ্রমিকদল বা লেবার পার্টির মধ্যে। এই শ্রমিকদলের মধ্যে চিন্তার খোরাক যোগাতেন একালের ফেবিয়ান কর্মীরা। সেই কর্মীরাই হয়ে রইলেন শ্রমিকদলের বুদ্ধি ও পরামর্শদাতা। ফেবিয়ানদের আদর্শ সার্থক করলেন শ্রমিকদল। বর্তমান শতাব্দীর এই পাঁচ বছরের মধ্যে শ্রমিকদল ভোটের জোরে কয়েকবার বৃটেনের শাসন ক্ষমতা দখল করেছে এবং প্রত্যেকবারই তারা আইনের সাহায্যে কিছু না কিছু পুঁজিবাদের কেল্লায় আঘাত হেনেছে। সবচেয়ে বড় আঘাত হানে শ্রমিকদল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ক্ষমতা দখলের পর। রক্ষণশীল ইংরাজেরা কোন দিনই ভাবতে পারেনি যে ভারতবর্ষ, সিংহল, মিশর, সুদান প্রভৃতি দেশগুলি তাদের ছাড়তে হবে। জাপানীদের হাত থেকে ব্রহ্মকে পুনর্দখল করে। কিন্তু শ্রমিকদল স্বেচ্ছায় এই সকল দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিল। শ্রমিকদল আরও বড় আঘাত হানলো কয়লা ও লৌহ শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করে। এত বড় ভোজ রক্ষণশীল ইংল্যাণ্ডের ধাতে সইলনা। তাই পরের নির্বাচনে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন চার্চিল সাহেব। বস্তুতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পিঠ পিঠ শ্রমিকদল বৃটেনের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত না থাকলে ব্রিটিসসিংহ এমন শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারতো না এবং পৃথিবীর ইতিহাসও হতো অন্যরকম। প্রায় ঠিক তেমন যেমনটি আমরা দেখেছিলাম প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনসের মাধ্যমে। ফেবিয়ানবাদ এখনো বেঁচে আছে শ্রমিক দলের মাধ্যমে। ফেবিয়ানদের কর্ম পদ্ধতি প্রকৃত বিশ্লেষণের দিক থেকে নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রেই সম্ভব। যে দেশের স্বাধীনতা নাই তাদের প্রথম কর্তব্য স্বাধীনতা অর্জন; সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আসবেই। আর যে দেশে পুরোমাত্রায় রাজতন্ত্র বা একনায়কত্ব, সে দেশেও ফেবিয়ানবাদ অচল, কারণ সেখানে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের কোন সুবিধা নেই।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীতে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ স্বাধীন রাষ্ট্রই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এখন আবার এই সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে ফেবিয়ান প্যাটার্নে আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। ভারতবর্ষের কথাই চিন্তা করা যাক। আবাদী থেকে প্রাগজ্যোতিষপুর পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বর্তমান কংগ্রেসী সরকার সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে আইনের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। অতএব ভারত-সরকারের তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদ ও ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে প্রভেদ রইলো কতটুকু? যে পথের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ আসবে, সেই "পথ" এর বিচারে ভারত সরকারের অনুসৃত নীতি আর ফেবিয়ানদের প্রদর্শিত পথের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তফাৎ রয়েছে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মধ্যে। ফেবিয়ানরা সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিকানা স্বত্বের বিলোপ চেয়েছিলেন আর ভারত সরকারের অনুসৃত নীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। ফেবিয়ান গোষ্ঠীর শ' শুধু একজন বড় কর্মীই ছিলেন না, সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে একজন বড় লেখকও ছিলেন। তাঁর লেখা "এন আনসোসাল সোসালিষ্ট" "ফেবিয়ান এসেজ ইন সোস্যালিজম্, "ফেবিয়ানিজম এণ্ড দি এমপায়ার" দি ইনটেলিজেন্ট ওম্যানস গাইড টু সোস্যালিজম্ প্রভৃতি পুস্তকগুলি সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে বার্নার্ড শ'য়ের প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। বস্তুতঃ জর্জ বার্নার্ড শ'য়ের অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। আনবিক যুগে যখন ধ্বংসের পথ একদিকে প্রশস্ত হয়ে উঠছে, আর অন্যদিকে চলছে

বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের অগ্রগতিহীন জয়যাত্রা. সেই পরস্পর বিরোধী জটিল সময়ে মার্ক্স ও'র চিন্তাধারা বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। শ' বলেছেন—ঈশ্বর বা অদৃশ্যশক্তি বলে যিনি আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান বা পূর্ণাঙ্গ ন'ন। তা যদি হতেন, তাহলে তিনি তাঁরই সৃষ্ট মানুষের দুঃখে কষ্টে ব্যাধি পীড়ায় স্নেহশীল পিতামাতার মতই বিচলিত হতেন এবং যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান সে জন্য এক মুহূর্তেই তিনি মানুষের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটিয়ে দিতেন। কিন্তু তা যখন তিনি করেন নি বা করতে পারেন না তখন বুঝতে হবে যে তিনি পূর্ণাঙ্গ বা সর্বশক্তিমান ন'ন।

তারপর এল আরও নানা জাতের প্রাণী, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হ'লনা, তাই সেই সব প্রাণীদেরও বিদায় নিতে হ'ল। তারপর এল মর্কট, দেখা গেল মর্কটেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, তাদের বংশও বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হতে লাগলো। তারপর এলো মানুষ। দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা সৃষ্টির সাথে সাথে ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্রমশঃ উন্নতির পথে, সার্থকতার পথে অগ্রসর হচ্ছে। সৃষ্টিকে পূর্ণাঙ্গ করেই ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক শক্তি তার নিজের পূর্ণতা খুঁজছেন। বস্তুতঃ তার সৃষ্টির মাধ্যমেই তার নিজের পূর্ণাঙ্গতা লাভের গবেষণা চলছে। তাই দেখি আদিযুগে তিনি সৃষ্টি করলেন ডাইনোসোর জাতীয় অতিকায় প্রাণী। দেখা গেল এই পৃথিবীর পক্ষে তারা অচল, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সার্থক হ'লনা। তাই ঈশ্বর ক্রমশঃ অতিকায় প্রাণীদের বিলুপ্তি ঘটালেন। আজ পর্যন্ত যত জীব সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ তাদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত। মানুষ কথা বলতে পারে, এবং চিন্তা ও কার্যের সমন্বয় ঘটাতে পারে। অর্থাৎ মানুষের হাতে কিন্তু এমন নিজস্ব ক্ষমতা আছে, যা দিয়ে মানুষ নিজেকে আরও উন্নত করে তুলতে পারে এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলতে পারে। কিন্তু মানুষ এই ক্ষমতার অপব্যবহার করছে; তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ, ক্ষমতার লড়াই—সকল কিছু মিলিয়ে মানুষ এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যে, যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়েও মানুষ ধ্বংসের পথে ছুটে চলেছে। এইভাবে চলতে থাকলে একদিন অতিকায় ডাইনোসোর অথবা অন্যান্য আদিম প্রাণীদের মত মনুষ্য সমাজের বিলুপ্তি ঘটবে; সৃষ্টি হবে অন্যশ্রেণীর জীব ঈশ্বরের গবেষণাকে সার্থক করে তুলতে।

এখন মানুষের কাছে দুটী পথ খোলা আছে—হয় বৈষম্যে ঢুকে ধ্বংসে ডেকে আনা, নতুবা সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে আদর্শ জীবন গড়ে তোলা। এই বৈষম্য দূরীকরণ ও আদর্শ জীবন গড়ে তোলার মধ্যেই রয়েছে শ'য়ের অর্থনৈতিক মতবাদ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা। শ' ছিলেন মস্তবড় জীববিজ্ঞানী তাই বিবর্তনবাদের মাধ্যমে তিনি মানুষের চিরন্তন অর্থনৈতিক ও সমাজ দর্শনকে ব্যক্ত করেছেন।

———

খাদ্য চিন্তা

অধ্যাপক—শ্রীসুবিমলকুমার ভট্টাচার্য

বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আবার অন্নাভাব দেখা দিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর দীর্ঘ পনেরো বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে; এই দীর্ঘকালের মধ্যে ১৯৫৭ সালের মত ব্যাপক অনাবৃষ্টি কখনও হয় নাই। এই অনাবৃষ্টির প্রকোপ কেবল বাংলাকে নহে পরন্তু বিহার, উড়িষ্যা এমন কি আসাম রাজ্যকেও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। বিহারের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। শুধু অন্নাভাবই

নহে নিদারুণ জলাভাবেও জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের খাদ্যাবস্থা বেশ আশাপ্রদ। অন্ধ্রপ্রদেশে ৬৮ লক্ষ টন বাড়তি ধান উৎপন্ন হইয়াছে এবং চিরকাল যেখানে খাদ্যঘাটতি সেই মাদ্রাজেও প্রয়োজন মত খাদ্য উৎপন্ন করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী বিগত দশবৎসরে ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদনের বিষয় পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ১৯৪৭ হইতে ৫১ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে ক্রমাগত অনাবৃষ্টির ফলে ভারতে গুরুতর খাদ্য ঘাটতি হইয়াছিল। ঐ সময় উত্তর ভারতের কোন কোন স্থানে অবশ্য শস্যহানি হইয়াছে তবে উহা খুব ব্যাপক আকারে হয় নাই। ১৯৫২ হইতে ৫৫ সাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতেই মোটামুটি ভাল ফসল হয় এবং ঐ সময় ধান সম্পর্কে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণতাও লাভ করে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের ভয়াবহ প্লাবন ও স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি এবং ১৯৫৭ সালের ব্যাপক অনাবৃষ্টি এবং ১৯৫৭ সালের ব্যাপক অনাবৃষ্টি প্রধানতঃ উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতেই অধিক ক্ষতিসাধন করিয়াছে। মৌসুমীবায়ুর খামখেয়ালীর উপর অবশ্য মানুষের হাত নাই তবে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে যে সুফল আশা করা গিয়াছিল তাহা ফলবতী হয় নাই। প্রথমতঃ যে সকল বড় বড় বহুমুখী পরিকল্পনার কাজ শেষ হইয়াছে তাহাদের জল কৃষকগণ পুরাপুরি কাজে লাগাইতে পারেন নাই কারণ অনেক স্থানেই এখনও শাখা খালগুলি প্রস্তুত হয় নাই—বলাবাহুল্য যে পরিকল্পনা রূপায়নের দোষেই এইরূপ হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ জলের সরবরাহ যথেষ্ট না হওয়ায় রাসায়নিক সার প্রয়োগের আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া কয়েকটি মাত্র বৃহৎ পরিকল্পনায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় হওয়ায় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাগুলি ব্যাপক-ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

ভারতে খাদ্যসমস্যার একটি বৈশিষ্ট্য হইল খাদ্যঘাটতি ঘটিবার পূর্ব হইতেই খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি। ১৯৫৬ সালে বন্যা এবং অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও সাধারণভাবে ভারতের খাদ্যোৎপাদন হ্রাস পায় নাই কিন্তু ঐ সময় খাদ্যের মূল্য আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময় খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য শ্রীঅশোক মেটার নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হয় তাহার মতে প্রধানতঃ কয়েকপ্রকার অর্থনৈতিক কারণে যথা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত অর্থব্যয়ে এবং ব্যবসাদারদের লোভের জন্য খাদ্যশস্যের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ৭৬ লক্ষ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য ছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে ৭০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্বাভাবিক কারণে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই। এই যে মূল্যের অহেতুক বৃদ্ধি ইহা রোধের জন্য সরকার ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা প্রভৃতি যে সকল ব্যবস্থা এপর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কিছু সুফল হইলেও ব্যবসাদারদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ মোটেই বন্ধ হয় নাই—অনর্থক সরকারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাউল কলগুলির উপর লেভী প্রথা তুলিয়া দিয়া সমস্ত প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত শিল্প (উৎপাদন নহে) অর্থাৎ Food Processing Industries সরকার নিজ তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করিলে তবে সুফল হইতে পারে।

পৃথিবীর খাদ্যাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের খাদ্যাবস্থা—বর্তমান জগতে দুইটি জাতি আছে—একটি অগ্রসর ও উন্নত জাতি, অপরটি অনগ্রসর ও অর্থভুক্ত জাতি। ভারতীয়গণ এই শেষোক্ত জাতীয় এবং খাদ্যের পরিমাণ ও পুষ্টির দিক হইতে ভারতের স্থান ব্রহ্মদেশ, শ্যাম এমনকি

কেনিয়া এবং ট্যাঙ্গানিকারও নিম্নে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে যথা ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে এবং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডে মাথাপিছু ৩০০০ ক্যালোরির অধিক খাদ্য দৈনিক গ্রহণ করা হয়—সুতরাং সেখানে সমস্যা অতি-ভোজন জনিত ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ সমস্যা। অপর পক্ষে ভারতে মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যদ্রব্যের খাদ্যমূল্য মাত্র ১৬০০ ক্যালোরি (১০ আউন্স শস্য ও ৭ আউন্স অন্যান্য খাদ্য। এই খাদ্য গ্রহণ করিয়া মানুষ কি ভাবে কাজ করিতে পারে তাহা বিশেষজ্ঞগণ বুঝিতে পারেন না! বস্তুতঃ আমাদের দেশে শ্রমিকের কার্য ক্ষমতা খুবই কম। দেশের অধিকাংশ শিশুই অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগিতেছে। বিশেষতঃ আমাদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব অত্যন্ত অধিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পনেরো বছরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে অথচ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র ৮ শতাংশ। ঐ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অধিকাংশ উন্নত দেশগুলিতেই হইয়াছে; সুতরাং ভারতের মত দরিদ্র দেশের অধিবাসীদের খাদ্য সরবরাহ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে বলিয়াই মনে হয়।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সরবরাহ—ভারতের লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৬-১৯৫৭ সালের হিসাবে দেখা যায় যে প্রতি হাজারে (Monthly Bulletin of Statistics, Feb. 1958) জন্মহার ২৭ এবং মৃত্যুহার ১১। অর্থাৎ প্রতি বৎসর প্রতি হাজার জনের সঙ্গে আরও ১৬ জন যোগ হইতেছে। মাথাপিছু ১৩ আউন্স হারে খাদ্য শস্য ধরিলেও প্রতি বৎসরে ভারতে খাদ্যের প্রয়োজন অন্ততঃ দশ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ মোট কর্ষিত জমি পরিমাণ আর বৃদ্ধি করিবার সুযোগ নাই বলিলেও হয়। কারণ কৃষিযোগ্য পতিত জমি বলিয়া যাহার পরিসংখ্যান তালিকায় দেখানো হয় তাহা অধিকাংশ অরণ্যভূমি। ঐ ভূমি চাষ করিলে ফসল অবশ্য উৎপন্ন হইবে কিন্তু উহাতে অরণ্য সৃষ্টি করিলে কৃষির পক্ষে পরোক্ষভাবে অধিক উপকার হইবে। আমাদের দেশে অরণ্যের পরিমাণ মোট ভূমির তুলনায় অত্যন্ত কম। ফলে বৃষ্টির অনিশ্চয়তা, অত্যধিক বন্যা, ধূলিঝড় ও ভূমিক্ষয় হইতেছে এবং কৃষিকার্যের নানা প্রকার অসুবিধা হইতেছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ইতোমধ্যেই লক্ষ লক্ষ একর কৃষিযোগ্য পতিত জমি "উদ্ধার" করা হইয়াছে। ইহার ফলে সাময়িক সমস্যার আংশিক সমাধান হইলেও দেশের কৃষিব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ভূমির মাত্র ১৩ ভাগ অরণ্য অথচ অন্ততঃ ২৫ ভাগ অরণ্য থাকা উচিত। বৃষ্টির অনিশ্চয়তার ইহা একটি প্রধান কারণ। পশ্চিমবঙ্গে যে ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু রহিয়াছেন তাঁহাদের জন্য বাৎসরিক প্রয়োজন ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। অথচ এই রাজ্যে নূতন জমি পাইবার আশা নাই বলিলেই হয়। সুতরাং একমাত্র উপায় বর্তমান কর্ষিত জমিগুলি হইতে অধিক ফসল উৎপন্ন করা।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা—১৯৫৭-৫৮ সালের খাদ্যোৎপাদনের হিসাবের পূর্বাভাষ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মোটামুটি হিসাবে ভারতের গম উৎপাদন প্রায় এক কোটি টনের কাছাকাছি হইতে পারে। (১৯৫৬ সালের উৎপাদন ৯০ লক্ষ টন) অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় কিছু বেশি; কিন্তু ধান উৎপাদন অনেক কম হইয়াছে। মনে হয় ১৯৫৬ সালের ২ কোটি ৮০ লক্ষ টনের স্থলে ১৯৫৭ সালে মাত্র ২ কোটি ৪০।৪৫ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হইয়াছে। জোয়ার, বাজরা উৎপাদন প্রয়োজন মত (২ কোটি টন) হইয়াছে। সুতরাং বিগত কয়েক বৎসরের তুলনায় এ বৎসর

খাদ্য আমদানীর পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বদান্যতা সত্ত্বেও খাদ্য আমদানি খাতে ভারত যে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা হারাইতেছে তাহা কম কম নহে।

১৯৫৭ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরে ভারতে মোট ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবর্তিত লক্ষ্য হইল বাৎসরিক খাদ্যোৎপাদন দেড় কোটি টন বৃদ্ধি করা। কিন্তু ইহাতেও জনসাধারণের খাদ্য তালিকার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। খাদ্য ঘাটতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র দুটি; একটি জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, অপরটি অধিক রাসায়নিক সার উৎপাদন। অন্যান্য ব্যবস্থা যথা ভূমি সংরক্ষণ, উৎকৃষ্ট রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার, যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কৃষি বিষয়ক শিক্ষার প্রসার উপরোক্ত প্রধান দুটি ব্যবস্থার পূরক হিসাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে বিঘা প্রতি ধান এবং গম উৎপাদন এক-তৃতীয়াংশের মত। সুতরাং আধুনিক মতে সর্বত্র চাষ আবাদ হইলে ভারতের খাদ্যোৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। বস্তুতঃ কেবল মাত্র জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার এবং নূতন কৃত্রিম সারের কারখানা স্থাপন করিলেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। (আগামী বারে সমাপ্য)

———

ভারতের উৎপাদনশীলতা আন্দোলন

শ্রমিক, মালিক আর সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টায় আজ পৃথিবীর সব দেশেই উৎপাদনশীলতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধোত্তরকালে একথা সবাই মেনে নিয়েছেন যে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অর্থই হল সম্পদবৃদ্ধি। জাপান যুক্তরাজ্য আর ইউরোপের সব দেশগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের উৎপাদনশীলতা সংস্থা গঠিত হয়েছে। তাদের কোনটি পরিষদ বা কোনটি কেন্দ্র হিসাবে উল্লিখিত হয়ে থাকে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার একটা ইউরোপীয় উৎপাদনশীলতা এজেন্সী আছে। এই এজেন্সীর মাধ্যমে সরকার, শিল্প সংস্থা, কৃষি সংস্থা, গবেষণা সংস্থা, বে-সরকারী উদ্যোগ আর নানা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। এদেশে ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা, আমেদাবাদ বয়নশিল্প গবেষণা সংস্থা আর অন্যান্য কয়েকটি পরিচালক সংস্থা এ কাজে অগ্রণী হন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা কারিগরী সহযোগিতা কার্যসূচী অনুসারে কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে এ ব্যাপারে গবেষণা চালিয়েছেন। এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ গঠিত হয়েছে। তখন থেকেই এই পরিষদ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নানা ব্যবস্থার প্রচলন করছেন আর সে কাজের সংহতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পরিষদটি হচ্ছে একটা স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান। এতে মালিক, শ্রমিক আর সরকারের ১১জন করে প্রতিনিধি আছেন। প্রয়োজন হলে কারিগর বা বিদ্বান ব্যক্তিদের মনোনয়ন করবার অধিকার পরিষদের রয়েছে।

উৎপাদনশীলতার অর্থ কি—উৎপাদনশীলতা বলতে ঠিক কি বোঝা যায়? কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় শ্রমশক্তি, মূলধন, যন্ত্রপাতি আর কাঁচামাল। এগুলি বিনিয়োগের অনুপাতে যে

উৎপাদন হয় সেই হারকেই উৎপাদনশীলতা বলে। অনেক সময় শ্রমিক প্রতি বা ঘণ্টা প্রতি উৎপাদনের হারকে উৎপাদনশীলতা বলে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু এটা ঠিক হয় না। কারণ শ্রমিককে দেয় মজুরীটা উৎপাদন ব্যয়েরই একটা অংশ মাত্র। সেজন্য শ্রমিক প্রতি বা ঘণ্টা প্রতি উৎপাদনের হিসাবে উৎপাদনশীলতা স্থির করাটা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

আবার উৎপাদনের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা জড়িয়ে ফেললেও শুধু বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হবে। উৎপাদনশীলতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও উৎপাদন বেড়ে যেতে পারে। ধরুন কোন কারখানাতে ১০০ শ্রমিক নিয়োগ করে দিনে ১০ টন বৈদ্যুতিক পাখা উৎপাদন করা সম্ভব হয়। আবার আরেকটি কারখানাতে ১২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করেও সমসংখ্যক পাখাই উৎপাদিত হচ্ছে। কাজেই দুটো কারখানার উৎপাদনের পরিমাণ সমান। কিন্তু প্রথম কারখানার উৎপাদনশীলতা বেশী।

শ্রমিক, যন্ত্রপাতি আর কাঁচামালকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে কম ব্যয়ে সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন করবার ক্ষমতার উপরেই উৎপাদনশীলতার সাফল্য নির্ভর করে। কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক অসুবিধার সৃষ্টি না করেই এ করতে হবে। যেমন ধরুন শ্রমিকের অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি বা অবসাদের সৃষ্টি না করে শ্রমিককে ঠিকভাবে খাটিয়ে বেশী উৎপাদন করাই যুক্তিযুক্ত হবে। কিভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব? প্রধান উপায়গুলি হচ্ছে—(১) কোন কাজকে কম আয়াসে ভালভাবে তাড়াতাড়ি শেষ করবার উপায় নির্ধারণ; (২) শ্রমিক মালিকের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন।

বিশেষজ্ঞের ভাষায় বলতে গেলে এজন্য চাই—সময় ও গতি পরীক্ষা; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালনা; শ্রমিক মালিক সম্পর্কে মনোবিকতা বোধ; মান নির্ধারণ আর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদের উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন বৃদ্ধি আর শ্রমশক্তি, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা। শ্রমিক আর মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা আবশ্যক। তাদের আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্বোধিত করে তোলা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনপ্রতি আয় আর জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে চেষ্টা হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হলে সেই লক্ষ্যে সহজে পৌছানো সম্ভব হবে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ বৈজ্ঞানিক গবেষণা উন্নত কারিগরি পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য গবেষণা চালাবেন আর বিদেশের কারখানাগুলিতে কারিগরি কর্মী এবং পরিচালকদের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবেন। গবেষণা আর কারিগরি জ্ঞানের বিস্তার পরিষদের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে কারও কিছু বক্তব্য থাকলে বা কিছু জানাবার থাকলে পরিষদ সানন্দে তা সরবরাহ করবেন। পরিষদের কার্যসূচীর সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৫টি স্থানীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ গঠন করা হবে। ইতিমধ্যেই বাঙ্গালোর আর কোয়েম্বাটুরে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে।

উৎপাদনশীলতার উপকারিতা—যে দেশেই উৎপাদনশীলতা আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেখানে সবাই এটা বুঝেছেন যে, অপচয় বন্ধ করা, উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারিত করা আর জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এ অপরিহার্য। বাঙ্গালোরে উৎপাদনশীলতা আন্দোলনের

ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, বৈদ্যুতিক মোটর কারখানার পরিকল্পনা সামান্য পরিবর্তন করবার ফলে মাঝারি আকারের মোটর উৎপাদন ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। দিল্লীর ট্রান্সপোর্ট লাভিসে শ্রমিক আর যন্ত্রপাতিকে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী খাটাবার ফলে কর্মদক্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে এখন সেন্টাল ওয়ার্কসে মাসে ১০০টি করে বাস মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে। ১৯৫৬ সালে মাসে ৬০টির বেশী বাস মেরামত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো যে, কাজের সময় না বাড়িয়ে, কাউকে ছাঁটাই না করে আর নতুন যন্ত্রপাতি না বসিয়েই এই ফল পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নতুন যন্ত্রপাতিও প্রয়োজন হবে না। শ্রমিকদের কাজ বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। আধার বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতির গ্রহণের ফলে শ্রমিকরাও বেশ লাভবান হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের হয় মাইনে বেড়ে গিয়েছে না হয় কাজের ভার কমে গিয়েছে। কাজের দেখা যাচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কাজের ভার বাড়াবার দরকার হয় না। তবে যেটুকু কাজ হবে সেটাতে যেন কোন ফাঁক বা গাফিলতি না থাকে তা হলেই ইপ্সিত ফললাভ হবে। কাজকে সহজ করে আনন্দদায়ক করে তোলাই উৎপাদনশীলতা আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এতে শ্রমিক কাজকে ভয় পাবে না। অনেকে মনে করেন, উৎপাদনশীলতা আন্দোলন সৃষ্টি করবে বেকারী আর ছাঁটাই। উৎপাদনশীলতায় বেশী লোক চাকরী পেয়েছে, মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ গিয়েছে বেড়ে।

সমাজের লাভ—উৎপাদনশীলতা উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে দেয়; কিন্তু এটাই সব নয়। মন প্রতি আয় আর জাতীয় সম্পদ বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মানকে উন্নত করে তোলে। সমাজ কি এতে উপকৃত হয় না? মানুষ নিয়েই সমাজ। কাজেই তার উন্নতি মানেই সমাজের অগ্রগতি। শ্রমিক আর মালিকের মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া আর প্রীতির ভাব গড়ে তোলাই উৎপাদনশীলতার লক্ষ্য। একদিকে শ্রমিক উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে ক্রেতাকে ব্যয় ভার থেকে মুক্ত করছে, অপরদিকে উৎপাদকের লাভ যাচ্ছে বেড়ে। শিল্পের লাভ বাড়লেইত শ্রমিকের লাভ। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে যে একটা অবিশ্বাসের গণ্ডী গড়ে উঠেছে উৎপাদনশীলতা আন্দোলন সেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে গড়ে তুলবে প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন। শ্রমিক-মালিক একাত্ম হয়ে জাতিকে, দেশকে আর দশকে নিয়ে যাবে প্রগতির পথে।

———

দশমিক পদ্ধতির ওজন

একটি মজার গল্প আছে। বোম্বাইয়ের এক চাষী প্রথম উত্তর ভারত ভ্রমণে গিয়া এক 'পাও' (সিকি সের) রাবড়ীর অর্ডার দেয় এবং বেশ তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করে। কিন্তু সে তৃপ্তি বেশীক্ষণ থাকে নাই। সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। কারণ সন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় যে পরিমাণ রাবড়ী খায় তাহার দ্বিগুণ খাইয়া ফেলিয়াছে। উত্তর ভারতে প্রচলিত এক 'পাও' বোম্বাইতে তৎকালীন প্রচলিত এক 'পাও'-এর দ্বিগুণ। গল্পটি সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, ইহা হইতে দেশে একাধিক রকমের ওজন ও পরিমাণ প্রচলনের বিপদ বুঝিতে পারা যায়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে মণ-সেরের ওজন প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সেরের ওজনের মধ্যে তারতম্য

আছে—উহা কোথাও ২৪ তোলা, কোথাও উহা অপেক্ষা বেশী, এমন কি কোথাও সের বলিতে বুঝায় ১.২ তোলা। আমাদের দেশে দেড় শতাধিক রকমের ওজন ও পরিমাপ প্রচলিত আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে একই জেলায় ওজন ও পরিমাপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন—যেমন খাদ্যশস্য ওজনের জন্য এক রকম সের আবার দুধ ওজনের জন্য আর এক রকম সের।

বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ—এই বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই ১৯৪৪ সালে পরিকল্পনা কমিশন সমস্যাটির পর্যালোচনা আরম্ভ করেন। তাঁহারা একই ধরণের ব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া সমীচীন সে বিষয়ে পরে বিস্তৃত ও বিশদ বিচার বিবেচনা করা হয়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর অনুসৃত দশমিক পদ্ধতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করা হয়।

দশমিক পদ্ধতির প্রধান গুণ হইল ইহা সহজ। মনে পড়ে ছেলেবেলায় যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন শিক্ষক মহাশয় নামতা মুখস্থ করানোর উপর বিশেষ জোর দিতেন। দশের নামতা মুখস্থ করা ও তার পুনরাবৃত্তি করা ছিল সহজ। দশমিক পদ্ধতিতে ওজন ও পরিমাপের ইউনিট দশের অনুপাতে বাড়িতে থাকে। যেমন দশ গ্রামে হয় এক ডেকা গ্রাম, দশ ডেকা গ্রামে এক হেক্টো গ্রাম, দশ হেক্টো গ্রামে এক কিলোগ্রাম, তদনুরূপভাবে বলা যায়—দশ মিলিলিটারে হয় এক সেন্টিমিটার, দশ সেন্টিমিটারে এক ডেসিমিটার এবং দশ ডেসিমিটারে এক মিটার। এদেশে ইতিপূর্বেই দশমিক পদ্ধতির মুদ্রা চালু হইয়াছে। এদেশে দশমিক ওজন ও পরিমাপ চালু হইলে আমাদের দৈনন্দিন হিসাব রাখা ও ব্যবহার পরিচালনা করা কতটা সহজ হইবে তাহা উপলব্ধি করা কষ্টকর নয়।

আমাদের ঐতিহ্য—ভারতই বিশ্বকে দশমিক পদ্ধতি দিয়াছে। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে জনৈক ভারতীয় গাণিতিক শূন্যের মূল্য আবিষ্কার করেন এবং বর্তমানের বিশ্বব্যাপী গণনা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। কাজেই ভারত এখন দশমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহার নিজস্ব ঐতিহ্য গ্রহণ করিবে। আগামী বিপ্লবের কিছুকাল পরেই দশমিক পদ্ধতি বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা নীতির জন্ম তাহা যখন আমরা আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, তখন ঐ বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার গ্রহণ করা অর্থহীন নয়। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় সংসদ দশমিক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনটির নাম ১৯৪৬ সালের ওজন ও পরিমাপের মান আইন। বর্তমানে প্রচলিত দৈর্ঘ, আয়তন, আকারাদির মানের পরিবর্তে নূতন মান ঐ আইনে বিবৃত করা হইয়াছে।

পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন—এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ধীরে ধীরে প্রবর্তন করিতে হয়—তাহাতে বেশ সময় লাগে। সেজন্য নূতন ব্যবস্থা দশ বৎসর ধরিয়া কার্যকরী করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। বিভিন্ন রাজ্য সরকার, বিভিন্ন শিল্প ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহিত পর্যায়ক্রমে আলোচনার পর স্থির করা হইয়াছে যে, আগামী ১লা অক্টোবর (১৯৫৮) হইতে বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকটি অঞ্চল নির্বাচন করিয়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতি চালু করা হইবে। ঐ দিনই সুতীবস্ত্র, লৌহ, ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট, লবণ, কাগজ ও কফি—এই সকল শিল্পে দশমিক পদ্ধতি চালু করা হইবে।

সাধারণভাবে এমন কি এই সকল বিশেষ এলাকায় ও শিল্পে নূতন পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধনে যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না ঘটে সেজন্য বর্তমান পদ্ধতিও ১৯৬০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালু রাখা হইবে। এই দুই বৎসর দশমিক পদ্ধতি ও প্রচলিত পদ্ধতি উভয় পদ্ধতিই চালু থাকিবে। ইহাতে লোকে নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে। দুই বৎসর পরে নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে নূতন পদ্ধতির শুধু চলিতে থাকিবে। বর্তমান পদ্ধতি আর চলিবে না। ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর অঞ্চলে নূতন পদ্ধতির প্রসার করা হইবে এবং এজন্য দুই তিন বৎসর সময় দেওয়া হইবে। সেই সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় শিল্পে ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইবে। ১৯৬৯ সালে মধ্যে দেশে দেশে সম্পূর্ণরূপে দশমিক পদ্ধতি চালু হইয়া যাইবে। কাজেই আগামী ১লা অক্টোবর হইতে নির্দিষ্ট এলাকার দোকানদারগণ সেরের পরিবর্তে কিলোগ্রামে বা যে কোন প্রচলিত বাটখারায় খাদ্যশস্য, কৃষি, কয়লা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে পারিবেন। খুচরা কাপড় বিক্রয়াদি কাজ বর্তমানের মত গজের হিসাবে চলিতে থাকিবে। মাদ্রাজ, কেরল প্রভৃতি রাজ্যে খাদ্যশস্য পরিমাপের বর্তমান ব্যবস্থা ব্যাহত হইবে না।

দশমিক মুদ্রা—১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল দশমিক মুদ্রা প্রবর্তিত হয়। এতদিন বহু লোক এই মুদ্রা ব্যবহারে কিছুটা অভ্যস্ত হইয়াছে। কেহ কেহ এই মুদ্রা ব্যবহারে এতটা নিপুণ হইয়াছে যে, তাহারা কাহাকেও নয়া পয়সার ভাঙ্গানি দিলে তাহারা কিছু-না-কিছু লাভ করিবেই। দশমিক বাটখারা ও পরিমাপ প্রবর্তনের ফলে প্রথমত যে অসুবিধাই ঘটুক না কেন তাহা সত্ত্বেও লোকে অল্প সময়েই নূতন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হইবে এবং পরিবর্তনকাল শেষ হইলেই নূতন ব্যবস্থা সকলই পছন্দ করিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বড় বড় শিল্পের ক্ষেত্রে ১লা অক্টোবর হইতে কাঁচা উপকরণ ক্রয় ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ে দশমিক ইউনিট চালু হইবে। মূল্য ও পরিমাণ দশমিক ইউনিটে ব্যক্ত করা হইবে। কারখানা এবং সেগুলির মাল সরবরাহকারী ও ক্রেতাদের মধ্যে নূতন ব্যবস্থায় কারবার চলিবে। তাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় ব্যাহত হইবে না। পাট শিল্প ব্যবসায়ের বৎসর ১লা জুলাই আরম্ভ হয় বলিয়া উহাতে তিনমাস আগেই নূতন ব্যবস্থা চালু হইয়াছে—অর্থাৎ পাটকলের পাইকারী কারবারে গত ১লা জুলাই হইতে দশমিক ব্যবস্থা চালু হইয়াছে।

বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে নূতন ব্যবস্থা চালু করা হইবে। সরকারী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানে মালপত্র ও সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহের ক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে। ইণ্ডেন্ট ও টেণ্ডারের ক্ষেত্রে পরিমাণ মূল্য দশমিক ইউনিটে প্রকাশিত হইবে। এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার ন্যাশন্যাল দশমিক বাটখারা ও পরিমাপে মালপত্র বুক করিবেন। খনি ও ভূমি সমীক্ষা দশমিক পদ্ধতিতে চলিবে। কিন্তু বর্তমানের মানচিত্রগুলির সঙ্গে পরিবর্তন তালিকা দিয়া সেগুলি প্রকাশিত হইবে। সরকারী বিভাগের সংগৃহীত কারিগরি, পরিসংখ্যানিক, বৈজ্ঞানিক ও পণ্য ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য দশমিক ইউনিটে প্রকাশিত হইবে।

প্রস্তুতিমূলক কাজকর্ম—নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণ প্রস্তুতি-মূলক কাজকর্ম আরম্ভ করিয়াছেন। বাটখারা ও মাপ কি পরিমাণে তৈয়ারী করা যাইতে পারে তাহার হিসাব করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, এ বিষয়ে অসুবিধা ঘটিবে না। অনুমোদিত

নির্মাতাদিগকে রাজ্য সরকারগণ লাইসেন্স মঞ্জুর করিবেন। ওজন যন্ত্রগুলি দশমিক ইউনিটে নির্দেশ করা হইবে। নূতন ওজন ও পরিমাপ চালু করার আইনগুলি বিভিন্ন রাজ্য সরকার জারি করিয়াছেন বা করিতেছেন। যে সকল রাজ্যের ওজন ও পরিমাপ বিভাগ রহিয়াছে সে সকল রাজ্যের ঐ বিভাগের শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে এবং যে সব রাজ্যের ঐ বিভাগ নাই, সে সব রাজ্যে নূতন করিয়া ঐ বিভাগ গঠন করা হইতেছে। কর্মীদের শিক্ষণের কাজও অগ্রসর হইতেছে। ভারত দশমিক পদ্ধতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করার বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে এবং বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এই দুইটি বৃহৎ দেশ কেন দশমিক পদ্ধতি গ্রহণ করিবে না সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। গত একশত বৎসরে ৪৮টি দেশ দশমিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা কিন্তু নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনে অনুতপ্ত নয়।

দশমিক পদ্ধতি ঐক্যসাধনের শক্তি বিশেষ—শেষ পর্যন্ত দশমিক পদ্ধতি ভারতবাসীর ভাল লাগিবে এবং সকল শ্রেণীর লোকের বিশেষতঃ স্কুল-কলেজের তরুণদের সময় ও প্রচেষ্টা প্রচুর পরিমাণে বাঁচিয়া যাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা অপেক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হইল—একই ধরণের বাটখারা ও পরিমাপ প্রবর্তনের ফলে জাতীয় ঐক্য সাধনে বিশেষ সহায়তা হইবে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের বাটখারা ও পরিমাপ প্রচলিত থাকায় অনৈক্য দেখা দেয়। যখন কোন ভারতীয় নাগরিক অনবরত বিভিন্ন প্রকার বাটখারা ও পরিমাপের দিকে মনোনিবেশ না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভাবিতে মনন করিতে পারিবে তখন বুঝিতে হইবে যে, জাতীয় ঐক্য সাধনের পথে উত্তম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

রাজ্যসরকার ও নয়া ঋণপত্র

শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত

স্মরণ থাকতে পারে, গত বছর কেবলমাত্র বম্বে এবং মহীশূর সরকার কর্তৃক বাজার থেকে ঋণ সংগৃহীত হয়েছে। অন্য কোন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এইভাবে ঋণ সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করা হয়নি, যদিও বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করার ইচ্ছা কোন কোন রাজ্য সরকারের ছিল। এর প্রধান কারণ হল এই যে, গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার বাজার থেকে ঋণ না তোলার জন্য এঁদের অনুরোধ করেছিলেন। কেন কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকার অনুরোধ করেছিলেন সেটা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে চেয়েছেন, যেহেতু তাঁর নিজের তরফ থেকে সংগৃহীত ঋণের তুলনায় রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের জন্য কমপক্ষে শতকরা চার আনা চড়া সুদ না দিয়ে উপায় থাকেনা, যেহেতু বাজারে কেন্দ্রীয় ঋণের চাহিদা কমে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার গত বছর আরো একটা যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। রাজ্য সরকারকে যদি বাজার থেকে ঋণ তোলার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে হয়ত দেখা যাবে, কোন কোন রাজ্য সরকার তাঁর ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে জনসাধারণের উপর ঋণপত্র ক্রয় করার জন্য পরোক্ষভাবে চাপ দিতে থাকবেন। ফলে কোন কোন লোক সরকারী চাপের দরুণ এতবেশী ঋণপত্র ক্রয় করতে বাধ্য হবেন যেগুলো ক্রয় করার সামর্থ্য এঁদের নেই। এই ধরণের পরিস্থিতির কুফল অনিবার্য ভাবে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে দেখা যাবে। সমস্ত প্রকার সরকারী ঋণ পত্রের দর নিম্নমুখী হয়েছে এর কারণ খুব সুস্পষ্ট। যে সব ক্রেতা সরকারী চাপের দরুণ সাধ্যাতীত পরিমাণে ঋণপত্র ক্রয় করতে বাধ্য হবেন তাঁদের পক্ষে নগদ টাকার প্রয়োজন মিটাবার জন্য বাজারে ঋণপত্র বিক্রী না করে গত্যন্তর নেই। তাই কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেছিলেন, বাজার থেকে বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক ঋণ সংগ্রহের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

বিগত ১৭শে জুন তারিখে একটা বিজ্ঞপ্তি মারফৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ঘোষণা করেছেন, দশটি রাজ্য সরকার শতকরা ৪।০ টাকা সুদের মোট সাতচল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার নূতন ঋণপত্র বাজারে ছাড়তে পারবেন। রাজ্য দশটি হলো অন্ধ্রপ্রদেশ, বম্বে, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, এবং পশ্চিম বাংলা। বলা হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের পক্ষ থেকে ঋণ তোলা হবে পাঁচ কোটি টাকা, বম্বে তুলবেন দশ কোটি টাকা, কেরলের পক্ষ থেকে ঋণ তোলা হবে তিন কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশ ৩ কোটি টাকার নূতন ঋণপত্র বাজারে ছাড়বেন। মাদ্রাজ, মহীশূর এবং পশ্চিম বাংলা এই তিনটি রাজ্যের প্রত্যেকটি পাঁচ কোটি টাকা ঋণ তুলবেন। বাকী রইল উড়িষ্যা, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশ। এই তিনটি রাজ্য যথাক্রমে তিন কোটি, আড়াই কোটি, এবং সাত কোটি টাকার নূতন ঋণপত্র বাজারে ছাড়তে পারবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি রাজ্য ঋণপত্রের টাকা ১৯৭০ সালের ১৫ই জুলাই সমমূল্যে পরিশোধ করবেন। তবে বম্বে সরকারের ঋণপত্র সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার। আমরা দেখেছি, বম্বে সরকার মোট দশ কোটি টাকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়বেন। এই ঋণের সবটাই ১৯৭০ সালে পরিশোধ করা হবে না। এর কিছুটা পরিশোধ করা হবে ১৯৭১ সালে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের ১৫ই জুলাই থেকে সব ঋণ পত্রের বিক্রী শুরু হবার কথা। যদি প্রত্যেকটি ঋণ পত্রের মোট মূল্যের অনুমানিক নয়-পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় তাহলে ১৯৫৮ সালের ১৯শে জুলাই কিম্বা এরও আগে কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে ঋণপত্র বিক্রী বন্ধ করা যাবে। এছাড়া বিজ্ঞাপিত ঋণ পত্রের অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা দশ ভাগ পর্যন্ত বেশী সংগ্রহ করার ক্ষমতা সমস্ত রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ঋণ পত্রের উপর ১৯৫৮ সালের ১৫ই জুলাই থেকে সুদ দেওয়া হবে। তবে এই সুদের উপর আয়কর ধার্য করা হবে বলে জানা গেছে। নগদ কিম্বা চেকে ঋণ পত্রের বিক্রী মূল্য দেওয়া যাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বিজ্ঞপ্তির একটা অংশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। অর্থাৎ শতকরা তিন টাকা সুদের কেরল সরকারের (১৯৫৫-৫৮) কোচিন ঋণপত্র গুলো এবং বম্বে, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের (১৯৫৮) ঋণপত্র কেরল, বম্বে, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং উত্তর প্রদেশের নূতন ঋণ পত্রে সমমূল্যে রূপান্তরের জন্য গ্রহণ করা হবে।

আমরা আগেই বলেছি, পশ্চিম বাংলা পাঁচ কোটি টাকার নূতন ঋণপত্র যাহাতে ছাড়তে পারবেন। এই ঋণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে কয়েকটা উন্নয়নকার্যে মূলধনী ব্যয়খাতে খরচ করা হবে। বলা হয়েছে, উন্নয়ন কার্যগুলো দুর্গাপুর কোকওভেন, গ্যাসগ্রীড এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রচারিত প্রেসনোটে দেখা যায়, সরকার জনসাধারণকে বুঝাতে চেয়েছেন, যেসব পরিকল্পনায় মূলধনী ব্যয়খাতে পাঁচ কোটী টাকা খরচ করা হবে সেসব পরিকল্পনার প্রত্যেকটি ফলপ্রসূ। তাই রাজ্যসরকার পরিকল্পনাগুলো কার্যকরী করার জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। শোনা যাচ্ছে, কোক ওভেন তৈরীর কাজ নাকি প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। তাছাড়া এই মর্মে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, বর্তমান বছর শেষ হবার আগেই কোক উৎপাদন শুরু হবে। বিগত ১৫ই জুলাই তারিখে বম্বে থেকে প্রচারিত খবরে প্রকাশ, বম্বে, মহীশূর, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান এই পাঁচটি রাজ্যের মোট চব্বিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের ঋণপত্রের বিক্রী ঐ দিন বন্ধ হয়ে গেছে। মাদ্রাজ সরকারের ঋণপত্র নাকি সম্পূর্ণভাবে বিক্রীত হয়েছে এবং অন্য চারটি রাজ্য সরকারের ঋণপত্র নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী বিক্রীত হয়ে গেছে। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, বম্বে সরকারের ঋণপত্রের বিক্রী সকলের আগে শেষ হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৫ই জুলাই এর পর দিন পশ্চিম বাংলা, অন্ধ্র প্রদেশ, কেরালা এবং উত্তর প্রদেশ এই কয়েকটি রাজ্যের ঋণপত্রের বিক্রী বন্ধ হয়ে গেছে।

এবার রাজ্যসরকারগুলি ৫০ কোটি টাকার মত ঋণপত্র বিক্রী করেছেন। এতে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে পড়েছে। প্রথমতঃ বাজারে উদ্বৃত্ত টাকার অভাব নেই; দ্বিতীয়তঃ লোকে এখনও রক্ষণশীল নিরাপদ বিনিয়োগ নীতির পক্ষপাতী, তৃতীয়তঃ সরকার ও পরিকল্পনার প্রতি দেশবাসীর আস্থা হ্রাস পায়নি। সর্বশেষে বলা যায় যে আভ্যন্তরীণ উৎস অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে সঙ্কুচিত ক্ষেত্র নয়।

স্বাধীনতার এগার বৎসর পরে

শ্রীউমাপদ মজুমদার

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট আমরা পুরুষানুক্রমে স্মরণ করিব ও ঐ তারিখ হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের হিসাব-নিকাশও করিব। আগামী ১৫ই আগষ্টে ভারত স্বাধীন জীবনের সুদীর্ঘ এগার বৎসর পূর্ণ করিয়া বার বৎসরে পড়িবে। কোলাহল পূর্ণ ঘটনা বহুল এই এগার বৎসরের উত্থান-পতনের খতিয়ান প্রস্তুত করিতে বহু প্রকারের মতভেদ দেখা দিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; কিন্তু এই মতভেদের অন্তরালে শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর অনৈক্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে না, দুঃখের বিষয় বৎসরের সঞ্চয়িত পাপ, অধর্ম, নিয়ম লঙ্ঘন ও নীতি বিগর্হিত কার্যগুলিকে পুণ্যের আবরণে ঢাকিবার প্রচেষ্টায় মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতে আমরা বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাইব। কেহ বলিবেন যে এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভারত রাষ্ট্রীয় সংহতি অর্জন করা ছাড়াও অর্থনৈতিক সংগঠনে ও সমাজ-কল্যাণে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে, বহু ভাষা ও ধর্মে বিভক্ত এক বিশাল জনশক্তিকে নূতন জাতীয়বাদ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে একক ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল। ইহাদের উপস্থিতি না থাকিলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ প্রচার ও বিজাতীয় মনোভাবের দ্বারা ভারতীয় রাষ্ট্রগঠনের মৌলিক শক্তির এতদিনে অবসান হইত। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় ও জনশক্তির উন্মেষণে আজ ভারতের

যে অর্থনৈতিক শক্তির স্বতঃস্ফূরণ হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা আশা করিবেন যে অদূর ভবিষ্যতে জনতা অর্থনৈতিক দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া এমন এক মৌলিক সমাজ ব্যবস্থার অধিকারী হইবে যাহা ভারতের নিজস্ব ও দ্রুত উন্নতিশীল।

আমার কেহ কেহ স্বীকার করিবেন না যে ভারতে কোন প্রকারের সমাজ বিপ্লব প্রবর্তিত হইয়াছে। যে পরিবর্তন আজ দেখা যাইতেছে তাহা তাঁহাদের মতে শ্রেণী বৈষম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধন-তান্ত্রিক শোষণের শ্রীবৃদ্ধি। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের প্রণালীতে আদর্শ ও অনুশীলনের মধ্যে তীব্র সংঘাত তাঁহারা দেখিতে পাইবেন। তাঁহারা দেখিবেন যে শাসকগোষ্ঠী ও শাসন পদ্ধতি সমাজ বিবর্তনের সহজ ও স্বাভাবিক পথকে রুদ্ধ করিতেছে। তাঁহারা দেখিবেন সমাজসেবার নামে আত্ম-সেবা হইতেছে। বেকার উপশমের অর্থে আত্মীয় পোষণ, স্বজাতি ও স্বগোত্র (রাজনৈতিক) তোষণ। তাঁহারা দেখিবেন প্রেমের নামে হিংসার শতনাম গ্রহণ, আলোর নামে অন্ধকারের বিস্তৃতি, আর মুষ্টিমেয় ধনী মুনাফাদার, ব্যবসাদার ও বুদ্ধিজীবীদের হাতে বিশাল জনতার লাঞ্ছনা ও প্রবঞ্চনা।

যাহা হউক আমরা এই রাজনৈতিক তর্কে যোগদান না করিয়া নিরপেক্ষভাবে সমাজ কল্যাণের মান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। গ্রীক সভ্যতার সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা মনে করেন যে সমাজ প্রগতি ব্যষ্টি ও সমষ্টির উভয়েরই কল্যাণসাপেক্ষ। আধুনিক চিন্তা-নায়করা আরও পরিষ্কারভাবে সমাজ-কল্যাণের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কল্যাণময়ী রাষ্ট্রের বিবর্তন সমাজের সর্বস্তরে মানবতার দ্রুত প্রবর্তনের উপর নির্ভর করে। সমাজের স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গীন পুষ্টির মধ্য দিয়া নাগরিক জীবনের দৈহিক ও মানসিক পূর্ণ-বিকাশের সুযোগ যে রাজনৈতিক শক্তি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিটি নাগরিককে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত ও সমর্থ হয় সেই রাজনৈতিক শক্তিকে প্রগতিশীল ও অর্থনৈতিক শক্তিকে মানবধর্মী বলা হয়।

অতীতে বহুদেশ বিপ্লব ও সৃজনীশক্তির দ্বারা বহু ধন উপার্জন করিয়াছে। ইহাতে জাতীয় অর্থের সম্ভাবেশ বাড়িয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে

ইহাতে জনসাধারণ আরও শোষিত হইয়াছে ও তাহাদের ক্লেশ বাড়িয়াছে। শিল্প বিপ্লবের পর দীর্ঘ সময় মানুষের যে হৃদয়বিদারক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ইউরোপের কোটী কোটী শ্রমিক ও কৃষকের গৃহে নিত্যনৈমিত্তিক শুনিতে পাওয়া যাইত তাহা ধন উৎপাদন-সম্প্রসারণ ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেই উদ্ভব হইয়াছিল, আর তাহার কারণ ছিল ক্ষুধা, অকালমৃত্যু ও মহামারী। যাহারা না মরিয়া বাঁচিয়া থাকিত তাহাদের শীর্ণ, জীর্ণ, কধিরহীন দীর্ঘমেয়াদী কর্মশ্রান্ত অবস্থায় মৃমূর্ষু দেখিতে পাওয়া যাইত। কোঠরাগত প্রাণহীন দৃষ্টি তাহাদের অসহায় অবস্থারই কথা বলিয়া দিত।

কোন সে শক্তি যে শক্তি বৃদ্ধকে বুভুক্ষু রাখিয়াছিল, যুবকের অকালমৃত্যু আনিয়াছিল, অসহায় শিশুদের দীর্ঘ পরিশ্রমে জীবননাশ করিয়াছিল, লোভের বশীভূত হইয়া মানুষকে জড় উৎপাদনী সামগ্রীতে পরিণত করিয়াছিল, মানবহৃদয় হইতে প্রেম ধর্মকে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল ?

শত শত বৎসর পর আজও আমাদের সেই শক্তিকে জীবিত অবস্থায় দেখিতে হইতেছে। ইহা সেই অর্থনৈতিক শক্তি যাহা অগণিত নরনারীকে জাতীয় সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিতে চায়, যাহা উৎপাদনের সাফল্য মুনাফা সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়ে রাখে। আজ ধনতান্ত্রিক পাত্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যে গণতান্ত্রিক ককটেল আমরা পান করিতেছি তাহার রূপ, রস ও গন্ধ অবর্ণনীয় কিন্তু আমরা জানি যে তাহার মাদকতা গ্রামকে বন্যা, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে, নগরকে বীভৎস রসে ভাসাইয়া দিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ফুটপাতে নামাইয়াছে। ইহা ধাপ্পাবাজী, বেনামদারী, জাল জুয়াচুরীর প্রাচুর্য আনিয়াছে, ভেজাল খাদ্য ও ঔষধ প্রভৃতি বিক্রয় করিবার সুযোগ দিয়া অর্থ উপার্জনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাপক্ষলনে উদাসীন নয়। পাপক্ষলনের জন্য মন্দির নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে আর প্রয়োজনবোধে ইহজন্মের সুকৃতির ফললাভ করিতে সর্বশক্তিশালী রাজনৈতিক দলের তহবিলে অর্থপ্রদান করাইতে শিখাইয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা যাক।

ভারতকে এখনও শিল্পপ্রধান দেশ বলা যাইতে পারা যায় না। ইহা কৃষি প্রধান দেশ। এখনও শতকরা ৭০ জন ব্যক্তি জীবন ধারণের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। কৃষি ব্যাপকভাবে ভারতের সামাজিক জীবন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে আমরা শুধু জীবন ধারণ করি না উপরন্তু শিল্পের কাঁচামাল ইহা হইতে গ্রহণ করি, আর ইহারই উপর নির্ভর করিয়া শিল্পগঠনের জন্য বিদেশী মুদ্রা অর্জনের তোড়জোড় করি। বহুকাল হইতেই ভারতের কৃষি দ্রব্য বিদেশী বাজারে বিক্রয় হইতেছে ও আন্তর্জাতিক মূল্য বিপর্যয়ে ভারতীয় কৃষকের জীবনে পুনঃপুনঃ বিপর্যয় আনিতেছে। যাহা হউক কৃষি তার নিজের প্রভাবের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশিষ্ট স্থান পাইল। ঠিক করা হইল যে শিল্পগঠনে যে অতিরিক্ত খাদ্য ও কাঁচামালের প্রয়োজন তাহা কৃষিশক্তির উন্নতি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর তাহা ছাড়া মুদ্রাস্ফীতির অন্তরায় একমাত্র কৃষি সামগ্রীর অতিরিক্ত সমাবেশ প্রথম পরিকল্পনার এক তৃতীয়াংশ কৃষির জন্য ব্যয় করা হইল কিন্তু তাহার প্রতিদানে আমরা কি পাইলাম।

১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে National Development Councilএর Standing Committeeইর সভায় কৃষির অবস্থা বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃতিত হয়। ১৯৪৯ থেকে

১৯৫৯ সালের কৃষি-উন্নতির খতিয়ান দেখিয়া কমিটি চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা পর্যালোচনায় ভিতর দেখিতে পান যে প্রদেশের প্রগতি বৈষম্য ছাড়াও ফসল বৃদ্ধির পরিমাণ হতাশজনক। খাদ্য শস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করা দূরে থাকুক কৃষি অর্থনীতি গঠন সম্বন্ধীয় কিম্বা কার্য সম্বন্ধীয় কোন প্রকার বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

তাঁহারা আতঙ্কিত অবস্থায় আরও দেখিয়াছেন যে সেচজমি কিম্বা ভাল জমিতে পরিমাণমত ফসল ফলাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। কোটী কোটী টাকা খরচ করিয়া যে সেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার আংশিক ব্যবহার হইয়াছে। অল্পব্যয়ের সেচ ব্যবস্থা যাহা চাষী ও গ্রামের লোকের সাহায্যে সম্প্রসারণ করা যাইত তাহা আমলাতান্ত্রিক বেড়াজালে আবদ্ধ করিয়া বাড়িতে দেওয়া হয় নাই। জনশক্তির উপর বিশেষ আস্থা রাখা হয় নাই। বহুপ্রদেশে ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থার জন্য পুকুর, কূপ ও নলকূপ খনন করা হইয়াছিল কিন্তু সংস্কার ব্যতিরেকে অনুপযোগী হইয়া পড়িয়া আছে। ভাল বীজ যাহার উপর শস্য ফলন নির্ভর করে তাহা জন্মাইবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয় নাই। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ও অপব্যয়ের জন্য প্রয়োজন মত সারের ব্যবস্থা হয় নাই। যখন রাসায়নিক সারের অনটন দেখা গিয়াছিল তখন সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সবুজ সার প্রস্তুত করিবার আগ্রহ দেখা যায় নাই। গ্রামকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে গ্রামীন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল, তাহা সার্থকরূপে গড়িয়া তোলা হয় নাই। গ্রাম্যজীবনে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশু প্রয়োজন উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তাহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে গ্রামের উন্নতির জন্য চাষীদের জমি কিম্বা ঋণ দিয়া কি সাহায্য করা হইয়াছে? C. D. ও N. E. S সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি। জমির উপর হইতে জন চাপ হ্রাস করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে? দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্বল্পব্যয়ের সেচ ব্যবস্থা লক্ষ্য ৯ মিলিয়ন একর। এই সম্পর্কে Planning Commission বলেছেন "Against the second plan target of 9 millions acres for minor irrigation, which is itself well below the potential that could be achieved if the man power resources of each area could be effected brought into action, according to the data available works complete during the first two years (second plan) account for 3·5 million acres."

এই সম্পর্কে আরও বলা যাইতে পারে নূতন ৩৪৩টী বীজ কেন্দ্র ১৯৫৬সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিকল্পনার লক্ষ্য ৪১৮৫। দ্বিতীয় বৎসরে ১০২৪টি হইয়াছে। পরিকল্পনানুসারে ইহার সংখ্যা ১৪১৬টি হওয়ার কথা ছিল। আধুনিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান ব্যবহারের রেওয়াজ খুব বাড়িয়াছে, কারণ পরিসংখ্যান নির্ণয় পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিনিধিমূলক অল্প আয়তনকে বিশ্লেষণ করিয়া সামগ্রিক পরিস্থিতির নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু পরিসংখ্যান যদি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঙ্কলিত না হয়, তাহা হইলে পরিসংখ্যান ব্যবহার বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে; কারণ সত্যের সহিত অনুমানের মিল থাকে না। আমাদের দেশের পরিসংখ্যান সঙ্কলন সন্দেহের উপরে নয়। বহু প্রকার স্ববিরুদ্ধ পরিসংখ্যান একই বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণাগার হইতে পাইয়াছি। সুতরাং যদিও এই প্রবন্ধে আমরা বাস্তব নির্ণয়ের মান হিসাবে পরিসংখ্যান ব্যবহার করিব কিন্তু বিভ্রান্ত হইব না। জাতির উত্থান ও পতন তাহার ব্যবহারিক জীবনে, কর্মশক্তিতে, জীবনের উচ্ছ্বাসে, সৃজনী শক্তিতে

কাক নিয়ে প্রতিফলিত হয়। যাহারা ৬০কোটী চীনাবাসীর প্রাণখোলা হাসি দেখিয়াছেন, কর্মজীবনের শৃঙ্খলা ও ব্যস্ততা দেখিয়াছেন, উৎপাদনে মানুষের শক্তির ও প্রকৃতির দানের মিতব্যয়িতা দেখিয়াছেন, শিক্ষায়তনে অপরূপ শ্রী, মাধুর্য ও সুস্থ বালক বালিকা দেখিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে চীনের জীবন প্রবাহ কোন দিকে যাইতেছে তাহা বুঝিতে কি কষ্ট হয়? কিম্বা পশ্চিম জার্মানীর নরনারীর সহজজীবন, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য, উৎপাদনে কর্মব্যস্ততা ও উন্নততর জীবন যাপনের মান যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের কাছে কি কিছুই লুকোনো থাকে?

যাহা হউক আবার আমরা আমাদের দিকে তাকাই। নিম্নোক্ত তালিকা হইতে ভারতীয় কৃষি-শক্তির বর্তমান অবস্থা বুঝিতে পারিব।

	(কোটী একর)	(কোটী একর)
	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬
জমি	৮০·৬৩	৮০·৬৩
বন	১০·০০	১২·৫৪
কৃষি অযোগ্য	১১·৭৪	১১·৮২
গোচারণ ভূমি	১·৬৪	২·৮৩
ফলের গাছ	৪·২০	১·৩২
কৃষি উপযুক্ত কিন্তু অব্যবহারিত	৫·৬৭	৫·৪২
পোড়ো জমি	৫·২৫	৫·২৭
ফসলের জমি	২৯·৩৪	৩১·২৮
ফল ও ফসলের জমি	৩২·৫৯	৩৬·৩৩
একবারের বেশী যে জমি চাষ হয়	৩·২৫	৪·৩৫

সেচ ব্যবস্থা
(লক্ষ একর)

উৎপত্তি স্থান	১৯৫৭-৩৮	১৯৫৫-৫৬	বেড়েছে না কমেছে
খাল	১৯৮	২৩২	+৩৪
পুকুর	৮০	১০৫	+২৫
কূপ	১২৫	১৬৮	+৪৩
অন্যান্য উপায়ে	৬৪	৫৮	— ৬

উপরের তালিকা দুইটি দেখিলে আমরা সম্যক বুঝিতে পারি যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া সত্ত্বেও কৃষিশিল্প বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। এখানে ওখানে সামান্য পরিবর্তন ছাড়া ভূমি সংস্কার কিম্বা হাল চাষের উন্নতির ব্যাপারে কিম্বা গ্রাম্য অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। কিংবা বহুশস্যের জমি সমগ্র কর্ষিত জমির তুলনায় অনেক কম। উন্নত ধরণের জমি কর্ষণের নীতি আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন আছে। জলাশয় ও বাঁধ নির্মাণের কাজে প্রচুর ব্যয় সত্ত্বেও সেচ ব্যবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। ৩২ কোটি একর কর্ষিত জমির মধ্যে মাত্র সাড়ে পাঁচকোটী একরে সেচ ব্যবস্থা আছে। কে বলিতে পারে যে এই সেচব্যবস্থার কতখানি শাসনতান্ত্রিক অযোগ্যতায় নষ্ট হইতেছে। আমরা বৎসরের পর বৎসর শুনিতেছি যে চাষের সময়ে জমিতে সেচ জল ছাড়া হয় না। ময়ূরাক্ষী ও দামোদরের জল কি এ বৎসরও

চাষীদের ঠিক সময়ে, দেওয়া হইয়াছে না অলাভাবে চারা গাছগুলিকে শুকাইয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছে, নিজেদের অক্ষমতা ঢাকিতে এখন চাষীদের নানা আইনের ফাঁদে বাঁধিবার চেষ্টা চলিতেছে।

আবার দেখা যাচ্ছে কৃষিজমির শতকরা ৭৫ ভাগ খাতে উৎপাদন ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা বৎসরের পর বৎসর বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকার খাদ্য আমদানি করিতেছি।

খাদ্য আমদানি (হাজার টন)

বৎসর	চাউল	গম ও ময়দা	অন্যান্য	সর্বসমেত
১৯৭৮	৮৬৭	১৩১১	৬৬৩	২৮৪১
১৯৪১	৭৪৯	৩০১৫	২৬১	৪৭২৫
১৯১৪	৬০৩	১১৭	৮	৮০৮
১৯৫৭	৭৪০	২৮৪০	—	৩৫৭০

উপরোক্ত খাদ্যশস্যের আমদানি তালিকা ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে যদিও চাউল উৎপাদন ২০, ৯৬৪,০০০ টন হইতে ১৯৫৬ সালে, ২১,১৪২,০০০ টন হইয়াছে, গম ঐ সময়ে ৬,০৮৫,০০০ টন হইতে ৯,০৬৮,০০০ টন হইয়াছে ও সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন ৪২, ৮৮৮,০০০ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৭,২৫১,০০০ টন হইয়াছে তবুও ইহা পর্যাপ্ত নয়, উৎপাদনের হার স্থায়ী নয়। সেজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইতেছে। কৃষি প্রধান দেশ ভারত খাদ্যের জন্য পর নির্ভরশীল, মুষ্টি ভিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। কারণ সকল সময়ে আমাদের ক্রয় করিবারও ক্ষমতা নাই। স্বাধীনতার এগার বৎসর পরও কৃষি প্রকৃতির জুয়াখেলার আবদ্ধ।

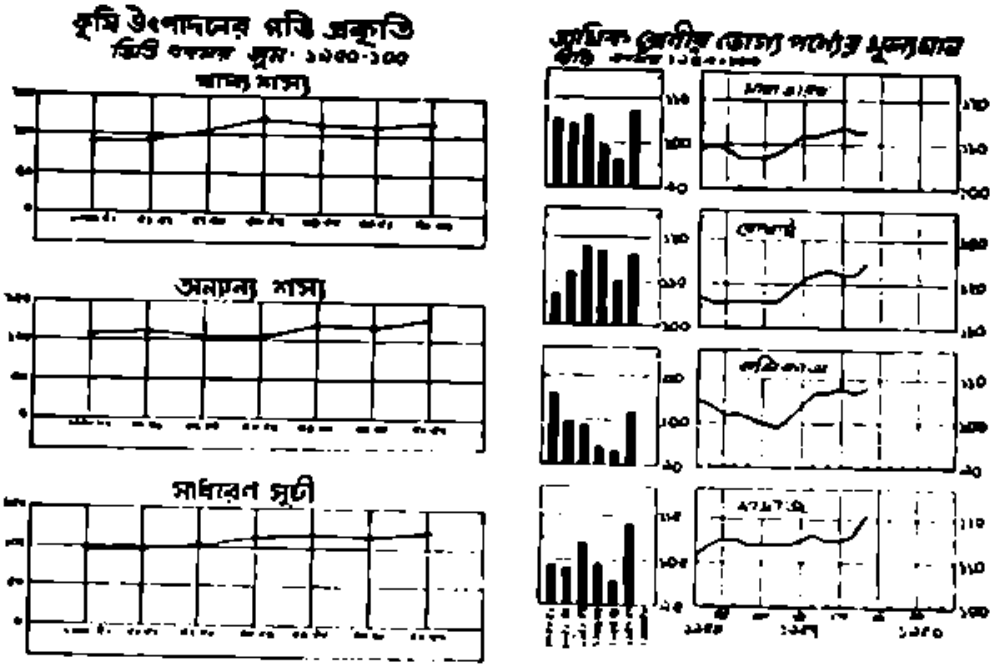

খাদ্য মূল্যের গতিবিধি খুবই চঞ্চল ও চঞ্চলা লক্ষ্মীর মতনই একস্থানে থাকিতে নারাজ। সাধারণ মূল্য তালিকা ১৯৪৫ সালের মধ্যভাগে ১৭.৬ বিন্দু কমিয়া যায় আবার ১৯৫৭ সালের মধ্য ভাগে ২৩ বিন্দু উপরে উঠে। শর্করা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য ১৯৫৩ সনের মধ্যভাগে শতকরা ৩৪ ভাগ কমিয়া যায় আবার ১৯৫৭ সালের মধ্যভাগে শতকরা ৫১ ভাগ বাড়িয়া যায়। আজ ১৯৫৮ সালের মধ্যভাগে

কতখানি বাড়িয়াছে তাহা না বলিলেও চলিবে। কারণ প্রতি মাসে মুদীর দোকানের হিসাব হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। খাদ্যদ্রব্য মূল্যের অস্থিরতা অর্থনীতির সকল বিষয়েই অনিষ্টকর। খাদ্যের অনটন লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সতর্ক হইবার চেষ্টা হইয়াছে। Planning Commission খাদ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য ধাপে ধাপে উচ্চ হইতে উচ্চতরে লইয়া গিয়াছেন। ১০ মিলিয়ন টন হইতে বাড়াইয়া ১৫·৫ মিলিয়ন টনে লইয়া গিয়াছেন। কৃষির জন্য ৩৭১ কোটী টাকা পাঁচ বৎসরে ব্যয় করা হইবে ২০০ কোটী টাকার সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী হইতে কৃষির জন্য আরও ৪৫ কোটী টাকা খরচ করা হইবে। ৩৭১ কোটি টাকার মধ্যে অকৃষি কার্য তালিকা বাদ দিলে কৃষি ক্ষেত্রে ১৭০ কোটী টাকা খরচ করা হইবে। কৃষির উন্নতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সংশোধিত ব্যয় তালিকায় কোন প্রকার পরিবর্তন করা হয় নাই।

দুঃখের বিষয়, ১৯৫৫-৫৬ সালে যখন খাদ্য উৎপাদন উচ্চস্তরে ছিল তখনও খাদ্য সঙ্কট বর্তমান ছিল। সঙ্কটময় পরিস্থিতি সরকারকে খাদ্য আমদানি করিতে বাধ্য করে। খাদ্যদ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি বন্ধ করিতে সরকারকে ৩২ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করিতে হয়। ১৯৫৫ সালে মাত্র ১৪ লক্ষ টন ও ১৯৫৪ সালে ৭ লক্ষ টন আমদানি করিতে হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে খাদ্য সঙ্কট ও মূল্যের উঠতি পড়তি ব্যাপারে ব্যবসাদারদের সহিত বহু প্রকারের শক্তিশালী ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট আছেন। অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য ইহা করা হয়। এত ঘনঘন উঠতি পড়তি হইতেছে যে ইহাতে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়িয়াছে। আজ এই সঙ্কট এত ব্যাপক হইয়াছে যে ভারতের বৃহত্তর অংশে অনাহার ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বাজারে যদিও মালের অভাব নাই কিন্তু মূল্য এত দ্রুত ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইতেছে যে সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে। মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে বন্টনের সমতা না থাকায় গরীব চাষী ও নিম্ন মধ্যবিত্তের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্তীকালে যে খাদ্য অনুসন্ধান কমিটি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাঁহারা কি বলেন নাই যে মুনাফাবাজী, সরকারী অকর্মণ্যতা ও অসাধু ব্যবহারে জনসাধারণের ক্লেশ বাড়িয়াছে? আমরা জানিতে পারি কি এই কমিটি যে মূল্য স্থিতিবান রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহার কি হইল? মূল্য ত বরাবর বাড়িয়াই চলিতেছে। পশ্চিমবাংলার একজন উপমন্ত্রী এই বিষয়ে তাঁর মৌলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে প্রথম পরিকল্পনায় ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রচুর সরকারী খরচ হওয়ায় অর্থাৎ ঘাটতি ব্যয়ের ফলে নোট চালু করায় বাংলায় সাধারণ মানুষের হাতে প্রচুর টাকা আসিয়াছে। এইজন্য গরীব ব্যক্তিরা মোটা চাউলের বদলে সরু চাউল খাইতে চাহিতেছে, দুগ্ধ প্রভৃতি বড়লোকী খাদ্যে নজর দিয়াছে আর আজ এইজন্যই খাদ্য সঙ্কট হইয়াছে। তাহারা যদি মোটা ভাত কাপড়ে সুখী হইত তাহা হইলে কোন সঙ্কট হইত না। এই উক্তি তিনি আইন সভায় করিয়াছিলেন। বিপক্ষ দল ইহাকে কতখানি গুরুত্ব দিয়াছিলেন তাহা জানিনা; কিন্তু এইরূপ উক্তি অজ্ঞানতা বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। ইহার ভিতর সত্যকে বিকৃত করিবার রাজনৈতিক প্যাঁচ আছে কারণ খাদ্য দপ্তরগুলি হামেসাই মনগড়া পরিসংখ্যান প্রস্তুত করিয়া দৈহিক ক্ষুধা উপশম না করিয়া সাধারণ বুদ্ধিকে মায়াজালে আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে।

বর্তমান কৃষি সঙ্কট অষ্টম শতাব্দীর শাসনতান্ত্রিক দুর্নীতি অপচয় ও শোষণের আধুনিক সংস্করণ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বৃটিশ সরকার কৃষক স্বার্থ পরিপন্থী সরকারী কৃষি-নীতির পরিণাম হাড়ে হাড়ে

বুঝিয়াছিলেন ও বেঙ্গল রেন্ট এ্যাক্ট, বেঙ্গল টেনান্সী এ্যাক্ট, মাদ্রাজ লাণ্ড এ্যাক্ট, ১৯২৮ ও ১৯২৯ সনের আইন প্রভৃতি চালু করিয়াছিলেন। তাহাতে অবশ্যই কৃষকের দুঃখের কিছুটা উপশম হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের অবস্থার অবনতি রোধ পায় নাই।

জমিদারী উচ্ছেদ ও অনুষংগিক ভূমি সংস্কারের কাজ পড়িয়াছিল। জমির মালিকানা ও রিলি-ব্যবস্থা মধ্যযুগের প্রেতাত্মার রূপে তখনও বিরাজ করিতেছিল। ভূমিসংস্কার ছাড়া কৃষি-উন্নতি হয় না। সুতরাং প্রথম পরিকল্পনার সূচনায় বলা হইয়াছে যে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক কাঠামো প্রস্তুত করিতে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিক মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে। বলা হইল কৃষি আইন এরূপভাবে পরিবর্তিত করা হইবে যাহাতে খাজনা কমিয়া যায়, চাষীর মালিকানা নিরাপদ হয়, জমিহীন চাষীরা নিজের জমি চাষ করিতে পারে। জমির মালিকানার উর্ধতম সীমানা নির্ধারিত করা হইবে। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-উৎপাদন করা ও গ্রামের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন সমবায় নীতিতে পুনর্গঠিত করা মনস্থ হইল। মধ্যস্বত্ব কিরূপভাবে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল :—

	লক্ষ একর	সমস্ত জমির অংশ
যে জমিতে মধ্যস্বত্ব ছিল	৩৪,৩৮	৪৩
যেখানে মধ্যস্বত্ব উঠাইয়া আইন করা হইয়াছে	৩২,২৩	৪০
যতখানি জায়গার মধ্য স্বত্ব উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে	৩০৬০	৩৮
যেখানে মধ্য স্বত্ব এখনও আছে	৩১৮	৫

কৃষকের মালিকানা নিরাপত্তা

	লক্ষ একর	সম্পূর্ণ জমির শতকরা
যেখানে কৃষকের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা আছে	৭৩০	৯
যেখানে আংশিক নিরাপত্তা আছে	২,৭৮৪	৩৪
যেখানে কৃষক অনায়াসেই ভূমিহীন হইতে পারে	১৯৩৮	২৬
যেখানে কোন নিরাপত্তা নেই	৯৯৭	১২

ভূমি সংসংস্কার আইনে জমির মালিকানার উর্ধতম সীমানা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম হইয়াছে ও দুই প্রকারে নির্ধারিত হইয়াছে। একটি বর্তমান মালিকানার, আর একটি ভবিষ্যৎ মালিকানার উপর।

ভবিষ্যৎ মালিকানার সীমানা

অন্ধ্র (হাইদ্রাবাদ)	১২ থেকে ১৮০ একর	মধ্য প্রদেশ	৪০ একর
আসাম	৫০ একর	পাঞ্জাব (পেপসু)	৩০ একর
বোম্বাই	১২ থেকে ৪৮ একর	উত্তর প্রদেশ	৩০ একর
দিল্লী	৩০ একর	পশ্চিম বাংলা	৫ একর
জম্মু ও কাশ্মীর	২২৮ একর		

বর্তমান মালিকানার সীমানা

অন্ধ্র	১৮ থেকে ২১০ একর	জম্মু ও কাশ্মীর	২২৮ ,,
আসাম	৫০ একর	পাঞ্জাব	৩০ ,,
হিমাচল	৩০ একর	পশ্চিম বাংলা	২৫ ,,

১৯৫৭সনের সেপ্টেম্বরমাসে N.D.E.S. এর যে সভা হয় তাহাতে ভূমি সংস্কারের নীতির পুনরায় উল্লেখ করা হয়; কারণ তখনও পর্যন্ত ভূমি সংস্কারকে চাষী স্বার্থ উপযোগী করা হয় নাই। অশোক মেহতা কমিটি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন In almost every state we are told that uncertainty about land reforms was affecting productive effort. The

announcment of intention to institute land reforms without setting up the proper machinery for implementation has deterred the big land holders from ownership in the improvement of land. At the same time this hesitancy of the big land holders is not compensated by greater interest on the part of the tenants because unless the tenants actually benefit from the implementation of the reform measures, they do not have either the will or the means to invest more in land. The development of land resources is therefore suffering. In our opinion the State Goverments should proceed expeditiously with enacting the necessary legislation for land reforms and what is more important following it up with effective implementation this should indeed contribute to the growth of agricultural production in the country."

ভূমিসংস্কারে বিভিন্ন প্রদেশ সরকারের আন্তরিকতার অভাব দেখা গিয়াছে। কৃষি উন্নতি ও কৃষকের স্বচ্ছলতার জন্য ভূমি সংস্কার করিবার প্রয়াস দুইটি প্রদেশ ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় নাই। বিলম্বিত কার্যসূচীর জন্যও আইন প্রবর্তনের অনর্থক বিলম্ব হওয়ায় বহু প্রদেশে বহু উটকা প্রজা ও ভাগচাষী উচ্ছেদ হইতেছে। গ্রাম্য কুচক্রের সহযোগে volunteer surrenders" নামে এক প্রকার মালিকানা সত্ব প্রত্যর্পন করান হইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার "Core" Projects স্থির করিবার সময় Mass scale "volunteer surrenders" বন্ধ করিবার কথা বলা হইয়াছে।

আসল কথা হইতেছে যে ভারতীয় কৃষির শতাব্দীর জড়তা এখনও যায় নাই। ঐতিহাসিক অবিচারে যাহা বৃটিশ শাসন ভারতীয় কৃষকদের উপর অন্যায় ভাবে আরোপ করিয়াছিল তাহা তথাকথিত ভূমি সংস্কারের দ্বারা বিনাশ হয় নাই। ভূমি সংস্কারের পরও সামন্তশক্তি ব্যবসা শ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া গ্রাম্যজীবনে প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে। ভূমি সংস্কার শতাব্দীর জড়তা ভাঙ্গিতে পারে নাই ও নূতন ছাঁচে পল্লী জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিতেছেনা। সেই পুরাতন দরিদ্র, সেই পুরাতন শোষণ দরিদ্র কৃষকের প্রতিসরকারী অবহেলা, বেশী ফসল ফলাইবার নাম করিয়া পল্লীর ধনীদের হাতে জমি তুলিয়া দেওয়া! এখনআছে বেনামদারী মামলা জালিয়াতি। নূতন হাওয়ার সাড়া ঐ ক্রটি বিচ্যুতিপূর্ণ অবহেলিত সমাজ জীবনে এখনও পাওয়া যায় না। ভূমি সংস্কার আইনে বহু প্রদেশে এখনও মালিকানা সীমানা নির্দেশ দেওয়া হয় নাই, পর্যাপ্ত কৃষিঋণের ব্যবস্থা হয় নাই, গ্রাম্য বেকারত্ব উপশম করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা হয় নাই। যাহা কিছু সুবিধা পরিকল্পনায় দেওয়া হইয়াছে তাহার বেশীর ভাগই ধনী চাষীরা কিম্বা ধনী মধ্যবিত্তরা পাইয়াছে।

দেখা গিয়াছে যে অনেক গ্রাম্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ত্রুটি পূর্ণ। পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার সময় দূরদৃষ্টি ও বিচার বিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয় নাই। নদী উপত্যকা পরিকল্পনায় জলাধারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিন্তু সে জল কিরূপে ব্যবহার হইবে তাহার ব্যবস্থা করা হয় নাই। জমির জলের ব্যবস্থা হইলে জমি কখন উন্নত ধরণের করার প্রয়োজন বিবেচনা করা হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনায় বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে ৫·৫৯ লক্ষ একর ও ৪·৬৪ লক্ষ একর জমির সেচের ব্যবস্থা হয় কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যবহার হইয়াছে মাত্র ২·৬৫ ও ২·২৩ একর। সুতরাং শতকরা ৫০ ভাগ জল ব্যবহার হয়নি। অশোক মেহতা কমিটি বলিয়াছেন "unless double cropping is introduced there is little prospect of additional

production from the Mayurakshi Project of the irrigation system of the D. V. C. in West Bengal while in many areas the fertility of the soil is satisfactory and what is lacking is irrigation. There are other areas where the newly iriirigated lands do not possess adequate fertility. সরকার কি সত্যই মনোযোগ সহকারে সমস্ত খুঁটিনাটি দেখিয়া কাজ করিতেছেন ? আবার অশোক মেহতা কমিটি বলিয়াছেন 'compiaints of delay and adulteration of seed are wide-spread. State Goverument should take adminiistrative active to ensure timely supplies of pure seeds"

সমিতিকে যদি ভূতে ধরে তাহা হইলে ভূত ছাড়াইবে কে ? ইহার পরে আসিতেছে সমাজ উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা। ইহা গ্রামোন্নতি পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার এক বিশেষ অস্ত্র। ইহা সরকারী ও বেসরকারী শক্তির মিলন ক্ষেত্র। প্রথম পরিকল্পনায় ১২০০ ব্লক (৭০০ সমাজ উন্নয়ন ও ৫০০ জাতীয় সম্প্রসারণ) তৈরী করিবার সঙ্কল্প লওয়া হয়। ৫২·৪ কোটি টাকা খরচ করিয়া ১২০০ ব্লক তৈয়ারী করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২০০ কোটি খরচের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইয়াছে।

খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটির পরই C. D আন্দোলনের কার্যাবলী পর্যালোচনা করিবার জন্য বলবন্ত রায় মেহটা কমিটি ১৯৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করে। এই কমিটি বলেন "One of the best successful aspects of the C. D & N. E. S work is its attempt to evoke popular initiative. We have found that few of the local bodies of a level higher than the panchayats have shown any enthusiasm or interest in the work & even the Panchayats have not come into the field to any appreciable extent. An attempt has been made to harness the local initiative through the formation of adhoc bodies mostly with nominated personnel and invariably advisory in character. These bodies have so far given no indication of durable strength nor the leadership necessary to provide the motive force for continuing the improvement of economic and social condition in rural areas".

এই কমিটি আরও বলিয়াছেন যে "For obvious reasons, economic development has to take precedence over welfare activities.....here we could point out that the tendency in the post war years has been to stress on the welfare activities more than the economic development activities. This is because the former is popular, easy of achievement and impress the casual observer."

সুখের বিষয় সরকার আগের চেয়ে বেশী সজাগ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। পুনরায় সরকার নূতন করিয়া কার্য তালিকা গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে পূর্ব দৃষ্টান্ত পুনরায় অনুসরণ

করা হইবে না। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি যে সরকারের অকৃতকার্যতার কারণ তাহাদের কার্যসূচী জনগণের মনে প্রেরণা জাগাইতে পারে নাই। চন্দন দধি-ফোঁটা ও মঙ্গল ঘটের সমাবেশ ইহা জাগাইতে পারে না। কেবল মাত্র আন্তরিকতা ইহার দীপশিখা প্রজ্বলিত করিতে পারে। নূতন স্বাধীনতার গন্ধে যেটুকু মাদকতা আসিয়াছিল দুর্নীতি, আত্মলোভ ও দুষ্টাচারের মধ্যে তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে। কে আবার দীপ শিখা জ্বালাইবে? ততদিন কি আমরা বাঁচিয়া থাকিব?

প্রাচ্যের কয়েকটী দেশে কৃষি সমবায় দ্বারা কৃষির উন্নতি প্রভৃত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে কৃষি সমবায় পদ্ধতি অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি ভারতীয় দল চীনে যান। তাঁহাদের মতে চীনের মত আমরা সমবায় প্রথায় প্রভূত উন্নতি করতে পারি। ১৯৫৪ সালে ২৬২টি কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষৎ মনে করেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩০০০ কৃষি সমবায় তৈয়ী হওয়া দরকার।

চীনের সহিত ভারতের অর্থনৈতিক বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। দুইটী দেশেই কৃষিপ্রধান ও উভয়েরই বিশাল জনশক্তি আছে। উভয়েই জল শক্তি ও খনিজ পদার্থে শক্তিশালী ও একই সময়ে দেশ গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলেই জানেন চীনে কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৯৪৯ সালে। ১৯৫৩ সালে ইহারা প্রথম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার সাফল্য এত ব্যাপকভাবে হইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চীন অসীম দুঃসাহসের পরিচয় দিতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প, শক্তি ও কৃষি উন্নয়ন এই পর্যায়ে লইয়া যাওয়া হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে চীন শিল্পে অতি অগ্রসর দেশ ইংল্যাণ্ড ও জাপানকে পরাভূত করিবে। স্থানান্তরে চীনের ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি আলোচনা করিব।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সাল (প্রথম পরিকল্পনা) পর্যন্ত ১৯৫২ সালের মূল্য অনুসারে কৃষিকার্যে শতকরা ২৩·৩ ভাগ বেশী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নূতন জীবনের আস্বাদ সারা চীনে এইরূপ ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে যে ১৯৫৭ সালে পরিকল্পনার লক্ষ্য অতিক্রম করিয়াছে এবং ১৯৫৮ সালে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার লক্ষ্য অনেক বেশী। চীনের কৃষি উন্নতির সাফল্যের কারণ হইতেছে যে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষি প্রতিষ্ঠান গুলিকে আয়তনে উপযুক্ত ও কৃষিকার্য পারদর্শী করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হয়নি; এমনকি, কৃষিকর্মে লিপ্ত চাষীদের জমি না দিয়া চাষ আবাদে জীবনধারণ করে না এরূপ ব্যক্তিদের জমির মালিকানা দেওয়া হইয়াছে; আর তাছাড়া ভারতের কৃষি ক্ষেত্রের আয়তন এত ক্ষুদ্র ও সংখ্যায় এত বেশী যে আর্থিক সাহায্য ও পদ্ধতির উন্নতির বেশী ভাগ জায়গায় সম্ভব হয়নি সুতরাং শস্যবৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রচেষ্টা ফলবতী করা যায়নি। দ্বিতীয়ত চীনে সমবায় সমিতির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি একত্রিত হওয়ায় প্রতিটি ক্ষেত্র আয়তনে বড় হয় ও আধুনিক প্রথায় চাষ করিবার সুযোগ পায়। দেখা গিয়াছে, যখনই এইরূপ সংস্থা তৈয়ারী করা হইয়াছে তখনই ২।১ বৎসরের মধ্যে ফসল পূর্বেকার অপেক্ষা ১০।২০ ভাগ বাড়িয়াছে। ১৯৫৭ সালের মধ্যে সমস্ত কৃষি শক্তির এক তৃতীয়াংশ সমবায় সমিতিতে যোগদান করিয়াছে।

প্রথমেই চীনা সরকার লাঙ্গলের উন্নতি করিয়াছিল। নানা রকমের উন্নত ধরণের লাঙল তাঁরা তৈয়ারী করাইলেন ও চাষীদের ব্যবহার করিতে দিলেন। ৫ বৎসরে ১,৮০০,০০০ Single

and Double Shared ploughs ও ৫০০,০০০ অন্যান্য ধরণের জন্ত টানা লাঙল তৈরী করিলেন। চাষীরা যখন ঐ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে লাগিল তখনই সারা দেশে ঐ যন্ত্রপাতি সারাইবার ও অংশ পরিবর্তনের ব্যবস্থা হইল। সাধারণ চাষীদের দ্বারা অবসর সময়ে বাঁধ ও জলাশয় প্রস্তুত করাইলেন। রাসায়নিক সার ছাড়াও যাহাতে সহজ প্রাপ্য দ্রব্য হইতে compost ও green manure করা যায় তার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করিলেন। এই ব্যবস্থা যাহাতে সফল হয় তাহার জন্ত বহু প্রকারের কৌশল করিলেন। কারণ, কৃষিক্ষেত্র প্রশস্ত ও তাহাতে বহু প্রকারের যান্ত্রিক কাজ করে। কৃষি-প্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নূতন জমিতে চাষ আবাদ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ভাল বীজের জন্ত গ্রামে গ্রামে ব্যবস্থা হইল। সারা চীনের জমিতে যাহাতে আইল দেওয়া হয় ও আইলের উপর ঘাস লাগান হয় তাহার ব্যবস্থা হইল—যাহাতে জলের প্লাবনে উপর ভূমির সারাংশ ধুইয়া না যায়। ইহা ছাড়া ট্র্যাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হইল। ১৯৬২ সালের মধ্যে চীন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াইতে মনস্থ করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় লগ্নী করিয়াছে কৃষিতে সরকার ৩৮১০ মিলিয়ন ইয়েন (৭,৬২৯ কোটী টাকা) আর কৃষকরা করিয়াছে ১২০০০ মিলিয়ন ইয়েন (২৪০০ কোটী টাকা)। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লগ্নীর টাকা আরও অনেক বাড়িয়াছে। ১৯৬২ সালে রাসায়নিক সারের কল ৫ থেকে ৭ মিলিয়ন টন সার প্রস্তুত করিবে। এই সময়ের মধ্যে আরও দুইটি ট্র্যাক্টর ফ্যাক্টরী প্রস্তুত কার্য আরম্ভ করিবে। গত ৫ বৎসরে চীনের খাদ্য শস্ত ৬৫৯.৯ মিলিয়ন টন হইয়াছে। পরিকল্পনার লক্ষ্যের চেয়ে মিলিয়ন বেশী ১২.৫ সমস্ত খাদ্য দ্রব্য লইলে উৎপাদন বৎসরে শতকরা ১০.৭ ভাগ বাড়িয়াছে। তুলা শতকরা ৫ ভাগ বাড়িয়াছে, তামাক ৩০ ভাগ বাদাম ২১ ভাগ, ইক্ষু ২০.৮, পাট ১৭২। পোড়াজমি কৃষি-উপযুক্ত করা হইয়াছে ৪.১ মিলিয়ন হেকটর, সেচ ব্যবস্থা ১৩ মিলিয়ন হেকটর, বহু ফসলের জমি ৯.৩ মিলিয়ন হেকটর। চাষীদের সরকারী ঋণ দেওয়া হইয়াছে ১১৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড ষ্টার্লিং অর্থাৎ দেড় হাজার কোটি টাকার বেশী। বর্তমান বৎসরের গমের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী হইয়াছে। ৩২ মিলিয়ন টন হইয়াছে। চীন গম উৎপাদনে পৃথিবীর সেরা উৎপাদনকারী আমেরিকাকে হারিয়ে দিল। ১৯৪৯ সালে চীন উৎপাদন করিয়াছে ১৩ মিলিয়ন টন, আমেরিকা ৩৩১ মিলিয়ন টন, ১৯৫৩ সালে চীন ১৮ মিলিয়ন টন আমেরিকা ৩১,১৯৫৭ সালে চীন ২৩ মিলিয়ন টন আমেরিকা ২৫ মিলিয়ন টন। এই বৎসর ১৯৫৭ সালের চেয়ে ৫২ ভাগ বেশী। বসন্তের ফসল না লইয়াই ৩২ মিলিয়ন টন হইয়াছে।

ভারতীয় জল সম্পদ—ভারতের জল সম্পদ নির্ণয় করা হইয়াছে ১৩,৫৬০ লক্ষ একর ফিট। ইহার মধ্যে ৪,৫০০ লক্ষ একর ফিট ব্যবহার করা যাইতে পারে। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত জল সম্পদের শতকরা ৬.৫ ভাগ ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহা ১৩ ভাগে পরিণত হইবে। সেচকার্য করিবার আর বিশেষ সুবিধা নাই। সেইজন্ত সেচকার্যের জন্ত বর্ষাকালের অতিরিক্ত জল সঞ্চয় করিয়া গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। উচ্চভূমিতে যেখানে নদীর জলের ব্যবস্থা করা যাইবে না সেখানে মাটির তলার জল ব্যবহার করিতে হইবে। সেইজন্ত পুকুর নলকূপ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিরাট জলশক্তির ব্যবহার করিবার জন্ত কয়েকটি নদী উপত্যকা পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই সকল সেচ ব্যবস্থা ছাড়াও বন্যানিয়ন্ত্রণ ও জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করিতেছে। ইহা ছাড়া উহারা জলযানের উন্নতি, মাছের চাষ ও পানীয় জলের ব্যবস্থাও করিয়াছে। এই সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্ত সরকার

প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় একতৃতীয়াংশে টাকা খরচ করিয়াছেন। কত অপব্যবহার ও অমিতব্যয় হইয়াছে তার হিসাব অবশ্য নাই। সরকার মনে করেন ১৯৫০ বৎসরে সেচ ব্যবস্থা দ্বিগুণ হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় ৩০০টি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছিল তাহাতে প্রায় ২২ মিলিয়ন একর জমি সেচ ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভাকড়া নাঙ্গাল—ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ উপত্যকা পরিকল্পনা ৭৪০ ফিট উচ্চ বাঁধের সহিত ৬৫০ মাইল লম্বা খাল লইয়া ইহা আধুনিক শিল্পের গৌরবময় অবদান। ১৯৪৬-১৯৫৭ সালে ১৫ লক্ষ একর জমি ভাকড়া খালের জল আবাদের জন্য পাইয়াছে। ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হইবার পর ইহা হইতে ৩০ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা হইবে। ইহার কার্য পুরাদমে চলিলে খাদ্যশস্য ৪·৫ লক্ষ টন, তুলা ৫.৯ লক্ষ বেল, ইক্ষু ১·৫ লক্ষ টন ডাইল ০·৩ টন ও তৈল বীজের উৎপাদন বাড়িবে। ইহার কার্য এখনও চলিতেছে ও আগামী বৎসরে শেষ হইবে বলিয়া আশাকরা যাইতেছে।
হীরাকুদ—এই পরিকল্পনায় মহানদীর জল কৃষি ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হইবে। ইহাতে ৬·৭ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। প্রধান বাঁধ ১৫,৭৩৮ গজ লম্বা। ইহার দুইদিকে তের মাইল লম্বা পরিখা ১৯৬০ সালে ইহার কার্য শেষ হইবে।

দামোদর—ইহাতে চারিটি জলাশয় নির্মাণ করা হইয়াছে তিলাইয়া, কোনার মাইথন ও পাঞ্চেত। ইহার সহিত জল তড়িৎ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা আছে। ২২৯১ ফিট লম্বা ২৮ ফিট উচ্চ। দুর্গাপুর ব্যারেজ ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা ১০·২৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করিবার ব্যবস্থা করিবে। ইহার খাল খননের কার্য ১৯৫৯ সালে সম্পূর্ণ হইবে।

তুঙ্গভদ্রা—অন্ধ্র ও মহীশূর সরকার ইহার কার্য আরম্ভ করেন, ৭৯৪২ ফুট লম্বা ও ১৬২ ফুট উচ্চ বাঁধ তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার কার্য এখনও চলিতেছে। কোণী নদীর ব্যারেজ ও খাল প্রস্তুতের কার্য চলিতেছে। ইহা ছাড়া চম্বল, নাগার্জুন, সাগর, রিহাণ্ড, ভদ্রা, কাকড়াপাড়া মাচকুণ্ড, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি পরিকল্পনার কাজ হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ৪০ লক্ষ একর জমিতে সেচের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১·৫ কোটি একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা হইবে আশা করা যায়। এই সকল প্রকার পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হইলে ১৯৬১ সালের মোট ১৮·৮৮ কোটি একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা হইবে। এই দশ বৎসরে শতকরা ৭৩ ভাগ বেশী সেচ ব্যবস্থা হইবে।

পরিকল্পনার নাম	মোট খরচ (লক্ষ টাকা)	জলসেচ একর (•••)
ভাকড়া	১৭০,০২	৩৬,০৪
দামোদর	১০৫,৩৮	১০,২৬
হীরাকুদ	৮৫, ৭০	২২,৬৭
চম্বল	৪৮,০৩	১১,০০
তুঙ্গভদ্রা	৩০,৩৬	৮৩০
ময়ূরাক্ষী	১৬,১১	৭২০
তুঙ্গভদ্রা	২৫,২২	২৩৪
কোণী	৪৪,৫৯	১৩,৯৭
নাগার্জুন	৮৬,৫৭	২০,৬০
কাকড়াপাড়া	১১,৬৬	৬৫২,০

শিল্প—১৯৫৩ সালের শিল্প আদমসুমারী হইতে আমরা জানিতে পারি যে সর্বশুদ্ধ ভারতে ৭,১০৪টি সমিতিভুক্ত ফ্যাক্টরী আছে। তাহার মধ্যে ৬,৩৯২টি ৭২৮·৭ কোটী টাকা লগ্নী করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৩২৪ কোটী Fixed Capital ও ৪০৩·৮ কোটী Working Capital. সর্বসমেত এই সকল সংস্থাতে ১৪,৭৭৭৯ ব্যক্তি কাজ করে। উৎপাদনের মূল্য ১,১২৩ কোটী টাকা। কোম্পানী আইন শাসন বিভাগ হইতে আমরা জানিয়াছি যে ৩২৪টি কোম্পানী ১৯৫৩ সালে ৩৩ কোটী টাকা লাভ করিয়াছে। পূর্বেকার বৎসরে ২৪·৬০ কোটী টাকা লাভ করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালের লাভের হার অনুসারে ১৯১ বিল্ বাড়িয়াছে ও ২৯১ হইয়াছে। ঐ সালে পাট কলে ৩২৬·২, কাপড় ৩৭৯·৪, চা ৩৯১·৪, চিনি ৪১৯·৮, কাগজ ৫১২·৭ লৌহ ও ইস্পাত ১৭৯·৪, কয়লা ৪৫·৪ ও সিমেন্ট ২৭৯·০ বিল্ বেশী লাভ হইয়াছিল।

সরকারের শিল্পনীতি ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতির বিবৃতিতে, বাৎসরিক বাজেটে ও সর্বশেষে ১৯৫৬ সালের ঘোষণার মধ্য দিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নীতিকে মিশ্র (খিঁচুরী নয়) অর্থনীতি বলা হয়। অর্থনীতির গঠন প্রণালীকে সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সমাজতান্ত্রিক গঠন প্রণালীর নমুনা এখনও আমরা পাই নাই। সাধারণভাবে যাহা বুঝিতে পারিতেছি তাহা এই যে সরকারী শিল্প গঠনের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, কর্তৃত্বের বৃদ্ধি ও সম্ভবতঃ বেসরকারী শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াসকেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলা হইয়াছে। ফল, বন্টনব্যবস্থার বৈষম্য-লক্ষণ করিলে ইহাকে কি বলা যাইতে পারে তাহা এখনও জানা যায় নাই। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীডেবর গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত নির্মাণ না করিয়াই গান্ধীজির মত বাংচিত আরম্ভ করিয়াছেন। গান্ধীজীর হৃদয় পরিবর্তনের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া জানা যায় নাই। গান্ধীজীর বিনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি প্রবর্তনের তিনি সহায়ক নন, গান্ধীজীর সামাজিক ন্যায় বিচারের সহিত তিনি অনেকদিন সম্পর্ক ছাড়িয়াছেন। তবুও তিনি গান্ধীজীর বাণী উচ্চারণ করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি আজ ১১ বৎসরে যে সামাজিক আবেষ্টন তৈয়ারী হইয়াছে তাহাতে বহু প্রকার সমাজ উন্নয়ন ব্লক গঠন করিলেও সমাজ পরিবর্তনের মনোভাব অতি অল্প কয়েকজনের মধ্যে আছে। তাঁহাদের বেশী সময় রাজনীতিতে অপাংক্তেয় করিয়া রাখা হইয়াছে। সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার গোড়ার দিকে সমষ্টি স্বার্থের কর্তব্যের কথা মনে রাখিত কিন্তু আজ নেতাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া "যে যাহার করিয়া নাও" পথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে শ্রীডেবর শিল্পপতিদের জাতীয় সম্পদের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। জনগণ, আর ভয়ের কারণ নাই তোমাদের সম্পদ তোমাদের অছিরা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যদি চাকুরী অভাবে কিম্বা অতিরিক্ত মূল্যের জন্য খাদ্যাভাবে তোমাদের স্ত্রী-পুত্র মারা যায় কিম্বা তোমাদেরও মৃত্যু হয়, কিছু ভাবিও না। শ্রীডেবর বলিয়াছেন তোমাদের জাতীয় সম্পদ অছিদের হাতে নির্বিঘ্নে আছে।

সরকারী শিল্পনীতিতে সমস্ত শিল্পকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম বিভাগের শিল্প যথা যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম, প্রতিরোধ সামগ্রী, এ্যাটমের তড়িৎ, লৌহ ইস্পাত, কাট ফোরজিং ইস্পাত ফ্যাক্টরী, খনির কাজের জন্য বড় বড় কলকব্জা, মেশিন টুলস্, ইলেক্ট্রিক প্ল্যান্ট, লিনগাইট, খনিজ তৈল, আয়রণ-ওর, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোম, জিপসাম, সালফার, স্বর্ণ, হীরা, তামা, দস্তা, টিন, উড়োজাহাজ, আকাশযান, রেলপথ, জাহাজ তৈয়ারী, টেলিফোন, টেলিফোনের তার, বেতারের সাজ সরঞ্জাম ও তড়িৎ উৎপাদন প্রভৃতি সংরক্ষিত শিল্প বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় সূচীর শিল্পগুলিতে সরকার বেসরকারী শিল্পপতিদের সাহায্য গ্রহণ করিবে। সার, ফেরোএ্যালয়, এ্যালুমুনিয়াম, ঔষধ কৃত্রিম রবার প্রভৃতি দ্বিতীয় সূচীতে আছে।

দেশ বিভাগের পর সবচেয়ে বড় সমস্যা হইয়াছিল খাদ্য ও কাঁচামালের অভাব। সেইকারণে প্রথম পরিকল্পনায় সমুদয় লগ্নী মূলধনের মাত্র ৮ ভাগ শিল্প ও খনি উন্নয়নের জন্য ব্যবহার হয়। বেসরকারী পরিবর্ধন ও সম্প্রসারণের জন্য মোট খরচ করা হইয়াছিল ২৩০ কোটী টাকা। এই পরিকল্পনায় স্থায়ী কারখানাগুলিকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করিবার যে কর্মসূচী লওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। এই খাতে ২৩০ কোটী টাকার মধ্যে মাত্র ১০৫ কোটী টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। শিল্প সম্প্রসারণের জন্য ৩২৭ কোটীর মধ্যে মোট ব্যয় করা হইয়াছিল ২৯৩ কোটী টাকা। লৌহ, ইস্পাত, এ্যালুমুনিয়াম, মেসিন টুল শিল্পে কম টাকা লগ্নী করা হইয়াছিল। বৈদ্যুতিক, কাপড়, চিনি, কাগজ শিল্পে বেশী লগ্নী করা হইয়াছিল। কতকগুলি শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছিল, কতকগুলি পৌঁছায় নাই। যে সব নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে নাম করা যাইতে পারে।— Staple fibre, cellulose, acetate filament, calcium carbide, hydrogen peroxide, rare earth compound, caustic soda, amonium cloride, penicillin D. D. T., newsprint, carding engines, automatic looms, steel wire ropes, jute spinning frames, deep well turbine pumps, motors, transformers.

	প্রস্তাবিত লগ্নী	প্রকৃত লগ্নী (কোটি টাকায়)
মেটালারজিক্যাল শিল্প	৮৫·০	৬১·০
খনিজ তৈল পরিশোধন	৬৭·০	৪৫·০
রাসায়নিক	২৬·০	২৭·০
ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৩·০	৪৭·০
কাপড়	৯·০	২০·০
চিনি	০·১	৫·০
রেয়ন	১৬·৫	৪·০
সিমেন্ট	১৭·৭	১৭·৫
কাগজ	৭·৪	১২·০
বিদ্যুৎ	১৬·০	৩২·৬
অন্যান্য	৩২·৩	১৮·৯
	৩২৭·০	২৯৩·০

উপরের তালিকা হইতে আমরা বেশী বুঝিতে পারিতেছি যে লগ্নী ব্যাপারে নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করা হয় নাই। যাহার ফলে চিনি ও কাপড় শিল্প অভ্যন্তরীণ বাজারের অভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতি করিয়া বিদেশী বাজার খুঁজিতেছে। সুখের বিষয় শিল্প উৎপাদন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে। ১৯৫১ সালকে base year করিলে ১৯৫৭ সালে সাধারণ শিল্প উৎপাদন সূচী হইয়াছে ১৬৮·১, সুতরাং এই সময়ে সাধারণভাবে উৎপাদন ৬৮ ভাগ বাড়িয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ব্যবস্থায় মোট তিনটি ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করা হইতেছে। তিনটি ফ্যাক্টরী তৈয়ারী করিতে মোট ৩৫০ কোটী খরচ হইবে। অবশ্য আরও বেশী হইতে পারে।

কারণ ইহার আগে অনেকবার মূল হিসাব বদলান হইয়াছে। সরকারী কারখানায় ১৯৬০—৬১ সালে মোট ২০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চিত্তরঞ্জন লোকোমোটি ফ্যাক্টরীতে ইস্পাত ফাউণ্ড্রি বসান হইবে। Heavy Electrical & industrial machine প্রস্তুত করা হইবে। তদ্ভিন্ন রূপালে একটি ফ্যাক্টরী তৈরী হইয়াছে। ১৯৬০ সালের মধ্যে কিছু কিছু দ্রব্য ওখানে প্রস্তুত হইবে। রাশিয়ানদের সহযোগিতায় heavy machine bulding plant, coal miniining machinery plant ও optical glass কারখানা খোলা হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পে মোট ১০২৪ কোটী টাকা ব্যয় করিবার কথা আছে। সরকারী শিল্পে ৫২৪ বেসরকারী শিল্পে ৫০৫ কোটী টাকা। সরকারী শিল্পে—লৌহ ইস্পাত ৩৫০ কোটী টাকা, সার ৩১ কোটী, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ২০ কোটী, লিনগাইট ৫২ কোটী, জাহাজ নির্মাণ ১৮ কোটী টাকা। জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন কাপড় ও পাট কলগুলিকে আধুনিক ছাঁচে পুর্নগঠন করিতে সাহায্য করিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে শিল্প-প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা—আরও লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করা, নাইট্রোজন সার তৈরী বৃদ্ধি করা। এ্যালুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, রং প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি করা। পাট ও কাপড় প্রভৃতি শিল্পকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পে মোট ব্যয়ের বিভিন্ন শিল্পের অংশ

		শতাংশ
খনি কার্য	৫০২·৫	৪৯·১
ইঞ্জিনিয়ারিং	১৫০·০	১৩·৭
রাসায়নিক	১৩২·০	১২·০
সিমেণ্ট প্রভৃতি	৯৩·০	৮·৫
পেট্রোল পরিশোধন	১০·০	·৯
কাগজ	৫৪·০	৫·০
চিনি	৫১·০	৪·৭
কাপড়, পাট, উল প্রভৃতি	৩৬·৩	৩·৩
রেয়ন প্রভৃতি	২৪·০	২·২
অন্যান্য	৪১·৫	৩·৪

শিল্প উৎপাদনের গতি

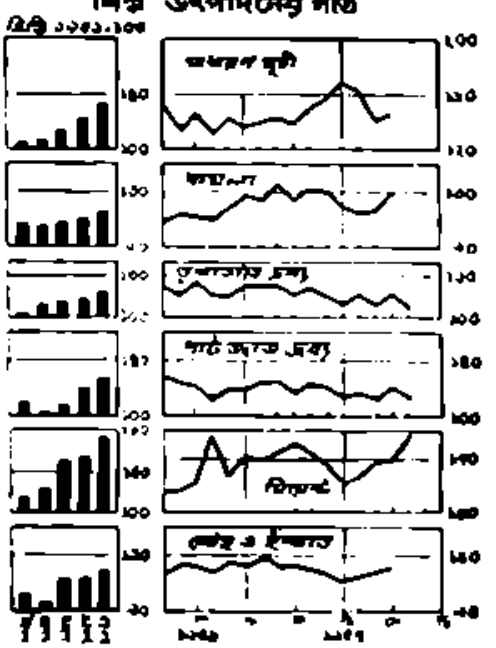

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সংস্থা

ভারতীয় অর্থনীতি হইতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে বাদ দেওয়া যায় না। ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা হইতে অন্তত পক্ষে ২ কোটি মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করে। তাঁত শিল্পে ন্যূনপক্ষে ৫০ লক্ষ ব্যক্তি কার্য করে। এই সকল ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প সংস্থাগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য প্রদেশ সরকার দায়ী। কেন্দ্রীয় ও সরকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বিধান করিতেছেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই সকল শিল্পকে ৩·৩ কোটী টাকা ঋণ ও ১·১ কোটী টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ৫৫টী কুটির শিল্প পল্লী গঠন করিবার জন্য ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার মধ্যে ১০টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ১৫ কোটী টাকা খরচ হইবে। যন্ত্রকৌশল শিক্ষা দেবার ভারও কেন্দ্রীয় সরকার লইয়াছেন।

জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা সরকার ও রেলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা লইয়া ক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে দেয় এবং যাহাতে ঐ সকল সংস্থাগুলি ঐ তালিকাভুক্ত মাল সরবরাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে। এই প্রতিষ্ঠান ধারে মেসিন সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে সরকার এই সকল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে ৩·৪ কোটি টাকার মাল ক্রয় করিয়াছেন। প্রথম পরিকল্পনায় এই শিল্পের জন্য মোট ৩৩·৬ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২০০ কোটি টাকা খরচ করা হইবে।

অর্থ ও রাজস্ব—প্রথম পরিকল্পনার শেষের দুই বৎসরে ঘাটতি পূরণের জন্য নোট ছাড়ার হার বাড়িয় দিয়াছিল। ইহাতে দ্রব্যমূল্য বাড়িতে থাকে। ১৯৫৫ সালে যে মাসে মূল্যসূচী ছিল ৮৯ বিন্দু, ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ৯৮ হয় কিন্তু ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তরতর করিয়া উঠিয়া যায় ১০৮ বিন্দুতে। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়েই বহির্বাণিজ্যের ঘাটতিও বাড়িয়া যায়। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫৭ সনের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত Current accountএ ঘাটতি হইয়াছিল ৫৯১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভিত্তি একটি দুঃসাহসিক সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে সাধারণ লোকের হাতে অনেক পয়সা আছে, বিদেশ হইতে প্রচুর ঋণ পাওয়া যাইবে। প্রয়োজনমত খাদ্য উৎপাদন দেশে হইবে, জনসাধারণের জীবন ধারনের মান এত উচ্চে আছে যে তাহা নীচে নামান যাইবে। এ সকলই যে কল্পনাপ্রসূত চিন্তা সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে বেশ বোঝা গিয়াছিল যে খাদ্য উৎপাদন ও শিল্পের গতি নীচে দিকে নামিয়া আসিতেছে। ১৯৫৩ সাল হইতে ১৯৫৬ পর্যন্ত জাতীয় আয় ১১৬ হইতে ১২০ কোটি টাকা আসিয়াছিল। পরিকল্পনার শেষের দুই বৎসরের লগ্নী আগের তুলনায় দ্বিগুণ। ১৯৫১ ১৯৫৩ সালে জনসাধারণের হাতের টাকার ২১৪ কোটি টাকা কমাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু ১৯৫৩ সালের শেষার্ধ হইতে উহা বাড়িতে থাকে। ১৯৫৩ সালে ২৯ কোটি টাকা, ১৯৫৪ সালে ১২৭ কোটি ও ১৯৫৫ সালে ২৩৪ কোটি বাড়ান হয়; সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভ হইতেই বাজারের উপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ ছিল। পর পর দুই বৎসরের (১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে) ৭০২ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়, আর ১৯৫৮ সালের আরও ২১৫ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয়ের কর্মসূচী মূল্য বৃদ্ধির চাপকে আরও বাড়াইয়াছে। ফলে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য মহার্ঘ হইয়াছে ও দ্রব্য প্রস্তুতের খরচ বাড়িয়াছে, শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভবনা কমিয়াছে। এই ভাবে খাদ্যদ্রব্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব প্রভৃতি পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য কার্যকরী করা দূরের কথা উহা বাগালের বাহিরের চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় পরিকল্পনা কমিশন দেখিলেন যে মূল্য বৃদ্ধি যে হারে হইয়াছে তাহাতে যদি লক্ষ্য একই রাখিতে হয় তাহা হইলে লগ্নীর টাকা বৃদ্ধি করিতে হইবে। কমিশন আর লগ্নীর টাকা বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন না। সরকার একটি 'Core" Projects এর তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

ব্যয়বরাদ্দের পরিবর্তিত তালিকা (কোটি টাকায়)

	প্রস্তাবিত ব্যয় প্রথম	শতকরা	পরিবর্তিত বরাদ্দ	শতকরা
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	৫৬৮	১১·৮	৫৬৮	১১৮

সেচ ও বিদ্যুৎ	২১৩	১৯·০	৮১০	১৭·৯
কুটির শিল্প	২০০	৪·২	২০০	৪·২
শিল্প ও খনিজ	৬৯০	১৪·৪	৮৮০	১৮·৪
যানবাহন	১৩৮৫	২৮·৯	১৩৪৫	২৮·০
সমাজ সেবা	৯৪৫	১৯·০	৮৬৩	১৮·০
অন্যান্য	৯৯	২·০	৮৪	১·৭

পরিবর্তিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে শিল্প ও খনি খাতে ১৯০ কোটী টাকা বেশী দেওয়া হইয়াছে। সেচ ও বিদ্যুতের খাত হইতে ৪৩ কোটী কমান হইয়াছে। ৪০ কোটী যানবাহন, ৮২ কোটী সমাজ সেবা ও ১৪ কোটী অন্যান্য খাতে কমান হইয়াছে। কৃষি ও সিঁড়ির জন্য খরচ কমান হয় নাই।

পরিকল্পনার খরচ প্রথম দুই বৎসর কিরূপ খরচ হইয়াছে

(কোটী টাকায়)

খরচ	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	মোট
	৬৩৫	৬৫৪	১৪৯৬

বিভিন্ন সূত্রে অর্থ সংগ্রহ

	১৯৫৬-৫৭		১৯৫৭-৫৮		মোট		
	কেন্দ্র	প্রদেশ	কেন্দ্র	প্রদেশ	কেন্দ্র	প্রদেশ	মোট
বাজেট	১৪০	—	৯৫	৫৫	২৩৫	৫৫	২৮৯
রেল	৩৪	—	৪৫	—	৭৯	—	৭৯
ঋণ	৭৮	৬৩	৬৮	৪	১৪৬	৬৭	২১৩
স্বল্প সঞ্চয়	৪০	১৯	১৫	৪০	৫৫	৫৯	১১৪
ঋণ	১১	৩	৭২	৫৭			
মোট	২৮১	৭৮	১৪১	১৪৬			৬৫৬
বিদেশী সাহায্য	৩৮		১০০				১৩৮
ঘাটতি	২০৮		৪৬৪				৭০২
					মোট		১৪৯৬

১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ সরকার একত্রিত হইয়া ৬০৫ কোটী লগ্নী করিয়াছে। এই টাকার মধ্যে ৩৫৯ কোটী টাকা পাওয়া গিয়াছে বাজেটের বাড়তি ঋণ ও স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনায়। ৩৮ কোটী টাকা বিদেশে থেকে পাওয়া গিয়াছে আর ২০৮ কোটী ঘাটতি পূরণে পাওয়া গিয়াছে। ১৯৫৬ সালে প্রদেশ সরকারদের বাজেটে ১ কোটী টাকার মত ঘাটতি হয়। প্রদেশ সরকার পরিকল্পনার জন্য মোট ৭৮ কোটী দেয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে লগ্নী বাড়িয়া ৮৯১ কোটী হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করিয়াছে ৫০০ কোটী ও প্রদেশ সরকারগুলি ৩৯১ কোটী। এই বৎসরে প্রদেশ সরকারদের বাজেটের চলতি হিসাব হইতে ৫৫ কোটী ও কেন্দ্রীয় সরকারের ১৫০ কোটী। এই সালে প্রদেশ সরকার মাত্র ৪ কোটী টাকার ঋণ গ্রহণে সমর্থ হয় কিন্তু স্বল্প সঞ্চয়ের জোগাড় প্রদেশ সরকারদের বাড়িয়া ৪০ কোটীতে আসে। কেন্দ্রীয় সরকারের কমিয়া ১৫ কোটীতে দাঁড়ায়। ঘোর ঘড়ি খাড়া, আর খাড়া ঘড়ি ঘোড় আর কি। ১৯৫৭ সালে কর ভার বৃদ্ধি হয় কিন্তু বাজেট তহবিল হইতে ১৯৫৬ সালের তুলনায় ৬২ কোটী কম পাওয়া যায়। এ বৎসরের

বিদেশী সাহায্য ৬২ কোটী বাড়িয়া যায়। আবার ঘোর বড়ি খাড়া প্রভৃতি বাজেট মিলাইতে ডেফিসিট ফিনান্স ৪৬৪ কোটী টাকা। গত বৎসরের তুলনায় ২২৬ কোটী টাকা বেশী।

১৯৫৮-৫৯ সালে মোট ১০০০ কোটী টাকা পরিকল্পনার কাজে ব্যয় হইবে। ইহার মধ্যে ৪৪৮ কোটী টাকা আসিবে আভ্যন্তরীন উৎস হইতে, ৩২৫ কোটী টাকা বিদেশী সাহায্য ও ২২৭ কোটী টাকা নূতন নোট চালু করিয়া। এখন দেখা যাইবে পরিকল্পনার তিন বৎসরে সর্বসাকুল্যে ২৪৫৬ কোটী টাকা খরচ করা হইবে। তাহা হইলে পরে দুই বৎসর ২৩৪৭ কোটী টাকা করিতে হইবে। সুতরাং পরিকল্পনার প্রায় ৪০ ভাগ শেষের দুই বৎসরে করা হইবে। প্রথম তিন বৎসর আভ্যন্তরীন উপায় হইতে পাওয়া গিয়াছে ১৮০ কোটী টাকা, আর বিদেশী ঋণ ও ঘাটতি পূরণে ১৩৪৫ কোটী টাকা। ইহাই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে আমাদের দুর্বলতা কোথায়?

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সুরু হইতেই বোঝা গিয়াছিল যে কর কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন। Taxation Enquiry Commision এর মন্তব্য অনুসারে ১৯৫৬ সাল হইতে কর ব্যবস্থার পরিবর্তন সুরু হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে দেখাইয়া করভার দৈর্ঘে ও গভীরতায় উভয় দিকেই বাড়িয়াছে। এই বৎসর নূতন কর প্রবর্তনের জন্য ১০৭ কোটী টাকা বেশী পাওয়ার কথা হয়। কিন্তু Wealth tax বা সম্পত্তি কর কমাইয়া দেওয়ায় উহা ৮৫ কোটী টাকায় নামিয়া আসে। ১৯৫৮ সালে যদিও Gift tax, Estate duty সংশোধন ও সিমেন্টের উপর উচ্চহারে কর বসান হয়। তবুও চা, পাট ও বস্ত্র শিল্পের করভার কমাইয়া দেওয়ায় বাড়তি কর খুব বেশী হইবে না। নূতন করের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৪ বৎসরে মোট ৭২৫ কোটি টাকা বাড়তি তুলিতে চাহিতেছেন। এই হিসাব পরিকল্পনার বিবেচিত অঙ্ক হইতে ৫০০ কোটি টাকা বেশী। প্রদেশ সরকারও অতিরিক্ত করের সাহায্যে ১৭৩ কোটি টাকা তুলিতে চাহিতেছেন। প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলিয়া ৮৯৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর তুলিতেছেন। সুতরাং এই তহবিল হইতে ৪০০ কোটি টাকার ঘাটতি পূরণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই অতিরিক্ত কর বাবদের টাকা বেশীর ভাগ চলতি খরচে খরচ হইয়া যাইবে। খাদ্য সাহায্য প্রদেশ সরকারকে অতিরিক্ত কর অংশ দেওয়ায় প্রতিরোধ খরচা বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি খরচ বাড়িতেছে। সুতরাং অতিরিক্ত করভারে জনসাধারণের কোন লাভ হইল না কারণ পরিকল্পনার ৪০০ কোটি টাকা ঘাটতি রহিয়াই গেল। লগ্নী বিষয়ে প্রদেশ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে ডুবাইয়াছেন। বাড়তি করের অংশ লইয়াও আশানুরূপ লগ্নী করিতে পারেননি। প্রথম দুই বৎসর ৮৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করার কথা ছিল। কিন্তু লগ্নীকার লগ্নী মাত্র ৬৫৪ কোটী টাকা।

বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি ১৯৫৬ সালে এপ্রিল হইতে ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেড় বৎসরে ৫৯১ কোটী টাকা। আর ১৯৫৭ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত ২৩০ কোটী টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিদেশী মুদ্রা তহবিল হইতে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৮ সালের মার্চ পর্য্যন্ত ৪১৯ কোটী খরচ করা হইয়াছে। I. M. F. থেকে ঋণ করা হইয়াছে ২৫ কোটী। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু থেকে বিদেশী ও সাহায্য ৬৭৯ কোটী টাকার বিদেশী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সরকার মনে করেন পরিকল্পনা সময়ে বিদেশী মুদ্রা ঘাটতি ১১০০ কোটী হইতে ১৭০০ কোটী হইবে।

ভবিষ্যতে বৈদেশিক মুদ্রার কি ব্যবস্থা হইবে তাহা ঠিক না হওয়ায়, বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় core project অনুযায়ী হইবে। core project অর্থে ইস্পাত কারখানা, কয়লার খনি, রেল, বন্দর ও কয়েকটি তড়িৎ কেন্দ্র। যাহা পাওয়ার আশা আছে তাহা ছাড়াও এই core prejectএর জন্য ২৬২ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা জোগাড় করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি গত তিন বৎসরের কার্যক্রম ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করে তাহা হইলে আরও ২ বৎসরে ১৮০৪ কোটি টাকা ঐরূপ ব্যবস্থায় পাওয়া যাইবে এবং ২০৪৪ কোটি নয়। বাজেটের চলতি হিসাবে ৩২০ কোটি, রেল ১২১, শুল্ক বন্দর সকল প্রভৃতি ৪৪০ বৈদেশিক সাহায্য ৯০০টাকা কোটি ঘাটতি পূরণ ২৮৩কোটি টাকা। ঘাটতি পূরণ ১২০০ কোটির বেশী করিলে সরকার ঠেলা সামলাইতে পারিবেন না। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসর ৭০২ কোটি টাকার ঘাটতি পূরণ করা হইয়াছিল তখন মুদ্রাস্ফীতি সেরূপ হয় নাই কারণ তখন আমদানি ঘাটতি পূরণ করিতে সঞ্চিত ষ্টার্লিং হইতে খরচ করা হইয়াছিল। সে উপায় আর নাই। সেজন্য Planning commisson মনে করেন যে কোন উপায়েই হউক আরও ২৫০ কোটি তুলিয়া ন্যূনপক্ষে ৪৫০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা করিতেই হইবে।

		(কোটী টাকা)	
		প্রথম পরিকল্পনা	সংশোধিত	ঘাটতি বাজেটের আকারে সংশোধিত
১.	কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	৫৬৮	৫৬৮	৫১০
২.	সেচ তড়িৎ	৯১৩	৪৯০	৪২০
৩.	কুটির শিল্প	২০০	২০০	১৯০
৪.	শিল্প ও খনি	৬৯০	৮৮০	৭৯০
৫.	যানবাহন	১৩৮৫	১৩১৫	১৩৪০
৬.	সমাজ সেবা	২৪৪	৮৬৩	৮১০
৭.	অন্যান্য	২৯	৮৪	৭০

চীনের প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে "We must centre our main efforts on 694 above norm industrial coustruction projects the core of which are the 156 projects to be designed with the help of the Soviet union" চীন প্রথম পরিকল্পনায় মোট ১৬,৩৪০ মিলিয়ন ইয়েন (১৪,৩২৮ কোটী টাকার বেশী) লগ্নী করা হয়।

	(শতাংশে)		
শিল্প	৪০·৯	শিল্প	১৮·৬
কৃষি	৮·০	সমাজ উন্নয়ন	২·৮
যানবাহন	১১·৭	চলতি মূলধন	৯·০
ব্যবসা	২·৮	অন্যান্য	৬·২

শিল্পের লগ্নী (শতাংশ)

ভারী শিল্প	২৪·৪	ভূসংক্রান্ত	০·৮
কয়লা	২৫·৫	বাড়ী তৈয়ারী	২·৬
মেশিন তৈয়ারী	২৬·০	স্থানীয় শিল্প	৭·১
কাপড় কল	৪·৪	অন্যান্য	৬·৬
হাল্কা শিল্প	২·৬		

চীন সরকার প্রথম পরিকল্পনার শিল্পের উৎপাদন ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ২৮০৩ ভাগ বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প লইয়াছিলেন ও ঐ সময়ের মধ্যে লক্ষের বেশী উৎপাদন করিয়াছেন এই সময়ের মধ্যে রেলের ভাড়া ১০১ ভাগ আর যাত্রী ৪৯০৪ ভাগ অভ্যন্তরীন মালবাহী জাহাজ ৩২১০৪ ভাগ, কুলবাহী জাহাজ ১৯০০৪ মোটরের রাস্তা ৩৭৩০৪ ভাগ আকাশযান ২১৮০৪ ভাগ।

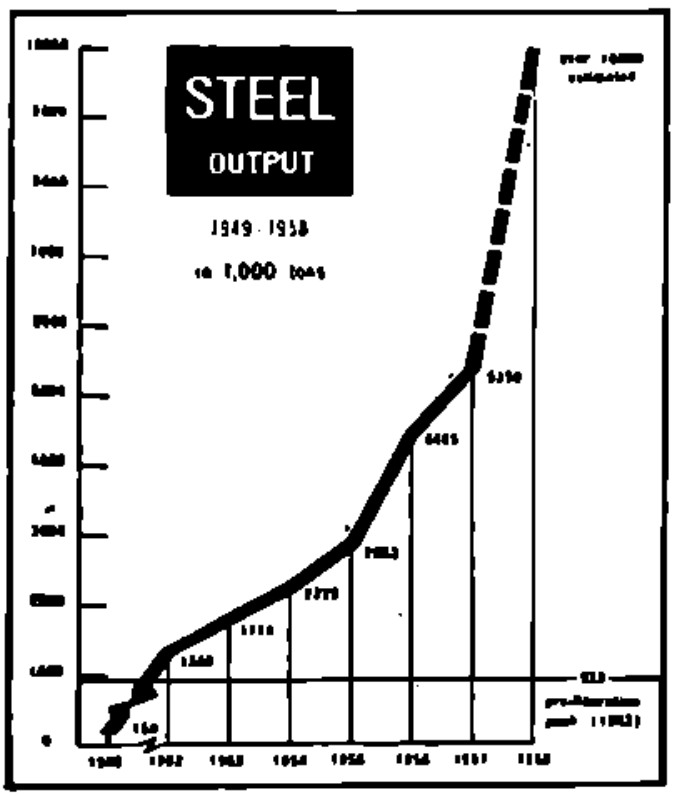

চীনের ইস্পাত উৎপাদন

চীনের ইস্পাত ও কারিগরী শিল্প বৃদ্ধি চমকপ্রদরূপে হইয়াছে। ভারতের অনেক ব্যবসায়ীর বলিতেছেন যে চীনাদের কারিগরি বুদ্ধি এত প্রখর যে তাহারা যে কোন মেশিন একবার দেখিলেই নিজেরা প্রস্তুত করিতে পারে। গত দিল্লীর Industries Fairএ চীনের তাঁবু বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহাদের তাঁবুর আকাশচুম্বী ক্রেণ তাঁহাদের ভয় ঘোষণা করিতেছিল।

চীনের ইস্পাত বৃদ্ধির হার বৎসরে গড়ে ৩১০৭ ভাগ। ইস্পাত শিল্পের এইরূপ দ্রুত উন্নতি কোথাও দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে চীন ১০ মিলিয়ন টন ইস্পাত প্রস্তুত করিতেছে। গত বৎসরের তুলনায় ৯০ ভাগ বেশী। পরের বৎসর ২০ মিলিয়ন টন হইবার আশা রাখে। বৃটেনের মত দেশে খুব উচ্চহারে উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে শতকরা ৪ ভাগ হয়। চীনের ইস্পাত উৎপাদনের ধরণ স্বতন্ত্র। ইহার অনেক ছোট ও মাঝারী ধরণের ইস্পাত প্রস্তুত করিবার সংস্থা আছে। এই সকল সংস্থারও উৎপাদন শক্তি বাড়ান হইতেছে। চলতি বৎসরে ১০০০০ হাজারের বেশী blast furnace নির্মাণ করা হইয়াছে। তাহাদের উৎপাদন শক্তি ২০মিলিয়ন টন।

ইস্পাত প্রস্তুত করিবার জন্য ২০০শর বেশী মাঝারী ও ছোট Besemer converters (৫ থেকে ১২ টন পর্যন্ত) নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহাদের ইস্পাত প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা ১০ মিলিয়ন টন। চেকিয়াং, শানসি, শানটুং ও শিকিংএর কারখানাগুলি কাজ আরম্ভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া বড় বড় আধুনিক ইস্পাত ফ্যাক্টরী নির্মাণ করা হইতেছে। আনশান লৌহ ও ইস্পাত ফ্যাক্টরীর সম্প্রসারণ কাজ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নুহান লৌহও ইস্পাত ফ্যাক্টরীর প্রথম ১,৩৮৬ কিউবিক মিটার ব্লাষ্ট আয়রন এই বৎসরের অক্টোবর হইতে ইস্পাত উৎপাদন সুরু করিবে। দ্বিতীয় কারবনেস, পালান কারখানা, রোলিং মিল প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। মধ্য মঙ্গোলিয়ার

পেটাই লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় ১৪১৩ cubic metre blast furnace বসান হইতেছে; আগামী বৎসরে উৎপাদন সুরু হইবে। এই তিনটি কারখানার প্রত্যেকটিতে ৩ মিলিয়ন ইস্পাত প্রস্তুত হইবে। চীন ১৯৫৩ সালে পৃথিবীর ইস্পাত উৎপাদনে ১৭টি দেশের পরে ছিল, ১৯৫৭ সালে ৮টি দেশের পরে আছে ও ১৯৫৯ সালে আশা করিতেছে ৬টি দেশের পরে থাকিবে ও ইতালী ও বেলজিয়ামকে উৎপাদনে পরাস্ত করিবে।

আর বেশী কথা চীনের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে লেখার প্রয়োজন চীনের এই চমকপ্রদ উন্নতির কার্য দ্বারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা চীনের এই আশাতীত সাফল্যের কারণ নিশ্চয় খুঁজিব। কারণ আমাদের সাফল্যের হার ইহার অনেক কম। গতানুগতিকভাবে অনেকে বলিবেন গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে ঢিমে-তেতালায় অমিতব্যয়ের ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় সুতরাং বাধা দিলে চলিবেনা। কিন্তু দেশ তাঁহাদের কথা শুনিবেনা কারণ রাজনীতির উপরে অর্থনৈতিক সমস্যা। পরিকল্পনার সাফল্যের মধ্যে দেশগঠন ও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। চীনের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছে তাহার কারণ পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্নধারার সামঞ্জস্য ছিল ও সমস্ত কর্মক্ষেত্রেই সাফল্যের জন্য একযোগে চেষ্টা চলিয়াছে। কৃষি, শিল্প, যানবাহন, রাস্তা হাস-পাতাল, বিদ্যালয়, সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই উন্নতির জন্য পরিশ্রম করা হইয়াছে। জনশক্তিকে প্রয়োজন ও ঔচিত্যের মানদণ্ডে বিচার করিয়া ও অপচয় নিবারণ করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রয়োজনের ছাপ শুধু জনসাধারণের মনের উপর দেওয়া হয়নি তাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের সঙ্গে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে প্রতি স্তরে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অসীম মনোবল ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রেরণা দেখা গিয়াছে। অধ্যবসায় ও সংগঠনকারী নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা বড় বড় পরিকল্পনা করিতেছে বলিয়া কিম্বা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতেছে বলিয়া ছোট ছোট উপায়গুলিকে অবহেলা করে নাই। এই অবহেলা শুধু আমরা কৃষি, সেচব্যবস্থা কিম্বা তড়িৎ উৎপাদনে দেখিতে পাই তা নয়, এমন কি ইস্পাত শিল্পেও দেখিতে পায় না। ছোট ছোট ইস্পাত কারখানায় যেখানে শ্রমিকরা উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পায় নাই তাহারা স্থানীয় সহজপ্রাপ্য দ্রব্য অভিনব উপায়ে ব্যবহার করিয়াছে। তাহাতে পদ্ধতির উন্নতি হয়নি কিন্তু উৎপাদন বাড়িয়াছে। কৃষি ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বিবেচনার সহিত স্থানীয় সহজপ্রাপ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবহারে পরিকল্পনার অনেক জটিল সমস্যা সহজ হইয়া গিয়াছে। চীনের কার্যপদ্ধতির মধ্যে অপচয় দেখা যায় না উপরন্তু জনশক্তির উদ্ভাস এত তীব্র যে শুধু প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের হার নির্ধারিত হারকে অতিক্রম করে নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচীতে এক দুর্লভ আত্ম বিশ্বাস ও জাতীয় গর্ব আনিয়া দিয়াছে। চাষী জমির মালিক হইয়াছে। মধ্যবিত্ত চাকুরী পাইয়াছে। শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক জীবনের অধিকারী হইয়াছে। যাহাদের লইয়া দেশ গঠন করিতে পারা যায়, তাহারা আবার দেশের মালিক হইল। তার পুনর্গঠনের মধ্যে সামাজিক জীবনে নিরাপত্তা লাভের আনন্দ চীনের কর্মজীবনে সহজেই দেখা যায়।

চীনের এই উজ্জ্বল গৌরবময় সাফল্যের নিকট আমাদের কি কিছুই শিক্ষার নাই? জাতি গঠন বোধ সকল জাতিরই আছে ও বৈশিষ্ট্য থাকাও অসম্ভব নয়; কারণ বৈশিষ্ট্যের অভাব হইলে একটি

প্রাচীন সভ্যতা ভারতে জন্মাইতে পারিত না ও পারিলেও বাঁচিয়া থাকিত না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা বলিব যাকল মানুষই একটি বিরাট জাতির অংশ। গঠন কার্যে পরিকল্পনার আয়তন কিংবা রাজকোষের অর্থের ব্যবস্থা যত বড়ই হউক না কেন, ইহাদের [illegible] তার চেয়ে বড় হইতেছে নেতৃত্বের কর্ম কুশলতা ও অনুপ্রেরণা শক্তি আর সমগ্র জাতির অটুট কর্মযোগ, আদর্শ নিষ্ঠা ও কর্মপরায়ণতা। জাতির এখন সঙ্কটে থাকিলে পদ্ধতির ভুল আপনা হইতে সংশোধিত হয়। তাই টনে জাতির দেশ গঠনের একাগ্রতা দেখিয়া আমাদের শুধু মুগ্ধ হইলেই চলিবে না, ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে হইবে। মানুষের পুনর্গঠন করিতে পারিলেই সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব, কারণ মানুষের আদর্শ ও গঠন শক্তি সমাজ পুনর্গঠনের একমাত্র অস্ত্র।

— — —

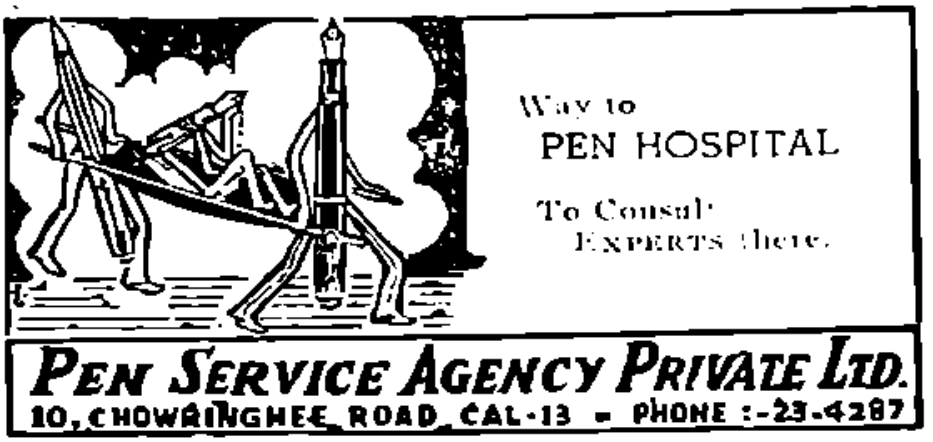

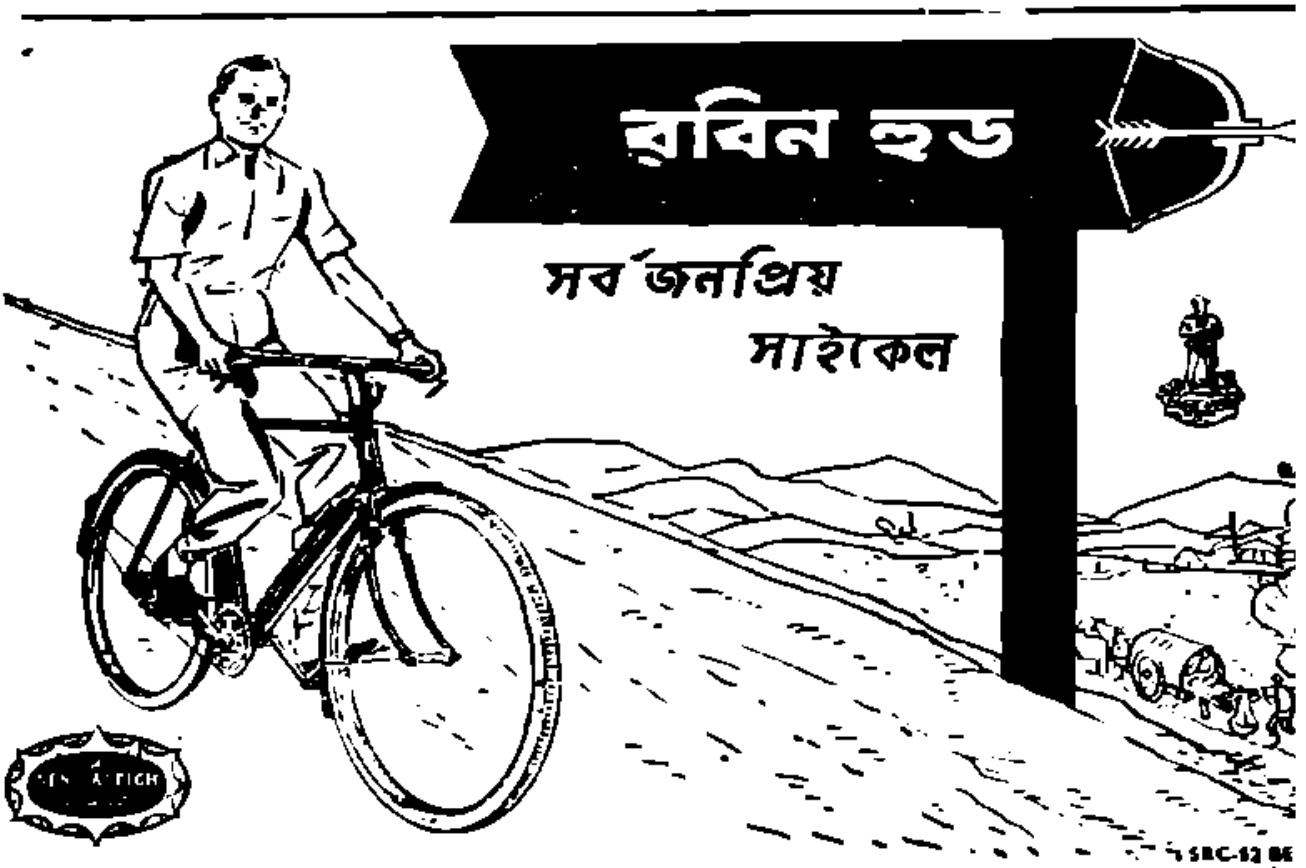

BUY

BEST SELECTED "B" GRADE COAL

FROM

SAMLA COLLIERIES LTD.

&

JAIPURIA KAJORA COLLIERIES LTD.

ENQUIRIES TO :

33, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA.

Phones : 22 { 2465, 2466, 2468, 3347

Gram : { JAIPURIA CALCUTTA

ডায়াপেপ্‌সিন

হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য্যই করা উচিত ডায়াপেপ্‌সিন সেই কার্য্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপ্‌সিন বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বল লাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপ্‌সিন ঠিক ঔষধ নহে. দুর্ব্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায়ক মাত্র।

ইউনিক্স ড্রাগ
কলিকাতা

রাধাবিনোদ মার্কা

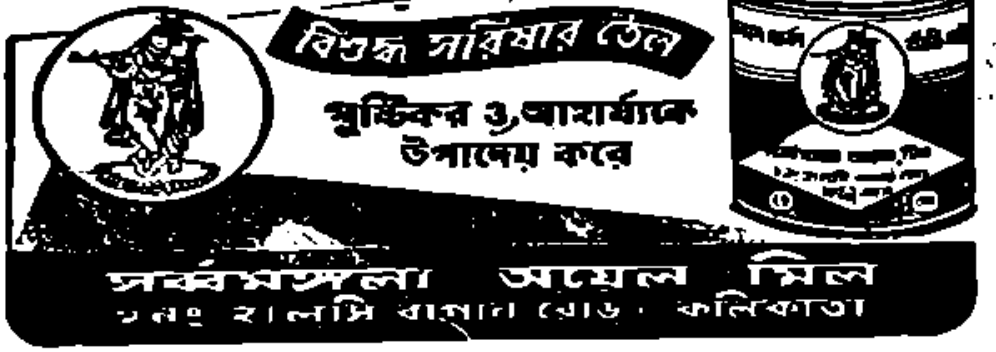

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নবগৌরাঙ্গ প্রেস, ১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ, হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত